গন্তব্য

গন্তব্য

ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ
কামিনী প্রকাশালয়
১১৫, অখিল মিস্ত্রী লেন,
কলিকাতা-৯

প্রকাশক ঃ
শ্রীশ্যামাপদ সরকার
১১৫, অখিল মিস্ত্রী লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ
মাঘ—১৩৬৫

প্রচ্ছদ ঃ
পার্থপ্রতিম বিশ্বাস

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীবিভাষ ঘোষ
৩৬, কৈলাস বোস স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

সূচি

গন্তব্য

দেওয়ালে ঠেসানো সাইকেলটা সোজা করে দু চার পা এগিয়েই হারু বুঝতে পারল পেছনের চাকায় হাওয়া নেই।

শালা, হারামির বাচ্চা! বাগদিপাড়ার ছেলেগুলো এখন নেই। তাতে অবশ্য গালি দিতে আটকায় না। ওরাই করে। আজ হারুর কপালে ভোগান্তি।

নিমগাছে সাইকেলটা লাগিয়ে ঝুঁকে পড়ে ভাল করে দেখে অবশ্য হারু বুঝতে পারল, ভর বিকেলে গালাগালটা অনর্থক খরচ হয়ে গেছে। হাওয়া খোলার কেস নয়। লিক। সারাতে উজিয়ে বাজার অবধি সন্তোষের দোকানে যেতে হবে। তার চেয়েও বড় কথা সারিয়ে আনতে আনতে সোনালি বেরিয়ে যাবে।

অনিকেত গুছিয়ে নিচ্ছিল।

—কী ব্যাপার হারুবাবু, মুখ শুকনো কেন?

—হারামি সাইকেলের বাচ্চা! পাংচার হবার আর সময় পেলি না? হল না স্যার। এদিক দিয়ে গেলে সোনালি পাবেন না। বরং ওদিকে হেঁটে গেলে মিলেও যেতে পারে। বড়ার চৌমাথায় শালা ভবানী মিনিট দশ দম মারে।...আমি কি সঙ্গে যাব?

ঘড়ি দেখে অনিকেত। তিনটে কুড়ি। শীতকালের তিনটে কুড়ি মানে দিনের বুড়ি। বাজারে সোনালি পৌঁছয় সাড়ে তিনটেয়। অসম্ভব। মাঠের পথ দিয়ে পিচ রাস্তায় উঠলে, যেতে মিনিট চল্লিশ লাগবে ঠিকই, কিন্তু হাঁপ-টাপ ছেড়ে, সোনালির পাইলট ভবানীর গাঁজার কল্কে ফাটিয়ে ওই অবধি পৌঁছনোর আগেই দেবীতলায় সোনালিকে ধরে ফেলতে পারবে অনিকেত।

রাস্তা চেনা, আলোও মুছে যায়নি। অনর্থক হারুকে আটকে রাখার মানে হয় না। ওর সাইকেলটাও বিকল। আজই সারিয়ে না নিলে বেচারি কাল নিষ্কর্মা বসে কাটাবে।

—থাক্। ঠিক পৌঁছে যাব।

রেক্সিনের ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে মোরামে ওঠে অনিকেত। কালভার্টের ওপর অর্জুন গাছটা অবধি পাশে পাশে হাঁটে হারু। আজ বেমক্কা দু-দুবার অনিকেতের সামনে মুখ খারাপ করে ফেলেছে, সে জন্য যে অনুতাপও হচ্ছে কথা না বলে হেঁটে চলাতেই তা মালুম। মাথাটি নিচু, চোখ মাটির দিকে। এতক্ষণ হারুর রডে বসলে শ্যালো থেকে রেপসিড সব কিছুই শুনিয়ে ছাড়ত অনিকেতকে। শোনা যে হল না সেটাই হারুর আফসোস যত, অনিকেতের তার থেকে কম নয়।

হারু ফিরে যেতেই অনিকেত একা।

শীতে কাঁপতে কাঁপতে তিনটে ছাগল ফিরে যাচ্ছে, একটার নিশ্চয়ই দলছুট হবার প্রবণতা, গলায় ঘন্টি বাঁধা; দ্রষ্টব্য কিন্তু ছাগল নয়, কঞ্চি হাতে পেছনে যে ছুটছে, খালি গা খালি পা কোমরে লেংটি, অনিকেতকে দেখেই ওপরের দুটো ফোকলা দাঁত দেখিয়ে

হেসে দিল, সেই পাঁচকড়ি। অন্য সময় হলে অনিকেতকে দেখলে ছুট লাগাত। ফাঁকা মাঠে অনিকেত ঢোঁড়া সাপ, সেই আনন্দেই অতখানি চওড়া হাসি। দেখতে দেখতে অনিকেত মোরাম ছেড়ে ধুলোতে গিয়ে উঠল।

এইবার চোখ নামাতে হবে। মাটিতে যে কত দ্রষ্টব্য! ভাঙা পাথর, খোলামকুচি, ঘাসের চাপড়া, ছাগলনাদি, গোবরের তাল। এইখান থেকে পাঁচশ গজ রাস্তা অনিকেতকে এইসব দেখতে দেখতেই যেতে হবে। রাস্তার দুপারে প্রকৃতির কোলে মানুষজন প্রাকৃতিক ক্রিয়াকর্মে ব্যাপৃত। ছেলেদের ও মেয়েদের পৃথক অঞ্চল। তাঁরা নিশ্চিন্তে বায়ুসেবন করবেন, আত্মীয়-বন্ধু-পরিজনদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন, চালের দাম থেকে বউমার গায়ের গয়না পর্যন্ত আলোচনা করবেন, কিন্তু একে অপরের দিকে তাকাবেন না। রাস্তা দিয়ে যারা যাবে, বিপদ তাদেরই। ভুল করেও যদি তাকিয়ে ফেলেছে, গাঁয়ে ঢিঢি পড়ে যাবে। মহিলারা দূর থেকে অনিকেতকে আসতে দেখেই ঘোমটায় মুখ আড়াল করছেন। মুখ ঢাকা থাকলে বাকিটুকু যদি দেখেও ফেলে পদযাত্রী, সে তো শনাক্ত করতে পারবে না!

বিল পার হয়ে মাঠ, আলে আলে যাওয়াই বিধি, তবে এখন ধান কাটা হয়ে গেছে। মাঠের মধ্যে নেমে শর্টকাট করেও এগিয়ে যাওয়া যায়। সময় ও দূরত্ব সাশ্রয়। তবে এবড়ো খেবড়ো মাঠে পা মচকে যাবার সমূহ সম্ভাবনা। কিছুক্ষণ এগিয়ে অনিকেত দেখল, যতখানি সাবধানে দেখেশুনে পা ফেলতে হচ্ছে তাতে সময় হরেদরে কম পড়ছে না। আবার আলেই উঠে পড়ল ভেবেচিন্তে।

লোকালয় পার হয়ে যাচ্ছে অনিকেত। ছোট ছোট মাটির ঘর, তার অন্তর্গত উচ্ছ্বাস ও দীর্ঘশ্বাস পেছনে ফেলে আমবাগান। এখানকার আমে আঁটি ও খোসাছাড়া বাকি আমত্বটুকু অনুপস্থিত। ছায়া এবং আমকুড়ানোর আনন্দ এইটুকুই মানুষকে দিয়ে এসেছে এই শতাব্দীপ্রাচীন বাগান।

একসময় আমবাগানও শেষ হয়ে যায়। কবরস্থান। একটি চতুষ্কোণ ভূমির আড়ালে থাকা মানুষের দেহাবশেষ এই স্থানটিকে সন্ধ্যার পর মানুষের অগম্য করে রেখেছে। গ্রামে সংস্কার এখনও চাঁদোয়ার মতো টাঙানো থাকে আকাশ আড়াল করে।

বাসরাস্তা দেখা যাচ্ছে দূরে। দূর, কিন্তু ছোট গাড়ি বড় গাড়ি তফাত করা যায়।

সোনালি! ওইরকমই ধরন এ দিকে। বাসের নাম সোনালি, মাধবী, গোলাপি। আবার অন্য নামও আছে, মায়ের আশীর্বাদ, খোকাবাবু, বিনোদকুমার। মানুষও আদর করে ওইসব নামেই ডাকে।

নাম! ভাবতে গিয়ে অনিকেত নিজের মনেই হেসে ফেলে। অনিকেত! দূরদৃষ্টি ছিল ঠাকুর্দার। বেঁচে থাকলে মাথায় হাত দিয়ে বলতেন, সার্থকনামা হও দাদুভাই! ছুটছে যে, কোথায় চলেছে অনিকেত? কোন বাড়া ভাত নিয়ে কে ডাকছে অনিকেতকে?

দহ। কোনও নদীর সঙ্গে চোরা যোগ আছে হয়তো। প্রখর গ্রীষ্মেও জল শুকোয় না। শীতে সাইবেরিয়ার পাখি আসে। একটু আগেও ঘুরে ঘুরে উড়ছিল, এখন আর দেখা যাচ্ছে না। দহের পশ্চিমে আবছা দেখা যাচ্ছে বাসরাস্তা হেঁটে মিনিট পাঁচেক। সোনালিকে আসতে দেখলে তাড়াতাড়ি হেঁটে গিয়ে ধরে ফেলতে পারবে অনিকেত।

জলের ধারে একটা কাঁঠালিচাঁপার গাছ। গন্ধটা টানে অনিকেতকে। অবশ করে দেয়। উঠতে ইচ্ছে করে না। জলের দিকে পা বাড়িয়ে বসতে বসতে একটা গোপন দৃশ্য দেখে

ফেলে অনিকেত। পুবে বাঁশঝাড়ের ওপরে চাঁদ উঠছে চুপিচুপি, গোপনে, অস্ত যাওয়া সূর্য যেন দেখতে না পায়। অতঃপর সারারাত চাঁদ ও চরাচর যে অবৈধ প্রেমে নিরত থাকবে, তা থেমে যাবে সূর্যের প্রথম কিরণের আগেই।

জল। উড়ে জায়গা বদল করে গঙ্গাফড়িং, মাছরাঙা শেষ শিকার মুখে নিয়ে উড়ে যায়, ঘোলা জল ঈষৎ আলোকিত হয় পড়ন্ত আলোয়।

বসে থাকে অনিকেত। শীতে হাত-পা শক্ত হয়ে আসে, অন্ধকার নেমে আসে ঝুপ করে, দূরে রাস্তায় গাড়িগুলো হেডলাইট জ্বালিয়ে ফেলে। সোনালি, সময় হয়ে এল, আর দেরি করলে পাওয়া যাবে না, যাওয়া হবে না অনিকেতের, তবুও পা যেন টেনে ধরে পেছন থেকে।

হঠাৎই অন্ধকারে খসখস আওয়াজ শোনা যায়। পাতাঝরার শব্দ? শুকনো পাতা মাড়ানোর আওয়াজ? কে? এই সন্ধ্যায়? এই অন্ধকারে?

পেছন ফিরে দেখার চেষ্টা করে অনিকেত।

তারপর আরও শব্দ। অন্ধকার ছিন্ন হয়।

আকাশে মেঘ ছিল না। সূর্যের অন্তিম আলোয় ছিল না তেমন রক্তাভা। দহের জল তবুও হঠাৎ রং বদল করে। কেউ যেন সিঁদুর গুলে দিয়েছে।

দুই

—ব্যালকেম নাকি লাক্ষাদ্বীপ নিয়ে যাচ্ছে?

—হ্যাঁ।

—আপনাকে বলেছে?

—না।

নীল সাফারির মুখ থেকে অনেকগুলো ভাঁজ মিলিয়ে গেল।

—কাদের বলেছে, মানে ওদের সিলেকশন ক্রাইটেরিয়া কিছু জানেন?

—ঠিক বলতে পারব না, তবে শুনেছি, যে নতুন ওষুধটা বিগত যৌবনদের যৌনক্ষমতা ফিরিয়ে দিচ্ছে সেটার প্রেসক্রিপশনের ওপরেই ওরা অ্যাসেস করছে। কম্পিউটার রেকর্ড মেইনটেইন করছে। এক হাজারের ওপর প্রেসক্রিপশন বেরুলেই ইনভিটেশন।

—তার মানে দরকার আছে কি না, দিলে কোনও ক্ষতি হবে কি না, অন্য ওষুধের সঙ্গে ইন্টারঅ্যাকশন আছে কি না কিছুই দেখার দরকার নেই?

—দরকার অবশ্যই আছে। তবে এই দরকার আপনার মাথায় ঢুকে থাকলে আপনার কপালে লাক্ষাদ্বীপ নেই।

শূন্যদৃষ্টিতে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিলেন নীল সাফারি। ধূসর স্যুট তাঁকে আশার বাণী শোনালেন,—অবে ঘাবড়াবার কিছু নেই। গুজরাট ফার্মা মার্চ-এ মরিশাস নিয়ে যাচ্ছে।

দুটো চোখে বাল্‌ব ফিট করে সাফারি এদিকে ফিরলেন,—বলেন কী, মরিশাস?

—হ্যাঁ, যাদের ব্যালকেম নিয়ে যাচ্ছে না তাদের মধ্য থেকেই চুজ করবে ওরা।

—তা হলে তো আমাদেরও চান্স আছে, কী বলেন?

—অবশ্যই। তবে নতুন যে অ্যান্টিবায়োটিকটা ওরা মার্কেট করেছে, ফোর্থ জেনারেশন কেফালোস্পোরিন, এক একটা ইঞ্জেকশন টু থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড, দিনে চারটে করে নিতে হয় দু সপ্তাহে, সেটা আগামী দু মাসে যে অন্তত একশো প্রেসক্রাইব করবে, তাকেই ওরা মরিশাস্ নিয়ে যাবে।

—ডিয়ার ফ্রেন্ডস্!

নীল সাফারি ও ধূসর স্যুটের কথোপকথন থেকে কান টেনে নিতে বাধ্য হল সম্বুদ্ধ। মিটিং শুরু হয়ে গেছে। মঞ্চে সভাপতি ও সম্পাদক আসন গ্রহণ করেছেন। এক পাশে চেয়ারের ওপর অনিকেতের ছবিটা রজনীগন্ধা-বেল ফুলের মালা-চন্দনে ঝলমল করছে। টেবিলের ওপর সাদা চাদরটার মতোই সমবেত ভদ্রমণ্ডলী শোক ও সন্তাপে নিষ্কলুষ। প্রত্যেকটি সাফারি-স্যুট-টাই-সোয়েটারের বুকের কাছে একফোঁটা কালো ব্যাজ শোকের চিহ্ন বহন করে পরিবেশকে যথোচিত গাম্ভীর্য প্রদান করেছে।

সভাপতি ইংরিজিতে শুরু করেও নিজেকে সংশোধন করে নেন,—প্রথমেই এক মিনিট নীরবতা।

সবাই একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল। মাথা নিচু। তার মধ্যেই আড়চোখে সম্বুদ্ধ দেখল। নীল সাফারি কড় গুনে হিসাব করছেন। দু মাসে একশো। তার মানে ষাট দিনে একশো। অর্থাৎ দিনে অন্তত দুটো প্রেসক্রিপশন করলে তবেই মরিশাস।

—বসুন। এবারে আমি সম্পাদক ডক্টর প্রীতম সমাদ্দারকে অনুরোধ করছি পরলোকগত ডক্টর অনিকেত চৌধুরীর ছবিতে মাল্যদান করার জন্যে।

মাল্যদান। এই পর্বটা সম্বুদ্ধকে চিরকালই কমিক রিলিফ দেয়। এক একজনকে ডাকা হয়, তাঁর নাম ও পদমর্যাদা ঘোষণা করে। তাঁরা শীর্ণ একটি বেলফুল অথবা গাঁদাফুলের মালা ছবিটির ঘাড়ে অর্পণ করেন। হিন্দিতে বলে মালা চড়ানো। সেটাই যথাযথ। পরে বুঝতে শিখেছে, এই পর্বটার লক্ষ্য মৃত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন নয়, উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিদের পদমর্যাদা ঘোষণা করে তাঁদের আপ্যায়ন।

শুকনো ও শীর্ণ ফুলের মালাও অনেক জড়ো হলে তার ভার কিছু কম হয় না। অনিকেত ঢেকে গেল। একদিক থেকে ভালই হল। ওর মুখটা, বিশেষত চোখ দুটো একগাদা কৌতুক জড়ো করে তাকিয়ে হেসে চললে মিটিং-এর শেষ অবধি সম্বুদ্ধর থাকাই কঠিন হয়ে যেত।

—প্রথমেই ডক্টর সমাদ্দার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ডক্টর চৌধুরীর স্মৃতিচারণা করবেন।

—বন্ধুগণ! চাঁছা গলা, এই গলাই প্রীতম সমাদ্দারকে ঠেলতে ঠেলতে সম্পাদকের চেয়ার অবধি এনে ফেলেছে,—আমরা আজ কোনও বিশেষ দাবি-দাওয়া-আন্দোলন উপলক্ষে জমায়েত হইনি। আজ আমাদের সমবেত হবার কারণ আমাদের একজন সদস্যের অকালমৃত্যু। আমরা শোকাহত। আপনারা সকলেই জানেন, ডক্টর চৌধুরী প্রাণ দিয়েছেন একটি গ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কাজ করতে গিয়ে। কী পরিস্থিতিতে তিনি মারা গিয়েছেন সেটা তদন্তসাপেক্ষ। আমরা শুধু বলতে চাই একটি প্রতিশ্রুতিবান তরুণ প্রাণ অকালে ঝরে গেল। আমার বক্তব্য আমি দীর্ঘায়িত করব না। ডক্টর চৌধুরীর ঘনিষ্ঠ অনেকেই এখানে আছেন। তাঁদের বলবার সুযোগ দিয়ে আমি আসন গ্রহণ করছি।

ঘড়ি দেখলেন সমাদ্দার। চারটে থেকে চেম্বার। এখনি না উঠলে দেরি হয়ে যাবে। সভাপতির কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে ধীরে সভার গাম্ভীর্য বজায় রেখে প্রস্থান করলেন।

তারপর বক্তৃতা। একের পর এক বক্তা মঞ্চে আরোহণ করে তাঁর সমস্ত সন্তাপ উজাড় করে সভাপতির অনুমতি নিয়ে বিদায় নিতে থাকলেন।

উপস্থিত জনসমাগম যখন রোগা হতে হতে অর্ধেকে গিয়ে ঠেকেছে, সম্বুদ্ধর মনে হল, এখনি তার যা বলবার বলে ফেলা দরকার।

উঠে দাঁড়াল সম্বুদ্ধ।

—বলুন ভাই, আপনি কিছু বলবেন?

সম্বুদ্ধ ঘাড় নেড়ে এগিয়ে গেল মঞ্চের দিকে।

নিজের নামটা সভাপতিকে জানিয়ে সম্বুদ্ধ শুরু করল,—এখানে যাঁরা উপস্থিত আছেন সকলেই ডাক্তার। নতুন করে বলবার প্রয়োজন নেই, আমরা প্রত্যেকেই অসুস্থ রোগীদের সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করেছি। প্রশ্নটা সেখানে নয়। রোগীদের সেবা করা, অথবা সরকারি চাকরি নিয়ে গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কাজ করতে যাওয়ার জন্য নিজের নিকটজন কারও প্রতিই কোনও দায় থাকবে না এমন তো হতে পারে না।

অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদকের গলা চুলকোচ্ছিল। বলে উঠলেন, তার মানে কি আপনি বলতে চাইছেন, অ্যাসোসিয়েশন রেজলিউশন নেবে, এবার থেকে আর কোনও ডাক্তার হেল্‌থ্ সেন্টারে চাকরি করতে যাবে না?

ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ ও উপহাস-সমৃদ্ধ জনা তিরিশ মুখের দিকে তাকিয়ে সম্বুদ্ধ বলল, একেবারেই নয়। অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হিসাবে আমাদের কর্তব্য জানতে চেষ্টা করা, কী পরিস্থিতিতে আটাশ বছরের এক তরুণ চিকিৎসক গ্রামে চাকরি করতে গিয়ে মারা যান। বোঝা, আরও যে সব তরুণ একইভাবে গ্রামে হেল্‌থ্ সেন্টারে যোগ দেবেন, তাদের জন্যেও একই ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করে আছে কি না। আমাদের একজন তরুণ সদস্য মারা গেছেন এই বলেই অ্যাসোসিয়েশন হাত ধুয়ে ফেলতে পারে না।

স্তব্ধতা। একটি আনুষ্ঠানিক শোকসভার শান্ত সমাহিত চেহারা, খবরের কাগজে যাকে "ভাবগম্ভীর পরিবেশ" বলা হয়ে থাকে, সেটা টাল খেয়ে গেছে। মানুষগুলো বিরক্ত। ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত। সকলেই ভদ্রতার মুখোশ এঁটে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজছে।

—তা হলে এই সভার কাছে আপনি কী আশা করেন ডক্টর সেন?

—একটি প্রস্তাব। শোকপ্রস্তাব যেমন যাবার যাবে, ডক্টর অনিকেত চৌধুরীর নিকটাত্মীয়ের কাছে একটি শুকনো কাগজের টুকরোর বেশি যার কোনও মূল্য নেই। একই সঙ্গে প্রস্তাব নেওয়া হোক, অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে একটি টিম সরেজমিন তদন্ত করার জন্যে ওই হেল্‌থ্ সেন্টারে যাবে। দরকার হলে স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে কথা বলবে। প্রয়োজন হলে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন-এর কাছে নির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ করবে।

—ডাক্তারি ছেড়ে গোয়েন্দাগিরি? যুগ্ম- সম্পাদক এতক্ষণে মুখ খুললেন।

—না না, এটা হালকাভাবে নেবার জিনিস নয়, সভাপতির খেয়াল হয়েছে ব্যাপারটা আরও গড়াতে দিলে পরের বছর নির্বাচনে এটাকেই বিরোধীপক্ষ ইস্যু করতে পারে,—ঠিক আছে, তদন্তকারী টিম-এ কে কে থাকবেন এখানেই ঠিক হয়ে যাক।

সম্বুদ্ধ প্রথমেই হাত তুলল, আমি।

দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ কোনও হাতই ওঠে না দেখে সভাপতিকেই আবার বলতে

হল,—আমার মনে হয় কাছাকাছি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আছেন অজিত পত্রনবিশ, আর জেলাসদরে পোস্টেড বিপুল মণ্ডল। আপনারাও ডক্টর সম্বুদ্ধ সেনকে অ্যাকমপ্যানি করবেন।

বেরিয়ে আসতে আসতে সম্বুদ্ধ দেখল কে একজন অনিকেতের ঘাড়ের ওপর থেকে ফুলের বোঝা সরিয়ে নিচ্ছে।

তিন

উর্দিপরা দারোয়ান, কাঁটাতারওয়ালা পাঁচিল এবং লেজ কাটা কুকুর। তিন ধাপ পেরিয়ে ড্রয়িংরুমে পৌঁছে পুরু কার্পেটে পা ডুবে গেল সম্বুদ্ধর। কার্পেটে কি জুতো খুলে ঢুকতে হয়? ভাবতে ভাবতেই সোফা। এত নরমও সোফা হয়? কোমরে বাত হয় না মানুষগুলোর?

খবর গিয়েছিল ওপরে। ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে যিনি নেমে এলেন, তাও কম করে দশ মিনিট পর, মিলির সঙ্গে তাঁর মুখের মিলই মনে করিয়ে দেয় সম্পর্ক। বয়েস অন্তত পঞ্চাশ। প্লাক করা ভুরু। মেয়ের ক্লাশমেটকে মিট করার জন্যেও ঠোঁটে লিপস্টিক ঘষে এসেছেন। পেছনে কফির প্লেট হাতে বেয়ারা।

—তুমি মিলির বন্ধু? একসঙ্গে পড়তে?...বোসো, ও ক্লাবে গেছে, এসে পড়বে।

বাইরে থেকে ইন্টারকমে নাম-পরিচয়-ঠিকুজি সব বলে আসতে হয়েছে। উত্তরগুলো আগেই জেনেছেন। তবু ঘাড়টা কাত করল সম্বুদ্ধ। মনে মনে বলল,—ক্লাশমেট শুধু মিলির নয়, অনিকেতেরও।

—কী ঝড়টা গেল বলো তো মেয়েটার ওপর দিয়ে? কতটুকুই বা বয়েস? অতবড় একটা শক্!

ঝড়। মিলির ওপর দিয়ে। সবকিছুর জন্যেই অবশ্য অনিকেতই দায়ী।

—বারবার বারণ করেছিলাম আমরা। আমি, মিলির বাবা। প্রথম থেকেই রিলেশনটা আমরা ডিসঅ্যাপ্রুভ করেছিলাম। কালচারেও এত ইনকম্প্যাটিবিলিটি। কোথায় আমরা, কোথায় ওরা। গোড়ায় ভেবেছি কমবয়েসের বন্ধুত্ব, ইনফ্যাচুয়েশন, কেটে যাবে। সাবধান করতে করতেই তো রেজিস্ট্রি টেজিস্ট্রি করে একেবারে...। একটা ইমম্যাচিওর ফুল, আইডিওলজিস্ট হামবাগ। কী, না দেশের সেবা করবে। কী, না গ্রামে ডাক্তারি করবে। আপনি বাঁচলে তবে না বাপের নাম! কোথায় রইল তোর সাফারিং হিউম্যানিটি?...ওই যে মিলি এসে গেছে। আমি যাই। আজ আমাদের অ্যানিম্যাল লাভার্স অ্যাসোসিয়েশনের অ্যানুয়াল মিট, আমি আবার ভাইস প্রেসিডেন্ট।

মিলি ড্রয়িংরুমে অর্ধেক ঢুকে সম্বুদ্ধকে দেখেই ডান হাতের তর্জনী, মধ্যমা আর অনামিকা নাচাল,—হাই। কখন এলি? একটু বোস, আমি দু মিনিটের মধ্যেই ফ্রেশ হয়ে আসছি।

টাইট জিনস্, পনিটেল, লিপস্টিক-মাস্কারা, হাই হিলস্। সুগন্ধের ঝড় তুলে খটখট করে দোতলায় উঠে গেল মিলি।

অনিকেতকে জিজ্ঞেস করেছিল সম্বুদ্ধ,—কী দেখলি ওর মধ্যে?

ওদের প্রায় লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট। ফার্স্ট ইয়ার থেকে একসঙ্গে ঘোরাঘুরি। ফাইনাল দিয়েই রেজিস্ট্রি। আগুনের মতো রূপ নিয়ে ছুটে বেড়াত মিলি। অনিকেত ছিল আইসক্রিমের মতো ঠাণ্ডা।

সম্বুদ্ধর সঙ্গে অনিকেতের ঘনিষ্ঠতাটা ইনটার্নশিপে। ততদিনে অনিকেত ব্যাচেলারত্ব খুইয়েছে। সম্বুদ্ধর প্রশ্নের জবাবে কফির কাপ থেকে ঠোঁট তুলে অনিকেত উত্তর দিয়েছিল, উত্তরে কফির উত্তাপ ছিল না,—জানিস তো ইংরিজিতে দুটো আলাদা শব্দ, টু সি, আর টু লুক। লুক থেকে সিতে পৌঁছতে যতটা সময় লাগে ততদিনে সম্পর্কটা এমন গভীর হয়ে যায়, এত জটিল কেমিস্ট্রি সব এসে যায় যে আর তখন ফেরা যায় না। তা ছাড়া ও আমাকে ভালবাসে সম্বুদ্ধ, আমার কাছে সেটাই ওর সবচেয়ে বড় যোগ্যতা।

অনিকেতের গভীর সম্পর্ক, অনিকেতের ভালবাসা এখন সম্বুদ্ধর সামনে বসে আছে। ফিনফিনে নাইটি, ওপরে হাউসকোটটাও চাপায়নি। ডানপাটা সামনে টান করা, নাইটি উঠে গেছে হাঁটুর কাছাকাছি। ফর্সা নির্লোম পাখানায় সম্বুদ্ধর জন্যও কি কিছু লেখা আছে?

—কিছু করার ছিল না জানিস! অনেক বুঝিয়েছি। কিছুই বুঝতে চাইত না। ওর ব্যাকগ্রাউন্ড, ফ্যামিলি, পলিটিক্যাল কনসেন্স, আরও কীসব কীসব, মাথাটাই বিগড়ে গিয়েছিল। না হলে ওইরকম রেজাল্ট-এর পরেও কেউ মরতে গ্রামে গিয়ে পড়ে থাকে?

গন্ধটা বদলে এসেছে মিলি। ঘরে ঢুকেছিল যে পারফিউমের গন্ধ সঙ্গে করে, ওপরে উঠে স্নানটান সেরে সেটা পালটে অন্য কিছু মেখেছে। এটার গন্ধ আরও মোহময়, মৃদু, কিন্তু মাদকতা আরও বেশি।

—একলা থাকত, তুই সঙ্গে যাবার কথা ভাবিসনি?

—পাগল? আমি? ওই এঁদো গ্রামে? জানিস একটা ভাল বাথরুম অবধি নেই! ও গল্প করেছিল, বালতিতে জল ভরে টয়লেটে ঢুকতে হয়। কমোড নেই, ফ্লাশ নেই, মগে জল তুলে ঢালতে হয়। মশা, সাপ, অন্ধকার। মাগো!

মনে মনে হিসাব করে সম্বুদ্ধ। অনিকেতের মৃত্যুর বয়েস একমাস সতেরো দিন। সাতচল্লিশ দিনের বিধবা একটি হিন্দু নারী তার সামনে বসে মৃত স্বামীর গল্প শোনাচ্ছে। সম্বুদ্ধ কি শভিনিস্ট হয়ে যাচ্ছে? অথবা মৌলবাদী?

—অনিকেত কখনও কিছু বলেছে তোকে? আই মিন, কখনও কথায় কথায়, অথবা ধর চিঠিতে, কোনও ক্লু,...মানে বলতে চাইছি, এই যে ওর আনটাইমলি ডেথ, মার্ডারই বলা ভাল, কোনও ব্যাকগ্রাউন্ড? মনে পড়ে কিছু?

কাঁধ শ্রাগ করল মিলি। ঝুঁকে এল,—তোর কফিটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। আর এক কাপ আনতে বলি?

চোখ সরিয়ে নিল সম্বুদ্ধ। অনিকেতের স্ত্রী, যদিও একদা, সম্বুদ্ধর কাছে অনিকেত এখনও জীবিত, ভীষণ। সম্বুদ্ধর অপরাধী মনে হচ্ছিল নিজেকে, মিলির এত কাছাকাছি।

—না থাক, একটু ভেবে বলতে পারিস, অনিকেত কিছু...?

—একটা কথা তোকে বলি, অনিকেত জানত না। আমার তো ইংলিশ মিডিয়াম ব্যাকগ্রাউন্ড, ফার্স্ট-ল্যাঙ্গুয়েজও স্কুলে হিন্দি ছিল, বাবা বাংলা পড়া একদমই পছন্দ করতেন না। তা অনিকেত আমাকে যে সব চিঠি টিঠি লিখত, বেশিরভাগই, বলা উচিত সবগুলোই বাংলায়। প্রথম দিকে, আমাদের অ্যাফেয়ারের গোড়ার পিরিয়ডটাতে,

সুচেতনা, মনে আছে তোর, সেই যে খুব ফর্সা, বালুরঘাট, ওকে দিয়েই চিঠিগুলো ডেসিফার করিয়ে নিতাম। জবাব অবশ্য লিখতাম ইংলিশেই। অনিকেত কিছু মনে করত না। শেষের দিকে, মানে আফটার ম্যারেজ, লাস্ট সিক্স মান্থ তো বটেই, ওর কোনও চিঠিই পড়তাম না। খুলেও দেখিনি কী লিখত। ইন্টারেস্টই চলে গিয়েছিল।

—কেন?

—এক কথা, বইয়ে লেখা ডাক্তারি শাস্ত্রটা মিথ্যে। যে খেতে পায় না তাকে ওষুধ কিনতে বলা এক ধরনের হিপোক্রিসি। আরে বাবা, অতই যদি খারাপ লাগে, চাকরিটা করা কেন? কত বুঝিয়েছি, ছেড়ে দাও। ওই কটা তো টাকা! প্র্যাক্টিস করলে সাতদিনে উঠে আসবে। আমাদের কাছ থেকে না নিতে চাও, ব্যাঙ্ক লোন নাও, বিদেশে চলে যাও, মেম্বারশিপ করে ফিরে এসো। নতুন নতুন প্রাইভেট সেন্টার ডেভেলপ করছে কলকাতায়, কোথাও একটা অ্যাটাচমেন্ট নাও। যা বইয়ে লেখা আছে তার সব কিছুই অ্যাপ্লাই করতে পারবে।

—অনিকেত কী বলত?

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মিলি। ভারী বুক ওপর-নীচ করল দুবার। নিশ্বাসে সুগন্ধ ছড়িয়ে বলল,—কিছুই বলত না। চুপ করে থাকত। বেশিক্ষণ থাকতে চাইত না এখানে। এসেই পালাই পালাই করত।

—পালিয়ে কোথায় যেত?

—কোথায় আবার? সেই হেল্‌থ্‌ সেন্টারেই? বাবা মারা যাবার পর রানাঘাটের বাড়িতে তো তেমন কেউ ছিল না। শুনেছি ওর দাদা নাকি ব্যাঙ্ক না কাকে ভাড়া দিয়েছেন। ও যেত টেত না বিশেষ। এখানে আসত, আর ছুটে ছুটে ফিরে যেত হেল্‌থ্‌ সেন্টারে।

সম্বুদ্ধ ঘড়ি দেখল,—তা হলে তোর কোনও আইডিয়া নেই, কেন অনিকেতের মতো একটা ছেলে, ওইরকম কেরিয়ার, অত ব্রিলিয়ান্ট, ওইভাবে বেঘোরে মারা গেল!

আড়মোড়া ভাঙল মিলি,—না রে, আমি তোকে এ ব্যাপারে কোনওরকম হেল্প করতে পারব না। এটুকু বলতে পারি, অনিকেতের ডেথ আমার কেমন মনে হয়, এক ধরনের সুইসাইড। প্রফেশনালি তো ও আগেই মরে গিয়েছিল। আর এই দুটো বছরে একটু একটু করে, ইমোশনালিও শেষ হয়ে গিয়েছিল।

ড্রয়িংরুমের দরজা অবধি এগিয়ে দিল মিলি। ড্রয়িংরুম থেকে বেরিয়ে সম্বুদ্ধ বাইরে লনে পা ফেলার আগেই গেট বন্ধ হয়ে গেল। মিলি উঠে গেল ওপরে। জীবনের অনেকগুলো বছর অনিকেতের জন্যে অপচয় করে ফেলেছে মিলি। এখনও সময় আছে। তাই একটুও বাজে খরচ করতে চায় না।

পাঁচিল পেরিয়ে বাইরের রাস্তায় এসে আর পেছন ফিরে তাকাল না সম্বুদ্ধ।

চার

শিয়ালদা স্টেশন থেকে বাইরে বেরিয়ে দু'মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলাম। রানাঘাট, বুঝতেই পারছিস, মফস্সল শহর। কাঁচা নর্দমা, খাটা পায়খানা, পানাপুকুর। থাকতামও আমরা কলোনির দিকে। তবুও গাছপালা, আকাশ, হাওয়া সবই ছিল পর্যাপ্ত। এ কোথায় এলাম?

এত মানুষ? এত যানবাহন? এত দোকান? আর মানুষগুলোর কেমন অদ্ভুত ধারা! সবাই হাঁটছে, অথবা ছুটছে। পাশেরজনের দিকে তাকানো নেই, দুদণ্ড জিরনো নেই, দুটো সুখদুঃখের কথা নেই। যেন কেউ তাড়া করছে পেছন থেকে। যেন পৌঁছতেই হবে। যেন ঠিক সময়ে ঠিক গন্তব্যে পৌঁছনোর ওপরেই বাঁচা-মরা। এ-ই কলকাতা?

কোন সকালে বেরিয়েছি! খিদে পেয়ে গিয়েছিল। রিটার্ন টিকিট কেটে এসেছি। পকেটে তখনও গোটা পাঁচেক টাকা পড়ে আছে। একটা জায়গায় লেখা দেখলাম— পাইস হোটেল। গুটি গুটি সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। সেই যাওয়াটাই যে কী কঠিন, এখনও ভাবলে হাত পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যায়। রাস্তা পার হওয়া। শিয়ালদা স্টেশনের বাইরে রাস্তা পার হওয়া একটা নিখাদ গাঁইয়া ভূতের পক্ষে কী কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল তুই কল্পনাও করতে পারবি না।

যা বলছিলাম, পাইস হোটেল। ঢুকতে গিয়ে থমকালাম। কালো বোর্ডের ওপর খড়ি দিয়ে গোটা গোটা করে লেখা—ভাত ডাল তরকারি পাঁচ টাকা, রুই মাছ ছয় টাকা, পাবদা/ইলিশ/ভেটকি দশ টাকা। পকেটে হাত ঢুকিয়ে তাড়াতাড়ি সবেধন নীলমণি পাঁচ টাকার নোটটা ছুঁয়ে দেখে নিলাম। ভাত ডাল তরকারিটুকুই পড়ে আছে। কিন্তু গোটাটাই খরচ করে ফেলব? যদি দরকার পড়ে? বাস ভাড়া? কতদূর কিছুই তো জানি না।

বেরিয়ে এলাম। এদিকে ওদিক তাকাতে নজরে পড়ল রাস্তার ওপরেই হাতে হাতে প্লেটে ঘুঘনি বিক্রি হচ্ছে। এগিয়ে দাম জিজ্ঞেস করলাম। দু টাকা। হাতে গড়া রুটি সঙ্গে, আট আনা এক একটা। দুটো রুটি আর ঘুঘনি খেয়েও দু টাকা রইল।

জলটা ফ্রি পাওয়া গেল। পেট ভর্তি করে জল খেয়ে নিলাম। বলা যায় না, অন্য কোথাও এটারও দাম লাগতে পারে। স্টেশনের মাথায় মস্ত ঘড়িটায় চোখ গেল। বেলা হয়ে যাচ্ছে। একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, মেডিক্যাল কলেজ।—সিধে চলে যান, মাথা না তুলেই জবাব দিল। কোন সিধে? হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, আর একজন আঙুল তুলে দেখাল। সোজা পশ্চিম দিকে যে রাস্তাটা বেরিয়ে গেছে, সেটা ধরে একটা মোড় ছেড়ে দ্বিতীয় মোড় থেকে ডান দিকে। হাঁটা দিলাম। সবজির পাহাড়। পচে পাঁক। আমার হাওয়াই চপ্পলের একটা স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে গেল। ভাগ্যিস জামার বোতাম ছিল না সবকটা, সেফটিপিন দিয়ে আটকানো ছিল, সেটাই খুলে চটিটা সামলে নিলাম তখনকার মতো। খানিকটা এগিয়েই আবার চমক।

একই রাস্তার এদিক-ওদিক এত তফাত! দু পাশে ঝকঝক করছে সোনা-রুপো-গয়নাগাঁটি। হয়তো হিরে-মুক্তোও। দেয়ালজোড়া আয়নায় ছেঁড়া জামা ছেঁড়া চটি ক্যাবলাকান্ত নিজেকে দেখতে দেখতে খুঁজে খুঁজে একসময় পৌঁছে গেলাম মেডিক্যাল কলেজে।

সেখানেও আর এক হ্যাঙ্গাম। রোগী-অ্যাম্বুলেন্স-আত্মীয়স্বজন-ব্লাডব্যাঙ্ক। ভিড়ে

ভিড়াক্কার। কেউ ভাল করে কথাই বলতে চায় না। শেষে কাঁধে স্টেথোস্কোপ এক বাচ্চামতো ডাক্তারকে দেখতে পেয়ে সাহস করে জিজ্ঞেস করলাম। সে আমার আপাদমস্তক দেখল। তারপর নাক সিঁটকে বুড়ো আঙুল দিয়ে একটা লালবাড়ির অন্ধকার কোণ দেখিয়ে হনহন করে চলে গেল।

ও বাবা, এখানেও তো ভিড় কিছু কম নয়। থই থই করছে মানুষ। ধোপদুরস্ত জামাকাপড় পরা লোকজন। মহিলাও আছেন কয়েকজন। কিন্তু আমার বয়সী ছেলে কোথায়? এরা কারা?

খোঁজ নিতে জানা গেল, এরা সকলেই রেজাল্ট দেখতে এসেছেন। ছেলেমেয়ের। তারাও আমারই মতো পরীক্ষা দিয়েছে। কিন্তু নিজেরা কেউ আসেনি। আমি অবশ্য এসেছি নিজেরটা নিজেই দেখে নিতে। আজই কাগজে বেরিয়েছে, জয়েন্ট এন্ট্রান্সের ফল টাঙানো হবে। দেখে বাবার কাছে ছুটে গেছি, টাকা চেয়েছি। টাকা চাইলে বাবা কেমন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। চাই না তো বিশেষ তাই দিয়ে দিল। কিন্তু রেজাল্ট? কোথায়? পরপর আঠারো খানা লিস্ট। প্রত্যেকটা কাগজের সামনে অন্তত পঞ্চাশজন মানুষ। যেটায় ভিড় সবচেয়ে কম সেটা দিয়েই শুরু করলাম। ভিড় ঠেলে সামনে পৌঁছে নীচ থেকে পড়তে পড়তে ওপর অবধি পৌঁছে দেখলাম এই লিস্টটা শিডিউল-ট্রাইবদের। আবার পরেরটা। তারপরেরটা। এই ভাবে একটার পর একটা কাগজ পড়ে যাচ্ছি, কোথাও আমার নাম নেই।

· খেয়াল করিনি, গুড়গুড় করে মেঘ ডাকল। এমনিতেই জায়গাটা ঘুপচিমতো, অন্ধকার। তারপর মেঘ করে অন্ধকার যেন আরও জমাট বেঁধে এল। লোকজনও চলে যেতে শুরু করেছে। র‍্যাঙ্ক অনুযায়ী লিস্ট টাঙিয়েছে। দুই থেকে সতেরো পাতা দেখা হয়ে গেছে। একটাই বাকি। জানি নেই, তবু এতদূর এসেছি, না দেখেই ফিরে যাব?

একজনই রয়েছেন তখনও। মধ্যবয়সী ভদ্রলোক। উনিও শেষ পাতাটাই দেখছেন। লাইটার জ্বালিয়ে। মেঘ আরও ঘন হয়েছে। হাওয়া দিচ্ছে এলোমেলো। লাইটার নিভে যাচ্ছে বারবার। ভদ্রলোক দেখছেন তলা থেকে। পাতায় গোটা চল্লিশেক নাম। চল্লিশ নম্বর থেকে শুরু করলাম। নেই নেই নেই নেই। দশ-আট-সাত-ছয়। উঠছি। দুই। থমকালাম। অনিকেত চৌধুরী। বসে পড়লাম।

থামল অনিকেত।

তারপর? সম্বুদ্ধ জিজ্ঞেস করেছিল।

ভদ্রলোকের দেখা হয়ে গিয়েছিল। লাইটার নিভিয়ে চলে যাওয়ার আগে আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। চোখ দেখতে পাইনি। না দেখলেও জানি সে চোখে অনুকম্পা ছাড়া আর কিছু ছিল না। ধরেই নিয়েছিলেন পাইনি। কোনও কথা বলেননি। একটি পুরনো লালবাড়ির একতলায় থামওয়ালা দীর্ঘ অলিন্দে একা মাটিতে বসে আমি অন্ধকারকে শুনিয়ে বলেছিলাম, আমি পেরেছি।

ফেরার পথে বৃষ্টি নামল। ভেজা আমার অভ্যেস আছে। কিন্তু এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। জল জমে জমে হাঁটু ছাড়িয়ে কোমর অবধি উঠে এল, জল, পচা আনাজ, ওপচানো নোংরা সব মিলিয়ে এক কদাকার বস্তু। তা-ই ঠেলে ঠেলে হাঁটছি। একা নই। অফিসফেরত অজস্র মানুষ। পাশাপাশি। অথচ কেউ কোনও কথা বলছে না। কেউ ডেকে জিজ্ঞেস করছে না, কী গো, তোমার না আজ জয়েন্টের রেজাল্ট বেরোনোর কথা!

বৃষ্টির জলকে নয়, চলমান অসংখ্য মানুষকে নয়, শিয়ালদা থেকে রানাঘাট অবধি কাউকে আমার কথাটা বলা হল না। প্রথম খবরটা জানালাম বাবাকে।

বাবা খুশি হলেন?

হয়তো! তবে চিন্তিত হয়েছিল বেশি। অনেক রাত অবধি বারান্দায় বাবার বিড়ির আগুন জ্বলতে নিভতে দেখলাম। ভোরে আমাকে ঘুম ভাঙিয়ে তুলে বলল, ডাক্তারি, সে যে অনেক টাকার ব্যাপার! কোথা থেকে জোগাড় হবে রে অত টাকা?

সকালে উঠে দেখলাম, আকাশে মেঘ নেই, ঝকঝক করছে রোদ্দুর, উঠোনের তুলসী গাছটার পাতায় তখনও টলটল করছে বৃষ্টির জল। মনে হল কলকাতা বড় হৃদয়হীন, বড় নিরুত্তাপ! এখানেই থাকি, থেকে যাই বাকি জীবনটা।

হোস্টেলের ঘরে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে ততক্ষণে। একটু আগেই রেজাল্ট দেখে এসেছে ওরা। এম ডি এন্ট্রান্স। এবারে আর অনিকেতের ওপরে কারও নাম নেই। সম্বুদ্ধও আছে। নীচের দিকে। লিস্ট দেখতে ওরা সবাই মিলেই গিয়েছিল। মিলিও ছিল। বাইরে। গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়িয়ে। তবু অনিকেত সম্বুদ্ধর সঙ্গে ফিরে এসেছিল হোস্টেলে।

গল্পটা যেখানে থামিয়েছে, পরেরটুকু সম্বুদ্ধর জানা। স্কলারশিপের টাকা ভরসা করে অনিকেতের কলকাতায় আসা। টিউশানি। ধার। স্কলারশিপ মাসে মাসে আসত না। বছর শেষে একসঙ্গে সবার ধার শোধ। তখন অবশ্য সম্বুদ্ধর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল না। অন্যদের কাছে শুনেছে। ইন্টার্নশিপে এক ঘরে থাকার সময় অনিকেতও বলেছে কিছুটা। হাসতে হাসতে বলেছে, টুলো পণ্ডিত ঠাকুর্দার দেওয়া গম্ভীর নামটা ছাড়া নিজের বলতে আর কিছুই ছিল না।

ট্রেনটা ঝাঁকুনি দিয়ে থামতেই মানুষ নামতে লাগল গলগল করে। শেষ জনা কয়েককে ওঠার সুযোগ না দিয়েই বাইরে যারা ছিল উঠতে লাগল। কোনওরকমে নেমে নিজেকে ঠিকঠাক করে নেবার আগেই বিপুল মণ্ডল সম্বুদ্ধর কানের কাছে ঠোঁট এগিয়ে আনল।

—আপনি তো সি এম ও এইচ অফিসে যাচ্ছেন, আমি একবার বুড়ি ছুঁয়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই পৌঁছে যাব।

অনুমতি নেবার অবকাশ ছিল না, তবু সম্বুদ্ধর ঘাড় নাড়া পর্যন্ত তো অপেক্ষা করবে। চোখের পলক ফেলার আগেই ভিড়ে মিশে গেল বিপুল।

বুড়ি! কী বলে গেল মণ্ডল? কী ছুঁয়ে আসবে? কে যে কী ছুঁতে যায়? ভাবনাটা শেষ হবার আগেই ওভারব্রিজ পেরিয়ে রাস্তা, ভিড়, রিকশা, এগোলেই বাসস্ট্যান্ড।

তুলনায় পত্রনবিশ অনেক সরাসরি।

—দেখুন ডক্টর সেন, মিটিং-এ সকলে মিলে বলল, আমারও কিছু করার ছিল না। আপনাকে এই অবধি পৌঁছে দিলাম, এবার আমার ছুটি। এখন বারোটা। বাসে উঠলে হেল্‌থ্ সেন্টারে পৌঁছতে সাড়ে তিনটে বেজে যাবে। শীতের বিকেল, বুঝতেই পারছেন। কিছু মনে করবেন না, আমি চলি।

রিক্সায় উঠে সম্বুদ্ধর মনে হল, এইভাবে এইখান থেকেই তো শুরু করেছিল অনিকেত। অনিকেতের সঙ্গেও কেউ ছিল না। সম্বুদ্ধর সঙ্গে, খুব কাছেই একজন অন্তত রয়েছে। অনিকেত নিজে।

পাঁচ

সি এম ও এইচ অফিসের একতলায় গিয়েই ধাক্কা খেল সম্বুদ্ধ। বড় কোলাপসিব্‌ল্‌ গেট, বন্ধ, মস্ত একখানা তালা ঝুলছে।

—কী ব্যাপার? আজ অফিস বন্ধ? ছুটি?

সম্বুদ্ধর গলা পেয়ে এগিয়ে এল খাকি শার্ট-প্যান্ট ভেতরে ঝাড়ু লাগাচ্ছিল যে, এতো সোকালে এসে গিয়েছেন, কোনও মিটিন আছে?

সকাল? ঘড়ি দেখল সম্বুদ্ধ। বারোটা ষোলো। ব্যাঙ্কের মতো এ দিকেও কি ইভনিং শিফট?

—অফিস কখন খুলবে ভাই?

—খুলিয়ে যাবে, তুরন্ত। ইন্তেজার কিজিয়ে।

রোদ্দুরে পিঠ লাগিয়ে ভাবছে সম্বুদ্ধ, নেহাত শীতের রোদ, পিঠ পুড়ছে না, হঠাৎই পাশে ঝনাৎ করে গেট খোলার শব্দ হল। ঘুরে দেখল গেট খুলেছে, এবং চাবির গোছা হাতে একজন স্বাস্থ্যকর্মী স্বাস্থ্যদপ্তরের জেলা আধিকারিকের অফিসে প্রবেশ করছে।

পেছন পেছন গুটিগুটি ঢুকল সম্বুদ্ধ।

সঙ্গে সঙ্গেই অ্যাবাউট টার্ন,—কী চাই?

এনার গলায় শুকনো লঙ্কা কিছু বেশি।

নিজের গলায় মধু ঢেলে দিল সম্বুদ্ধ, আজ্ঞে, সি এম ও এইচের সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই।

—দেখা? অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, উনিই তো বারোটায় আসতে বললেন।

—বারোটা? এবারে স্বাস্থ্যকর্মীরই দু' চোখ জড়ো হয় বারোটার কাঁটা বরাবর, বারোটায়, সি এম ও এইচ? এখানকার সি এম ও এইচ কে বলুন তো?

—ডক্টর কে পি দে। নামটা জেনে এসেছিল সম্বুদ্ধ।

স্বাস্থ্যকর্মীর এবারে ভুরুতে ভাঁজ।

—ঠিক আছে, বলছেন যখন, অপেক্ষা করুন। দোতলায় চলে যান। বড় ঘরে ঢুকে ডানদিকের শেষ টেবিল। কে সি দে। উনিই সি এম ও এইচের সব দেখাশুনা করেন। খুড়োভাইপো সম্পর্ক। ওনাকে বললেই হবে।

সারি সারি ফাঁকা চেয়ার, খালি টেবিল, স্তূপাকার ফাইল, ওপরে তিন ইঞ্চি পুরু ধুলো, কোনওদিন কোনও ফাইল টেবিল পরিবর্তন করেনি। ঘরের মধ্যে হাডুডু খেলছে তিন জেনারেশন ছুঁচো। তার মধ্যে সবচেয়ে বড়গুলোর সাইজ ধাপার মাঠে চড়ে বেড়ানো শুয়োরের চেয়ে কম নয়। ভয়ে ভয়ে পা তুলে বসল সম্বুদ্ধ।

একটার পর থেকে আস্তে আস্তে চেয়ারগুলো ভর্তি হতে শুরু করল। ভাইপো এলেন একটা কুড়িতে। চশমা খুললেন, কাচ মুছে খাপে ভরলেন। খাপ ফোলিওব্যাগে ঢুকিয়ে ব্যাগ থেকে বের করলেন নোংরা একটা ডাস্টার। ঝাপটে ঝাপটে চেয়ার ও টেবিল থেকে ধুলো ঝাড়লেন, চেয়ারের হাতল-টাতল মুছেও নিলেন। ডাস্টারও ফোলিওব্যাগে ঢুকল। এবারে বেরুল একটা জলের গ্লাস। গ্লাস বাজিয়ে কাকে যেন ডাকলেন। সে এসে গ্লাস নিয়ে চলে যেতে কে সি দে উঠে বাইরের বারান্দা দিয়ে হেঁটে আবার উধাও হয়ে গেলেন।

উল্টোদিকে বসেছিল সম্বুদ্ধ। সম্বুদ্ধ কেন, একটা শিংওলা গণ্ডার কিংবা বাইসন বসে থাকলেও দে-র নজরে পড়ত না। মিনিট দশেক পরে গ্লাস নিয়ে বাইরে গিয়েছিল যে, সে এল। জল ভর্তি গ্লাশ টেবিলে রেখে একটা পোস্টকার্ড চাপা দিল। তারপর সম্বুদ্ধর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, চা খাবেন?

চা? এই দেড়টায়? খিদেয় পেট চুঁইচুঁই করছে। এখন চা খেলে গলা দিয়ে রক্ত উঠবে। ঘাড় নেড়ে না বলে দিল সম্বুদ্ধ। লোকটা যেন অবাক হল। তিরিশ সেকেন্ড দাঁড়িয়ে রইল। সম্বুদ্ধ বিরক্ত হল,—বললাম তো খাব না। লোকটা সরে গেল।

আরও মিনিট পনেরো পর একজন এসে সম্বুদ্ধর পাশে বসল। বয়েসে কিছু বড়, রসেবশে চেহারা।

—কোন হেল্‌থ্ সেন্টার?

সম্বুদ্ধ বুঝতে না পেরে মুখ ঘোরাল।

—ডাক্তার তো?

এবারে সম্বুদ্ধ ঘাড় কাত করল।

—তাই তো জানতে চাইছি। কোন হেল্‌থ্ সেন্টার?

সম্বুদ্ধর যেন ধড়ে প্রাণ এল,—আপনিও ডাক্তার?

—নিশ্চয়ই। আপনাকে আগে দেখিনি, তাই খোঁজ নিচ্ছিলাম, কোন হেল্‌থ্ সেন্টার।

এখানকার কোনও হেল্‌থ্ সেন্টার নয়, কলকাতায়, ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ।

—আপনি তো সরকারের পুষ্যিপুত্র মশাই! ম্যানেজ করলেন কী করে? মন্ত্রী না সেক্রেটারি? পায়ের ধুলো দিন।

ভদ্রলোক সত্যি সত্যিই নিচু হচ্ছেন দেখে ভড়কে গিয়ে পা টানল সম্বুদ্ধ। নীচে ঘুরছিল যারা, এদিক ওদিক সরে গিয়ে সম্বুদ্ধর জুতোসুদ্ধ পা দুখানার জায়গা করে দিল।

—আমি বিপ্রদাস নায়েক, পাহাড়পুর হেল্‌থ্ সেন্টার,...চলে?

বাড়ানো সিগারেটের প্যাকেট ফিরিয়ে দিল সম্বুদ্ধ। বিপ্রদাস জানতে চাইলেন,—চা আনতে দিয়েছেন?

—এসেছিল, না বলে দিয়েছি।

—বলেন কী? আঁতকে উঠলেন বিপ্রদাস, কে সি দের টেবিলে কাজ নিয়ে এসেছেন, এখনও চা আনাননি?

কাঁচুমাচু মুখ করে সম্বুদ্ধ বলল, ভুল হয়ে গেছে?

—আলবত ভুল হয়েছে, হাজারবার ভুল হয়েছে। কার্তিক আজ আর টেবিলে ফিরবে না। যাই দেখি কোথায় গেল, চা-বিড়ি খাইয়ে মান ভাঙিয়ে ধরে নিয়ে আসি।

আরও মিনিট পনেরো অপেক্ষা করবার পর সম্বুদ্ধর মনে হল, এতক্ষণ যারা ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল তারা এবারে পেটের ভেতর তাদের বহুশ্রুত কেত্তন শুরু করেছে। উঠে পড়ল। নীচে নেমে দ্যাখে সিঁড়ির কোনায় একটা ভাঙা টেবিল সাজিয়ে প্রাইমাস স্টোভে পাম্প দিচ্ছে এক অনতিতরুণ। টেবিলের ওপর পাঁউরুটি ও তার বুকে বসাবার ছুরি পাশাপাশি শোয়ানো।

সম্বুদ্ধ গিয়ে দাঁড়াতে ঘাড় ঘুরল।

—কিছু খাবারদাবার পাওয়া যাবে?

—টোস্ট। বাটার পেতে পারেন, একটাকা পিস, সর চিনি দিয়ে বানালে দু টাকা পড়বে।

সর-চিনি? দুধের সর তার ওপর চিনি ছড়ানো। শুনেই খিদেটা তিনগুণ বেড়ে গেল সম্বুদ্ধর।

—সর-চিনি। কতক্ষণ লাগবে?

—বসুন, বানিয়ে দিচ্ছি।

কয়েকটা প্যাকিংবাক্স সিঁড়ির তলায় রাখা ছিল। তাতে বসেই সর-চিনি সহযোগে পাঁউরুটির সৎকার করল সম্বুদ্ধ। সঙ্গে লিকার-চা, লেবু দিয়ে।

খেতে খেতে কথা পাড়ল।

তপন, টোস্ট-চার কারিগর, কিছু রেখে ঢেকে বলল না।

—কে পি দে, কংসারিপ্রসাদ দে, চেনেন নাকি লোকটাকে?

—অল্পস্বল্প আলাপ।

—ডাকাত, মশাই, ডাকাত। সকালটা তোলা তুলতে হেল্‌থ্ সেন্টারগুলোয় ঘুরে বেড়ায়। পুকুরের মাছ, খেতের কপি, গাছের নারকোল। কিছুই না পাওয়া গেলে ক্যাশ টাকা। নিদেনপক্ষে একটা গোটা গান্ধী, তার কমে মনই ওঠে না।

—গোটা গান্ধী?

—পাঁচশো টাকার নোট, অবজ্ঞায় তার দিকে তাকায় তপন মালাকার,—এই সিঁড়ির তলার জায়গাটুকু পেতেই আমাকে চারখানা গান্ধী খরচা করতে হয়েছে। ওর চারটে, আর শালা দালালের বাচ্চা কার্তিককে একখানা।

—কার্তিকও?

—জানেন না? এই অফিসে কেউ 'নে' বলে না, কেবল 'দে' 'দে'। এক ওই কংসারি, নৈবেদ্যর কলাটি, আর তার সাগরেদ কার্তিকচন্দ্র দে। কেন দেখা হয়নি আপনার সঙ্গে?

ঘাড় নাড়তে গিয়েও থমকে যায় সম্বুদ্ধ। দেখেছে। কিন্তু তাকে কি সাক্ষাৎ বলা যায়?

ঘড়ি দেখে উঠতে যাবে, তপন বসায়,—চললেন কোথায়?

—যাই, দেখি এসেছেন কি না সি এম ও এইচ।

—এখন টিফিন টাইম। ঠিক আড়াইটেয় ঢুকবে। গাড়ির আওয়াজ পাবেন। ভীষণ পানচুয়াল।

আড়াইটেই। পান চিবোতে চিবোতে যে মানুষটা সিঁড়ি দিয়ে যথাসময়ে ওপরে উঠল, তার হাঁটাচলা দেখলেই বোঝা যায়, অফিসটাকে সে খাসতালুক বলেই মনে করে।

সম্বুদ্ধও ওপরে গেল। জনা তিনেক কান এঁটো হাসি নিয়ে কার্তিক-ভজনায় ব্যস্ত, দূর থেকে দেখে সম্বুদ্ধ দ্রুত ইতিকর্তব্য স্থির করে নিল।

চেয়ারে পেছন ঠেকিয়ে সামনে তাকিয়েই সম্বুদ্ধকে দেখতে পেল কংসারি, চমকে উঠল।

সম্বুদ্ধ কে? সম্বুদ্ধকে চেনে না কংসারি। কিন্তু কংসারির এই চমকানো চেনে সম্বুদ্ধ। লোকটা পুরনো ঘা লুকোচ্ছে। অর্শ কিংবা ভগন্দর, দাদ বা চুলকানি, বিবাহের আগের বা পরের দুর্বলতা। মানুষটার লুকোনোর অনেক কিছু আছে।

—কী ব্যাপার? কী চাই? আপনি কে?

তিনটে প্রশ্নই দ্রুত উচ্চারণ করল কংসারি। করতে গিয়ে গলা কেঁপে গেল। তাড়াতাড়ি টেবিলে ঢাকা দিয়ে রাখা জল খেল।

গুছিয়ে বসল সম্বুদ্ধ—আমার নাম সম্বুদ্ধ, ডক্টর সম্বুদ্ধ সেন। ডক্টর্স অ্যাসোসিয়েশন

থেকে আমাকে পাঠানো হয়েছে।

—কী প্রয়োজন? দাঁত ও নখহীন ডক্টর্স অ্যাসোসিয়েশনের নাম শুনে কংসারি নিজেকে গুছিয়ে নেয়।

—ডক্টর অনিকেত চৌধুরীর সম্বন্ধে আপনাকে দুয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতাম।

কৌটো থেকে একটু সুপুরি বের করে হাঁ-এর মধ্যে ঢোকাতে যাচ্ছিল কংসারি। মুখ বন্ধ করে ফ্যালে। দু'বার ঢোঁক গেলে। তবে ওই পর্যন্তই।

—মার্ডার। শার্প ওয়েপন দিয়ে পেছন থেকে হিট করা হয়েছিল। মাথাটা শরীরের থেকে আলাদা হয়ে যায়। এক কোপেই শেষ। পরদিন সকালে বডি আইডেন্টিফাই করে একজন জেলে। মাথাটা জলের মধ্যে ছিল, পরে পাওয়া যায়।

—জানি, এগুলো জেনেই আমি এসেছি ডক্টর দে। আমার জিজ্ঞাস্য অন্য। একজন ইয়াং ডাক্তার খুন হয়ে গেল, ব্রুটালি মার্ডারড্। আন্ডার হোয়াট সারকামস্ট্যানসেস? কারা এর পেছনে আছে? হোয়াট ইজ দ্য ট্রুথ বিহাইন্ড?

হাসল কংসারি। পঞ্চাশ বছরের পুঞ্জীভূত নিকোটিন দাঁত ও ঠোঁট থেকে উপচে এল সম্বুদ্ধর দিকে। হাসলে কারওকে এত কদাকার দেখায়? চোখ ঘুরিয়ে নিতে হল সম্বুদ্ধকে।

—ইনভেস্টিগেশন? সে তো পুলিশ করবে। করছেও। আইবি দেখছে ব্যাপারটা। আজকাল জার্নালিস্টরাও করে শুনেছি। কিন্তু ডাক্তার-ইনভেস্টিগেটর? কী যেন নাম বললেন আপনার?

—সম্বুদ্ধ, সম্বুদ্ধ সেন। না, আমি পুলিশ বা কাগজের লোকের এক্তিয়ারে হাত দিতে চাই না। আমি শুধু জেলার হেল্‌থ্‌-এর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ হেড হিসাবে আপনার কাছে জানতে চাইছি, দূর দূর হেল্‌থ্‌ সেন্টারে যে সব ডাক্তার কাজ করছে তাদের নিরাপত্তার জন্যে আপনি কী ব্যবস্থা নিচ্ছেন?

—ব্যবস্থা? কীসের ব্যবস্থা? আমার জেলায় সাড়ে তিনশো ডাক্তার আছে, বিভিন্ন জায়গায় ছড়ানো। একজন মারা গেছে। মিস্টেরিয়াস সারকামস্ট্যানসে। এরকম ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি। তার জন্যে ব্যবস্থা?

—আগে ঘটেনি, কিন্তু ঘটেছে যখন, পরেও ঘটবে না তার গ্যারান্টি আপনি দিতে পারেন?

—কে কীসের গ্যারান্টি দিতে পারে মশাই? এই যে আপনি বসে বসে বাণী দিচ্ছেন, বাইরে বেরিয়ে আপনিই গাড়ি চাপা পড়বেন না সে গ্যারান্টি কেউ দিতে পারে?...শুনুন, আমার সময় অত সস্তা নয়, এবারে আপনি আসতে পারেন।

আর বসে থাকার মানে হয় না। বাইরে বেরিয়ে এল সম্বুদ্ধ। কোনও খবরই পাওয়া গেল না। কার কাছে পাওয়া যেতে পারে খবর? ভাবতে ভাবতেই মনে পড়ে গেল। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এল।

টিফিনআওয়ার শেষ হয়ে গেছে। সিঁড়ির নীচটা এখন ফাঁকা। তপন খালি প্লেট-কাপ গোছাচ্ছে। একজনই খদ্দের, খাওয়াদাওয়া শেষ, বসে বসে বিড়ি টানছে।

—আসুন স্যার, চা দিই এককাপ?

না, থাক। প্যাকিং বাক্সে বসতে বসতে সম্বুদ্ধ বলল।

—কাজ হল?

—না।

—বলেছিলাম না, হারামির হাতবাক্স। কার্তিককে টাকা দিয়েছিলেন?
জবাব দিয়ে ঘাড় নাড়ল সম্বুদ্ধ।
এতক্ষণে তপনের সঙ্গী জানতে চাইল, কীসের কেস?
সম্বুদ্ধ ঘুরে তাকাল।
তপন বলল,—আমাদের ওষুধের এস্টোর, সেখানকার ডেরাইভার, গজেন, গজেন মিস্ত্রি। আপনি বলতে পারেন, ও অনেক খবর-টবর রাখে।
কী ভেবে সম্বুদ্ধ বলেই ফেলল, আমার বিশেষ বন্ধু, অনিকেত, ডক্টর অনিকেত চৌধুরী, শিমুলিয়া হেল্‌থ্‌ সেন্টারে ছিল। খুন হয়ে গেছে। সে ব্যাপারেই...
হঠাৎই যেন স্তব্ধতা নেমে এল। মুখ চাওয়াচায়ি করল গজেন আর তপন। তারপর গজেনই মুখ খুলল, ব্যাপারটা নিয়ে খুব তোলপাড় হয়েছিল কদিন। শেষ পর্যন্ত ঝিলের জলেই ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে সমস্ত।
সম্বুদ্ধর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল, কারা করেছে জানেন।
ঘাড় নাড়ল গজেন, জানি না। মানুষটা তেএঁটে ছিল। মানতে চাইত না। এঁড়ে গরুর মতো ঝগড়া করত। ওষুধ নিতে এলে দশ হাজার সই করলে সাত হাজার পাওয়া যাবে এটাই নিয়ম। ওই ডাক্তারবাবু একবার হাসপাতালে ফিরে দেখেছিল গুনতিতে কম। পরে বহুত হুজ্জোতি করেছিল। ভয়ও দেখিয়েছিল সাহেবকে। তারপর থেকে গুনে গুনে ওষুধ নিত।
—সাহেব পেছনে লাগেনি?
—পেছনে লাগার লোকই নয়। জুতোর তলায় পেরেক বাঁকা থাকলে দে সাহেব মুচিকে ডেকে পেরেকটা ঠুকে নেয় না, দু' আঙুল দিয়ে তুলে ফেলে দেয়।
—তা হলে...
—চললাম দাদা, চলি তপন, হাত নেড়ে গজেন চলে গেল।
তপন চুপচাপ শুনছিল। টেবিলে কাপ সাজিয়ে রাখতে রাখতে বলল, এই রাজত্বে কেউ তেড়া হয়ে টিঁকতে পারে না। হয় পালিয়ে যায়, নইলে বেঘোরে মরে।

ছয়

আকাশটা এত বড়? আর নিচু?
ভয়ে ভয়ে আবার তাকাল সম্বুদ্ধ। ওপাশে কয়েকটা তাল-নারকোল গাছ, সামনে শিমুল, নিম আর তেঁতুল; মাথায় টানটান করে টাঙানো একটা আকাশ, সেখানে টুনি বালব-এর মতো জ্বলজ্বল করছে গ্রহ-নক্ষত্র, নিজস্ব নিয়মে জ্বলতে-নিভতে জ্বলতে-নিভতে কয়েক আলোকবর্ষ দূরের পৃথিবীতে আলো পাঠাচ্ছে। ছোটবেলায় মা ছাদে মাদুর পেতে শুয়ে চিত হয়ে আকাশের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলত, মরে গেলে ওইখানে নতুন একটা তারা দেখতে পাবি। সম্বুদ্ধ জানে, প্রাচীন এই আকাশে মৃত মানুষদের জন্যে আর জায়গা নেই।
অন্ধকার। হারু একটা হারিকেন জ্বালিয়ে ঘরের কোণে রাখতে চেয়েছিল, সম্বুদ্ধই বারণ করেছে। আলোয় অনেক কিছু দেখা যাচ্ছিল। তারে একটা পাজামা দু'টো গেঞ্জি,

ছড়িয়ে মেলা তোয়ালে; জানলার নীচে কয়েকটা ইট সাজিয়ে একটা তাক। সেখানে আয়না-চিরুনি-সাবান; একটা কাঠের বুক-র‍্যাক্, সেখানে দুটো মেডিসিনের বই, একটা জার্নাল; খাটের নীচে জড়ো করা কিছু ফিজিশিয়ান্স্ স্যাম্প্ল। সব কিছুই অনিকেতের। আলো জ্বাললেই মানুষটা হই হই করে এসে পড়ে। তার দিনযাপনের প্রতিটি সামগ্রীতে হাত রেখে সম্বুদ্ধর দিকে তাকিয়ে থাকে। অন্ধকারে অনিকেতকে দেখা যায় না। মনে মনে ছোঁয়া যায়।

মশারির ভেতর বসে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিল সম্বুদ্ধ। মশারির আড়ালে বিছানা, তার চাদর-বালিশ-কম্বল সবকিছুতেই অনিকেতের স্পর্শ এখনও জীবন্ত। সম্বুদ্ধ যেন চুরি করছে, যেন গোপনে অনিকেতের ফেলে যাওয়া জোব্বাটা গায়ে চড়িয়ে অনিকেত সাজছে।

টিউবওয়েল টেপার আওয়াজ আসছে ঘটাং ঘটাং করে। তিনচারবার শুকনো আওয়াজের পর জল পড়ার শব্দ। বাসন ধুচ্ছে হারু। দেখা যাচ্ছে না। দুটো কুকুর ফেলে দেওয়া খাবারের বখরা নিয়ে কামড়াকামড়ি করছে। তাদেরও আক্রোশ আর গর্জন জলের শব্দ ছাপিয়ে চলে আসছে সম্বুদ্ধ পর্যন্ত। ওই আওয়াজগুলো মাইনাস করে দিলে রাত্রিটি নিস্তব্ধ। মনে হয় নক্ষত্র স্থান বদলালে তারও শব্দ পাওয়া যাবে। এই স্তব্ধ রাত্রিটিতে সম্বুদ্ধর জিজ্ঞাসার কোনও উত্তর নেই।

বরং হারু অনেক কিছু বলেছে। সম্বুদ্ধ যে তার প্রশ্নের মীমাংসায় পৌঁছে গেছে তা নয়। কিন্তু অনিকেতের অবস্থানটা বুঝে নিতে সুবিধা হয়েছে।

অবশ্য তাতে শ্রদ্ধা,—প্রায় ভক্তির সীমানায়, এত বেশি যে ছাল ছাড়িয়ে অনিকেতকে বের করে আনতে কষ্টই হয়েছে সম্বুদ্ধর।

হারুর এই আতিথেয়তার আতিশয্যও কিন্তু সম্বুদ্ধর জন্য নয়, অনিকেতের বন্ধুর জন্য বরাদ্দ।

নাহলে বাস থেকে নেমেই সম্বুদ্ধর মনে হয়েছিল, ভুল করে ফেলেছি। অবশ্য অপশন্ বেশি কিছু ছিল না। সি এম ও এইচ অফিস থেকে বেরোতে বিকেল গড়িয়ে গেল। যেটুকু খবর পাওয়া গেছে তা নিয়ে কলকাতায় ফিরে যাওয়ার কোনও মানে হয় না। হেল্থ্ সেন্টারে যেতেই হবে। কিন্তু কখন?

কাল শনিবার। সকালের বাস ধরে পৌঁছতে পৌঁছতে দুপুর গড়িয়ে যাবে। ততক্ষণে হয়তো কাউকেই পাবে না। পরদিন ছুটি। অতএব সেই সোমবার অবধি অপেক্ষা। অতখানি সময় নিয়ে বেরোয়নি সম্বুদ্ধ।

অতএব যেটা করা উচিত সেটাই করল সম্বুদ্ধ। সামনে দাঁড়ানো বাসটায় নিজেকে গুঁজে দিল। মানুষ, মাল, এমনকী মুরগি-ছাগলের সঙ্গেও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান শেষে বাসটা যখন সম্বুদ্ধকে নামিয়ে দিয়ে টাটা করে চলে গেল, সম্বুদ্ধর তখন প্রথমেই মনে হল, কাজটা হঠকারী হয়ে গেছে।

পথেই বিকেলের রোদ দিনটাকে শুষে ছিবড়ে করে অন্ধকারের হাতে ফেলে রেখে চলে গেছে। বাসে আর কিছু না হোক, শখানেক প্রাণীর সাহচর্য ছিল। রাস্তায় দাঁড়িয়ে সম্বুদ্ধ দেখল সে একা, এবং কান অবধি কাঁপিয়ে উঠে আসছে তীব্র শীত। এদিক ওদিকে তাকিয়ে একটাই দোকান দেখা গেল খাবারের, সেটাও ঝাঁপ বন্ধ করছে, খড়কুটো আঁকড়ে ধরার মতো ছুটে গিয়ে সম্বুদ্ধ শুধু জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, এখানে হেল্থ্

সেন্টারটা কোন দিকে?

উত্তরে হারিকেনের আলোতেও ভুরু কুঁচকে উঠতে দেখে তাড়াতাড়ি নিজেকে সংশোধন করেছিল সম্বুদ্ধ, মানে হাসপাতাল?

—হাসপাতাল?

শ্লেষ্মা ও দ্রব্যগুণে জড়ানো কণ্ঠস্বরে সম্বুদ্ধর প্রতিধ্বনি শুনিয়ে মানুষটা কম্ফর্টারে ভাল করে গলা জড়িয়ে আঙুল তুলে অনির্দেশ্য এক দিকে দেখিয়ে বলেছিল, এগিয়ে যান। তারপর গান গাইতে গাইতে হারিকেন নিভিয়ে টর্চের আলো দোলাতে দোলাতে অন্ধকারে মিশে গিয়েছিল।

তবু পৌঁছেছিল সম্বুদ্ধ। এবং পৌঁছে দেখেছিল, অন্ধকারে ফাঁকামাঠে নিঃসঙ্গ কয়েকটি পাকা বাড়ির মধ্যে একটিতে সন্ধ্যাদীপের মতো আলো জ্বালিয়ে একটি মানুষ যেন তারই প্রতীক্ষায় বসে আছে। পরিচয় দিতে উঠে এসেছিল, ডেকে নিয়ে গিয়েছিল ভেতরে, এবং কোনও কথা বলার আগেই ভেঙে পড়েছিল কান্নায়।

—আমি পাপী, কান্নার দমকে কেঁপে উঠতে উঠতে হারু বলছিল, আমার দোষ। আমি কেন যাইনাই সঙ্গে, আমি কেন এগিয়ে দিলাম না। যমে টেনেছিল আমারে। নরকেও ঠাঁই হবে না আমার।

মুড়ি-বাতাসা দিয়েছে যত্ন করে। রাত ঘন হলে ডাল আর পোস্তর বড়া। দাম দিতে গেলে অনর্থ করেছে,—সার থাকলে কি পয়সা দিয়ে খেতেন? খাওয়াদাওয়া মিটে যেতে বাসন ধুতে গেছে কলতলায়।

—বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম, কী করব? নেব চাকরিটা? বাবা কোনও জবাব দিল না প্রথমে। তারপর বলল, সরকারি চাকরি, বাঁধা মাইনে, গেজেটেড অফিসার, ছেড়ে দিবি? গেজেটেড অফিসার কে যেন ছিল বাবার চেনা-জানা, দোর্দণ্ড প্রতাপ। তা ছাড়া সকলকে সই ধার দিত। রেশনকার্ড থেকে অ্যাডমিট কার্ড। অ্যাটেসটেশন। দেখেশুনে কিনা কে জানে, বাবার ভীষণ লোভ ছিল তকমাটার ওপর।

—তা হলে বাবার কথাতেই জয়েন করছিস?

হস্টেলের বিছানায় পা তুলে বসেছিল অনিকেত। সামনের চেয়ারে সম্বুদ্ধ। এমডির রেজাল্ট বেরিয়ে গেছে। বেশিরভাগই বাইরে যাচ্ছে এমআরসিপি করতে, কয়েকজন সম্বুদ্ধর মতো টিচিং-এ জয়েন করেছে, অনিকেত গাধাটা চলল গ্রামে খালি-পা ডাক্তার হতে।

—না, বলতে হয় তাই বলা। ওইটুকুর বাইরে বাবা দেখতে পায় না। সরকারি চাকরি, নিরাপত্তা, সামাজিক সম্মান। মাস গেলে মাইনে। ওটা জরুরি। বাঁধা মাইনের খুব ভক্ত বাবা।...বাবা নয়, আমিই। হেল্‌থ্‌ সেন্টারে যাচ্ছি আমারই চয়েসে।

—দেশোদ্ধার? চ্যারিটি?

—নাঃ, হেসে ফেলেছে অনিকেত, আমার ইনএবিলিটি। কলকাতায় এখনও, এই দশ বছর কাটিয়েও আমার অ্যালিয়েন লাগে, মনে হয় এখানকার মানুষগুলোকে আমি চিনি না। কলকাতা বড় নিষ্ঠুর, কাউকে আদর করে কাছে ডাকে না, শুধু মানুষে মানুষে দূরত্ব বাড়ায়। কলকাতা কখনও আমার শুকনো মুখ দেখে ডেকে জিজ্ঞেস করেনি, আহা, বাছা আমার, দুপুরে খাওয়া জুটেছে তো?

সম্বুদ্ধ মিলির কথা জানতে চায়নি। মিলিও তো অনিকেতের কলকাতার মধ্যেই পড়ে।

অনিকেত আবার বলেছিল, মফস্‌সল শহর থেকে শুরু করেছি, কলকাতাকেও দিলাম অনেকগুলো বছর। গ্রাম গ্রাম করি, গ্রাম চেনা হল না এখনও। দেশের পঁচাত্তর ভাগই নাকি গ্রাম। বলব দেশ, আর গ্রাম জানব না? যাই, দেখে আসি।

—দেখে ফিরে আসবি?

—ওইভাবে বলা যায়? যাওয়ার কথাই জানি এখন। তারপর তো ফেরা।

ফেরা হয়নি অনিকেতের।

অন্ধকারে ফিরে আসছে হারু। ঘাসের ওপর ভেজা পায়ের শব্দ, হাতে ডাঁই করা কলাইয়ের বাসন, শব্দ হচ্ছে ডবডব, ঝনাৎ করে রান্নাঘরের শিকল খুলল, রাখতে গিয়ে হাতাখুন্তি কিছু একটা মাটিতে পড়ল। শব্দকে আলাদা করতে শেখেনি সম্বুদ্ধ। অন্ধকার যখন দৃষ্টি কেড়ে নেয়, শব্দগুলো প্রাণ পেয়ে যায়। কান পেতে শব্দের নিশ্বাস তফাত করছিল সম্বুদ্ধ।

ভাত চড়িয়ে একটু আগেই এইখানে মেঝেতে থেবড়ে বসেছিল হারু, সম্বুদ্ধ বলেছিল, একি, মাটিতে কেন, চেয়ারে উঠে বসুন, আমি খাটে বসছি।

দুকানে হাত চাপা দিয়ে হারু বলেছিল, ছিছি, শুনলেও পাপ, অধম্ম হবে যে! আপনাদের সঙ্গে এক আসনে? তাই কখনও হয়?

জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে অন্ধকারকে শুনিয়ে হারু বলেছিল, এমন মানুষ আমরা দেখি নাই। বাগদীপাড়ার খাঁদু মেঝেন, আঙুলের ঘা বিষিয়ে গিয়ে সেপটিক, সার ঘাড়ে করে হাসপাতালে তুলে আনল। পেনিসিলিন চলল সকাল-বিকেল আর ড্রেসিং। প্রথমে নিজে, তারপর আমি। সেই খাঁদু গোটা পাখান নিয়ে আবার মাঠে যাবে, ধান কাটবে, আমাদেরও বিশ্বাস যায় নাই। সব আসবে কাল। সার-এর বন্ধু আপনি, উনিরে কতখানি ভক্তি করত মানুষ দেখবেন।

ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালবাসা। তাইতে মানুষ খুন হয়ে যায়? হারুকে দিয়ে হবে না।

শুতে যাবে হারু, একবাব ঢুকল ঘরে। টর্চের আলো জ্বালিয়ে আবার নিভিয়ে ফেলল সম্বুদ্ধ।

—ঘুমান নাই?

—এই ঘুমোব। কাজ শেষ হল?

হাসল মানুষটা। ঠাণ্ডা মেঝেতে বসল আবার।

—টুকুখানি কাজ। তার আবার শেষ!

—নিবাস কোথায়? অন্তরঙ্গ হতে চাইল সম্বুদ্ধ।

—বারাসতের দিকে, দেগঙ্গা।

—বাড়িতে আছে কে কে?

—বুড়ি মা, বউ, তিন মেয়ে, একটার বিয়া দিলাম বৈশাখে। দুই ছেলে, ছেলেগুলান অমানুষ, খায়দায় কাঁসি বাজায়।

সম্বুদ্ধ লম্বা করে একটা নিশ্বাস নেয়, দীর্ঘশ্বাসের মতো গোপনে ছাড়ে। তারপর গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা, এই যে আপনার সার-এর মৃত্যু,...খুন হয়েছিল অনিকেত জানেন তো,...আপনার কিছু মনে হয় না,...মানে অনিকেতের তো শত্রু ছিল না।

মানুষটা চুপ করে রইল অনেকক্ষণ। তারপর ভেজা ভেজা গলায় বলল, শত্তুর ত'

একখান ছিল না আজ্ঞে। মানুষটা আপস করে নাই। কিছুর সঙ্গে না। শহর থেকে ওষুধ আনতে যেত, ঘুষ না দিলে ওষুধ মিলত না, তাই নিয়ে পিটিশন দিল। লাইগেশনের টাকা, চারটা অপারেশন, খাতায় তিরিশখান, বাকি টাকার ভাগ-বাটোয়ারা, বিএমওএইচ—ফ্যামিলি প্লেনিং সব ক'টা অফিসারকে চটায়ে রাখল,—কী, না এইখানে ওইসব জালজোচ্চুরির কারবার হবে না। ফার্মাসিস্ট শিবেন চট্টরাজ হাসপাতালের পেথিডিন ঝাড়ত, একদিন আউটডোরে জামাকাপড় খুলে বেইজ্জত করল। দিদিমণি সনকা, সকালে আসে এগারোটায় হাওয়া, জোর করে তাকে থাকা করাল; তাই নিয়ে অ্যাসোসিয়েশন, কিছুতেই কিছু হল না, করায়ে ছাড়ল। চণ্ডীডাক্তার, পঞ্চায়েত সমিতি, কোয়াক প্র্যাক্টিস, স্যালাইনের বোতল হাসপাতাল থেকে ভ্যান-এ উঠছে, সার গিয়ে আটকাল, রিসিট দিয়ে বোতল নিয়ে যাবেন চণ্ডীবাবু। বাপের জন্মে এমন কথা শোনে নাই চণ্ডী, চোখে আগুন নিয়ে শেষমেষ তিনদিনের দিন সব বোতল ফের হাসপাতালে জমা করে গেল। এই যে খাঁদু মেঝেন ওর কেসটাই ধরেন, ওর মালিক সত্য মণ্ডল সেকি কম ক্ষার পুষেছে? খাঁদুর ওষুধের টাকা দেয় নাই মণ্ডল সেই অজুহাতে মণ্ডলের হাসপাতালে ঢোকা বন্ধ করে দিল কে, আমাদের সারই না! শত্তুর, শত্তুর। শত্তুর একটা নাকি?.. মরার খবরে উল্লাস যদি দেখতেন, যেন পরব লেগেছে!

অনেকখানি বলে থামল হারু। তারপর গোঙানির মতো বলল, মানুষের মতো মানুষ ছিল একখান। মস্ত একখান মানুষ। আমাদের কত অহংকার! শেষ দিনটায় আমি যদি সঙ্গে থাকতাম! অন্তত দুইখান লাশ আরও পড়ত।

হারু উঠে দাঁড়ায়। ঘুমোতে যাবে। যাবার আগে ঘোরে।

—কাল মাসের মিটিং, বিএমওএইচ অফিস যেতে হবে। মানুষগুলোকে কাল দেখবেন। ভাল। মন্দও। মন্দরা মুখোশ এঁটে আসবে। বুঝে কথা বলবেন। থেকে গেলে সন্ধেয় দেখা হবে। মনে রাখবেন। খোঁজ নেবেন। আসবেন মাঝে মাঝে।

অন্ধকার ঘরে একা সম্বুদ্ধকে রেখে চলে গেল হারু।

সাত

টিউবওয়েলের আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল সম্বুদ্ধর।

জানলা দিয়ে সামনে তাকিয়ে চোখ বন্ধ করতে ভুলে গেল। কুয়াশা। সামনে একফালি সবুজ, পার হয়ে মোরামের রাস্তা, পার হয়ে তালগাছে ঘেরা পুকুর! ওই পর্যন্ত। তারপরেই ঝাপসা। মাটি থেকে চার পাঁচ ফুট অবধি সাদা একটা দেওয়াল। ঠিক সাদা নয়, ছায়া ছায়া, রহস্যে মোড়া। কুয়াশার মধ্য দিয়ে তির্যক নেমে আসছে রোদ্দুরের ফলা, পুব থেকে পশ্চিমে। তুলোর মতো কেটে কেটে যাচ্ছে কুয়াশা। কুয়াশার দেওয়ালে রোদ্দুরের ছটায় যে ফাঁক, সেইখান দিয়ে দেখা যাচ্ছে দিগন্তবিস্তারী মাঠ, ধানকাটা হয়ে গেছে, হুহু মাঠ গিয়ে শেষ হয়েছে আকাশের সীমানায়, যেখানে একসারি সামাজিক বনসৃজন আকাশ আর মাটিকে আলাদা করে দিয়েছে!

সম্বুদ্ধ বাইরে বেরিয়ে এল। অনিকেতের কোয়ার্টারের পেছন দিকে দরজা। সেদিকেই টিউবওয়েল। জল নিচ্ছিল কোনও গৃহবধূ। তার দু' আড়াই বছরের ছেলেটি বিরক্ত

করছিল বারবার। জলভরা শেষ। এবারে তাকে শাস্তি দিতে কোলে তুলে একদিকের বুকের কাপড় সরিয়ে তার মুখে গুঁজে দেওয়া হল, তারপর সম্বুদ্ধকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে মাটিতে জলের দাগ এঁকে হেঁটে চলে গেল পশ্চিমে।

ঘাসের ওপর গিয়ে দাঁড়াল সম্বুদ্ধ। দাঁড়িয়েই চমকে উঠল। শিশিরে ডুবে আছে ঘাস, সম্বুদ্ধ দাঁড়াতেই তার খালি পা টেনে নিল ভেতরে, যেন বলে উঠল, এতদিন কোথায় ছিলিস? ঠাণ্ডা, তবু পা সরিয়ে নিতে ইচ্ছে করছে না। সামনেই একটা শিউলি গাছ, গাছের নীচে লাল-সাদা ফুল ডাঁই হয়ে আছে, জমে আছে গন্ধ। দুহাতে ফুল নিল সম্বুদ্ধ, সকালের ঘ্রাণ নিল বুক ভরে।

এত পাখি? কারুও ডাক আলাদা করে শোনা যাচ্ছে না। সকলে মিলে যেন ঠিক করেছে, একটা দিনের জন্মের খবর সবাইকে জানাবেই জানাবে।

মোহগ্রস্তের মতো দাঁড়িয়েছিল সম্বুদ্ধ, ঘোর ভাঙল হারুর ডাকে।

টেবিলের উপর চা চাপা দেওয়া আছে, দুখান বিস্কুট আছে পাশে। বাথরুমে জল ভরা আছে। ...আসি তা'লে আজ্ঞে।

রোদে পোড়া নিকষ কালো চেহারাটা ধোপদুরস্ত পাজামা-শার্টে জ্বলজ্বল করছে। চান করেছে সদ্য। ফোঁটা ফোঁটা জল তেলসহ চুঁইয়ে নামছে রগ বেয়ে। সকালের রোদ্দুরের মতো ঝকমকে হাসি, তাতে পড়ে থাকা শিউলির গায়ের ধুলোটুকুও নেই।

হাসল সম্বুদ্ধ,—আসুন, আবার দেখা হবে।

জয়গুরু, বলে সাইকেলের প্যাডেলে পা রাখল হারু।

রাত্তিরে ভাল করে দেখতে পায়নি, এখন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল সম্বুদ্ধ। ফাঁকা মাঠের মধ্যে বিঘেখানেক জমি নিয়ে হাসপাতাল। এখনও বন্ধ। পুব-পশ্চিমে টানা স্কুল-বাড়ির মতো পাকাবাড়ি, বারান্দা নেই। পশ্চিমে কোলাপসিব্‌ল্ গেট, খুলে ভেতরে ঢুকতে হয়। পলেস্তারা খসা বাড়ির দেওয়ালে "ছোট পরিবার সুখী পরিবার" এর কেবল সুখটুকু নিয়েই প্রাচীন হেল্‌থ্ সেন্টার দাঁড়িয়ে রয়েছে। সামনে একটু ফাঁকা জমি, আগাছা, একটা শিমুল গাছ, নীচে একখানা চায়ের দোকান, তার পরেই মোরাম-বিছানো রাস্তা। বাকি তিনদিকে কোয়ার্টার। পশ্চিমের লাগোয়া কোয়ার্টারটা ডাক্তারের। উত্তরে একসারি কোয়ার্টার, ভাঙাচোরা, সাপ আর চামচিকের আস্তানা।

অনিকেতের কোয়ার্টারে তিনটে ঘর। দক্ষিণেরটায় অনিকেত থাকত। পুবের ঘরটায় হারুর আস্তানা, পশ্চিমের ঘরটা খালিই পড়েছিল। বাথরুম বরং একখানা। মনে হয় অনিকেতই সেটা ব্যবহার করত। হারুর স্নান কলতলায় এবং বাকি কাজ মাঠেঘাটে হয় বলেই সম্বুদ্ধর অনুমান।

এখনও হাসপাতালের ঘুম ভাঙেনি। সম্বুদ্ধ চা-বিস্কুট খেয়ে বাথরুমে ঢুকল। তোয়ালে দিয়েছে হারু, অনিকেতেরটা, সাবান। মিলির কথা মনে পড়ে গেল সম্বুদ্ধর,—বালতিতে জল ভরে বাথরুমে ঢুকতে হয়। কমোড নেই, সিস্টার্ন নেই, জানলায় শার্সি নেই, স্নানের শাওয়ার নেই। এখানে মানুষ থাকে? অনিকেত ছিল। সম্বুদ্ধ থাকতে আসেনি।

বাইরে বেরিয়ে এবার বদল দেখতে পেল সম্বুদ্ধ।

সামনের ফাঁকা জায়গাটায় কিছু মানুষজন জড়ো হয়েছে; একটা মোষের গাড়ি, মোষগুলো খুলে শিমুলগাছে বাঁধা; সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে ঘাসের ওপর বসে; চায়ের দোকানের ঝাঁপ খুলেছে, সেখানে উনুনে আঁচ পড়েছে, ধোঁয়া উঠছে চাল ফুটো করে

সোজা; কুয়াশার আস্তর কেটে গেছে; ঝকঝকে রোদ্দুরে শেষ শিশিরের ফোঁটাও ঘাসের শরীর থেকে দ্রুত অদৃশ্য হচ্ছে।

হাসপাতালের পশ্চিমের কোলাপসিব্‌ল্ গেট খোলা। এই শীতেও খালি গা, মালকোঁচা মেরে ধুতিপরা ছোটখাটো একটি মানুষ, গালে তিনদিনের অকাটা দাড়ি, ঝাঁটা দিয়ে আওয়াজ করে সিমেন্টের মেঝে পরিষ্কার করছে।

কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে হাসপাতালের গেট অবধি গেল সম্বুদ্ধ। দেখতে পেল। হাত থেমে গেল।

হারুর কাছ থেকেই শুনে নিয়েছিল। সম্বুদ্ধ বলল, আপনি শম্ভু?

—আজ্ঞে। শম্ভু দাস, সুইপার। দণ্ডবত বাবু। আপনাকে তো ঠিক...

—আমি আপনাদের আগের ডাক্তারবাবুর বন্ধু। আমার নাম সম্বুদ্ধ। কাল রাতে এসেছি, হারুবাবুর কাছে ছিলাম, আজ চলে যাব।

—প্রাতঃ পেন্নাম। আপনিও ডাক্তারবাবু? এখানে আসবেন?

—আমিও ডাক্তার। তবে এখানে আসব না।

শুনে উৎসাহে কিঞ্চিৎ ভাঁটা পড়ল শম্ভুর। জোরে জোরে ঝাঁটা চালাতে লাগল। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সরে এল সম্বুদ্ধ।

সামনের ফাঁকা জায়গাটা ভরে উঠেছে। লোকজন দেখছে সম্বুদ্ধকে। নতুন মানুষ, কিন্তু আগ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করতে ভরসা পাচ্ছে না। শেষ অবধি চায়ের দোকান থেকে উঠে এল একজন, পঞ্চাশের ওধারে, লাল কম্ফর্টার, খয়েরি সোয়েটার, লুঙ্গি, পাম্প শু।

—মশাইকে আগে কখনও...

পরিচয় দিল সম্বুদ্ধ।

—অ! তা এখানে আগমনের হেতু?

—এই দেখতে। অনিকেত আমার বন্ধু ছিল। কিছু জিনিসপত্রও রয়ে গেছে। ওর তো বাবা-মা বেঁচে নেই। কলকাতায় স্ত্রীর সঙ্গে কথা বললাম। ভাবছি, ওগুলো নিয়ে যাব।

—ইস্ত্রি, তিনি তো এলেন না একবারও। তিনিও নাকি ডাক্তার?

—বুঝতেই পারছেন, অল্প বয়সে, অতবড় শক্। বিছানায় একেবারে শয্যাশায়ী। ওর বাবা-মা ছাড়তে চান না।

—তেনারাও না হয় আসতেন।

প্রসঙ্গ ঘোরানোর জন্যেই সম্বুদ্ধ তাড়াতাড়ি বলল, মশাইয়ের পরিচয়?

—আজ্ঞে আমার নাম হরনাথ মুকুজ্যে, নিকটেই আমার ভদ্রাসন। পুজোআচ্চা করি, ক'ঘর যজমান আছে, জমিজিরেতও আছে দু'চার বিঘে, চলে যায়।

—আলাপ হয়ে ভাল লাগল। অনিকেত খুব বলত আপনাদের কথা। হাসপাতাল, এখানকার মানুষজন, সরল, প্রাণবন্ত। ...কেমন ছিল আপনাদের আগের ডাক্তারবাবু?

—ভাল। সদাশয় ভদ্রলোক, গরিবের জন্য দয়ামায়া ছিল। তবে কিছু মনে করবেন না, আপনার বন্ধুটি ছিটগ্রস্ত ছিল।

—বলেন কী?

—হ্যাঁ, নইলে কেউ সাইকেল নিয়ে দূর দুরান্তে ঘুরে বেড়ায়? নেশাভাঙ করত না, মেয়েছেলের দোষও ছিল না। তবু সাঁওতালদের গ্রামে গিয়ে পড়ে থাকত, ওদের লেখাপড়া শেখাত, বিনা পয়সায় ওষুধ দিত।

—তা সেগুলো খারাপ কি?

—খারাপ? এবারে বাঁকা চোখে হরনাথ তাকালেন সম্বুদ্ধর দিকে—ভাল বলছেন? ভদ্রলোকের ছেলে, অত নামযশ, অতবড় ডাক্তার, কোয়ার্টারে বসে রুগি দেখলেও না হোক পঞ্চাশ-একশো টাকা রোজগার হত, সে কিনা টো টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে হাঁড়ি-বাগদি-ডোমেদের ডেরায়? গ্রামের ছেলেছোকরাগুলোও উচ্ছন্নে যেতে বসেছিল।

—তা হলে মরে গিয়ে ভালই হয়েছে বলুন? গ্রামে আবার শান্তি ফিরে এসেছে।

—তা বলতে পারেন।

বলেই হরনাথের মনে হল, বেফাঁস বলে ফেলেছেন। যাই, চায়ের দামটা দেওয়া হয়নি, বলে তাড়াতাড়ি ফিরে গেলেন, বাঁশের বেঞ্চিতে তাঁরই দিকে তাকিয়ে বসে থাকা জনাছয়েক বহুদর্শী গ্রামবাসীর দিকে।

মাটিতে থেবড়ে বসা, রোদ-পোয়ানো মানুষগুলোর দিকে তাকাল সম্বুদ্ধ। অনিকেত গ্রামে থাকতে চেয়েছিল। গ্রামে হরনাথও থাকেন। হরনাথরাই গ্রাম নিয়ে ভাবেন, মানুষকে ভাবান। এই আপাতনিরীহ মানুষগুলোকে দেখে মনে হয় শীতের প্রত্যূষে একফালি রোদ্দুরের ওম ছাড়া এদের ভাবনায় অন্য কিছুই নেই।

সম্বুদ্ধ আবার হাসপাতালের দিকে হাঁটা দিল। খেয়াল করেনি, একটা সাইকেল কলতলায় কোয়ার্টারের গায়ে ঠেসিয়ে রাখা। সাইকেল থেকে নেমে হন্তদন্ত হয়ে হাসপাতালের দিকে এগুতে এগুতে পেছনের কাছা ঠিক করছে যে মানুষটি, বাবরি চুল, গলায় কণ্ঠী, তাকে লক্ষ করে পেছন থেকে ডাকল সম্বুদ্ধ, শিবেনবাবু।

চট্টরাজ থমকাল কিন্তু পেছন ফিরল না। যেন ট্রেনের ইঞ্জিন, দরকার হলে পেছনে হেঁটে আসবে, কিন্তু মুণ্ডু ঘোরানো যাবে না, সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। সম্বুদ্ধ গুটিগুটি সামনে যেতেই দু'হাত কপালে ঠেকাল, নমস্কার আপনিই ডাক্তারবাবু?

করিতকর্মা লোক। খবরটবর নিয়েই এসেছে।

—হ্যাঁ, আমি অনিকেতের বন্ধু, ক্লাসমেট ছিলাম, কিছু জিনিসপত্র...

—কিছু খবরাখবর মিলল?

সম্বুদ্ধ সতর্ক হল। এর কাছে ভ্যানতাড়া করে লাভ নেই। সরাসরি বিষয়ে আসাই ভাল।

—আপনার কাছে কিছু জানার ছিল শিবেনবাবু!

—আসুন অফিসঘরে বসে কথা হবে।

এগিয়ে যেতে যেতে সম্বুদ্ধ হিসাব করার চেষ্টা করছিল। হারু? অতরাতে এসেছে সম্বুদ্ধ, হারু বেরিয়ে গেছে সাতসকালে, খবর দেওয়া সম্ভব নয়। শম্ভু? শিবেন আসতেই জানিয়ে দিয়েছে? হতে পারে। কিন্তু মানুষটার গলার স্বরে সারা রাতের প্রস্তুতি। ও জেনেছে আজ নয়, কালই। কিন্তু কীভাবে?

—বড্ড ধুলো, শম্ভুটা কী যে পরিষ্কার করে? একটু দাঁড়ান, ডেকে দিই।

—থাক। আমার অসুবিধে হবে না। একটা চেয়ার টেনে বসে সম্বুদ্ধ। বসতেই গা শিরশির করে। এখানে বসেই কি অনিকেত রোগী দেখত?

—চা আনাই? এখানে চা-টা ভাল বানায়। আগের ডাক্তারবাবুর খুব পছন্দ ছিল।

—না, না, আমার চায়ের নেশা নেই। তা ছাড়া সকালে হারু খাইয়েছে এককাপ।

—তা হলে মুড়ি-আলুর চপ দিতে বলি? পেটে তো কিছু পড়েনি সকাল থেকে?

—আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না। আমার তাড়া আছে। দু'চারটে কথা বলেই চলে যাব।

—বসুন স্যার। একটিপ নস্যি নিয়ে গুছিয়ে বসে শিবেন চট্টরাজ।

—কেমন মানুষ ছিলেন আপনাদের আগের ডাক্তারবাবু?

—ঈশ্বর মশাই, সাক্ষাৎ ভগবান, দু' হাত কপালে ঠেকান শিবেন, গরিবের মা-বাপ। কত মানুষের যে কত উপকার করেছেন! কাউকে জানতে অবধি দিতেন না। বলতেন, শিবেনবাবু, দেখে রাখুন, এই মানুষগুলোই আমার দেশ। ভগবান মানতেন না, তবু দূর-দূরান্ত থেকে আসা মানুষের সেবা করতেন যেন ঈশ্বরের দাসানুদাস! আমরা অনাথ হয়ে গেলাম। ডাক্তার আরও হয়তো আসবেন, কিন্তু ওইরকম একটা মানুষ...

শিবেনকে সামলে নিতে সময় দিল সম্বুদ্ধ। কোঁচার খুঁটে চোখ মোছা শেষ হলে বলল, তা এই দেবতুল্য ডাক্তারবাবুর সঙ্গে আপনার নাকি কী একটা ব্যাপারে কিঞ্চিৎ মনোমালিন্য...

—রটনা রটনা। দুষ্টলোকে বলে বেড়ায়। আমিই তো সব দেখতাম। ওষুধের হিসাব বলুন, স্টক-সাব স্টক বলুন, ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর টাকা বলুন, সব কিছু এই শিবেন চট্টরাজের ওপর ফেলে রেখে ডাক্তারবাবু ঘুরে বেড়াতেন।

—বলেন কী? হাসপাতাল ফেলে রেখে ঘুরে বেড়াতেন?

—সে তো রোগীদেরই স্বার্থে। কোথায় সাঁওতাল বস্তিতে কলেরা হচ্ছে, ডাক্তারবাবু চললেন স্যালাইন দিতে; কোথায় বাগ্‌দি পাড়ায় এনকেফালাইটিস, ডাক্তারবাবু মশা মারার তেল ছড়াচ্ছেন। কাজ কি একটা?

—আচ্ছা, ভাল কথা মনে পড়ল, এখানকার পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য কার সঙ্গে নাকি ওই স্যালাইনের বোতল নিয়েই...

—হবে না? প্রায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন শিবেন, কী অন্যায় আবদার বলুন তো? বলে কিনা কলেরা হচ্ছে, দশ বোতল স্যালাইন হবে? তা সে সময় ডাক্তারবাবু ছিলেন না, সরল বিশ্বাসে আমিই দিয়ে দিলাম দশ বোতল স্যালাইন। ডাক্তারবাবুর কাছে খবর গেল সেই স্যালাইন একশো টাকা করে বোতল বিক্রি হচ্ছে। আর যায় কোথায়? সোজা চিঠি দিয়ে লোক পাঠালেন, এখুনি রিসিট কেটে দিয়ে যান, আর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বোতল ফেরত দিন।

—পঞ্চায়েত তা হলে দেখতে পারত না ডাক্তারবাবুকে।

—শুধু পঞ্চায়েত কেন, ডাক্তারবাবুর একরোখা স্বভাবের জন্য লেগেছে তো সক্কলের সঙ্গে। ওই সনকা, পটের বিবি, কাজের নামে অষ্টরম্ভা, এলেন বোধহয়, বাইরে গলার আওয়াজ পাচ্ছি, তাকেও কাজ করিয়ে ছেড়েছেন ডাক্তারবাবু, ও-ও হাড়ে চটা। এদিকে হারু, অতকাল ধরে কোয়ার্টারটা ভোগদখল করছিল, ডাক্তারবাবু থাকতে শুরু করলেন, হারুরই কি কম আঁতে লেগেছিল? ডাক্তারবাবুর ওপর রাগ কারও কম ছিল না।

—আর আপনি?

—বললাম যে, এখনও আমি গায়ত্রী জপ করার সময় ইষ্টদেবের আগে ওনারই নাম স্মরণ করি।

—হাতে নাতে পেথিডিন চুরি ধরার পরও?

—পেথিডিন? এই হাসপাতালে? সাপ্লাই আসে নাকি? দেখবেন স্টক-রেজিস্টারটা?

—লোকে যে বলে?

—লোকে অমন অনেক কথাই বলে।

রোগীরা জানলা দিয়ে উঁকি ঝুঁকি মারছিল অনেকক্ষণ। এবারে দুয়েকজন দরজায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে এল সম্বুদ্ধ।

—ঢ্যামনা! আজ সাতসকালে কোন রসের নাগর নিয়ে পড়েছে রে শম্ভু? এসে থেকে দেখছি গুজুর গুজুর। লোকটা কে?

শম্ভুর চোখ, ঠোঁটের আঙুল কোনওটাই লক্ষ করেনি সনকা। বলেই যাচ্ছিল, শেষ অবধি সম্বুদ্ধ সামনে গিয়ে দাঁড়াতে থামল।

—নমস্কার।

সম্বুদ্ধর নমস্কারের জবাবে পানখাওয়া কালো ঠোঁটের উপুড় আর ক'টা চোখের তেরচা দৃষ্টি ফিরিয়ে দিল সনকা। শম্ভুর দিকে চোখের ভাষায় যেন জানতে চাইল, হ্যাঁরে শম্ভু, মালটা কে?

—নমস্কার, আমার নাম সম্বুদ্ধ, আমি আপনাদের আগের ডাক্তারবাবুর বন্ধু।

—অ।

—ওর কিছু জিনিসপত্র পড়েছিল, সেগুলো নিতে এসেছিলাম।

—বেশ। তা নেওয়াটেওয়া হয়েছে?

—হ্যাঁ, এবারে চলে যাব। একটা দুটো কথা ছিল আপনার সঙ্গে...

—এখন? কত রুগি বাইরে হইচই করছে দেখছেন না?

তা ঠিক, রোগীদের জন্য সনকার বুকভরা ভালবাসা।

—তা তো বটেই। বেশি সময় নেব না, এক মিনিট।

—বলে ফেলান।

—ডাক্তারবাবু, মানে অনিকেত, মানুষটা কেমন ছিল?

এবারে ঘাড় কাত করে সনকা, শম্ভুর দিকে দ্যাখে,—কী বলব রে শম্ভু? মরা মানুষের নিন্দে করতে নাই। নইলে বলতাম, মানুষটা ছিল পয়লা নম্বরের হারামি, একটা তিলে খচ্চর।

সম্বুদ্ধ তাকিয়ে থাকে সনকার দিকে। মানুষটাকে ভাল লাগছে সম্বুদ্ধর। এর কোনও ঘোমটা নেই। যা বলার সোজাসুজি, স্পষ্ট করে বলেছে।

—হয়েছে, আর কিছু জানতে চান?

—না, বলে হাসপাতালের গেট দিয়ে বেরিয়ে আসে সম্বুদ্ধ। আর তখনই গাড়িটা ঘ্যাঁচ করে এসে মোরামের ওপর ব্রেক কষে।

—কই মা সনকা, কোথায় গেলি?

ভরন্ত চেহারার মানুষটার গলা শুনে ছিটকে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এল, সনকা একা নয়, চট্টরাজও।

গেটের পাশে দাঁড়িয়েছিল সম্বুদ্ধ। সম্বুদ্ধকেই যেন খুঁজছিল,—এই তো আপনার কথাই শুনলাম, কাল সি এম ও এইচ রেডিওগ্রাম করেছিলেন, ভাবলাম একবার দেখা করে যাই। আমার নাম গোলোকপতি সাউ, আমি এখানকার বি এম ও এইচ।

হাত তুলে নমস্কার করল সম্বুদ্ধ।

শম্ভু ততক্ষণে বাইরের রোদে দু' খানা চেয়ার এনে ফেলেছে।

—না রে, রোদ চড়ে গেছে, ওই গাছের ছায়াতে পেতে দে।

চেয়ারে বসে গোলোকপতি কোমরের বেল্ট আলগা করে পা টান করে দিলেন। মানুষজন গোল করে ঘিরে গোলোকপতিকে দেখছিল। হরনাথ এগিয়ে এলেন, যা, ভাগ, ডাক্তারবাবুকে আরাম করতে দে।

হরনাথকে দেখে নমস্কার করলেন গোলোকপতি, ভাল আছেন?

—ভাল, আপনি? অনেকদিন বাদে এলেন।

—হ্যাঁ, সেই যেদিন ঘটনাটা ঘটল, তারপর এই আজ।

ঘটনাটার কথা উঠতেই কেমন স্তব্ধতা ছেয়ে এল চারিদিক। সনকার আপাতত রোগীটোগীর কথা খেয়াল নেই। দোকান থেকে ডাক্তার সাউয়ের জন্য বড় এক গেলাসে চা এনে ফেলল।

—একি, একা আমার? আর একটা চা নিয়ে আয়, বড় করে, আর দু'খানা বিস্কুট, তাড়াতাড়ি।

ডক্টর সাউয়ের পাশে বসতে বসতে সম্বুদ্ধ বলে, না না, আপনি খান, আমি আর চা খাব না।

—তাই কখনও হয়? আপনি আমাদের অতিথি। জলখাবার খাওয়া হয়েছে?

উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে ডাক্তার সাউ নিজেই উঠে গিয়ে চায়ের দোকানে অর্ডার টর্ডার দিয়ে এসে আবার চেয়ারে বসে হুশ করে চায়ে চুমুক দিলেন।

—বলুন ভাই, কিছু খবরাখবর জোগাড় হল?

—না, মানে তেমন কিছু...। আমার উদ্দেশ্য প্রাইমারিলি জায়গাটা দেখা, অনিকেতের বইপত্র দুয়েকটা পার্সোনাল জিনিস ওর স্ত্রীর হাতে পৌঁছে দেওয়া, আর একটু খোঁজখবর নেওয়া যাতে...

—সেই কথাটাই তো বলছি। কিছু জানা গেল?

—আসলে এখানে এসে যেটা মনে হচ্ছে, অনিকেত যা করতে চেয়েছিল, যা ভেবে এসেছিল, মনে হয় শেষের দিকে...

—পারছিল না। আইডিওলজি এক জিনিস, আর তার অ্যাপ্লিকেশন আর এক। প্রথম থেকেই কনফ্রন্টেশনে গিয়ে পড়েছিল আপনার বন্ধু। আমাকে খুবই রেসপেক্ট করত, আসত পরামর্শ টরামর্শ নিতে, ওকে সাবধানও করেছি, শোনেনি।

—ওর কোনও শত্রু? কাউকে সন্দেহ করেন?

—সেইভাবে কেউ নয়; আবার সবাই। লোয়ারকাস্ট, শিডিউল্ড্ ট্রাইব ওদের সঙ্গে বেশি ওঠাবসা করত, সে জন্য গ্রামের ভদ্রলোকরা চটেছিল। হাসপাতালের স্টাফদের সঙ্গেও সদ্ভাব ছিল না। পঞ্চায়েতকে চটিয়ে রেখেছিল। মা সনকা, বাবা শিবেন, যাও, তোমরা আউটডোরটা চালু করো।

সনকা ও শিবেন আদেশের ভারে কুঁজো হয়ে গুটিগুটি হাসপাতালে সেঁধিয়ে যায়।

সুযোগ পেয়ে সম্বুদ্ধ কথাটা পাড়ে,—আচ্ছা, এই ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর অপারেশনগুলো, লাইগেশন, ভ্যাসেকটমি, এ সব কি আপনিই করতেন?

—আর কে করবে? করতাম না, এখনও করি। এদিকে খুব ভাল কাজ হয়। গতবছর এই ছোট হেল্থ্ সেন্টারেও ছশো লাইগেশন হয়েছে।

—ছশো?

—ছশো বাইশ। জেলায় সেকেন্ড।

—শোনা যায় এই লাইগেশনের সংখ্যা নিয়ে আপনার সঙ্গে নাকি অনিকেতের মতের অমিল গোছের...

চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল গোলোকপতির। হাতের ইশারায় চায়ের দোকানের ছেলেটাকে ডাকলেন। নিজের গ্লাসটাও দিয়ে দিল সম্বুদ্ধ।

—হ্যাঁ, কী যেন বলছিলেন, সম্বুদ্ধর দিকে ফিরলেন ডক্টর সাউ,—ঠিকই শুনেছেন। লাইগেশন ব্যাপারটাতেই ডক্টর চৌধুরী ছিল না। একবার মস্ত ক্যাম্প হল, ও এলই না। পেছনের মাঠে বাগ্‌দিদের ছেলেদের সঙ্গে সারাদিন বল পেটাল। সন্ধ্যাবেলা আমরা যখন ক্যাম্প গুটোচ্ছি, তখন এসে খোঁজখবর নিল। একবার বলেছিল, আমার এলাকায় অত না-লাইগেশন হওয়া মেয়ে আছে? আমি জবাব দিয়েছিলাম, এলাকায় তোমার তো দু'বছরও হয়নি চৌধুরী। আমি ষোলো বছর আছি। কোন মেয়ের ক'টা স্বামী তাও আমি বলে দিতে পারি। হেসে হেসেই বলেছিলাম। ঝগড়া না, বিবাদ না। শুনেছিল দু'য়েকজন। তারাই রটিয়েছিল সাতকাহন করে। তেমন কিছু না।

ঘড়ি দেখছিলেন সাউ। শিমুল গাছের ছায়া ছোট হতে হতে অদৃশ্য। রোদ চমকাচ্ছে মাথায়। যেতে হবে সম্বুদ্ধকেও।

—আজই ফিরবেন?

ঘাড় হেলাল সম্বুদ্ধ।

—যাবার আগে একবার চণ্ডীবাবুর সঙ্গে দেখা করে যেতে পারেন। কোয়াক ডাক্তার। তবে কিনা বহুদিনের প্র্যাক্টিস, অভ্যেসে একধরনের ক্লিনিকাল আকুমেন তৈরি হয়ে যায়। তা ছাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য। আপনি এসেছিলেন অথচ দেখা করেননি শুনলে দুঃখ পাবেন।

চণ্ডী ডাক্তার। হারু বলেছিল। গেলে খারাপ হয় না।

—কত দূর?

—দূর বেশি নয়। তা ছাড়া আমার যাবার রাস্তাতেই পড়বে। আপনাকে ড্রপ করে দিয়ে যেতে পারি।

অ্যাম্বুলেন্সের পেছনে উঠে বসল সম্বুদ্ধ। সামনে ড্রাইভারের পাশে ডক্টর সাউ। হেল্‌থ্ সেন্টারটা ফাঁকা মাঠের মধ্যে। মোরাম ধরে কিছুটা উত্তরে গিয়ে বাঁক নিলেই কিন্তু বাড়িঘর। রাতে এসেছে, অতটা বুঝতে পারেনি। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই বাজারে পৌঁছে গেল অ্যাম্বুলেন্স। এখানেই বাস থেকে নেমেছিল কাল।

সম্বুদ্ধকে সঙ্গে নিয়ে চণ্ডীডাক্তারের চেম্বারে গেলেন সাউ। বাজারের পেছন দিকে একটা সাইকেল সারানোর দোকান। সেটা পাশে রেখে ভাঙা মন্দির পার হলেই ডাক্তারবাবুর চেম্বার। বাইরে থেকে দেখলে টালির ছাদ একটা ভাঙাচোরা কুঁড়েঘর মনে হয়। ভেতরে ঢুকে হকচকিয়ে গেল সম্বুদ্ধ।

পুরোদস্তুর নার্সিংহোম। একপাশে সবুজ পর্দা-ঘেরা ডাক্তারবাবুর চেম্বার। সেদিকে রোগী দেখার রেক্সিন মোড়া বেঞ্চি, চেয়ার টেবিল সবই আছে। এদিকে গোটা চারেক রোগীসুদ্ধ বেড, নীল পাড় সাদা শাড়ি নার্স, এমনকী স্যালাইনের বোতল অক্সিজেনের সিলিন্ডার অবধি।

স্যালাইনের বোতলগুলোর দিকে তাকিয়ে অনিকেতকে মনে করার চেষ্টা করছিল সম্বুদ্ধ, ডক্টর সাউয়ের কথায় চমক ভাঙল,—আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই, ইনি আমাদের হাসপাতালের আগের ডাক্তারবাবু, তাঁর বন্ধু,...সরি নামটাই জিজ্ঞেস করা হয়নি, মানে কথায় কথায়...

—সম্বুদ্ধ, সম্বুদ্ধ সেন।

—বদ্যি? বেশ বেশ, ক্লাশমেট মানে ডাক্তারিপড়ার বন্ধু? চণ্ডীডাক্তার বললেন।

সম্বুদ্ধ ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলল।

ডক্টর সাউ আর দাঁড়াতে চাইলেন না,—অনেক কাজ পড়ে আছে, আপনারা আলাপ করে নিন, আসি ডক্টর সেন, খুব ভাল লাগল আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে, সুযোগ পেলেই আবার আসবেন, এলাম ডাক্তারবাবু।

ঘরটা ঠাণ্ডা, স্যাঁতসেতে। মানুষটাও কেমন যেন। মরামাছের মতো চোখ, খসখসে গলার স্বর, ডান গালে মস্ত একটা আঁচিল, খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবি, কালো জহর কোট, পকেটে চেন লাগানো ঘড়ি।

—তা দেখা হল বন্ধুর হাসপাতাল?

—ইচ্ছে ছিল অনেকদিনই। অনিকেত তো ছাত্র হিসেবে খুবই ভাল ছিল। তা সত্ত্বেও একরকম জোর করেই গ্রামে ডাক্তারি করতে এসেছিল। ও প্রায়ই বলত, বইয়ের বিদ্যে আর ডাক্তারি দুটোর মধ্যে অনেক তফাত। যে খেতে পায় না তাকে অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ লিখে দেওয়া মূর্খামি।

—ওটাও বইপড়া বিদ্যে।

বুঝতে না পেরে সম্বুদ্ধ চোখ তুলে তাকাল।

ততক্ষণে চেয়ারে বসেছেন চণ্ডী। উল্টোদিকে সম্বুদ্ধ। ডিবে থেকে সুগন্ধী জর্দা নিয়ে চোয়ালে ঢাললেন চণ্ডী।

—ওই যে, খেতে পায় না বললেন। গ্রামে এখন খেতে পায় না এমন লোক নেই। ভূমিসংস্কারের পর দু' বেলা দু' মুঠো খেতে পাওয়া এখন সকলেরই সাধ্যের সীমানায় এসে গেছে। প্রশ্নটা অন্য, ওষুধ কিনে খাবে না দয়ার দান হিসেবে নেবে।

—দয়ার দান? ক্রমশ অবাক হচ্ছিল সম্বুদ্ধ।

—হাসপাতালের ওষুধ। মানুষের ধারণা বিনে পয়সার চিকিচ্ছে, চিকিচ্ছে নয়। ওতে রোগ সারে না। মানুষ হাসপাতালে যায় বটে, লাইন দিয়ে ওষুধও নেয়। নিয়ে পচা পুকুরে ছুড়ে ফেলে আমার চেম্বার থেকে দাম দিয়ে ওষুধ কিনে ঘরে ফেরে। তাতেই রোগ সারে ওদের।

—অনিকেতও কি তাই বিশ্বাস করত?

—সেটাই তো বলছি। ওনার বিশ্বাস ওনার বই পড়া বিদ্যে। সত্তর বছর গ্রামে না থাকলে গ্রামকে চেনা যায় না ডাক্তারবাবু।

—অনিকেতকে বলেছিলেন কখনও?

—কতবার। মানুষটাকে ভাল লাগত আমার। সৎ, কর্তব্যনিষ্ঠ। মানুষের ভাল করার জন্যে কত চেষ্টা! গ্রামে গ্রামে সাইকেল নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। অসুখ খুঁজতেন। সেটাই ছিল ওনার দুর্বলতা।

চণ্ডীডাক্তারের কথা কিছুই বুঝতে পারে না সম্বুদ্ধ।

—ডাক্তারকে অসুখ খুঁজে বেড়াতে হয় না ডক্টর সেন। অসুখই ডাক্তারকে খুঁজে নেয়। আমি বলেছি, আপনি চেম্বার করুন, কোয়ার্টারেই সকালবিকেল রোগী দেখুন। বেশি নয়, দশ টাকা ভিজিট নিন। রোগী ঢেউয়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে। নাওয়াখাওয়ার সময় পাবেন না।

—অনিকেত কী বলেছিল?

—আমার কথাগুলো ভাল লাগেনি। পরে অন্যদের বলেওছিলেন শুনেছি।

—কিন্তু প্র্যাক্টিস করা তো অন্যায়, বেআইনি।

—কীসের আইন মশাই? অত গুণী ডাক্তার এই গ্রামে পড়ে থেকে দুটো পয়সা রোজগার বেআইনি? আইন যারা বানায় তারা এসে দেখেছে ক'টা হেল্‌থ্‌ সেন্টারে বিজলি আছে, জল আছে? ডাক্তারগুলো খাবে কী শোবে কোথায়? একটা সিনেমা-থিয়েটারও দেখার সুযোগ নেই।

সম্বুদ্ধ খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা ডাক্তারবাবু, আপনার সঙ্গে কি অনিকেতের কোনও,...মানে শুনেছি হাসপাতালের স্যালাইন নিয়ে..

—ঠিকই শুনেছেন। কলেরা হচ্ছিল। স্যালাইন দিতে হবে। ক'টা লোক হাসপাতালে যায় স্যালাইন নিতে? আমার এখানে তখন ভেতরে জায়গা হচ্ছে না, বাইরে তেরপল খাটিয়ে মাটিতে লোক শুইয়ে স্যালাইন দিচ্ছি। অত স্যালাইন পাব কোথায়? হাসপাতালে চাইলাম। তা ডাক্তারবাবু বললেন স্লিপ দিয়ে সই করে আনতে হবে। উপায়? তাই আনলাম। চিন্তা করুন, মানুষগুলো মরে যাচ্ছে, উনি আইন দেখাচ্ছেন।...তা সব থেমেটেমে গেলে ফেরত দিয়ে এসেছিলাম। গোরুর গাড়ি ভর্তি করে স্যালাইনের বোতল নিয়ে গিয়ে বলেছিলাম, এই নিন ডাক্তারবাবু, দশ বোতল নিয়ে গিয়েছিলাম, বিশ বোতল জমা করে গেলাম। গ্রামের মানুষ, মুখ্যু সুখ্যু, কিন্তু আমাদের এমনটাই ধারা। সুদসুদ্ধ শোধ। পরে দরকার হলে আবার দেবেন, তাতে মানুষের উপকারই হবে।

সম্বুদ্ধ খেয়াল করেনি, হঠাৎ শালপাতার ঠোঙায় লুচি এল, আলুর দম আর বোঁদে।

—এসব কী? এত আমি খেতে পাবব না।

—এই হচ্ছে শহরের মানুষের আর এক দোষ। আতিথেয়তা করতেও জানে না, নিতেও জানে না। খান তো! বেলা কম হয়নি। কখন খাবার জুটবে ঠিক নেই। সামান্যই আয়োজন। আগে জানা থাকলে বাড়ি নিয়ে যেতাম। পুকুরের মিরগেল মাছ খেতেন আয়েশ করে। ফিরে গিয়ে বলতেন, হ্যাঁ, মাছ খাইয়েছিল বটে।

লুচির কোনা ভাঙে সম্বুদ্ধ। তেলেভাজা লুচি। আলুর দমে শুকনো লঙ্কার ঝাল। বরং বোঁদেগুলো ঝরঝরে।

শীতের বেলা, ধরতে ধরতেই ফস্কে যায়। বাইরে বেরিয়ে সম্বুদ্ধ দেখল তার নিজের ছায়াই গাছের মতো লম্বা।

চণ্ডীডাক্তার পাশে পাশে হাঁটছিলেন।

—একবেলা খাই, তাও খেতে খেতে বেলা গড়িয়ে যায়। কতদিন হয়েছে সন্ধ্যার আগে অন্ন ছুঁতে পারিনি। আজ তো তাড়াতাড়ি হয়ে গেল।

ইচ্ছে হলেও পা চালাতে পারছিল না সম্বুদ্ধ। পাশাপাশি ওষুধের বাক্স হাতে আসছিল জগা, চণ্ডীর কম্পাউন্ডার কাম বডিগার্ড।

—বাজারে সোনালি ঢোকার সময় হয়ে গেছে। আপনি এখান থেকেই বাস পেয়ে যাবেন।

—সোনালি?

—লাস্ট বাস। আমাদের বাসের ওইরকমই নাম সব। খারাপ?

—খারাপ কেন হবে? ভালই তো! বলতে বলতে সম্বুদ্ধ অন্য কথা ভাবছিল। লাস্ট বাস? কিন্তু সম্বুদ্ধকে যে একবার কোয়ার্টারে ফিরতে হবে। দুয়েকটা জিনিস রয়ে গেছে। অনিকেতের বইপত্রগুলো কাল রাতেই ভেবে রেখেছিল সম্বুদ্ধ, নিজের কাছে রেখে দেবে। কোয়ার্টারের চাবিটাও পকেটে। হারু বলে দিয়েছিল চায়ের দোকানে রেখে দিতে। সেটাই বলল চণ্ডীকে,—আমাকে যে একবার হাসপাতাল হয়ে যেতে হবে!

—হাসপাতাল?

থমকে দাঁড়ালেন চণ্ডী,—তা হলে তো আর সোনালি পাবেন না। গিয়ে ঘুরে আসার সময় হবে না।

দমে গেল সম্বুদ্ধ।

জগা চুপচাপ ছিল, এবারে কথা বলল,—কেন বড় রাস্তায় তুলে দিয়ে এলে সোনালি পেয়ে যাবেন।

—ঠিক, চণ্ডী যেন রাস্তা দেখতে পেলেন, ওদিক দিয়ে গেলে সোনালি পেয়ে যাবেন। কিন্তু রাস্তা যে অনেকখানি!

—আমি তুলে দিয়ে আসব।

—সাইকেলটা নিয়ে যাস তা হলে। পেছনে বসিয়ে নিস, সামনে বসা ডাক্তারবাবুর অভ্যেস নেই।

—কাশেমের মোপেডটা পেলে ওটাই নিয়ে যাবখন।

—তা হলে তো খুবই ভাল হয়।

বড় রাস্তায় এসে দু'দিকে ভাগ হয়ে গেল ওরা। জগা চণ্ডীবাবুকে ছাড়তে বাঁয়ে গেল, সম্বুদ্ধ ঘুরল ডানদিকে।

আট

সামান্যই জিনিস, গুছিয়ে নিতে সময় লাগল না। সম্বুদ্ধ একটু খুঁজল, অনিকেত ডাইরি টাইরি কিছু লিখেছিল কি না। পাওয়া গেল না। মিলির একটা ছবি পেল, কয়েকটা বই, কিছু টাকাপয়সা। টাকাগুলো শেষ অবধি রেখেই দিল, হারুর জন্যে। বাইরে এসে চায়ের দোকানে চাবিটা দিতে ওরা নিয়ে রাখল, মনে হল বলা ছিল।

মোরামে উঠে একবার পেছন ফিরে তাকাল। হাসপাতাল। বন্ধ এখন। অসুস্থ মানুষেরা কেউ নেই। স্টাফেরা চলে গেছে। হারুও নেই। সম্বুদ্ধ চলে যাচ্ছে। অনিকেত কি কোথাও মিশে আছে এখানেই? সম্বুদ্ধর মনে হল অনিকেতের শেষ স্মৃতিটুকু মুছে নিয়েই সে চলে যাচ্ছে।

খেয়াল করেনি কখন জগা এসে দাঁড়িয়েছে। মোপেডের শব্দটা কানে গিয়েছিল, অন্যমনস্ক ছিল, নইলে দেখতে পেত।

এম এইট্টি মডেলের নিচু মোপেড। পেছনে জড়োসড়ো হয়ে বসতে হয়। জগা একবার জিজ্ঞেস করল, ঠিকমতো বসেছেন, ছাড়ব?

হ্যাঁ বলতে না বলতেই চালিয়ে দিল জগন্নাথ। হঠাৎ চলতে শুরু করায় ঝাঁকুনিতে কাত হয়ে যাচ্ছিল সম্বুদ্ধ, জগাকে আঁকড়ে ধরে সামলে নিল।

মোরামের ধুলো উড়ছে লাল। পেছন দিকে তাকিয়ে একসময় হেল্‌থ্‌ সেন্টারের পুরনো বাড়িটা গাছাগাছালির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখল। রোদ মরে আসছে। কনকনে হাওয়ায় কান ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। শীতটা যেন এতক্ষণ কোথাও ঘাপটি মেরে ছিল, রোদ মরে আসতে একটু একটু মুখ বাড়াচ্ছে।

—রাস্তা দিয়ে গেলে ঘুর হয়। আলে আলে গেলে কম পড়ে। মাথা না ঘুরিয়েই জগন্নাথ বলল।

শক্ত পেশিবহুল চেহারা, মধ্য চল্লিশের মানুষটা দরকারের বাইরে কথা বলে না। এতক্ষণে একটা কথা বলল সম্বুদ্ধর সঙ্গে যেটা না বললেও ক্ষতি ছিল না।

খালি মাঠ বুক চিতিয়ে পড়ে আছে। একদিকে শ্যালোর আওয়াজ, দুয়েক টুকরো খেতকে ছিঁড়েখুঁড়ে দুনো তিনো ফসল তোলার ধান্দা। এতক্ষণ ঘরবাড়ি মানুষজন দেখা যাচ্ছিল। গ্রাম ছাড়িয়ে ফাঁকা মাঠে এসে পড়তেই মানুষের সাক্ষাৎ বিরল হয়ে গেল।

একটা আমবাগান, ঝিমিয়ে থাকা ইটভাঁটা, পার হয়ে দূরে দেখা গেল বড় রাস্তা, পিচের ওপর বিকেলের পড়ন্ত আলো পড়ে সাপের চামড়ার মতো চকচক করছে।

—সোনালি আসতে দেরি আছে। আপনাকে টুকু অপেক্ষা করতে হবে।

ইটভাঁটা পার হয়েই একটা দহ। জল। মন কেমন করা বিকেল এখানেই যেন স্নানটান সেরে ফিরে যাবে সন্ধ্যার অন্ধকারে।

—এখানেই ওনাকে পাওয়া গিয়েছিল। হঠাৎ বলল জগন্নাথ।

—থামুন। নিজের গলার স্বরে নিজেই চমকে উঠল সম্বুদ্ধ। মোপেড থামিয়ে অবাক হয়ে তাকাল জগন্নাথ।

—এখানেই? ঠিক কোনখানটায়?

এগিয়ে এসে আঙুল তুলে দেখাল জগা। জলের ধারে ছোট একটা কাঠচাঁপা, তারই নীচে পাওয়া গিয়েছিল অনিকেতকে। পায়ে পায়ে হেঁটে গাছের পাশে এসে দাঁড়াল সম্বুদ্ধ। ঘুরল।

—জগন্নাথবাবু!

—বলুন স্যার।

—অনেক উপকার করেছেন আপনি, এতদূর অবধি এগিয়ে দিলেন আমাকে। এইটুকু তো পথ, বড় রাস্তা দেখা যাচ্ছে। ও আমি নিজেই চলে যেতে পারব। সন্ধে হয়ে আসছে, এবারে আপনি ফিরে যান।

একটু ইতস্তত করল জগা, ভাবল কী যেন, তারপর 'ঠিক আছে' বলে মোপেড স্টার্ট করে ফিরে গেল যেদিক থেকে এসেছিল সেইদিকেই।

ঘাসের ওপর বসল সম্বুদ্ধ। ব্যাগটা নামিয়ে রাখল পাশে। পাখির ডাক, অজস্র অসংখ্য। অনিকেতও কি শুনেছিল এইসব? সূর্য দেখা যাচ্ছে না, এখনও পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে শেষ আলোর আভা। জলের ভেতর থেকে ঘাই মারল, একটা মাছ বোধহয়। কিনারায় কুয়াশার মতো জড়ো হচ্ছে বিকেলের হিম।

সম্বুদ্ধ পা ছড়িয়ে দিল।

কী চেয়েছিল অনিকেত? কোথায় যেতে চেয়েছিল? কতদূর যেতে পেরেছিল শেষ অবধি?

মিলির কাছে শেষ দিকে অনিকেত ছিল একটা লায়াবিলিটি। ঘাড় থেকে বোঝা নেমে যাওয়ায় মুক্তির আনন্দে মিলি এখন উড়ছে।

মা ছোটবেলায় মারা গিয়েছিল, বাবাও চলে গেলেন। দাদাদের সঙ্গে সম্পর্ক এতটাই ক্ষীণ, মারা যাবার পর পাঠানো চিঠিও ফেরত এসেছিল। অনিকেত ছিল একেবারেই একা।

অবশ্য অনিকেতের আদর্শ ছিল। কলকাতা শহরকে কখনও আপন ভাবেনি অনিকেত, আশ্রয় খুঁজেছিল এইখানে,—বাঁশবাগান আকন্দের ঝোপ কাঁঠালিচাঁপা পাখির ডাকের ভেতরে। এরাও কি অনিকেতকে ভালবেসে কাছে ডেকে নিয়েছিল? বুকে জড়িয়ে ধরেছিল আপন করে?

মানুষকে ভালবাসত অনিকেত। গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াত। গরিব মানুষের অসুখ-বিসুখ-যন্ত্রণায় বুক পেতে দিত। তারা কি জানে অনিকেত মারা গেছে? তারা কি অনিকেতের অভাব বুঝতে পেরেছে? কই, একজনও তো সম্বুদ্ধর কাছে এগিয়ে এসে বলেনি, আহা, মানুষটা বড় ভাল ছিল গো! সম্বুদ্ধর কেমন মনে হয়, অনিকেত তাদের কাছে কী ও কতখানি ছিল, সেটা বুঝে উঠতেও এই মানুষগুলোর কয়েক শতাব্দী লেগে যাবে।

হারু ভালবাসত অনিকেতকে। শিবেন ও সনকা ঘেন্না করত। অনিকেতের মৃত্যু ওদের কাছে বিরাট এক রিলিফ। স্থানীয় গড়পড়তা মানুষের কাছেও অনিকেতের মৃত্যু, মরেছে আপদ গেছে। সি এম ও এইচ কে পি দে বি এম ও এইচ একটাই সুতোয় বাঁধা। সেখানেও অনিকেত ছিল একটা ব্যতিক্রম, একটা বেসুর। জনপ্রতিনিধি চণ্ডীডাক্তার, হাজার বছর ধরে গ্রামীণ মানুষের নাড়ি টিপে বসে আছেন। অনিকেত তাঁর এই চলমান বর্তমানে একটা ঢেউ। জল এখন আগের মতোই শান্ত ও নিস্তরঙ্গ।

আসলে, সম্বুদ্ধর মনে হয়, অনিকেত কোথাওই যেতে পারেনি। যাওয়াটা শুরু করেছিল অনিকেত। কিন্তু একলা এই যাওয়ায় কোথাও পৌঁছনো যায় না। সামনের ঝিলে একটা খোলামকুচি ছুড়ে দিলে জলের আন্দোলন যতটুকু স্থায়ী হয়, তার চেয়েও ক্ষণস্থায়ী ও অকিঞ্চিৎকর ছিল অনিকেতের প্রয়াস।

কিন্তু সম্বুদ্ধ? কী খুঁজতে এসেছিল সম্বুদ্ধ? সম্বুদ্ধ কি জানত না অনিকেতের এই না-পারা? না কি অনিকেত যেখানে শেষ করেছে সেখান থেকেই শুরু করবে সম্বুদ্ধ? একা সম্বুদ্ধ? আবার?

অন্ধকার ঘন হতে থাকে। শের শাহর সময় থেকে একই রকম পড়ে থাকা ভারতবর্ষের একটি রাস্তায় অন্ধকার ছিঁড়তে ছিঁড়তে এসে দাঁড়ায় বাস, সোনালি। তখনও ঝিলের ধারে সম্বুদ্ধ। পাখির শেষ ডাকটাও ততক্ষণে থেমে গেছে। স্তব্ধতা। কয়েকটা পাতা মাড়ানোর খসখস শব্দ। গাছের নীচে অন্ধকার জমাট বেঁধে আসে। ঝিলের জলে সামান্য আলোড়ন। তারপর পড়ে থাকে অনন্ত সময়।

ফাউ

বাজারের ব্যাগ হাতে মাধবী ঢুকল, পিছনে হাঁপাতে হাঁপাতে রঘু, ঝাঁকার ওজনে ঘাড়টা বেঁকে সামনে নুয়ে পড়েছে।

রঘুর হাল দেখে আমিই এগিয়ে গেলাম। ভীষণ ভারী, দুজনে মিলেও সামলাতে পারলাম না। ধপাস করে ড্রইংরুমের মেঝেতে আছড়ে পড়ল।

মাধবী রান্নাঘরে ঢুকেছিল, ব্যাগ থেকে জিনিসপত্রগুলো বের করে গুছিয়ে রাখতে। বেরিয়ে এল হাসতে হাসতে, যুদ্ধজয়ের হাসি। আমার দিকে সেই হাসি নিক্ষেপ করে বলল, যা যা দরকার সমস্ত নিয়ে এসেছি, এখন নিশ্চিন্ত।

ঢালের মতো কাগজটা তুলে মাধবীর কাছ থেকে নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা করছিলাম। কারসাজিটা মাধবী ধরে ফেলল। না ধরার কোনও কারণ নেই। চৌষট্টি পাতার কাগজে প্রথম দু' পাতা বাদ দিলে বাকি পুরোটাই বিজ্ঞাপন। খবরটুকু পড়ে ফেলতে দশ মিনিটের বেশি লাগে না। ও বাজারে বেরিয়েছে ঘণ্টাখানেক আগে, তখনও কাগজটা আমার হাতে ধরা ছিল। খবরের কাগজ কেউ মুখস্থ করে?

হাত থেকে কাগজটা কেড়ে ভাঁজ করে রাখতে রাখতে মাধবী বলল, কাল দুপুরে স্নানের পর আমার চিরুনি নিয়ে টানাটানি করেছিলে মনে আছে?

—করব না? দু' দিন হল আমারটা খুঁজে পাচ্ছি না। সামান্য ক'গাছা চুল তাই দিয়ে অত বড় টাকটা ঢেকে আঁচড়াতে হয়, কসরত তো কম করতে হয় না? সম্বল বলতে ওই একখানা চিরুনি। সেটাও যদি না পাওয়া যায়...

ভুবনমোহিনী হাসি হাসল মাধবী—জানি গো জানি। সেই জন্যেই তো কালকেই লিস্ট-এ তুলে রেখেছিলাম। আজ প্রথমেই খোঁজ করেছি তোমার চিরুনির। দেখলাম এক কেজি চন্দ্রমুখি আলুর সঙ্গে একটা করে চিরুনি দিচ্ছে। দু' কেজি একসঙ্গে নিয়ে নিলাম। তোমার যা ভুলো মন! একটা হারালেও আর একখানা থাকবে, আমারটা নিয়ে টানাটানি করতে হবে না।

চমৎকৃত মুখে আমি বসে রইলাম।

মাধবী উৎসাহিত হয়ে বলে চলল, যা যা লিস্ট করেছিলাম সমস্ত পেয়ে গেছি। এক কিলো কইমাছের সঙ্গে একটা বঁটি, আড়াইশো পোস্তয় একখানা ঝাঁটা, দুটো ফুলকপির সঙ্গে সাবান কেস, পালংশাকের সঙ্গে টুথব্রাশ। এখন কিছুদিন বাজারে না গেলেও চিন্তা নেই।

নভেম্বরের শুরু, এখনও গরম যায়নি। ফ্যানের তলায় দাঁড়িয়েও রঘু ঘামছিল। মাধবী এক দাবড়ানি দিল—ওই তো কটা জিনিস, বয়ে এনে হেদিয়ে গেল। যা, অনেক হাওয়া খাওয়া হয়েছে। ধড়মড় করে উঠে রঘু ঝাঁকাটা টানতে টানতে ঘরের একপাশে নিয়ে গেল। এক এক করে জিনিসগুলো বের করে জায়গামতো রাখতে লাগল। মাধবী স্নানে ঢুকল।

বছর কয়েক হল আমি বাজার করা ছেড়ে দিয়েছি। লাউয়ের সঙ্গে কুচো চিংড়ি,

মোচার সঙ্গে নারকেল, কুমড়োফুলের সঙ্গে বেসন—ওই পর্যন্ত আমার দৌড় ছিল। এই বাজার আমি পারি না। মাধবী পারে। ওই করে।

প্রথমে খুঁজে খুঁজে দেখে নিতে হয় বাড়িতে কোন কোন জিনিস ফুরিয়ে গিয়েছে। সাবান টুথব্রাশ টুথপেস্ট ঝাঁটা বঁটি ছুরি কাঁচি চিরুনি আয়না। লিস্ট বানাতে হয়। বাজারে ঢুকে প্রথমেই খোঁজ নিতে হয় কীসের সঙ্গে কী দিচ্ছে। আগে ফাউয়ের বাজার। লিস্ট মিলিয়ে ফাউগুলো ঝাঁকায় ভরা। তারপর ফাউ নিতে গিয়ে যা যা না কিনলেই নয় সেগুলো কিনে বাজারের ব্যাগে ঢোকানো। আসলের জন্য থলি। ফাউয়ের জন্য ঝাঁকা।

প্র্যাকটিসটা শুরু হয়েছিল আগেই। কিন্তু গোড়ার দিকে ব্যাপারটায় অনেকখানি জল মেশানো ছিল। এক শাড়িতে এক গাড়ি। অনেকেই লাইন দিয়ে শাড়ি কিনে গাড়ি চাইতে গিয়ে জানতে পারল, শাড়ি কিনলে মিলবে কুপন, সেই কুপন নিয়ে লটারি, আর লটারিতে নাম উঠলে তবে পাওয়া যাবে গাড়ি। ক্রমশ প্রকাশ্য হল লটারিতে যে ভাগ্যবতীর নাম উঠেছে তিনি দোকানদারের মেজো ছেলের ছোট শালি।

আস্তে আস্তে সবকিছুতে পরিশীলন এল। নতুন সহস্রাব্দের গোড়াতেই দেখা গেল শাড়ির সঙ্গে ব্লাউজপিস, জুতোর সঙ্গে মোজা, শার্টের সঙ্গে টাই, এমনকি রবীন্দ্ররচনাবলীর সঙ্গে চশমা ফ্রি পাওয়া যাচ্ছে। আর তারপরেই শুরু হয়ে গেল মাদারি কা খেল্।

বাজারটা কেউ যেন ধরে উপুড় করে দিল। যা ছিল পায়ের তলায় তাই উঠে এল মাথায়। খবরের কাগজে খবর বিজ্ঞাপনকে জায়গা ছেড়ে ফুটনোটের চেহারা নিল। আর বিজ্ঞাপনের পাতায় পাতায়—না ডিসকাউন্টে আর ভুলছে না মানুষ—ফাউয়ের হাতছানি। শুধু টিভি, শুধু ফ্রিজ, কেবল একটা ওয়াশিং মেশিন কেনা ছেড়ে দিয়েছে সবাই। সঙ্গে কী দিচ্ছে—ওয়াকম্যান, মিউজিক সিস্টেম না ভিসিপি তাই নির্ধারণ করে দিচ্ছে কে কোনটা নেবে। মাধবী বলছিল, একসেট লিপস্টিকের সঙ্গে হেয়ারডাই, পরচুলা আর নকল দাঁতের সেট দিচ্ছে তিনটে কোম্পানি। মাধবীর বান্ধবীরা যার যা প্রয়োজন, চাহিদা অনুযায়ী নিজের ব্র্যান্ডের লিপস্টিক সংগ্রহ করছে।

একদিকে অবশ্য কেনাকাটার ঝঞ্ঝাট একেবারেই কমে গেছে। ক'বছর আগেও মাধবীর সঙ্গে মার্কেটিং-এ বেরুতে হবে ভাবলেই গায়ে জ্বর আসত। মনে আছে, একবার পুজোর আগে একখানা শাড়ি কিনতে দুপুর আড়াইটে থেকে রাত্তির দশটা অবধি হাতিবাগান চষে ফেলে শেষ অবধি না কিনেই মুখ শুকনো করে বাড়ি ফিরেছিল মাধবী। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আর কখনও ওর সঙ্গে বাজারে বেরুব না। প্রতিজ্ঞা রাখতে পারিনি। কিন্তু এখন মাধবী নিজেই আর জোরাজুরি করে না। তা ছাড়া বাজারটা ও বাজারে যাবার আগেই সেরে ফেলে। প্রতিদিন খবরের কাগজের সঙ্গে বিজ্ঞাপনের যে ক্রোড়পত্র প্রকাশ পায় তা থেকেই দাগ দিয়ে জিনিস বেছে রাখে ও। বাজারে গিয়ে ফাউ মিলিয়ে জিনিস নিয়ে আসা তারপরে দুইয়ের ঘরের নামতার মতোই জলভাত।

বাথরুম থেকে বেরিয়েছে মাধবী। সাড়ে এগারোটা। টিভি চালিয়ে এইবারে বসবে। গৃহবধূদের বিশেষ অনুষ্ঠান সৈরিন্ধ্রী। কোন কোন শপিং সেন্টারে কী কী জিনিস ফাউ হিসেবে কোন কোন মালের সঙ্গে গছানো হবে গৃহবধূদের সেই বিষয়েই পরামর্শ দেওয়া হবে।

এইসব শিক্ষাকেন্দ্রে গৃহকর্তাদের প্রবেশ নিষেধ। উঠে শোবার ঘরে চলে গেলাম।

সোফায় বসেছিল, উঠে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াল, আলসেয় বসা একটা কাক তাড়াল হুস করে। তারে মেলে দেওয়া জামাকাপড়গুলো উল্টে দিল রোদে, পিছনে ঘাড় ঘুরিয়ে একবার আমাকে দেখল, তারপর শব্দ করে এসে পাশে বসল। রিমোটটা আমার হাতে ছিল, কেড়ে নিয়ে সুইচ টিপে টিভি বন্ধ করে দিল। অন্য সময় হলে বলত—ঘণ্টায় ঘণ্টায় কী পৃথিবী উল্টে দেওয়া খবর তৈরি হয় শুনি, যে হাঁ করে খালি নিউজ দ্যাখো? আজ কোনওরকম ধানাইপানাই করল না। তার মানে ব্যাপার গুরুতর।

ঘুরে বসলাম মাধবীর দিকে, বলো।

—বলব আর কী, ঝাঁকিয়ে উঠল মাধবী, না কানে শোনো, না চোখে দ্যাখো। আমার হয়েছে জ্বালা!

এসব ক্ষেত্রে কোনও কথা না বলে চুপ করে থাকাই শ্রেয়। বাকিটা মাধবী এখনই বলবে, বলার জন্যেই ওর আসা।

—টুপুরের কত বয়েস হল খেয়াল আছে?

—টুপুর? দাঁড়াও...বলে হিসাব করতে করতে বলে ফেললাম, এই ডিসেম্বরে ওর আটাশ পূর্ণ হবে।

—মানে উনত্রিশ! আর্তনাদ করে উঠল মাধবী। আমার কত বয়েসে বিয়ে হয়েছিল তোমার মনে আছে?

—কেন থাকবে না? বাইশ বছর তিন মাস। অবশ্য যদি সার্টিফিকেটে গোলমাল না করা হয়ে থাকে।

—ওসব তোমাদের ধারা। আমাদের গুষ্টিতে কেউ কখনও জাল জোচ্চুরি করেনি। আমার ঠাকুর্দা ছিলেন টুলো পণ্ডিত। বাড়িতে একটা নীতির আবহাওয়া...

মনটাকে মাধবীর ধারাবিবরণী থেকে বিচ্যুত করে নিলাম। টুলোপণ্ডিতের বংশে চোর প্রতারক জন্মায় না? যাই হোক, এটা যুক্তি তর্কের সময় নয়, চুপচাপ বসে মাধবীর বাণী হজম করাই এখন আমার কাজ।

—আসল কথাটা বলি, মাধবী এতক্ষণে লাইনে এল, টুপুরের বিয়ের ব্যাপারে কিছু ভেবেছ?

নড়েচড়ে বসলাম। ঠিকই তো, টুপুর—সেদিন জন্মাল, নার্সিংহোম থেকে নিয়ে এলাম একটা মাখনের পুতুল, স্কুলে গেল, উঁচু ক্লাস, কলেজ, ম্যানেজমেন্ট কোর্স, এখন একটা মাল্টিন্যাশন্যাল কোম্পানির এক্সিকিউটিভ। বিয়ের কথাটা তো কখনও ভাবা হয়নি।

—ভাবাভাবির দরকার নেই, নিজেরটা ও নিজেই ব্যবস্থা করে নেবে।

—পারবে না, খুব জোরের সঙ্গে বলল মাধবী,—ওর সেই এলেম নেই। কোন বাবার মেয়ে দেখতে হবে তো! দিনরাত বই মুখে করে বসে থাকে। খাবারটা হাতের কাছে এনে ধরে দিলে, তবে খায়। এখনও এক গ্লাস জল গড়িয়ে খেতে শিখল না। অচল, অচল! নিজেরটা করে নেবে সে গুড়ে বালি। আমাদেরই উঠে পড়ে লাগতে হবে।

একটা সময় মেয়েরা বাবা-মার পছন্দ অপছন্দ পরোয়া করত না, নিজেরাই দেখেশুনে ঠিকঠাক করে বাড়িতে এসে বলত, এই তোমার জামাই। বছর দশেক হল হাওয়া বদলে গেছে। নিজের নিজের কেরিয়ারে এতখানিই ব্যস্ত হয়ে গেছে মেয়েরা যে, এইসব বাজে ব্যাপারে ভাবনা চিন্তা করার সময়ই পাচ্ছে না। ফলে আবার বাবা-মাকে সিনে নামতে হয়েছে।

বিগত কয়েকটা বছরে সমাজের ভিতরে বেশ বড় রকমের ওলটপালট ঘটে গিয়েছে। এটা এখন প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, মেয়েরাই বেশি সৎ, কর্মনিষ্ঠ ও পরিশ্রমী। ফলে মুটে-মজুর গোছের কিছু কায়িক শ্রমের কাজ ছাড়া সাদা রঙের চাকরি বলতে যা বোঝায় তার অধিকাংশই মেয়েদের করায়ত্ত। কলকারখানায় ব্যাপক হারে অটোমেশন চালু হওয়ায় এবং প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মুটে-মজুরের কাজও কমে আসতে লাগল। ছেলেদের মধ্যে বেকারি বাড়তে লাগল হু হু করে। যদিও জন্মের আগে সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণ বেআইনি, অনেক হবু বাবা মা-ই গর্ভের সন্তান ছেলে জানতে পারলে গর্ভ নষ্ট করিয়ে নিচ্ছে। ফলে জনসংখ্যায় পুরুষ ও মহিলার অনুপাত ৪০:৬০ এ গিয়ে ঠেকেছে। এবং এইসব কিছুর অবশ্যম্ভাবী ফল মেয়েদের উপযুক্ত পাত্র না জোটা।

মাধবী বোধহয় প্রস্তুত হয়েই এসেছিল, আমার অসহায় মুখচ্ছবি দেখে ওর করুণা হল। কাগজের শেষ পাতায় একটা পাতা জোড়া বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে। সেটাই খুলে আমার সামনে মেলে ধরল।

ধামাকা। শাড়ি ধামাকা, গাড়ি ধামাকা, টিভি ধামাকা, বাড়ি ধামাকা। রবীন্দ্রসদন, নন্দন, একাডেমি, একদা বিখ্যাত হলগুলো যখন দিনের পর দিন খালি পড়ে থাকতে লাগল, তখনই মার্কেটিং-এর লোকজন হাত বাড়িয়ে দিল। শোরুম হিসেবে এগুলো ব্যবহৃত হতে থাকল। একজিবিশন, সেল, শেষপর্যন্ত ধামাকা। ওইটাই বোঝে লোকে। মাধবী যে পাতাটা খুলে ধরেছে সেখানেও এক ধামাকার বিজ্ঞাপন।

সোজা বাংলায় বর-বাজার। আইসস্কেটিং রিঙ্ক-এ পরপর তিনদিন দুপুর তিনটে থেকে রাত ন'টা অবধি বসবে বরবাজার। যার যেরকম চাহিদা পছন্দ করে আসতে হবে। যথাসময়ে মাল বাড়িতে পৌঁছে যাবে।

মাধবীর দিকে তাকিয়ে বললাম, আজই তো চার তারিখ। মাধবী ঘাড় নাড়ল, হ্যাঁ স্টকে মাল থাকতে থাকতেই যাওয়া ভাল। আজই খুলবে, চলো সকাল সকালই বেরিয়ে পড়ি।

ডাক্তারি ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভর্তির জন্য পাড়ায় পাড়ায় মোড়ে কোচিং সেন্টার চালু হয়েছিল এককালে। চাহিদা পূরণের জন্য কয়েক হাজার মেডিক্যাল কলেজ ও লাখের কাছাকাছি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপিত হওয়ায় ঘরে ঘরে এখন ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার। তাদের বেকারত্ব গ্রানাইট পাথরের মতো অজর-অনড়-অক্ষয়। তারপর ঢল নেমেছিল কম্পিউটর ট্রেনিং-এর। শেভিংসেটের দামে কম্পিউটার লভ্য হয়ে যাওয়ায় কম্পিউটার শিক্ষার আর কোনও দাম নেই।

ফলে মেয়েদের সঙ্গে লড়তে লড়তে ছেলেদের এখন দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। শেষ পর্যন্ত একটাই পেশা পড়ে রয়েছে তাদের জন্য,—স্বামীগিরি। কিন্তু পঞ্চাশ বছর আগের হম্বিতম্বি করা মালিক-স্বামী নয়। বাসনমাজা, ঘরমোছা, রান্নাকরা, বেবিসিটিং থেকে বাজার-হাট-দোকান-ইলেকট্রিক বিল সমস্ত কিছুর দায়িত্ব। এনটায়ার হাউস কিপিং। গ্যাজেট এসে গেছে অজস্র। কিন্তু সেগুলো হ্যান্ডেল করাও তো শিখতে হবে।

পাড়ায় পাড়ায় এখন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট। গৃহকর্মনিপুণ পাত্র তৈরির জন্য বাবা মা-রা প্রচুর অর্থব্যয় করে ছেলেদের ভর্তি করেছে। চার বছরের গ্র্যাজুয়েশন কোর্স। দু' বছরের পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন। আর সমস্ত প্রস্তুতি পর্বের শেষ এই ক্যাম্পাস ইন্টারভিউ, বরবাজার।

স্বয়ম্বরসভাও বলা যেতে পারে। মেয়েরা নিজেরাই যায়। কখনও কখনও টুপুরের মতো মেয়েদের বাবা মাকেও যেতে হয়। আজ আমাদের পালা।

ভিতরে ঢুকে গেটের ঠিক বাঁদিকে প্রথম এক্সিবিটই জ্যান্ত হারকিউলিস। একরকম হাঁটু গেড়ে বসার ভঙ্গি, সেইরকম উদ্ধত বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, চেহারা পোশাক ধরনধারণে আত্মবিশ্বাস ঠিকরে বেরোচ্ছে। দুরন্ত শক্তির আধার সেই পুরুষ শরীরে কিলবিল করছে পেশি। আর সামনে দাঁড়িয়ে একাগ্র মনোযোগ দিয়ে তাকে পর্যবেক্ষণ করছে তার কাস্টমার।

টাইট জিনস হাই হিল পনিটেল মেয়েটি সামনে থেকে দেখা শেষ করে পিছনে গেল। পিছন থেকে ঘুরে আবার সামনে। দেখা শেষ হয়েছে, একবার পরখ করে নেবার পালা। টিপেটিপে দেখতে লাগল বাইসেপস, ট্রাইসেপস, ট্রাপিজিয়াস। ঝুঁটি করে বাঁধা চুল খুলে টেনেটুনে দেখে নিল আসল না নকল। হাঁ করিয়ে গুনে দেখল দাঁতের সংখ্যা। তারপর এগিয়ে গেল এজেন্টের দিকে। এবার দরদাম।

হ্যাঁ, প্রত্যেকে তার নিজস্ব এজেন্ট নিয়ে এসেছে। বলা উচিত, এজেন্টরাই তাদের নিজেদের প্রডাক্ট প্রোমোট করছে। হাজার হাজার উপযুক্ত পাত্রের মধ্য থেকে শ'খানেক। সুযোগ পেতে প্রথমে এজেন্ট ধরতে হয়েছে। এজেন্টের সঙ্গে কমিশনের বন্দোবস্ত। এক একটা ধামাকার জন্য আলাদা আলাদা হাউস। এজেন্টরাই তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। স্টল বুক করে। বিজ্ঞাপন থেকে প্রডাক্ট প্রোমোশন সব কিছুরই দায় এজেন্টের। ভাল এজেন্ট পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার।

হারকিউলিসকে পাশে সরিয়ে এগিয়ে যেতেই একটা গোলমালের মধ্যে পড়ে গেলাম দুজনে। জোর বাকবিতণ্ডা হচ্ছে। এখানেও মাল পছন্দ করতে এসেছেন আমাদেরই মতো হবু শ্বশুর-শাশুড়ি। পাত্রীর বাবার গলা বেশ চড়া,—বলছেন ছেলে কম্পিউটার লিটারেট নয়, তা হলে টেন পার্সেন্ট লেস করবেন না কেন? আমার মেয়ে মাসের পনেরো দিনই অফিসের কাজে ইউরোপ আমেরিকা ঘোরে। ই মেল-এ কোনও ইনস্ট্রাকশন পাঠালে ও তো বুঝতে পারবে না। মেয়ে না হয় গাঁটের পয়সা খরচ করে কম্পিউটার শিখিয়ে নেবে, কিন্তু সে টাকাটা কি আপনাদেরই দেওয়া উচিত নয়?

মাধবী অনেকক্ষণ ধরেই টানাটানি করছিল। এবার কানের কাছে বেশ জোরে জোরেই বলল,—এখনও কয়েকটা খালি আছে, চলো ভিড় হবার আগেই বাজার সেরে ফেলি।

শেষ অবধি একজনকে পাওয়া গেল, ভদ্রস্থ চেহারা ও পোশাক পরিচ্ছদ, সামনে কোনও কাস্টমার নেই, গিয়ে দাঁড়াতেই এজেন্ট এগিয়ে এল।

—আসুন ম্যাডাম, ওয়েলকাম স্যার। একদম এ-ক্লাস জিনিস আমার। চেস্ট থার্টি এইট, ওয়েস্ট থার্টি টু, বাইসেপস...

—থাক থাক, থামিয়ে দিল মাধবী, আসল কথায় আসুন, এক্সট্রা কী কী মিলবে?

—হ্যাঁ ম্যাডাম, গিফট হিসেবে পাচ্ছেন পেডিগ্রি; ভবানীপুরের দত্ত পরিবার, এখনও বাড়িতে দুর্গাপুজো হয়। সন্ধিপুজোর সময় বত্রিশটা পাঁঠাবলি...

—কী সাংঘাতিক! ভাগ্যিস বললেন! বলিটলি আমার মেয়ের একেবারেই সহ্য হয় না। একবার বাজারে মুরগির ছাল ছাড়ানো দেখেই মেয়ে সাতদিন...। চলো চলো, এগিয়ে

দেখা যাক।

পরের জনের পরনে ধুতি পাঞ্জাবি, ঝাঁকড়া একমাথা চুল, গালে যিশুখ্রিস্টের দাড়ি; উদাস অন্যমনস্ক দৃষ্টি আমাদের ওপর এক ঝলক ফেলেই ঘুরিয়ে নিল অন্যদিকে। মামুলি কথাবার্তার পর মাধবী আসল কথাটা পাড়ে,—কী দিচ্ছেন ছেলের সঙ্গে?

—চমৎকার ছবি আঁকে। আসন বুনতে পারে, ক্রুশের কাজ তাকিয়ে দেখবার মতো। এমন চমৎকার ঘরদোর গুছিয়ে রাখবে, লোকে এলে আর যেতেই চাইবে না।

—বলেন কী? ছোট থেকেই মেয়ে একা থাকতে ভালবাসে, ভিড়ভাট্টা ওর একটুও সহ্য হয় না। শেষকালে ওই ভিড়ের জন্যই হয়তো হবে বিবাহবিচ্ছেদ। খোরপোষ দিতে দিতে মেয়ের জীবনটাই বরবাদ হয়ে যাবে। দরকার নেই অমন ছেলের।

এবারের ছেলেটির কানে মাকড়ি গলায় ধুকধুকি হাতে বালা। নিয়মমাফিক আলাপ পরিচয়ের পর যথারীতি ফাউয়ের কথায় আসে মাধবী।

—অসম্ভব ট্যালেন্টেড আমার ক্যান্ডিডেট ম্যাডাম। ছোট থেকেই স্কুলে ডেস্কে তবলা বাজাত। আজকালকার স্কুলগুলো, জানেনই তো, ট্যালেন্টের কোনও কদর করে না। স্কুল ছেড়ে দিতে হল। তাতে অবশ্য ওর কিছু যায় আসেনি। শহরের যে কোনও হোটেল ক্যাবারে ডিস্কোয় জানতে চান পিন্টো দ্য ড্রামার, সবাই এক ডাকে চিনতে পারবে।

—ড্রাম? কালীপুজোর রাতে বাজির আওয়াজের ভয়ে মেয়ে আমার দরজা জানলা বন্ধ করে কানে তুলো গুঁজে শুয়ে থাকে। সে সহ্য করবে ড্রামের আওয়াজ?

ঘেমে উঠেছে মাধবী, এসিটা কি কাজ করছে না? বয়েস হচ্ছে। ঠাণ্ডায় এত ঘাম হওয়া ভাল নয়। হলের মাঝখানে কয়েকটা চেয়ার পাতা আছে। তাড়াতাড়ি মাধবীকে সেখানে নিয়ে বসিয়ে দিলাম। পাশেই ফাউন্টেন পেপসি। এক গ্লাস এনে মাধবীর হাতে দিতেই ঢকঢক করে পুরোটা খেয়ে এলিয়ে পড়ল চেয়ারে। দৃষ্টিতে—কী হবে?

বাজনা শুরু হয়েছে। সামনেই স্টেজ। সেখানে একজন উঠে ঘোষণা করল, লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলম্যান, এখনই শুরু হবে প্যারেড। আপনারা ধৈর্য ধরে আর একটু অপেক্ষা করুন। তারপর নিজের নিজের পছন্দ বোতাম টিপে জানিয়ে দিন। যাদের এখনও হিল্লে হয়নি তারা এবার একে একে হেঁটে যাবে। বিস্তারিত বলে যাবে এজেন্ট। প্রসপেকটিভ কাস্টমার সামনে বসে দেখবে, পছন্দ হলে বোতাম টিপলেই এজেন্ট যোগাযোগ করে নেবে।

প্যারেড অবধি আমরা থাকব না। প্যারেড সাধারণত মেয়েরাই অ্যাটেন্ড করে। বিশেষত সুইমসুট ইভেন্টটায় বড়রা আসবে না, এটাই অলিখিত নিয়ম।

সময় ফুরিয়ে আসছে, এবারে চলে যেতে হবে, মাধবীর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার করুণা হল। কানের কাছে মুখ নিয়ে বললাম, তুমি কি জানো, ফাউ হিসেবে একটা ছেলের কাছে তুমি ঠিক কী চাও? মাধবী একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। জবাব না দিয়ে আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

মাধবীর চোখ থেকে চোখ না সরিয়ে আমি বললাম, আমার কাছে এই তিরিশ বছরে তুমি কী এক্সট্রা পেয়েছ মাধবী?

সাপ দেখার মতো লাফিয়ে উঠল মাধবী। গলা তুলে বলল, তোমার কাছে? জ্বলুনি। বিছুটি পাতার মতো সর্ব অঙ্গে জ্বালা ধরিয়েছ তুমি। তিরিশ বছর ধরে ভাজাভাজা করে খেয়েছ। এখনও খাচ্ছ। ওগুলোই ফাউ।

হাত ধরে বসালাম মাধবীকে। আমার হাতের মধ্যে ওর হাত ধরাই থাকল। চোখে চোখ রেখে নরম করে বললাম, সেটাই সত্যি? এই এতগুলো বছরে যন্ত্রণা ছাড়া তোমাকে আর কিছুই দিইনি আমি?

হঠাৎই চুপ করে গেল মাধবী। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় চোখ নামিয়ে নিল ও। আমার হাতের মধ্যে ঘেমে উঠল ওর নরম হাত। আগের মতো ওর ঠোঁট কাঁপতে লাগল তিরতির করে। শ্বাস-প্রশ্বাস ঘন হয়ে এল।

তারপর কাউকে কিছু না বলেই উঠে দাঁড়াল ও। সবচেয়ে কাছে যে এজেন্ট দাঁড়িয়েছিল গটগট করে হেঁটে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। জিজ্ঞেস করল, আর ভালবাসা, স্নেহ, মমত্ব, সহমর্মিতা? এইসব? এইসব কি ফাউ হিসেবে মিলবে আপনার ক্যান্ডিডেটের কাছ থেকে?

অবাক হয়ে যেন অন্ধকারে হাতড়াচ্ছিল এজেন্ট। প্রথম থেকে দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় একের পর এক এজেন্টের সামনে দাঁড়িয়ে একই কথা আউড়ে যাচ্ছিল মাধবী। শেষে একজন ছুটে গিয়ে নিয়ে এল তাদের ম্যানেজারকে।

ম্যানেজারই সমস্ত এজেন্টের ওপরওয়ালা। এই বর বাজারের সমস্ত ব্যবস্থাপনাই তার তদারকিতে। তার হাতে ছাপানো বই। সেখানে সকলের সম্বন্ধে প্রতিটি খুঁটিনাটি বিস্তারিত লিপিবদ্ধ আছে।

—ইয়েস ম্যাডাম, মে আই হেলপ ইউ?

মাধবী ঘুরল ম্যানেজারের দিকে। মানুষটি বৃদ্ধ, ভদ্র, বিনীত, আচারে ব্যবহারে মার্জিত। ভরসা হল বোধহয়। আমাকে টেনে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল।

মাধবী বলল, ইনি আমার স্বামী। তিরিশ বছর ধরে আমরা একই ছাদের তলায় একসঙ্গে আছি। ঠোকাঠুকি যে লাগেনি, তা নয়। মানুষটা গোঁয়ার, একরোখা, বাতিকগ্রস্ত। কিন্তু আমি জানি, কখনও যদি কোনও বিপদে পড়ি ওই আমার পাশে এসে দাঁড়াবে। বুক দিয়ে আমাকে রক্ষা করবে। ওই আমার আশ্রয়। ভালবাসা দিয়ে, সহমর্মিতা দিয়ে, সমব্যথা দিয়ে তিরিশ বছর ধরে ও আমাকে ঘিরে রেখেছে। ওকে ছাড়া আমি অচল, অসম্পূর্ণ।

একটু থেমে, শ্বাস ফেলে মাধবী বলল, সেইটাই, ওইটুকুই ফাউ হিসেবে আপনার ক্যান্ডিডেটদের কাছ থেকে, আমার মেয়ের ভবিষ্যৎ জীবনের সঙ্গীর কাছ থেকে আমার চাহিদা ম্যানেজারবাবু। পাওয়া যাবে?

পকেট থেকে লম্বা একটা প্রডাক্ট মনোগ্রাফ বের করলেন ম্যানেজার। মন দিয়ে অনেকক্ষণ দেখলেন। তারপর বইটা পকেটে রেখে বললেন, সরি ম্যাডাম। যা যা চাইলেন সেগুলো আমাদের আগের লিস্টে ছিল। বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কী করব বলুন? চাহিদা নেই।

দ্বিরাগমন

অনেকক্ষণ টানা ওপরে উঠে হাঁপিয়ে গিয়েছিল গাড়িটা। দম নেবার জন্যে থামতেই ভেতরে কী যেন হয়ে গেল। হঠাৎই স্থান-কাল ভুলে বিশুদ্ধ মাতৃভাষায় চেঁচিয়ে উঠলাম, দাঁড়াও দাঁড়াও। দাঁড়িয়েই ছিল কিষেণলাল, বাংলা শুনে ঘাবড়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে দরজা খুলে দিল, হাত বাড়িয়ে নামাল আমাকে গাড়ি থেকে। অনেকক্ষণ বসে থেকে কোমর ধরে গিয়েছিল। সোজা হতে হতে চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিলাম, বাঁদিকে একটা সরু রাস্তা পাহাড়ের গা বেয়ে সোজা ওপরে উঠে গেছে, ওইদিকেই উঠবে এবার গাড়ি। এখানটা বাসস্ট্যান্ড, কয়েকটা দোকান, একটা গুমটি। হ্যাঁ, এটাই সেই জায়গা।

বাস দাঁড়ায় যেখানে, গুমটির সামনে, ও দিকে পাহাড়ের খাঁজে একটা স্ট্যাচু আছে। পেছনে কয়েকটা বাঁধানো ধাপ। ওইখানেই বসেছিলাম চারজনে, পাশাপাশি। কেউই কোনও কথা বলছিলাম না।

খিদে পেয়েছিল। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে আসছিল। কিন্তু সেই মুহূর্তে সমস্ত কিছু ছাপিয়ে শরীর-মন জুড়ে ছিল অপমান।

গান্ধী আশ্রমের কেয়ারটেকার—সিঁড়ির মাথায়, দু'ধাপ নীচে সুভাষ, তারপরে আমি, আশু মাঝখানে। একেবারে রাস্তায় মণি, চারখানা লাগেজ পাহারা দিচ্ছে।

বিশুদ্ধ হিন্দি। বুঝতে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। এই আশ্রমের পবিত্রতা রক্ষার দুরূহ কর্তব্য তাঁর ওপর ন্যস্ত। অতগুলি পরিবার তাঁর আশ্রয়ে নিশ্চিন্ত। তিনি কি তাদের বিশ্বাসের অমর্যাদা করতে পারেন?

চোখের ভাষা, বডি-ল্যাংগোয়েজ বলে দিচ্ছিল, পাহাড়ের ঝোপ-জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসা চারমূর্তির মূল অভিপ্রায় যে আশ্রমে আশ্রিতা সমস্ত অবলা নারীর শ্লীলতাহানি, সেই দুরভিসন্ধি তিনি ধরে ফেলেছেন।

সুভাষ কিছু বলতে যাচ্ছিল। যুক্তিটুক্তি। নীচ থেকে মণি ডাকল, নেমে আয়রে। শুধু শুধু কথা বাড়িয়ে লাভ নেই।

আশু সঙ্গে সঙ্গে দুই লাফে নীচে, পেছন পেছন আমি। সুভাষ হঠাৎই আবিষ্কার করল, তার দু'হাতের দূরত্বে কেয়ারটেকার, তার হাতের মুঠোয় লোহাবাঁধানো লাঠি এবং বন্ধুরা অনেক তফাতে রাস্তায়। ইতিকর্তব্য ঠিক করতে ও সময় নিল না।

কতক্ষণ বসেছিলাম? পাহাড়ের ছায়া লম্বা হতে হতে ঢেকে ফেলেছে উপত্যকা, বরফের চূড়ায় বসে রোদ পোয়াচ্ছিল শীত, সুযোগ পেয়ে হুই হুই করে নেমে আসছে নীচে, চারজনে পাশাপাশি বসে অপেক্ষা করছি শেষ বাসের, যা আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবে কাঠগুদাম, পাহাড় থেকে সমতলে।

খোঁজাখুঁজি ততক্ষণে মিটে গেছে। সরকারি ডাকবাংলো, বনদপ্তরের আবাস গেটই খোলেনি। একটা হোটেল তৈরি হচ্ছে, তার তিনখানা ঘর হয়েছে সদ্য, মণি খোঁজ নিতে গিয়েছিল, ও-ই ম্যানেজার, ঘুরে এসে কথা বাড়ায়নি, তাতেই যা বোঝার আমাদের বোঝা

হয়ে গেছে। মাথা ঝুঁকিয়ে কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে চারজনে বসেছিলাম পরাজিত সৈনিকদের মতো।

আশু বোধহয় মাথা তুলেছিল। নাহলে ওরই নজরে পড়ল কী করে?

আঙুল তুলে দেখাল, লোকটাকে খেয়াল করেছিস?

ছোটখাটো পাহাড়ি মানুষ, মাথায় মস্ত বড় পেঁচানো পাগড়ি। আমাদের দিকেই তাকিয়ে ছিল, সবাই একসঙ্গে দেখা শুরু করতেই, বিব্রত হয়ে অন্যদিকে ফিরে দাঁড়াল।

তখন থেকে কাছাকাছি ঘুর ঘুর করছে। কোনও বদ মতলব নেই তো? আশুর কথা শেষ হবার আগেই তড়াক করে উঠে পড়ল সুভাষ। কাছে গিয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে কী যেন বলল। মানুষটাও ঘাড় নেড়ে নেড়ে জবাব দিল। তারপর, যেন কতদিনের চেনা, দুজনে গল্প করতে করতে এক চক্কোর ঘুরে এল কোথা থেকে। কিছুক্ষণ পরেই দেখি, সুভাষ একা, হন্তদন্ত হয়ে আসছে।

কিছু একটা ওর চোখেমুখে নিশ্চয়ই ছিল। ওকে আসতে দেখেই আমরা তিনজনে দাঁড়িয়েছি, ও কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, চল, ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

মালপত্র ঘাড়ে তুলেছি, সুভাষও ততক্ষণে দম ফিরে পেয়েছে, যেতে যেতে বলল, হোটেল-টোটেল নয়, একখানাই ঘর, গুদাম হিসেবে ব্যবহার করে, এখন খালি। দু'দিনের জন্য দিতে অসুবিধে নেই। আমি হ্যাঁ বলে দিলাম।

এইভাবেই, কৌসানী, সেই প্রথম রাত্রিটিতে আমাদের থাকতে দিয়েছিল।

—সাহাব, এরপর ফিরতে রাত হয়ে যাবে।

কিষেণলাল গাড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এখান থেকে নৈনিতাল অন্তত পাঁচঘণ্টা। এখনই না ছেড়ে দিলে অন্যায় হবে।

ওরা গাড়িটা রাখতেই বলেছিল। যদি ঘুরতে যান কোথাও, সাইটসিয়িং। ড্রাইভারও থাকবে, ওকে বলা আছে। আসতে আসতে মত বদলালাম। গাড়ি মানেই পিছুটান। সঙ্গে ড্রাইভার। পাহাড় ওদের কাছে ব্যবহারজীর্ণ, মলিন। প্রকৃতি পুরনো বউয়ের মতো চেনা। টানাটানি করে নিয়ে যাবে, একটা পাহাড়ের গর্ত দেখিয়ে বলবে গুহা, দু'খানা পাথর ভগবান। ডিস্কো দেখাবে, ভিডিও পার্লার, যে পাথরে পা রেখে জুহি চাওলা শুটিং করেছিল সেটাই ওদের কাছে দ্রষ্টব্য। বদলে বখশিস প্রত্যাশা করে।

কিষেণলালকে জপালাম। অফিসারদের কিছু জানানোর দরকার নেই। ফিরে গিয়ে চুপচাপ দু'দিন বাড়িতে বিশ্রাম নিয়ে তিনদিনের মাথায় অফিসে হাজিরা দেবে। বললেই হবে আমার সঙ্গে ছিল। ওরা কিছু জানতে পারবে না। ছাব্বিশ বছরের টগবগে ছেলে, বিয়ের বয়েস এক বছর চারমাস, এককথায় রাজি।

উত্তরাঞ্চল, নতুন রাজ্য। কিছু অফিস হচ্ছে নৈনিতালে। প্রথম দিকে প্রশাসনিক জটিলতা ছাড়াবার জন্যে আমার মতো পোড়খাওয়া আমলার ডাক পড়ে। রিটায়ার করেও তাই এদিক ওদিক ছোটাছুটি। এক সপ্তাহের কাজ পাঁচ দিনেই হয়ে গেল। দুটো দিন হাতে। এত কাছে কৌসানী। ফিরে যাব?

হোটেলের লবিতে মাল নামাচ্ছিল কিষেণলাল। ম্যানেজার এসে বিনীতভাবে বলল, এক্সিকিউটিভ সুইট খুলে দিচ্ছি স্যার। বেয়ারা গিয়ে এসি অন করে দেবে। ড্রিংকস কিছু লাগবে?

ঘরে ঢুকে এসি গিজার অন করে সুইচগুলো দেখিয়ে ডিনারের অর্ডার নিয়ে চলে গেল

ছেলেটা। জুতো খুলে শু-র‍্যাকে রেখে হাঁটতে হাঁটতে ঘরের উত্তর দেওয়াল অবধি হেঁটে এসে কী মনে করে পর্দা টেনে সরিয়ে দিলাম। সরে গেল পঁয়ত্রিশ বছর।

ঘর দেখে দমে গিয়েছিলাম। কোনওরকমে চারজনের শোবার জায়গা। জানলা নেই। বাইরে থেকে শিকল তুলে দিলে চারটে মানুষ মরে হেজে গেলেও কেউ টের পাবে না। সুভাষ উৎকণ্ঠিত হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়েছিল, যদি পছন্দ না হয়? মণি গম্ভীর গলায় বলল, খুব ভাল ঘর চুজ করেছিস সুভাষ, জানলা নেই। কোনওদিক থেকেই ঠাণ্ডা আসবে না। আমরা তো তেমন লেপ-কম্বল আনিওনি।

সূর্য ডুবে গেছে। এখনও আলো আবছা লেগে আছে পাহাড়ের মাথায়। আলোর নীচেই দ্রুত জমে উঠছে অন্ধকার। অন্ধকার জড়িয়ে রহস্যের মতো মেঘ। সামনে একটি উপত্যকা, কুয়াশায় ঢাকা। একটু পরেই পাহাড় ডিঙিয়ে উঠে আসবে চাঁদ। পাহাড় আঁকড়ে থাকা কুয়াশারা ঘুম ভেঙে উঠে বসবে। উড়তে উড়তে মিশে যাবে আকাশে। চাঁদ তার আলোর চাদর বিছিয়ে দেবে বরফ ঢাকা চূড়ায় চূড়ায়।

হাতঢাকা দস্তানা ছিল না। একটা মাত্র সোয়েটারে শরীর ঢেকে কনকনে ঠাণ্ডায় ঠকঠক্ করে কাঁপছিলাম চারজনে। নাকের ডগা জমে বরফ হয়ে গিয়েছিল। কথা বলছিলাম না কেউই। শেষ উত্তাপটুকু ভেতরে সঞ্চয় করে রাখছিলাম ভবিষ্যতের জন্য। আসলে আমাদের সমস্ত শব্দ ও বাক্য শুষে নিয়েছিল সামনের দ্রুত ঘটে যাওয়া দৃশ্যান্তর এবং আমাদের জাগতিক বোধ লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

আজও পর্দা সরিয়ে শুরু হল আমার অপেক্ষা। সামনের কুয়াশায় মোড়া উপত্যকা এবং আমার মধ্যে এখন একটি কাচের দেওয়াল, ঘরের আলোর প্রতিফলন সেখানে। উঠে গিয়ে আলো নিভিয়ে এলাম। উপত্যকা পার হয়ে অন্ধকার। চাঁদ উঠবে, সেই অন্ধকার ভেদ করে মাথা তুলবে বরফঢাকা পাহাড়।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে, অপেক্ষা করতে করতে, সারাদিনের ক্লান্তি, চোখ বন্ধ হয়ে এল। চোখ খুলে দেখলাম, দরজায় বেল, ডিনার।

টেবিলে খাবার সাজাচ্ছে ছেলেটা, একঝলক বাইরে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আজ চাঁদ উঠবে না?

কতরকম অর্ডার সার্ভ করতে হয় ওদের। ভাল খাবার, ড্রিংকস, ভাড়ার গাড়ি। আজ চাঁদের অর্ডার দিয়েছে কাস্টমার। প্রস্তুত থাকতে হয়। হেসে জবাব দিল, উঠবে, শেষ রাতে, অল্প সময়ের জন্য। উঠেই অস্ত যাবে।

কন্টিনেন্টাল ডিনার বলেছিলাম, হালকা। বাইরে গেলে এটাই স্যুট করে। সুপে চামচ ডুবিয়ে মনে পড়ল, সেইরাতে আমরা বেহিসেবি হয়েছিলাম। একপ্লেট মাংস নিয়েছিলাম চারজন। রুটির টুকরো ঝোলে ডোবাতে ডোবাতে আমাদের মুগ্ধতা নিবেদন করছিলাম ফেলে আসা এক রূপমতীর পায়ে। সে-ই আমাদের প্রথম প্রেম। অথচ ভাগ করে নিতে এতটুকুও কষ্ট হচ্ছিল না। বাইরে অসহ্য জ্যোৎস্নায় ঝলসে যাচ্ছিল রাত্রি।

মোরগের ডাক থেমে থেমে বাজছিল। ঘুম ভেঙে ধড়মড় করে উঠে বসলাম। হাত বাড়িয়ে অ্যালার্ম অফ করে দিলাম। তারপরেই ছুটে জানলায়। পর্দা টেনে সরিয়ে দিতেই—ত্রিশূল।

পুব থেকে আলো এসে পড়েছে মাথায়, রং বদলাচ্ছে। গেরুয়া থেকে লাল হয়ে কমলা। ছড়িয়ে যাচ্ছে শীর্ষ থেকে শীর্ষে। যেন ঘাপটি মেরে ছিল অন্ধকারের আড়ালে,

আলোর ছোঁয়ায় হই হই করে সামনে এসে পড়েছে দুষ্টু ছেলের দল—নন্দাদেবী, নন্দাঘুণ্টি, কৈলাশ একের পর এক গিরিশৃঙ্গ। হলুদ হয়ে রং এখন সাদা। তারপর সব লুকোচুরি, দুষ্টুমি থামিয়ে বরফের মুকুট মাথায় দিয়ে গম্ভীর মুখে সবাই উত্তর আকাশ পাহারা দিতে বসে পড়ল।

মণি যায়নি। অনেক ডাকাডাকি ঠেলাঠেলি করেও ওর ঘুম ভাঙানো যায়নি। শেষ অবধি ওকে ফেলে রেখেই আমরা বেরিয়েছিলাম। বাইরে এসে আশু বলেছিল, ওর যা ঘুম, ঘর থেকে সব ঝেড়েপুঁছে নিয়ে গেলেও ও কম্বলমুড়ি দিয়ে পাশ ফিরে শোবে। তার চেয়ে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে যাই।

সুভাষ নতুন কেনা তালাটা দরজায় লাগিয়ে পকেটে চাবি ফেলে বলেছিল, সেটাই ভাল।

গান্ধীআশ্রমের সামনে গিয়েই দাঁড়িয়েছিলাম সকলে। আরও অনেক মানুষ আমাদের সঙ্গেই সেই আশ্চর্য দৃশ্য প্রত্যক্ষ করছিলেন। কেয়ারটেকার ছিলেন না। সারারাত পাহারা দিয়ে ক্লান্ত হয়ে সম্ভবত নিদ্রামগ্ন ছিলেন উষাকালে। চুটিয়ে পাহাড় দেখে নামার পথে গরম জিলিপি আর চা খেয়ে, মণির জন্যে শালপাতার ঠোঙাভর্তি জিলিপি নিয়ে ঘরে ফিরেই তোপের মুখে পড়েছিলাম আমরা।

—এতটুকু আক্কেল নেই তোদের? ঘরে একটা নর্দমা পর্যন্ত নেই সে খেয়াল নেই? ভাবলাম ঘরেই করে ফেলি। নেহাত তোদের ভালবাসি বলেই...

আশু সারারাস্তা বলতে বলতে আসছিল, বেচারা মণি! কী জিনিস মিস করল জানতেও পারল না। ওর রুদ্র মূর্তি দেখে আর কথা বাড়াল না।

সাইটসিয়িং-এ যাবেন স্যার?

ম্যানেজারের লোক দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। উল্টোদিকে তাকিয়ে দেখলাম। ত্রিশূলের মাথায় পতাকার মতো মেঘ উড়ছে। উড়তে উড়তে ছিঁড়ে টুকরো হয়ে উঠে যাচ্ছে আকাশে। জড়ো হচ্ছে। জমতে জমতে একসময় ঢেকে উঠবে। উপত্যকা পার হয়ে ধেয়ে আসবে এদিকে। এসব ছেড়ে কেউ যায়?

সেদিনও এমনি মেঘ জমেছিল। জমছে, জমছে, আকাশের মেঘ, আমাদের কী? গা করিনি। পাকদণ্ডী বেয়ে হাঁটতে হাঁটতে আধ-পাহাড়ে আমরা, হঠাৎই মেঘটা আকাশ ছেড়ে নেমে এল। কী ঘটছে বোঝার আগেই ঝমঝম বৃষ্টি। প্যান্ট-শার্ট-সোয়েটার-মাফলার সুদ্ধ চারজনেই ভিজে ঢোল।

সেই রাতটা মনে থাকবে। বৃষ্টি হলে পাহাড়ে যে অত ঠাণ্ডা পড়ে কে জানত? সম্বল বলতে একখানা মাত্র কম্বল। দুটো গেঞ্জি, দুটো শার্ট, তার ওপর কম্বল জড়িয়ে দরজা বন্ধ করে ছোট ঘরটায় চারজনে জড়াজড়ি করে বসে সারারাত হিহি করে কাঁপলাম। ভোররাতে মণি বুদ্ধি বাতলাল, গান গাইলে ঠাণ্ডা পালায়, চ গান ধরি। দরজা বাজিয়ে সারারাত কীর্তন গেয়ে কাটিয়ে দিলাম আমরা।

পাখি ডাকতেই কম্বলমুড়ি দেওয়া মণিকে টানতে টানতে ত্রিশূলের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে আশু বলেছিল, দেখে নে! কী জিনিস মিস করেছিলি, জন্মের শেষ দেখে নে। এ সুযোগ আর আসবে না।

ভাড়ার গাড়ি ফেরত পাঠিয়ে দিলাম। হেভি ব্রেকফাস্ট দিয়েছিল। গরম জলে স্নান করে ঝরঝরে হয়ে বাইরে বেরিয়ে দেখলাম মেঘে মেঘে সমস্ত ঢেকে গেছে। বিকেল

অবধি মেঘ ছাড়া কিছুই দেখা যাবে না। গাড়ি নেই, তাতে কী যায় আসে? পাহাড়ি রাস্তায় একটু হেঁটে এলে কেমন হয়?

রাস্তাটা শুরু হয়েছে গান্ধীআশ্রমের সামনে থেকে, উঠে গেছে পাহাড়ের গা বেয়ে সোজা। আর্মি বেস আছে ওপরে, আরও ওপরে পি ডব্লু ডির বাংলো, পাহাড় থেকে এক পা ঝুঁকে। পাহাড়ে থাক কেটে কেটে ভিউ পয়েন্ট বানানো হয়েছে। আগে এসব ছিল না। সব পাহাড়ই পাহাড়, সব পয়েন্টই ভিউ পয়েন্ট।

হাঁপিয়ে গেছি। পথের পাশে বোল্ডার, বসে বুক ভরে নিশ্বাস নিতে নিতে সামনে তাকালাম। জায়গাটা চেনা। এইখানে একটা ছবি তুলেছিল সুভাষ। উপত্যকা পেছনে রেখে পোজ দিয়ে দাঁড়িয়েছিল আশু। দূরে সারি সারি পাহাড়ের চালচিত্র। ছবিটা ডেভেলপ করে সুভাষ আগে দেখায়নি আশুকে, বলেছিল, রূপকধর্মী ছবি, এক্সিবিশনে দেব। শেষ অবধি দেখা গেল, আশুর সঙ্গে একই ফ্রেমে একটা ছাগল, দু-পা তুলে গাছের পাতা চিবোচ্ছে।

বসে থেকে হাঁটুতে জোর ফিরে পেয়েছি। আবার হাঁটা শুরু করলাম। মোড় ঘুরতেই গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা গেল বাংলো বাড়ি। চারপাশে বাগান, ফায়ারপ্লেস, ওপরে চিমনি। ঘোরানো বারান্দায় একটা দোলনা। একধাপ নীচে বাগান, মাঝখানে একটা ব্যাডমিন্টন খেলার কোর্ট, নেট টাঙানো। দেখা হয়ে গেছে, সুভাষ তাড়া লাগাচ্ছে, চল দেরি হয়ে যাবে, মণির নড়াচড়ার নাম নেই। চোখের সামনে ওপর থেকে নীচে হাত নেড়ে আশু দেখল চোখের পাতা পড়ছে না। মণির দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলাম, দোলনায় দুলতে দুলতে বই পড়ছে আঠারো-উনিশের একটা মেয়ে। মুখ দেখা যাচ্ছে না, শুধু দীর্ঘ চুলের ঢল নেমেছে ফর্সা পিঠ বেয়ে সেইটুকু দেখেই মণি স্ট্যাচু। আশু ফিসফিস করল, কুঁচবরণ কন্যা তার মেঘবরণ চুল। মণি এবার মুখ ঘোরাল, বলল, তোরা যা, আমি এইখানে একটু বসি। সেদিন মণিকে নামিয়ে আনতে আমাদের অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল।

আরা পারা যাচ্ছে না। বুকটা যেন লাফিয়ে উঠে এসেছে গলায়। ঘাড়ে, হাঁটুতে, কোমরে সবকটা জয়েন্ট মটমট করছে। শরীরে দুশো না কতগুলো হাড় আছে না গুনেও বলে দিতে পারি। একটা সিমেন্টের বেঞ্চি বানানো আছে, আমারই মতো বৃদ্ধদের জন্য বোধহয়, তাড়াতাড়ি গিয়ে থেবড়ে বসলাম।

ওপরে পথ, পথের ধারে গাছের সারি। পাতার ফাঁকে বাংলো। ফুলে ফুলে সাজানো বাগান। বাগানে কি এখনও টাঙানো আছে ব্যাডমিন্টনের নেট? দোলনায় দুলছে এক কিশোরী? বাগান পেরিয়েই উপত্যকা, তারপরেই বরফে ঢাকা মেঘের মতো পাহাড়। কেউ কি পথের ধারে বসে আছে? তৃষিতের মতো অপেক্ষা করছে কখন দোলনা থেকে নেমে সেই মেয়েটি একবার ঘুরে তাকাবে?

সম্ভব-অসম্ভবের সীমানার ওপারে সেই পাতায় ঢাকা বাড়ির দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। এই জীর্ণ অস্থি, এই বৃদ্ধ ফুসফুস কোনওদিনই আমাকে ওইখানে আর পৌঁছে দিতে পারবে না।

আজকাল চিঠি লেখা প্রায় ভুলতে বসেছি। মণিকে চিঠিই লিখতে হল, কারণ বহু

কাগজপত্র হাঁটকেও ওর একটা ঠিকানা ছাড়া কিছুই পাওয়া গেল না। তাও ভয়ে ভয়ে ছিলাম, যদি পাল্টে গিয়ে থাকে, যদি না পায়।

দিনদশেকের মধ্যেই উত্তর এসে গেল, চিঠি পেয়ে সঙ্গে সঙ্গেই জবাব লিখেছে বোঝা যায়।

"রিটায়ার করেছি। নমিতা নেই বছর দুই হল, সেরিব্রাল। মেয়েটার দেখেশুনে বিয়ে দিয়েছিলাম, জামাইয়ের কোল্ডস্টোরেজ। গরিব শ্বশুর, জামাইয়ের প্রেস্টিজে লাগে। নিজে আসে না, ওকেও পাঠায় না। ছেলের এক বস্তা কোয়ালিফিকেশন, এম এ. বিটি, কম্পিউটার, করেসপনডেন্স-এ আরও আরও কী। বছর বছর স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় বসে, ফিরে এসে হাত-পা ধুয়ে টিউশনি পড়াতে যায়। হীরককে তো তুই দেখেছিস, এমনিতে খারাপ নয়, কিন্তু কী যে গেরো লেগেছে! তোর নাম কাগজে দেখি, ছবি কেটে রেখেছে ছেলে। ও-ই বলে, অত বড় মানুষ, অত যোগাযোগ, একবার বলে দেখতেও পারো। আমারই বাধো বাধো লাগে। কী জানি কী ভাববি? ... আর কৌসানী? মনে আছে। চোখ বন্ধ করলে দেখতে পাই, চোখ খুললেই মিলিয়ে যায়। ওটা স্বপ্নই ছিল। স্বপ্নে কি কখনও ফিরে যাওয়া যায়?"

আশু পুনেয়, ফোন নম্বর ছিল, রাতের দিকে রিং করতেই পেয়ে গেলাম। কিছু বলার আগেই হড়বড় করে বলে গেল, দেখেছিস, একেই বলে টেলিপ্যাথি। তোর কথাই দু'দিন ধরে ভাবছিলাম। তুই বম্বেতে ছিলি না?

—হ্যাঁ, চারবছর।

—টাটা মেমোরিয়াল-এ যোগাযোগ আছে? ডক্টর স্বামীনাথন?

পাঁচ সেকেন্ড সময় নিলাম, যতটুকু না নিলে আশুর কাছে ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হবে না। বললাম, নারে, মনে পড়ছে না। কেন, কার অসুখ?

—আমার। লাংস-এ একটা স্পট, কয়েনলিশন। বলছে কেটে বাদ দিয়ে দেবে। আর্লি স্টেজ, পসিবল কিওর। রেডিয়েশন কি কেমো লাগবে পরে। তাড়াতাড়ি করিয়ে নিতে বলছে সবাই। তাই ভাবছিলাম, তোর যদি...

সুভাষের সঙ্গে ইমেইল যোগাযোগ ছিলই। মাস কয়েক হল কোনও খবর পাইনি। ধানাই পানাই না করে সোজাসুজি বললাম, কৌসানী মনে আছে? যেতে ইচ্ছে করে? যদি সব ব্যবস্থা করি, যাবি?

ইমেইলে স্ক্রিন বোঝাই করে দিল সুভাষ—'তুই তো আমার পুরোটাই জানিস। মৌসুমীর সঙ্গে সব চুকেবুকে যাবার পর নতুন করে কোনও সম্পর্কতে আর যেতে চাইনি। কেমন মনে হত, আমিই বোধহয় ইনকেপেবল। কাজে ডুবে থাকতাম, ল্যাবেই কেটে যেত সারাটা দিন। মোটামুটি বাকি জীবনটা একা থাকার সিদ্ধান্ত যখন নিয়েই ফেলেছি, আলাপ হল ক্যাথির সঙ্গে। একটা কনফারেন্স-এ আলাপ, একই ফিল্ড-এ কাজ করছি দুজনে। কথা বলতে বলতে অনেক রাত হয়ে গেল, অথচ ঘুম পাচ্ছে না। দুজনেরই কথা চালিয়ে যেতে ভাল লাগছে। আস্তে আস্তে দেখলাম সাবজেক্ট-এর বাইরেও আমাদের অনেক কমন ইন্টারেস্ট—টেনিস, পিকাসো, হিচকক আর ঘুরে বেড়ানো। আমেরিকায় এতদিন এসেছি, গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন দেখিনি শুনে ও এমনভাবে আমার দিকে তাকাল! দিন দশেক ছুটি নিয়েছি। ও বলছিল, গ্র্যান্ড ক্যানিয়নেও নাকি এক এক পিক হিন্দু দেব-দেবীর নামে—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব। ত্রিশূল দেখেছিলাম কৌসানীতে,

মনে আছে? সেই শুরু। শিব অবধি পৌঁছে গেছি। দেখা যাক ভাগ্য কোথায় টেনে নিয়ে যায়! কী বলছিলি, আবার কৌসানী? নারে ও জায়গাটা পার হয়ে এসেছি, সামনে আর কৌসানী পড়ে না।”

—কী ভাবছ?

সোমা কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে খেয়াল করিনি। হাসলাম। হাসিতে কত কিছু মুছে দেওয়া যায়, আশু-মণি-সুভাষ, মুছে দেওয়া যায় কৌসানী।

—পিউ ফোন করেছিল, আসতে পারবে না। চেয়ার টেনে বসল সোমা, হাত বাড়ানো দূরত্বে।

বাবাকে ইমেইল করে মেয়ে, মাকে ফোন। আগের বছর আসেনি। সোমা আশা করেছিল এই সময়টা বরফে বরফে ডুবে যায় ওদেশ, ছুটিও থাকে লম্বা, নিশ্চয়ই আসবে।

—কী একটা অ্যাসাইনমেন্ট পেয়েছে তিন সপ্তাহের জন্যে ইজিপ্ট যাচ্ছে। আচ্ছা উজিয়ে ইজিপ্ট অবধি আসতে পারলি, আর এইটুকু আসা গেল না?

জবাব না দিয়েই বসে রইলাম। মনে মনে সোমাকে বললাম, ইজিপ্ট মানে অ্যাসাইনমেন্ট শুধু নয়, ইজিপ্ট মানে মমি, পিরামিড, মরুভূমি। ইজিপ্ট-এ কলকাতা নেই।

জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিল সোমা। চাঁদ ওঠেনি। গাছের ডালে ঝুলে আছে চাপ চাপ অন্ধকার। অন্ধকারেই দৃষ্টি থমকে যায়, পেরিয়ে গেলে শুধুই শূন্যতা।

হাত বাড়িয়ে সোমাকে স্পর্শ করলাম। চোখ ফিরিয়ে ভেতরে তাকাল সোমা।

—ক'টা দিন ছুটি নেব ভাবছি। কৌসানী যাব। তুমি যাবে?

হাসল সোমা। কিশোরীর হাসি। মাথা নামিয়ে বলল, সেই যে বরফ-ঢাকা পাহাড়, কৈলাস, ত্রিশূল? সেই যে কবে থেকে তোমার কাছে গল্পই শুনে আসছি?

—হ্যাঁ হ্যাঁ সেই কৌসানী। যাবে?

সামনে ঝুঁকে, সোমার চোখের দিকে তাকিয়ে তীব্র আগ্রহে চেয়ে রইলাম। সময় নিচ্ছে সোমা, বড্ড বেশি সময় নিচ্ছে। মাথার ভেতর দপদপ করছে, নিজের হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। সোমা কি যাবে না? সোমা কি ফিরিয়ে দেবে?

যেন সোমার যাওয়া-না-যাওয়ার ওপরেই নির্ভর করছে আমার অবশিষ্ট জীবন, আমার বেঁচে থাকা।

মাথা তুলে চোখে চোখ রাখল সোমা। ওর সম্পূর্ণ দৃষ্টি আমার শরীরে ছড়িয়ে দিতে দিতে বলল, গেলেই হয়।

সহযাত্রী

নীল খামে গোলাপি চিঠি। ভালবাসার কুহুরব, কবির কবিতা, গালিবের গজল।

ঝকঝকে সেন্টার টেবিল, ফুলদানিতে উথলে ওঠা সাদা ফুল—ওগুলো কাগজের, বাহারি আলোর শেড, দেয়ালে গণেশ পাইন—আসল নয় প্রিন্ট। টেবিলে পেপারওয়েট চাপা দেওয়া নীল খাম।—প্রেমপত্র?

ভুল। নিষিদ্ধ মাদক, এক প্যাকেট জালনোট অথবা আরডিএক্স বোঝাই ব্রিফকেস। তিন হাজার ভোল্ট। ছুঁলেই মৃত্যু।

দরজা খুলেই সরে গিয়েছিল অপর্ণা, শব্দহীন। দেওয়ালে হাত রেখে জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে চোখ গেল চিঠিটার দিকে। চোখ সরিয়ে নিলাম। চিঠি, অপর্ণা, পিউ ইত্যাদি কোনও কিছুর দিকে আর একবারও না তাকিয়ে তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকে গেলাম।

শাওয়ার খুলে শরীরটা নীচে গুঁজে দিতে দিতে হ্যাঙ্গারে চোখ বোলালাম। না, পাজামা-পাঞ্জাবি রাখেনি অপর্ণা। ব্যাটল-ফ্রন্ট ওয়ান। ইগনোর করতে হবে এই সমস্ত, উপেক্ষা; যেন কিছুই দেখিনি। টাওয়েলটা ঝোলানো আছে, ভুল করেই হয়তো। স্নান সেরে টাওয়েল জড়িয়ে বেডরুমে ঢুকে পাজামা পরে বাইরে এসে দেখলাম অপর্ণা টেবিলে খাবার সাজিয়ে ফেলেছে।

পাঞ্জাবি চড়াইনি, খোলা বুকে অপর্ণার পছন্দের ট্যালকামের সুবাস, আমার প্রথম সন্ধি প্রস্তাব।

অপর্ণা অগ্রাহ্য করল।

চেয়ারে বসতে বসতেই শুনলাম অপর্ণা বলছে, পরীক্ষার গার্ড ছিল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা হয়ে গেছে। আমি শুতে যাচ্ছি।

উত্তরের অপেক্ষা না করে ভেতরের ঘরে ঢুকে ঘুমের আলো জ্বালিয়ে দিল অপর্ণা। দরজাটা ভেজিয়ে দিল। চোখে আলো পড়ে যাতে ঘুমের ব্যাঘাত না হয়।

বেড়ে দেওয়া খাবারের দিকে তাকালাম। কুমড়োর ঘ্যাঁট, ওলভাতে আর কাটা পোনার ঝোল। ফ্রন্ট নাম্বার টু। গা গুলিয়ে উঠল, জিভের স্বাদ চলে গেল। নেড়ে-চেড়ে উঠে পড়লাম।

হাতমুখ ধুয়ে ব্যালকনিতে গিয়ে বসলাম। পিউ ঘুমিয়ে পড়েছে। ওর ঘর অন্ধকার। বাইরের আলো নিভিয়ে দিতেই তারাসুদ্ধ আকাশটা কাছাকাছি এসে গেল। আর সিগারেটটা ধরানোর পর অপর্ণার পরিপাটি সংসার দরজার আড়ালে চলে গেল।

দোষটা পুরোপুরিই আমার। গজগজ করেছিলাম, এই বয়েসে একলা ভূতের মতো পড়ে থাকো; অত করে বললাম, ফোনের লাইনটাও নিতে দিলে না। নিয়ম করে চিঠিও যদি না লেখো...

প্রসন্ন হেসেছিল মা। উদ্বেগটুকু তারিয়ে উপভোগ করতে করতে বলেছিল, তুই কী

ভাবিস বল তো? পোস্টাপিস কি এখানে? সেই ঘোষপাড়া অবধি ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে যাওয়া...আজকাল চোখেও ভাল দেখি না। তার চেয়ে এই বেশ আছি। চিন্তা নেই, সবাইকে বলা আছে। মরে গেলে খবর ঠিকই পাবি।

ঝাঁঝিয়ে উঠেছিলাম, দিনরাত খালি মরা মরা কর কেন? মরে গেলে তো চুকেই গেল। মরার আগেও অনেক কিছু থাকে। কোমর ভেঙে শুয়ে রইলে, প্যারালিসিস, বাত। খবরটা পেলে যা হয় একটা ব্যবস্থা তো করতে পারি!

মা যেন চিন্তায় পড়েছিল। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল, মৃত্যু নয় রে, রোগভোগকে ভয় পাই। ঠিক আছে, কয়েকটা পোস্টকার্ড দিয়ে যাস, সুযোগ পেলে দু ছত্র লিখে রাখব। কারও হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেব, ফেলে দিয়ে আসবে।

পোস্টকার্ড নয়, খামই দিয়ে এসেছিলাম এক ডজন, সঙ্গে গোলাপি কাগজের রাইটিং প্যাড। খামে ডাকটিকিট সাঁটিয়ে ঠিকানা লিখে মা-র হাতে দিয়ে বলেছিলাম, চিন্তা নেই, শেষ হলে আবার দিয়ে যাব।

তারপর থেকেই শুরু হয়েছে মা-র চিঠি লেখা। ঠিক নেই, হয়তো পর পর দুখানা চিঠি এলো, আবার দু-তিন মাস কোনও খবর নেই।

চিঠির ভাষা এইরকম:

ক) পলির ছোটখোকার অন্নপ্রাশন। সোনার হার দিব মনস্থ করিয়াছি।

খ) শান্তনুর বড় ছেলে বিদেশে যাইবে, খুব করিয়া ধরিয়াছে। আমি কিন্তু কথা দিয়াছি, যথাসাধ্য সাহায্য করিব।

গ) চন্দ্রার শ্বশুরমহাশয় গুরুতর অসুস্থ, বাইপাসের কেস। লক্ষাধিক টাকার প্রয়োজন। আমার কাছে আসিয়াছিল।

নীচে লেটারবক্সে চিঠি আসে। আমিই কালেক্ট করি। পড়ে ছিঁড়ে ফেলে দিই। একবার লম্বা ট্যুরে বাইরে গেছি, অপর্ণার হাতে পড়ে গেল। অমন সুন্দর খাম, বয়েসটা ভালনারেবল্ দেখি তো খুলে কার চিঠি?

ফিরে আসতেই জিজ্ঞেস করল, কত দিলে?

প্রথমে ধরতে পারিনি। অবাক হয়ে বলেছিলাম, কাকে? কী ব্যাপার?

অপর্ণা মুখ বেঁকিয়েছিল, ন্যাকা! তোমার মা-র কথা বলছি। কত দিলে?

—পাঁচশো।

না ভড়কে মিথ্যে কথাটা বলতে পেরে বেশ তৃপ্তি হয়েছিল। কিন্তু অপর্ণার মুখ দেখে মনে হল ও বিশ্বাস করেনি। আগের মাসেই ওর বোনের ম্যারেজ অ্যানিভার্সারিতে একটা প্রেজেন্টেশন কিনবে বলে টাকা চেয়েছিল। খুব সিরিয়াস মুখ করে বলেছিলাম, ক্যালকুলেশনে ভুল হয়েছিল, এ মাসের মধ্যে ইনকামট্যাক্সে হাজার দশেক জমা না দিলেই নয়। কিছু মনে কোরো না প্লিজ। এখন পাঁচশো কোথা থেকে বেরুলো জিজ্ঞেস করতেই পারত। জিজ্ঞেস যে করল না তার একটাই কারণ, আরও বড়সড় স্ক্যাম হাতেনাতে ধরবে বলে ছিপ ফেলে বসে রইল।

তারপর থেকে মা-র চিঠি এলে আমিই খুলি। কিন্তু অপর্ণার মুখ দেখে বুঝতে পারি, চিঠির ভাষা ওর মুখস্থ। সভ্যতার নিয়ম অনুযায়ী অবশ্য আমরা দুজনেই সীমান্তে অস্ত্রসজ্জা করেও যুদ্ধটা স্থগিত রেখে দিই।

টায়ার্ড ছিলাম। সিগারেটটা শেষ করে আর বসে থাকতে পারলাম না। শুতেই চোখ

জড়িয়ে গেল

যুদ্ধটা সকালেই শুরু হয়ে গেল।

ব্রেকফাস্টের টেবিলে পিউ গুটি গুটি পাশে এসে দাঁড়াল,—সামার ভ্যাকেশনে স্কুল থেকে এক্সকারশনে নিয়ে যাচ্ছে, দেরাদুন-মুসৌরি। এই উইকের মধ্যেই টাকাটা জমা দিতে হবে। কবে দেবে?

—কত?

—পাঁচ হাজার।

ডিমসেদ্ধটা গলায় আটকে গিয়েছিল। জল দিয়ে নামিয়ে দিলাম।

—পাঁচ হাজার? মাকে বলেছিস?

—হ্যাঁ, মা বলেছে তিনটে বিয়ে আছে এই মাসে, প্রেজেন্টেশন কিনতে হবে, তাই দিতে পারবে না। কবে নেব বাবা? ম্যাম্ খুব প্রেশার ক্রিয়েট করছে।

হঠাৎ-ই মেজাজ গরম হয়ে গেল। অপর্ণা যে আড়ালেই আছে, যথাসময়ে আত্মপ্রকাশ করবে, না বুঝে বলে ফেললাম, স্কুলের এক্সকারশন, তাতে পাঁচ হাজার? জুলুম নাকি? কমপালসারি না অপশনাল? অপশনাল হলে বলে দে, যাব না।

পিউ শুরু করেছিল, ক্লাশ এইট অবধি থ্রি, নাইন থেকে ফাইভ থাউজ্যান্ড, অপর্ণা এসে স্টিয়ারিংটা পিউর হাত থেকে কেড়ে নিল।

—অপশনালই যদি হয়, ওর অপশন কি সব সময়ই না হবে? আগেরবার সবাই সাউথ ইন্ডিয়া গেল, অসুখের বাহানায় ওকে আটকে রাখলাম। তাই নিয়ে পেরেন্টস টিচার মিটিং-এ...। যাকগে, ফাইভ থাউজ্যান্ড, আজকালকার বাজারে, এমন কিছু এক্সরবিট্যান্ট মনে হচ্ছে না আমার।

—প্রত্যেক মাসে কোনও না কোনও ছুতোয় টাকা চাওয়া। আগের মাসে ফেস্ট, তার আগের মাসে স্পোর্টস, কখনও হাজার, কখনও দু হাজার। আমি কি টাকার গাছ?

এটার জন্যই অপেক্ষা করছিল অপর্ণা। ছুটে গিয়ে খামটা টেবিলের ওপর থেকে তুলে আনল, তখনও না খোলা,—নাকের সামনে নাচাতে নাচাতে বলল, গাছ নয়? তাহলে এটা কী? তোমাকে ঝাঁকালেই যে টাকা বেরোয় সেটা কি মিথ্যা? মায়ের বেলা গৌরী সেন, আর মেয়ে চাইলেই তুমি নাঙ্গা ফকির?

অসহায়ের মতো তাকাই মেয়ে ও মায়ের দিকে। কোথাও এতটুকু করুণা নেই, কারও চোখে সহানুভূতির লেশমাত্র নেই। তলানি চা-টুকু গলায় ঢেলে উঠে পড়লাম।

—অনন্ত বলছিল, এবারে ফলন কম, তিন হাজারের বেশি দিতে পারবে না।

—বল কী? অতগুলো আমগাছ, মাত্র তিন হাজার? এ তো পুকুর-চুরি!

—চুরি তো চুরি। আমার কী-ই বা করার আছে বলো? ও জানে আমার হয়ে বলার কেউ নেই। সবকটা গাছ খালি করে পেড়ে নিয়ে গেলেও আমাকে চুপ করে থাকতে হবে।

—অত কথার কী আছে? এসেছি যখন আজই অন্য কাউকে ঠিক করে যাচ্ছি।

—থাক থাক, এক দিনের জন্য এসে গোলমাল পাকিয়ে যেতে হবে না। অন্য কেউ নেই। থাকলেও কেউ আসবে না। অনন্ত এখন কে জানিস? অনন্তবাবু। রেল লাইনের ধারের বাজারটা ওর এলাকা, ওর ছেলেরাই তোলা আদায় করে। তিন হাজার দিচ্ছে তা-ই কত ভাগ্যি।

ছায়ায় দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল। খেয়াল করিনি, পিপড়ের চাক হয়েছে গাছে, পা ফুলিয়ে দিয়েছে। বেলা বাড়ছে, হাওয়া তেতে উঠছে। মাকে বললাম, চলো, ভেতরে গিয়ে বসি।

পেছনের ইটখোলা পুকুরে মাছ ছেড়েছিল, মাছগুলো দেড় কেজি দু কেজি পর্যন্ত হয়েছিল, রাতের অন্ধকারে জাল ফেলে কারা সমস্ত তুলে নিয়ে গেল। পুকুর ধারে সারি সারি নারকোল গাছ, পাড়ার ছেলেরা পেড়ে নিয়ে যাবার সময় মুখোমুখি পড়ে গেলে এক আধখানা দিয়ে যায়। হনুমানের উপদ্রব, পেঁপে গাছে একটাও পেঁপে রাখার উপায় নেই। গন্ধরাজ লেবুর গাছ ছিল, পাতে লেবু না হলে বাবার খাওয়াই হত না, রেগেমেগে সেটাও কাটিয়ে দিল। সূর্যাস্ত আর মার মাঝখানে মাথা তুলেছে কয়েকটা গাছ—কামিনী, রঙ্গন, বকুল। মার লাগানো। এখন ওরাই মার সংসার।

—ফুল ফোটে?

—ফোটে না আবার? মার চোখে প্রশ্রয়। —রাত পুরোবার আগেই সব এসে হাজির হয়। চুপি চুপি। ভাবে আমি টের পাই না। বাচ্চা থেকে বুড়ো কেউ বাদ নেই, বউ-ঝিরাও আসে। হাতে লম্বা লম্বা আঁকশি। সকালবেলা গাছতলায় গেলে দেখবি, একটা পাপড়িও পড়ে নেই।

—দেখো ওগুলোও আবার কাটিয়ে দিয়ো না রাগ করে।

—না রে বাবা না। ফুল সে যে হাত দিয়েই নাও, পৌঁছবে তো সেই ভগবানেরই পায়ে। নিক না, কত নিবি নে। গাছ ফাঁকা করে ফুল পেড়ে নিয়ে যায়, ভোর না হতেই গাছ আবার ফুলে ফুলে সেজে যেমনটি তেমন।

ফুলের কথা বলছিল মা। বসেছিও একটা পদ্মফুলের ওপর। ফুল-আঁকা আসন। এই আসনটায় আমার বরাবরের লোভ। মাও এটাই পেতে দেয়।

হাঁটু ভাঁজ করে বেশিক্ষণ বসতে কষ্ট হয়, পা ব্যথা করে। মাকে বলা যায় না। পা বদলে বদলে বসি। কাঁসার থালায় চূড়া করে বাড়া ভাত, বাটিতে ছোলার ডাল, বেগুনভাজা, বাটা মাছের ঝাল, মৌরলা মাছের অম্বল। সপ্তাহে একদিন বাজার করায় মা। আমি আসব বলে আনিয়েছে। পাশে মিনি থাবা গেড়ে বসে। ভদ্র, মার ট্রেনিং। খাওয়া শেষ না হলে মুখ বাড়ায় না।

লোডশেডিং, হাতপাখা নিয়ে হাওয়া করছিল মা। বারণ শুনছিল না। বলল, দাশুকে ডেকেছিলাম।

—কোন দাশু?

—কলের মিস্তিরি, পাঁচুর মেজোভাই... তোর মনে নেই।

—হঠাৎ দাশুকে কেন?

—আর বলিস না। একদিন রাতে বাথরুমে যাচ্ছিলাম, ঝাঁটাটা রাস্তায় পড়েছিল দেখতে পাইনি। আছাড় খেয়ে রক্তারক্তি কাণ্ড।

বাথরুমটা ঘরের লাগোয়া নয়।বারান্দা দিয়ে হেঁটে উঠোনের এককোনায় যেতে হয়।

—কবে থেকে বলছি, একটা অ্যাটাচড বাথ বানিয়ে নাও। কথাটা কানে নিলে তো!

—তখন বয়েস অল্প ছিল, রক্তের তেজ ছিল গা করিনি। এখন, চোখে ভাল দেখি না, তাছাড়া একা মানুষ, ভয়ভয় করে। তা এবার ঠেকায় পড়ে দাশুকে খবর দিলাম। দাশু দেখেশুনে বলল, মাসিমা, যেমন তেমন করে করলেও ফিটিংস নিয়ে হাজার দশ-বারোর কমে হবে না। ভেবে দেখুন। খবর দিলে মালপত্র নিজেই এনে বসিয়ে দিয়ে যাব, চিন্তা

করতে হবে না।

চুপ করে আছি দেখে মা প্রসঙ্গ বদলাল।

—পুকুর, আমগাছ, বাগান কিছুই আর রাখা যাচ্ছে না। পঞ্চাশ হাজার অবধি দর পেয়েছি। বেচেই দিতে হবে শেষ পর্যন্ত।

—পঞ্চাশ হাজার? স্টেশনের ধারে এই জায়গাটার দাম জানো? পুকুরটাই আট কাঠা, সঙ্গে আমবাগান, অতখানি ফাঁকা জমি। ছ'লাখের এক পয়সাও কম হবে না।

—ছ'লাখ? বিধবার সম্পত্তির দাম ছ' লাখ? হাসালি! কাত হয়ে পড়ার অপেক্ষা। শেয়ালে শকুনে ছিঁড়ে খাবে।

ঠিক এইখানেই এসে কথা শেষ হয়ে যায় আমাদের। এর পরেই যে কথাটা শুরু হওয়া উচিত, সেটাই আমি বলি, মনে মনে। একলা পড়ে আছো কেন মা? আমার কাছে গিয়ে থাকলেই তো পারো?

কথাগুলো মা ঠিকই শুনতে পায়। শুনতে পায় বলেই জবাব দেয় না। জবাব দেয় না বলেই জবাবটা এত তীব্রভাবে ফিরে আসে আমার কাছে।

দুপুরে বাবার খাটে শুয়েছিলাম। সারা দুপুর এপাশ ওপাশ করেছি। ভেবেছি। মাকে বলা দরকার। মাকে বোঝানো উচিত। আমার দায়িত্ব। বাবা হিসেবে আমার কর্তব্য।

কয়েকটা নারকোল, গোটা চারেক পেয়ারা, একটা মানকচু ঝোলায় ভরে দিচ্ছিল মা।

মাকে বললাম, পিউর মাধ্যমিক এসে গেল।

হাসিতে মার মুখের ছায়া কেটে গেল। বলল, কতদিন দেখি না দিদিভাইকে। শুনেছি খুব মিষ্টি হয়েছে। পরের বার যখন আসবি একটা ছবি আনিস সঙ্গে করে।

ঢোঁক গিললাম। কথাগুলো এখনি না বলে ফেললে হারিয়ে যাবে।

—মাধ্যমিকের পর উচ্চ মাধ্যমিক। অপর্ণার ইচ্ছা সায়েন্স। তার পরে জয়েন্ট এন্ট্রান্স, আই আই টি। ডাক্তারি না হলে ইঞ্জিনিয়ারিং। কলকাতা না হলে ব্যাঙ্গালোর। আমাদের দিন আর নেই মা। একটা র‍্যাট রেস। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। সবাই চেষ্টা করছে। হাজারটা কোচিং সেন্টার, করেসপনডেন্স কোর্স। চান্স পেলেও বিশাল খরচ। বাবা হিসেবে আমারও তো একটা দায়িত্ব...। কীই বা রোজগার করি বলো?...তুমি একটু বোঝার চেষ্টা করো মা।

কথা থামিয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল মা। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঝোলাটা হাতে দিয়ে বলল, সাবধানে যাস। দেখেশুনে রেললাইন পার হোস। গিয়ে চিঠি দিস।

প্রণাম করে বেরিয়ে আসছি, পেছন থেকে ফিসফিস করে বলল, দিদিভাইকে ঠিকমতো মানুষ কর। কোথাও ফাঁক রাখিস না। যেন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। দশের একজন হয়। আমার জন্যে না ভাবলেও চলবে। বলেছিলি বলেই না চিঠি লিখি, উত্যক্ত করি। আর করব না, কথা দিচ্ছি। তুইও আর অনর্থক এদিক নিয়ে মাথা ঘামাস না। আসার দরকারও নেই এখন। আমি ঠিকই সামলে নেব। তেমন দরকার পড়লে কাউকে দিয়ে খবর পাঠাব।

প্রথম মেঘটা ডাকল ট্রেনে ওঠার পর। মুচকি হাসলাম। এটা ভয় দেখানো ডাক। গাছের নীচ থেকে ডালে বসা বেড়ালের দিকে তাকিয়ে কুকুরের ঘেউ ঘেউয়ের মতো।

প্ল্যাটফর্মে ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করতে করতেই দেখেছিলাম উত্তর-পশ্চিম আকাশে

মেঘ সাজছে। একটু পরেই দুষ্টু ছেলের মতো ঝাঁকড়া হয়ে গেল মেঘের মাথা। হাওয়া বইতে শুরু করল এলোমেলো। ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেল আকাশময়। হাওয়াটাও যেন ফ্রিজ বন্দি ছিল, হঠাৎ বেরিয়ে এসে ঠাণ্ডা করে দিল চারিদিক। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখতে পেলাম, একটা শেড তৈরি হচ্ছে, খুঁটি লাগানো হয়েছে চারপাশে, এখনও চালা বসানো হয়নি। তার মানে বৃষ্টি নামলে অসহায়ের মতো ভেজা ছাড়া উপায় নেই।

ভাবতে ভাবতেই ট্রেন ঢুকে পড়ল। আর ট্রেনে উঠতে না উঠতেই মেঘের হুঙ্কার। পাত্তা না দিয়ে জায়গা খুঁজে বসে পড়লাম।

আজ ট্রেনেরও হলিডে মুড। তিনজনের সিট পাঁচজন করা নেই, দুটো সিটের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের সারি নেই, ভিড়ের মধ্যে ঝাঁকা ছুড়ে দেওয়া ভেন্ডার নেই, এমনকী মানুষে মানুষে ঘর্ষণে তৈরি কথার উত্তাপও নেই। সমাহিত ট্রেনের কম্পার্টমেন্ট বিয়েবাড়ির সাজগোজ, মেলা দেখতে যাবার আগ্রহ, একটি দুটি হকারের বিনীত নিবেদন এবং ছুটির বিকেলের আলস্য বয়ে এক স্টেশন থেকে অন্য স্টেশনে গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে।

আলস্য এক সংক্রামক ব্যাধি। চারপাশে পরিব্যাপ্ত নির্লিপ্ত প্রশান্তি কখন আমার মধ্যেও ঢুকে পড়েছে টের পাইনি। ধড়মড় করে উঠে পড়ে বুঝতে পারলাম, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

ট্রেনটা মৃগীরোগীর মতো থরথর করে কাঁপছে। ভূমিকম্প? বাইরে তাকালাম। আকাশটা যেন নেমে এসেছে নীচে। গাছের মাথায় জমে আছে ঝুলের মতো ঘন কালো মেঘ। ধুলোর পর্দার আড়ালে ডুবে গেছে ধানক্ষেত। ছোট বড় সমস্ত গাছ হাজার চেষ্টাতেও ফল-ফুল-পাতা কিছুই ধরে রাখতে পারছে না। একটা প্রবল ঘূর্ণি সবকিছু তার পেটের মধ্যে টেনে নিয়ে উড়ে যাচ্ছে দূরে। সঙ্গে গুমগুম শব্দ, যেন মাটির নীচে কোনও বিস্ফোরণ। দমকা হাওয়া ডান দিক থেকে ঢুকছে হু হু করে, ট্রেন ফুঁড়ে চলে যাচ্ছে বাঁ দিকের জানলা দিয়ে বাইরে।

দু'একজন উঠে জানলা বন্ধ করতে গেল। বাকিরা হাঁ হাঁ করে উঠল, খবরদার, ঝড়ের মধ্যে জানলা বন্ধ করবেন না। ট্রেন উল্টে যাবে।

স্পিড কমাতে কমাতে ট্রেনটা একসময় থেমে গিয়েছিল। ঝড়ের তীব্রতা একটু কমলে আবার নড়েচড়ে চলতে শুরু করল। একটা স্টেশন এল। দুয়েকজন নামল। উঠলও কেউ কেউ।

তারপরেই শুরু হল বৃষ্টি। আর তখনই বুঝতে পারলাম, ট্রেনের কম্পার্টমেন্টের চেয়ে প্ল্যাটফর্ম ছিল অনেক নিরাপদ। কোথাও না কোথাও দাঁড়াবার জায়গা ঠিকই জুটে যেত। না হলে দূরে স্টেশনমাস্টারের অফিস। টিকিট কাউন্টার। ছুটে বাড়িতেও ফিরে যাওয়া যেত। কতটুকুই বা দূর! এখানে?

দরজাগুলোর পাল্লা বন্ধ হয় না। দুটো বাদে কোনও জানলাতেই শার্সি নেই। গুটিকয়েক যাত্রী ছোটাছুটি করে বন্ধ জানলা দুটোর কাছে বসে আত্মপ্রসাদের হাসি হাসল,—যাক, এখানে ছাঁট আসবে না। কয়েক মিনিটের মধ্যে হাসি মুছে গেল। যে ছাদের ভরসায় সবাই এতক্ষণ নিশ্চন্ত ছিল, দেখা গেল সেটাও ছাদ নয়, চালুনি। ঝরনার মতো ওপর থেকে জলের স্রোত নেমে চুপচুপে ভিজিয়ে দিল সকলকে।

হাওয়ার সোঁ সোঁ আওয়াজ, দমকা হাওয়ার এক একটা ঝাপটা, মেঘের গর্জন,

অবিরল জলধারা, অসহায়ের মতো ভেতরে সবাই বসে। ট্রেনটা মাঝে মাঝে থামছে, আবার চলছে। বিকেল ফুরিয়ে গেছে। শেষ আলোর বিন্দুটুকুও শুষে নিয়েছে কালো মেঘ। এক প্রবল দুর্যোগের মধ্যে যেন আমাদের অনির্দেশ যাত্রা।

হঠাৎ সকলকে চমকে দিয়ে বাইরের অন্ধকার লাফিয়ে এল ভেতরে।

—যাঃ ওভারহেড তারে কারেন্ট চলে গেল। অন্ধকারের ভেতর থেকে কে যেন বলে উঠল। ট্রেনটাও কাঁপতে কাঁপতে একটা স্টেশনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল।

বৃষ্টি কখনও একটু ধরে আসছে। পরক্ষণেই দ্বিগুণ বিক্রমে নামছে। বাইরে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। অন্ধকার ভেদ করে ক্বচিৎ কখনও আলোর একটা ফলা হেঁটে যাচ্ছে সামনে-পেছনে। টর্চ হাতে মানুষ। ওইটুকু ছাড়া জীবনের লক্ষণ অনুপস্থিত।

কখন যেন বৃষ্টি ও অন্ধকারের একঘেয়েমি পার হয়ে মার কথাগুলো সামনে এসে দাঁড়াল।

আজ স্পষ্ট করেই বলে দিল, আমাকে নিয়ে তোর না ভাবলেও চলবে। মরে গেলে খবর পাবি, এসে মুখাগ্নিটা করে যাস। অভিমানের কথা। কিন্তু ভেতরের সত্যটা এড়াব কী করে? আমার জীবনে আর মা নেই। এবং উল্টোটাও। আমার শৈশব, আমার অতীত, আমার স্মৃতি, মার কাছে তার পরেই একটা পূর্ণচ্ছেদ। মা ফিরিয়ে দিল। আমার অতীত গা থেকে খুলে নিয়ে মা আমাকে চলে যেতে বলল, অপর্ণা ও পিউর কাছে। ওরাই আমার সংসর্গ ও সাহচর্য। ওরাই আমার অবশিষ্ট জীবন।

বৃষ্টির তেজ কমে আসছে। হাওয়ার ঝাপটাও কম। মাথা বাঁচিয়ে বসা যাচ্ছে এখন। ভিজে জামাকাপড় গায়েই শুকোচ্ছে। গিয়েই ওষুধ খেয়ে নিতে হবে, পড়লে ঝাড়া এক সপ্তাহের ধাক্কা।

বেশি নয়। দশটা বছর পিছিয়ে গেলেই দেখতে পাই। ট্যুর থেকে ফিরে দরজায় কড়া নাড়ছি, পনিটেল দুলিয়ে লাফাতে লাফাতে এসে দরজা খুলে দিচ্ছে পিউ, পাপড়ির মতো গোলাপি ঠোঁট, জ্বলজ্বলে দুটো চোখ।

—কী এনেছ বাবা?

তর সইত না। ব্যাগ কেড়ে নিয়ে হাঁটকাতে শুরু করত। এক বাক্স রং পেনসিল, গন্ধ রবার, আলোজ্বলা ডটপেন। ছুটে গিয়ে অপর্ণাকে দেখিয়ে আসত। পাশে নিয়ে শুতে যেত।

বাড়ি এখনও ফিরি। ট্যুর এখন আরও লম্বা, আরও টায়ারিং। ক্লান্ত পা দু'খানা টানতে টানতে বাড়ির দরজায় যখন এসে দাঁড়াই, ডোরবেলে আঙুল ছোঁয়াই, ভেতরটা তৃষিতের মতো অপেক্ষা করে। অপর্ণা দরজা খুলে সরে যায়। পিউ কোথায়? নিজের ঘরে।

ওর বাবা এখন অনেক কিছু এনে দিতে পারে। পারে, কিন্তু শর্তসাপেক্ষে। পেয়ে খুশি হতে হবে। আগের মতো চোখের তারায় ঝাড়বাতি জ্বালিয়ে ছুটে মার কাছে গিয়ে বলতে হবে, দ্যাখো, বাবা কী এনেছে! পিউর দু'চোখে খুঁজতে থাকি। না, সেখানে কোনও চাহিদা নেই। অতএব তৃপ্তিও নেই। নির্লিপ্ত সেই চোখে আমি নেই। অপর্ণা জানে না, অপর্ণাও নেই।

বৃষ্টিটা বোধহয় থেমেই গেল। হঠাৎই আবিষ্কার করলাম, ট্রেনের কম্পার্টমেন্টে আমি ছাড়া আর কেউ নেই। বাইরে অনন্ত অন্ধকার, একটা স্থাণু নির্জীব কামরার মধ্যে আমি একা, মনে হল এক তীব্র একাকিত্বে আমাকে ফেলে রেখে সবাই চলে গেছে। মনে হল

এই অন্ধকারেই আমার নিবৃত্তি। তাড়াতাড়ি উঠে প্ল্যাটফর্মে নামলাম।

অন্ধকারে চোখ থমকে গেল। চাপ চাপ অন্ধকার, তারই মধ্যে অশরীরীর মতো ঝিম মেরে দাঁড়িয়ে আছে ট্রেনটা। যেন কোথাও যাবার নেই। যতটুকু কথা ছিল পৌঁছে দেওয়া হয়ে গেছে তার সবটাই।

ট্রেন আর যাবে না নাকি? বাকি লোকজনই বা গেল কোথায়? আজ কি এখানেই রাত্রিবাস?

—গরম চা!

এত কাছে এসে হাঁক পাড়তে হয় ভাই? মরচে পড়া যন্ত্র, কখন প্রাণপাখিটা ফুস করে বেরিয়ে যায়! বুকটা এমন ছ্যাঁৎ করে উঠেছিল। আর একটু হলেই হয়ে গিয়েছিল আর কী!

তবু, গরম চা শুনেই ভেতরটা ব্যাকুল হয়ে উঠল। মনে হল চা-ই নয় শুধু, মানুষ, মানুষের সান্নিধ্য, বলে উঠলাম, কত করে চা?

—পাঁচ টাকা। খুচরো দেবেন কিন্তু।

পাঁচ টাকা? বলতে গিয়েও চেপে গেলাম। পঞ্চাশ হলেও নিতাম। এক চুমুক ভেতরে পাঠিয়ে মনে হল সমস্ত কিছুই ফিরে আসছে—আত্মবিশ্বাস, বেঁচে থাকার ইচ্ছা, এবং ছোটখাটো অসততাও। দশটাকার নোট বাড়িয়ে বললাম, খুচরো তিন টাকার বেশি হচ্ছে না। অন্ধকারেও চাওয়ালার চোখ পড়তে পারলাম। সেখানে অবিশ্বাস ও সন্দেহ। পাঁচ টাকা গুনে দিয়ে অন্ধকারে মিশে গেল চাওয়ালা।

চাকরিতে জয়েন করে অপর্ণার কি অপরাধবোধ হয়েছিল? নাহলে আমাদের খুশি করতে অত ব্যস্ত হয়ে পড়বে কেন? পিউর জন্যে রোজ স্কুল ফেরত কিছু না কিছু হাতে করে আনা চাই, ঘুষ। আমাকেও বেশি আদর, বেশি যত্ন, বেশি নজর। অপর্ণা ভুলিয়ে রাখতে চেয়েছিল, দুয়েকটা বছর।

আমি যে ওর চাকরিতে আপত্তি করেছিলাম তা কিন্তু নয়। বরং ওর চাকরিটা আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল। হরিমতী বালিকা বিদ্যালয়ের জায়গায় সেন্ট হেলেনা—পিউয়ের স্কুল, হোয়াইট ওয়াশের বদলে প্লাস্টিক পেইন্ট—আমাদের নতুন ফ্ল্যাট, দার্জিলিং-পুরী-বকখালি না হয়ে মাঝে মাঝে গোয়া-মানালি এইসব ফাঁকগুলো অপর্ণাই ভরাট করে দিচ্ছিল। সুযোগ নিতে নিতে, স্বাচ্ছন্দ্যে অভ্যস্ত হতে হতে একসময় আবিষ্কার করলাম অপর্ণা আর আমিও আর এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। অভ্যেস? বয়েস? পৌনঃপুনিকতা? অথবা সবগুলোই। একটা একটা করে পালক সম্পর্ক থেকে টেনে তুলতে তুলতে ভুলেই গেলাম যে কাক নয়, ময়ূরই ছিল এটা এক কালে। মধ্যরাতে এক ঘরে পিউ অন্য ঘরে অপর্ণাকে ঘুমের গভীরে শুইয়ে রেখে টিভির রিমোট টিপতে টিপতে হিসাব করি দুটো না তিনটে, তিনটে না চারটে, দশ না কুড়ি মিলিগ্রাম, একটু ঘুমের জন্য কতখানি ওষুধের কাছে আজ নতজানু হতে হবে?

চাওয়ালা ফিরে আসছে। হাঁকতে হাঁকতে একেবারে ট্রেনের লেজ অবধি চলে গিয়েছিল লোকটা। কেটলিতে এখনও খানিকটা পড়ে আছে বোঝা যাচ্ছে।

কাছে আসতে জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে ভাই, ট্রেন কি যাবে না?

জবাব না দিয়েই চলে যাচ্ছিল। পেছন থেকে ডাকলাম, আর এক ভাঁড় চা হবে?

ফিরে এল। চায়ের ভাঁড় এগিয়ে দিয়ে বলল, ওপরের তারে গাছ পড়ে গেছে। সব গাড়ি বন্ধ।

—কী হবে তা হলে? সারারাত এইখানে, অন্ধকারের মধ্যে...

গলায় নিস্পৃহতা ঢেলে চাওয়ালা জবাব দিল, খবর পেয়ে সারাই গাড়ি আসবে, গাছ সরাবে, লাইন টেস্ট করবে, তারপর গাড়ি ছাড়বে। সামনেও পরপর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

—সর্বনাশ! সে তো বহুক্ষণের ব্যাপার!

—কপাল ভাল থাকলে দু-তিন ঘণ্টা। আবার তেমন তেমন হলে,...এবারে খুচরো দেবেন তো?

পকেট হাতড়ে পয়সা বের করতে করতে থেমে গেলাম। একটা আওয়াজ! মৃদু অথচ গম্ভীর, যান্ত্রিক কিন্তু বিরতিহীন একটা শব্দ অনেকক্ষণ থেকেই আসছে। যেন অন্ধকারের অনুষঙ্গ হয়ে মিশে ছিল এতক্ষণ। চাওয়ালার কথায় যেন পরিপার্শ্ব থেকে আলাদা হয়ে আমার কানে পৌঁছুল।

জিজ্ঞেস করলাম, আওয়াজটা কীসের ভাই?

চাওয়ালা বিরক্ত হচ্ছিল। অযথা দেরি করিয়ে দিচ্ছি। কিছু করার নেই। পয়সা না নেওয়া অবধি ওর যাওয়ার উপায় নেই।

—আপ লাইনের ওদিকে একটা ইঞ্জিন দাঁড়িয়ে আছে। সেটারই আওয়াজ পাচ্ছেন।

—কারেন্ট নেই, ইঞ্জিন চলছে?

চায়ের দাম হাত থেকে একরকম কেড়ে নিয়ে যেতে যেতে নিতান্ত অবজ্ঞায় বলে গেল, ডিজেল ইঞ্জিন, কারেন্ট লাগে না।

চোখ অনেকটা সয়ে এসেছে। আবছা দেখতে পাচ্ছি, ওদিকে আপলাইনেও একটা ট্রেন দাঁড়িয়ে। আমাদেরই মতো অন্ধকার, আমাদেরই মতো শব্দহীন নিশ্চল। আওয়াজ ওর নয়। ওই ট্রেনের আড়ালে কোনও ইঞ্জিন আছে যা যতিহীন শব্দ মিশিয়ে দিচ্ছে নৈঃশব্দ ও অন্ধকারে। আছে যে তার প্রমাণ ওই শব্দ, বাকিটুকু অনুমান।

চা খেয়ে সিগারেটের তেষ্টাটা আবার মাথায় চড়ে বসল। ডাক্তারের বারণ, গুনে গুনে চারটে ভরি রোজ সকালে,—চার নম্বরটাই পড়ে আছে, প্যাকেট খুলে দেখলাম ভিজে নেতিয়ে গেছে। দেশলাইটা? চার পকেট হাতড়ে দেশলাই পেলাম না। মনে পড়ল, খাবার পর মাকে লুকিয়ে ছাদে উঠে সিগারেট ধরিয়েছিলাম, দেশলাইটা আলসেয় রেখেছিলাম, আর পকেটে ভরা হয়নি।

নেশা এমন জিনিস মাথায় একবার উঠলে নামানো কঠিন। অন্ধকার ভেদ করে দূরে চোখ চালিয়ে মনে হল প্ল্যাটফর্মের একদম শেষে একটা কেরোসিনের কুপী জ্বলছে, শিখাটা হাওয়ায় কাঁপছে তিরতির করে। যাব? ট্রেন ছেড়ে দেবে না তো?

মনে হয় না। তা ছাড়া তেমন তেমন বুঝলে সামনে যে কম্পার্টমেন্ট পাব উঠে পড়ব। যাবার মধ্যে যাবে কটা নারকোল আর মানকচু। এমনিতেই বেশিরভাগ সময় ওগুলো পড়েই থাকে, কাউকে না কাউকে ধরে দিয়ে দিতে হয়।

অন্ধকারে গুটিগুটি এগোচ্ছি, হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তে সামলে নিলাম।

—দেখবেন। কে যেন অন্ধকার থেকে বলে উঠল।

মুখ ফিরিয়ে দেখলাম, অন্ধকার নিশ্ছিদ্র নয়, দু'খানা বিড়ির আগুন জ্বলছে নিবছে। এগিয়ে দেখলাম উবু হয়ে মুখোমুখি বসে দু'জন বিড়ির আগুনে গা সেঁকছে।

একটু ইতস্তত করলাম। মুটে-মজুর গোছের লোক। বলব? শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললাম, একটু আগুন হবে?

জবাব না দিয়ে একজন দেশলাইয়ের প্যাকেট বাড়িয়ে দিল। তিনখানা কাঠি খরচ করেও যখন সিগারেটটা ধরল না, ভাবলাম ফিরিয়ে দিই। দেশলাইটা এগিয়ে দিতে গিয়ে দেখলাম অন্ধকারে দু'জনে আমার দিকেই তাকিয়ে আছে।.

—ভিজে গেছে, জ্বলবে না। বিড়ি চলবে?

বাড়ানো হাতে বিড়িখানা গুঁজে দিয়ে নিজেই দেশলাই জ্বালিয়ে হাওয়া আড়াল করে ধরিয়ে দিল একজন। দেশলাইয়ের আগুনে দেখলাম মুখভর্তি বসন্তের দাগ, খেটে খাওয়া একটা মানুষ। বিড়িতে দুটো টান দিয়ে পকেটে হাত ঢোকাচ্ছি, অন্যজন বলল, নেশার দাম নিই না বাবু।

ঢোঁক গিলে হাত বের করে নিলাম। থাক্, চাওয়ালা এদিকে এলে দু'জনকে চা খাইয়ে দিলেই হবে।

বসে বসে কোমর ধরে গেছে, একটু পায়চারি করে নিলে হাত-পাগুলো ছাড়বে। এগুতে গিয়েই সামলে নিলাম। আর একটু হলেই আবার হোঁচট খাচ্ছিলাম। পেছন থেকে ওদের একজন বলে উঠল, দেখে পা ফেলবেন বাবু, হাজার হোক, মানুষ তো।

মানুষ! ঝুঁকে পড়ে কাপড়ে জড়ানো জিনিসটা দেখতে দেখতে বললাম, কী এটা?

—মানুষ বাবু। বডি। রেলে কাটা পড়েছে। আমরা ডোম, নিয়ে যাচ্ছি।

দু'পা পিছিয়ে এলাম। বডি?

ডেডবডি? ওরা নিয়ে যাচ্ছে? ওরা ডোম? ওদের দেওয়া বিড়ি আমার ঠোঁটে?

গা গুলিয়ে উঠল। ফেলে দেব? ওরা যদি দেখতে পায়? যদি ভাবে, ডোম বলে ঘেন্না করছে? বিড়িটা মুখ থেকে হাতে নিলাম। ওদের অলক্ষ্যে ফেলে দিলেই হবে।

বডিটা পাশে রেখে দু'জনে এমনভাবে বসে রয়েছে, যেন একবাক্স গয়না। উঠে গেলে কেউ নিয়ে যাবে।

—এইখানে, এই স্টেশনেই ঘটল?

—না বাবু, নতুন গাঁয়ে কাটা পড়েছে। দু'শো ছাপ্পান্নয়।

দু'শো ছাপ্পান্ন? ট্রেনের নম্বর। রেলের লোক এইভাবেই বলে। এরাও রেলের কর্মচারী। ডেডবডি নিয়ে মর্গে পৌঁছে দিয়ে তবে এদের ছুটি। নতুন গাঁ? ভাবতেই গা হিম হয়ে গেল। নতুন গাঁর পরে মাঝে দুটো স্টেশন, তারপর আমি উঠেছি। তার মানে ঝড়-বৃষ্টি-অন্ধকার তার সমস্তটা, প্রতিটি মুহূর্তে ও আমার সঙ্গে ছিল! এক ট্রেনে। হয়তো এক কম্পার্টমেন্টে।

কিন্তু তাই যদি হবে তা হলে ওকে নামাল কেন? অন্ধকার প্ল্যাটফর্মে নামিয়ে তারপর যদি উঠতে না পারে? ট্রেন ছেড়ে চলে যায়? এই জনমানুষহীন স্টেশনে আসা নিশ্চয়ই ওদের উদ্দেশ্য ছিল না? লোকগুলো খামোখা ভয় দেখাচ্ছে না তো?

জিজ্ঞেস করলাম, তা শুধু শুধু নামালে কেন বৃষ্টি বাদলার মধ্যে? নামানো আবার তোলা! হুট করে ট্রেন ছেড়েও তো দিতে পারে!

হাসল একজন। চকচকে দাঁত ঝলসে উঠল।

—না বাবু, আমাদের ফেলে ট্রেন যাবে না। ভিজে চুপসে ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে দুজনে একটু বিড়িতে টান দিতে নামলাম। তা ভাবলাম, মানুষটা একা পড়ে থাকবে, অন্ধকারে কে কখন মাড়িয়ে দেয়! উঃ বলে যে চেঁচিয়ে উঠবে, সে ক্ষমতাটুকুও যদি থাকত!

অন্ধকারের আড়ালে দুটো মানুষ বসে আছে, পাশে শোয়ানো ওদের সহযাত্রী। পরম যত্নে সমস্ত ব্যথা-যন্ত্রণা থেকে আড়াল করে নিয়ে যাচ্ছে ওরা। ওরা কারা?

আমাদের টুকরো টুকরো কথার পেছনে যেন চাপা পড়েছিল, হঠাৎ চাপা গোঙানির মতো সেই আওয়াজ দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনের অবয়ব ডিঙিয়ে উঠে এল। ইঞ্জিনের আওয়াজ, চাওয়ালা বলে গেল; ইঞ্জিন কি দেখতে পেয়েছে ও? না। অথচ এই অপার্থিব অন্ধকারের সঙ্গে মিশে থাকা ক্ষীণ ওই আওয়াজকে ও চেনে। ও জানে রেললাইনের ওপারেই ও আছে, দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনের আড়ালে। স্থির, কিন্তু অমোঘ।

দৃষ্টি ফিরিয়ে আনলাম সামনে, কাপড়ে জড়ানো ও পড়ে রয়েছে। ওকে কি দেখা যাচ্ছে? খণ্ডবিখণ্ড অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে ও কি সামনে এসে দাঁড়িয়েছে? শবদেহের পূতিগন্ধে কি ভরে গেছে চারিধার? কিছুই নয়।

কিন্তু আমি জেনে গিয়েছি ও আছে। ও ছিল। নৈঃশব্দ্যের সঙ্গে, অন্ধকারের সঙ্গে লীন হয়ে ও ছিল। শুরু থেকেই ও আছে। বাকি পথটুকু সঙ্গী হয়েই ও যাবে।

মা ফিরিয়ে দিয়েছে। ফিরে যাচ্ছি অপর্ণা ও পিউর কাছে। কোথায় যাচ্ছি আমি? কতটুকু জায়গা পড়ে রয়েছে আমার জন্যে?

শুরু নয়, শেষও নয়। রয়ে গেছে এক সামান্য যাত্রা। এই যাত্রাপথে তাকে নিয়েই আমায় চলতে হবে। সে আমার নিত্যসঙ্গী, এক অনন্য সহযাত্রী।

জিকে

প্রথম দৃশ্য

সমীরণের বসবার ঘর। সোফা ডিভান-অয়েলপেইন্টিং সেন্টার টেবিল না থাকায় ড্রয়িংরুম বলা যাচ্ছে না। টিভি আছে, টিভি রাখবার তেকোনা টেবিল আছে, টেবিলের পেটে একমাসের খবরের কাগজ আছে, যেগুলো মাসের তেইশ তারিখ মিতালি বিক্রি করে। তা ছাড়াও দেয়ালে একফুট বাই আট ইঞ্চি একটা পলেস্তারা খসে যাওয়া আছে, ছাদে বর্ষার জলের দাগ আছে, বসবার ঘর থেকে রান্নাঘরে যাবার মুখে জল আটকানোর জন্য সিমেন্টের একটা ধাপ আছে, যেটায় মিতালি এখনও, এই ভাড়াবাড়িতে তিনবছর আটমাস কাটাবার পরও হোঁচট খায়।

সমীরণ কাগজ পড়ছিল। সন্ধেবেলা অফিস থেকে ফিরে হাতমুখ কচলে ধুয়ে লুঙ্গি পরে (ছি ছি লুঙ্গি ভদ্রলোক পরে?—মিতালি বিয়ের পরে পরে বলত, আজ বছর আষ্টেক বন্ধ করেছে) চেয়ারে পা তুলে বাবু হয়ে বসে সমীরণ প্রায় বাসি কাগজটায় চোখ বোলাচ্ছিল। গত শীতে হঠাৎ ঠাণ্ডা বসে কাশি ও তৎসহ থুথুতে কয়েকফোঁটা রক্ত সমীরণের তর্জনী ও মধ্যমার মাঝখান থেকে পঁচিশ বছরের সঙ্গী সিগারেট কেড়ে নিয়েছে। মিতালি দয়া করে চাটুকু দিচ্ছে। সেটাও বাদ গেলে সমীরণের সমস্ত দিনটায় এক বিন্দু বিলাসিতা এই সন্ধের আয়েশটাও চটকে যাবে।

সবচেয়ে বড় প্রাণী, লার্জেস্ট অ্যানিমেল কী বলো তো বাবা?

টুকটুক কখন গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে খেয়াল করেনি। কাগজের পাতাজোড়া খুন, ধর্ষণ, রাজনীতি, অর্থনীতি সারাদিনের ক্লান্তি ও জীবনযাপনের বিমর্ষতা একঝলকে মুছে যায় সমীরণের চোখ থেকে। দৃষ্টিতে সেটাই উঠে আসে যাকে অভিধানে বলা হয় স্নেহ।

সমীরণ হাসে, হাতি?

—আউট, ব্লু হোয়েল।

নীল তিমি? সমুদ্রও নীল, তিমিও নীল। সেই সমুদ্রে তিমি। নীলের কি আলাদা আলাদা শেড? হবে নাই বা কেন? আকাশ নীল, সমুদ্রও নীল, তবু পুরীর সৈকতে দাঁড়িয়ে সমুদ্র আর আকাশকে আলাদা করে চিনতে তো কষ্ট হয়নি সমীরণের। এবং মিতালির। ওদের বিয়ের বয়স তখন তিনমাস। আজ এগারো বছর পরেও সমীরণ জানে, সমীরণ এবং মিতালির মতো, আকাশ ও সমুদ্রকে আলাদা করতে কোনও অসুবিধা হবে না।

—শার্ক হোয়েল কোথায় থাকে বলতে পারো?

শার্ক? মানে হাঙর? ভাবনাটা ইংরেজি থেকে বাংলায় নামালেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে সমীরণ। হাঙর মানে জ-স! সেই সিনেমাটা। কিন্তু শুধু শার্ক নয়, শার্ক হোয়েল।

হাঙর-তিমি। নাকি তিমি-হাঙর? সমীরণ ঘাড় নাড়ে।

—পাস? অস্ট্রেলিয়ার ওয়েস্ট কোস্ট-এ।

অস্ট্রেলিয়া? ভূগোল বই, ম্যাপ। প্রশান্ত মহাসাগর। ক্যাঙ্গারু, কিলিমাঞ্জারো। না, না কিলিমাঞ্জারোটা বোধহয় আফ্রিকায়।

অস্ট্রেলিয়ায় আর কী কী আছে? ক্রিকেট, ডন ব্র্যাডম্যান। তিনিও তো আর নেই। চেয়ারে কাত হবার চেষ্টা করে সমীরণ।

হেরে গিয়েছে সমীরণ। জিতে বড় বড় পা ফেলে ভেতরের ঘরে চলে গেছে টুকটুক। এই খেলাটায় রোজ হারে সমীরণ। খেলতে বসলে মিতালিও। লুডো খেলতে গিয়েও যে মিতালি হেরে গেলে চোট্টামি করে আঙুলের ঠেলায় কাঁচাঘুঁটি পাকিয়ে দেয়, সেই মিতালিও হেরে গিয়ে আনন্দে ডগমগ করে। উঠে গিয়ে পাঁউরুটি আর ডিমসেদ্ধ বানিয়ে টুকটুকের কাছে গিয়ে চোখ পাকায়, একটুও ফেলবে না কিন্তু। সমীরণের পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে চোখ দিয়ে বলে যায়, দেখেছ? চোখে সকাল বিকেল আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অহঙ্কার পরে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

আজ টেস্ট নিচ্ছিলাম, জানো তো? সবকটা লার্জেস্ট, টলেস্ট, লংগেস্ট, স্মলেস্ট ওর মুখস্থ। একটাও ভুল করল না।

স্মলেস্টগুলো জানে সমীরণও। বাজারের থলি, যেটায় আড়াইশো গ্রামের বেশি মাছ ধরে না। মাসকাবারে কয়েকটা কাগজের টুকরো, যা মাসের কুড়ি তারিখের মধ্যে ভোকাট্টা হয়ে উড়ে যায়। ছোট ছোট ইচ্ছে, নিজেদের বাড়ি, একবার গোয়া বেড়াতে যাওয়া, মিতালির জন্য একটা ওয়াশিং মেশিন। জানে না, কিন্তু কল্পনায় দেখতে পায়, লার্জেস্ট ওশান প্যাসিফিকের ওপার থেকে ঘুমের দেশ পেরিয়ে উঠে আসবে সূর্য, এই রাত্রিটুকু পার হলে। টলেস্ট পিক্ মাউন্ট এভারেস্ট-এর মাথায় এই নিস্তব্ধ রাত্রিটিতে জমে উঠছে, বরফ, এভারেস্ট কি উচ্চতর হচ্ছে?

উত্তর দিল না সমীরণ। সমীরণও দেখেছে। সবচেয়ে উঁচু পাহাড়, সবচেয়ে বড় নদী, সবচেয়ে চওড়া আকাশ, সমীরণের মাঝে মাঝে মনে হয় ওই সবচেয়ে বড়রা টুকটুকের সঙ্গে পরামর্শ করেই যেন ওইসব হয়েছে।

মিতালির নিশ্বাসের গন্ধ পায় সমীরণ,—হ্যাঁগো, ওটার দাম করেছ?

এবারে সমীরণ দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে; গোপনে, নিঃশব্দে।

—তিরিশ হাজার।

—তিরিশ? আর্তনাদের মতো শোনায় মিতালির স্বর।

—হ্যাঁ, অ্যাব্রিজডটা। আসলটা কুড়ি ভল্যুম, লাখের কাছাকাছি।

চুপ করে যায় মিতালি। ভাবনা একটা নয়। কুড়ি ভল্যুম এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা আনলেই তো হল না, সেগুলো রাখবার জায়গা চাই। বইয়ের র‍্যাক বানাতে হবে একটা। র‍্যাকটাও ধরাতে হবে এই প্রকোষ্ঠের পেটের মধ্যে।

কিন্তু আনতে যে হবেই। এনসাইক্লোপিডিয়া। জ্ঞানের আধার। একবার শুধু কষ্ট করে কটা ভল্যুম টুকটুকের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া। ব্যস আর চিন্তা নেই।

—অবশ্য সবই তো টুকটুক শেষ অবধি পুষিয়ে দেবে, বলো?

মনে মনেই ঘাড় নাড়ে সমীরণ। বলে, শেষ তিনটে যদি নাও পারে, দশ লাখ তো বাঁধা।

—তোমার না বড্ড ছোট মন। না পারে! কেন? না পারার কথা ভাবছ কেন? ওই ছেলেটা যদি পারে, টুকটুক পারবে না কেন?

অকাট্য যুক্তি। ওই ছেলেটা। পড়ছিল। আই পি এস-এর প্রিপারেশন। হঠাৎ কী খেয়াল হল, হাত বাড়িয়ে একটা ফোন। তারপর টিভি। তারপর এককোটি।

সৌরভ-বিশ্বনাথন আনন্দ-তেন্ডুলকার-লিয়েন্ডার। একটা একটা করে সমস্ত ছবি টুকটুকের পড়ার টেবিল থেকে তুলে নিয়েছে মিতালি। এখন একখানাই ছবি, টেবিলজুড়ে। হাসি, এক কোটি যার দাম।

ফোনে একবার ট্রাই করবে নাকি? সমীরণ ফিসফিস করে।

—পাগল? এখনও প্রিপারেশনই হয়নি। সবকিছুর একটু প্রস্তুতি আছে। ঠিকমতো প্রিপেয়ার্ড হয়ে তবেই না যাবে টুকটুক। এখনই এই আনপ্রিপেয়ার্ড অবস্থাতেই ওকে এক্সপোজ করে তারপর যদি নার্ভাস হয়ে যায়? না পারে? কতখানি শকড হবে ভেবেছ? তা ছাড়া কেউ না পারলে তাকে চান্স দেয় না শুনেছি।

দম নেবার জন্যে থামে মিতালি। তারপর বলে, দেখো, আমাদের টুকটুক যখন মাঠে নামবে, কেউ ওকে আটকাতে পারবে না। নেমেই সেঞ্চুরি।...হ্যাঁগো, এক কোটি থেকে কত যেন ট্যাক্স কাটে?

এক কোটি? বুকের আওয়াজ শুনতে পায় সমীরণ। হাত ঘামে। বাথরুম পেয়ে যায়। উঠে হালকা হয়। জিভ শুকিয়ে আসে। ঢকঢক করে জল খায় আধ জাগ। মিতালির পাশে শুতে শুতে দেখতে পায় মিতালি তখনও জেগে; সামান্য দূরে ছাদ, সেদিকে অথবা ছাদ ছাড়িয়ে দূরে দৃষ্টি, সে দৃষ্টিতে সমীরণ নেই।

তৃতীয় দৃশ্য

মিতালির পাঁচু কাকাকে সমীরণ চিনতে পারেনি। পাঁচু কাকাই সমীরণকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি মিতুর, মানে মিতালির বর, না?

চুয়াল্লিশ বছরে বর-টর বললে যতখানি লজ্জা পাবার কথা, ততখানিই লজ্জা হাসিতে এনে কেশে সমীরণ বলল, আপনাকে তো ঠিক মানে...

—চিনতে পারছ না। এতে লজ্জার কী আছে? দেখা তো সেই বিয়ের সময় আর শ্বশুরের শ্রাদ্ধে। যাই হোক, মিতুল আছে কেমন? বাচ্চাটাচ্চা? কটি যেন তোমার?

একটু গায়ে পড়া ভাব। যেচে আলাপ করলেন। ডাকলেনও সটান তুমি করে। কিন্তু সবকিছুতে এমন একটা আন্তরিকতা আছে, কেটে সমীরণ বেরিয়ে আসতে পারছিল না।

—ছেলে, একটিই, ক্লাস সিক্স, সেন্ট জর্জ।

—বাঃ বাঃ, বেশ বেশ, ছোট সংসার, সুখী সংসার। ইংলিশ মিডিয়াম। চমৎকার। আজকাল বাচ্চারা খুব চটপটে আর স্মার্ট হয়। বেশ বলিয়ে কইয়ে। যাব একদিন। মিতুলকে বোলো। দাদুভাইয়ের সঙ্গেও আলাপ করে আসব। তোমরা রোববার বাড়িতে থাকো তো?

ঘাড় নাড়ল সমীরণ। ইলেকট্রিক বিল জমা দেওয়া হয়ে গিয়েছিল। অনর্থক গ্যাজর

গ্যাজর করে অফিসে দেরি হয়ে যাচ্ছিল। তাহলে আসি বলে এগোতে যাবে, খপ করে হাত ধরে ফেললেন পাঁচুকাকা—যাব যে, তোমাদের ঠিকানাটা দিলে কই?

বিরক্তিটা চোয়ালে চিবিয়ে আরও পাঁচটা মিনিট খরচ করতে হল সমীরণকে। বাড়ি ফিরে সন্ধেবেলা বলল মিতালিকে।

—ও মা, পাঁচুকাকা? তোমাকে চিনতে পারল?

মিতালির উচ্ছ্বাস দেখে জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে সমীরণ জিজ্ঞেস করল, কে এই পাঁচুকাকা?

ভীষণ ভাল মানুষ। এককালে স্বদেশি করেছেন, ভাল চাকরি করতেন, ছেড়ে দিয়ে ইস্কুল করেছেন। শুনেছি এখন আর তেমন কিছু করেন না। বিয়ে থা করেননি। সংসারের দায় নেই। এর ওর খোঁজ নিয়ে বেড়ান।

—এখন চাপতে আসছেন তোমার ঘাড়ে।

—ও রকম করে বোলো না গো। আমার বাবা কিছুদিন পাঁচুকাকার বাবার কাছে কাজ শিখেছেন। নিজের না হলেও নিজের চেয়ে কিছু কম নন। তুমি আসতে বলেছ তো?

হ্যাঁ বলে সমীরণ ভাবল, বলেনি, বলাটা আদায় করে নিয়েছেন পাঁচুকাকা।

চতুর্থ দৃশ্য

আলমারি এসে গেছে।

—বসার ঘরেই ভাল, লোকজন এসে দেখবে, কী বলো?

তা ঠিক। সমীরণ লক্ষ করেছে। ভূষির ব্যবসায়ীর বাড়িতেও রবীন্দ্রনাথ পঁচিশ ভল্যুমে বসার ঘরে বিরাজ করেন। এনসাইক্লোপিডিয়া। আড়ালে লুকিয়ে রাখলে তো হয়েই গেল! পারলে সমীরণ গলায় লকেট করে ঝুলিয়ে রাখত।

বই এবং আলমারি। ফলে ঘরটা আরও ছোট হয়ে গেল। আনমনে অন্ধকারে হাঁটতে গেলে ঠোকাঠুকি। তা হোক, ও রকম ঠোকাঠুকিতে সমীরণ বা মিতালির কোনও আপত্তি নেই। ব্যথাট্যথাও লাগে না তেমন। বরং আলমারির গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়, আহা, লাগেনি তো!

এবং টুকটুক, পড়ে চলেছে টুকটুক। পড়েই চলেছে। বড় বড় বইয়ের আড়ালে টুকটুক ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। ডুবে যাচ্ছে। আবার ভেসে উঠছে। একটার পর একটা বইয়ের গন্ধমাদন শেষ করে নতুন নতুন পাহাড় জয় করতে চলেছে টুকটুক। ক্লান্তি নেই।

ছোটখাটো দুয়েকটা রিটার্নও আসতে শুরু করেছে। ক্লাস-এ ইংলিশে ফিফটি ফাইভ, বেঙ্গলি ফর্টিফোর, ম্যাথস থার্টি নাইন। হিস্ট্রি সেভেনটি ফোর। জিওগ্রাফি এইট্টিটু। আর জিকে...হান্ড্রেড। হান্ড্রেড আউট অফ হান্ড্রেড। প্রগ্রেস রিপোর্টটা দু আঙুলে নাচাতে নাচাতে এনে মিতালি খাটের ওপর ফেলেছিল। শাড়ির আঁচলে ঘাম মুছে বলেছিল; দেখেছ?

ততক্ষণে দেখে নিয়েছে সমীরণও।

—কিন্তু ম্যাথস্ এ যে অত কম...?

—রাখো তোমার ম্যাথস্। ম্যাথস্ কী দেয়? কোটির কথা ছেড়েই দাও হাজারও কি দিয়েছে কারোকে? ম্যাথস্ নয়, জিকে, জিকেটা দ্যাখো।

দেখেছিল সমীরণ, দেখেই যাচ্ছিল।

একটা ক্যুইজ কনটেস্ট হল। পাড়ায়। ফার্স্ট রাউন্ড, সেকেন্ড রাউন্ড, থার্ড রাউন্ড, সেমিফাইনাল। রুদ্ধশ্বাসে বসে আছে সমীরণ-মিতালি। ফাইনাল। সীতার অন্য নাম কী? পারল না টুকটুক। প্রাইজ দেবার সময় কাউন্সিলার স্থানীয় আটাকলের মালিক, পকেট থেকে একশো টাকার নোট বের করে পিন্ দিয়ে আটকে দিলেন টুকটুকের বুকে। প্রধান অতিথি, প্রাইমারি হাইস্কুলের হেডমাস্টার অশ্বিনী ভট্টাচার্য কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, চাইল্ড প্রডিজি।

বাড়িতে এসেও মুখ গোমড়া করে ছিল টুকটুক। মিতালি জড়িয়ে ধরে বলল, দূর বোকা ছেলে, দেখলি না ফার্স্ট হয়ে ওই ছেলেটা পেয়েছে একটা তিরিশ টাকা দামের পেন। আর একটা না পেরেও তুই পেয়ে গেলি একশো টাকা। ওটা দিয়ে তোর নামে একটা অ্যাকাউন্ট খুলে দেব ব্যাঙ্কে।

রাতে সমীরণকে বলল, খাতা খুলল। এই শুরু। এবারে আসবে। স্রোতের মতো, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি। ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টটা কালই খুলতে হবে। ওরা তো চেক-এই পেমেন্ট করে, না গো?

পঞ্চম দৃশ্য

পাঁচুকাকা কিন্তু এসে বেশ জমিয়ে দিলেন।

আগেই ফোন করে জানিয়ে রেখেছিলেন। সমীরণ বাড়িতে ছিল, সকাল সকাল বাজারে গিয়ে খানিকটা চিতলমাছ কিনে আনল। মাসের মাঝামাঝি, বেহিসেবি খরচা। তবু মিতালিই চাপাচাপি করল, মানুষটা খেতে ভালবাসে, আগেকার দিনের লোক তো, তোমাদের মতো পেট পিঠ সমান নয়। চিতলের মুইঠা বানাব, গরম মশলা দিয়ে, টুকটুক ভালবাসে। পারলে কাঁটা ছাড়িয়ে এনো।

সকাল থেকেই রান্নাঘরে ঢুকেছিল মিতালি। মিতালির এই চেহারাটাও অনেকদিন পরে দেখা হয়ে গেল সমীরণের। কৃতিত্বটা পাঁচুকাকারই প্রাপ্য। পাঁচুকাকা ঢুকলেনও বেশ নাটকীয় ভঙ্গিতে। ডান হাতের মাটির হাঁড়িটা মিতালির হাতে তুলে দিয়ে ডানহাতে টুকটুককে কোলে নিয়ে একটা পাক খেয়ে নিলেন দরজার মুখেই। মিতালি হাঁ হাঁ করে ছুটে এল; ও কী করছেন পাঁচুকাকা, ও কি আর ছোটটি আছে, আপনারই শেষকালে পড়ে গিয়ে হাড়গোড় ভাঙবে। হো হো করে হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসা নকল দাঁত জিভ দিয়ে বসাতে বসাতে পাঁচুকাকা বললেন, আবোল তাবোলের সেই শেষ কবিতাটা পড়েছিস মা?

—আবোল তাবোল? টুকটুক চোখ বড়বড় করল।

—আবোল তাবোল পড়োনি? দাঁড়াও বলেই কাঁধের ঝোলা থেকে একখানা আবোল তাবোল বের করে হই হই করে পড়ে যেতে লাগলেন পাঁচুকাকা। সমীরণেরও মনে হল শৈশবটা যেন লাফাতে লাফাতে গ্রাম-গঞ্জ-নদী-নালা পার হয়ে সমীরণের ড্রয়িংরুমে ঢুকে পড়ল এখনই পাঁচুকাকার সঙ্গে।

মিতালি রান্নাঘরের দরজার আড়াল থেকে হাতের ইশারায় সমীরণকে ডাকল। সমীরণ উঠে কাছে যেতেই টেনে রান্নাঘরে ঢুকিয়ে নিল, দেখেছ? সমীরণ দেখল এক

মালসা রাবড়ি।

—রাবড়ির কত দাম গো? কত করে কিলো?

সমীরণ জানে না। এখনও কলকাতায় যে রাবড়ি বিক্রি হয় তাই খেয়াল করেনি কখনও, সেই রাবড়ির কিলো।

—কতখানি এনেছে দেখেছ?

—কেজি দেড়েক হবে।

—বোঝো।

মিতালি গেল পাঁচুকাকার কাছে, করেছেন কি পাঁচুকাকা? অত দাম দিয়ে রাবড়ি টাবড়ি...

—টাবড়ি আর কোথায় আনলাম মামণি। রাবড়ি। আমার খুব প্রিয়। দাদুভাইকে দিয়ো। ওরা তো এই জিনিসের স্বাদ পেল না। আমাকেও দিয়ো খানিক। বুড়োবয়েসে রাবড়ি দেখলে লোভ সামলাতে পারি না।

খেলেনও তেমনি। অতখানি ভাত, মাছের মুড়ো দিয়ে ডাল, বেগুনভাজা, চিতলপেটি, আমড়ার চাটনি, কড়াপাকের দু খানা সন্দেশ খেয়েও না হোক আড়াইশো রাবড়ি সাঁটালেন। সেধে সেধে খাওয়ালেন সমীরণ-মিতালিকেও। টুকটুকের বেলায় মিতালি হাঁ হাঁ করে উঠল। থাক পাঁচুকাকা, ওর আবার পরশু ক্লাশটেস্ট, পেট খারাপ হলে মুশকিল।

খেয়ে দেয়ে বিছানায় আধশোয়া হয়ে পা ছড়িয়েছেন পাঁচুকাকা, গুটিগুটি টুকটুক পাঁচুকাকার কাছে এল।

—দাদু!

—বলো। প্রায় বুজে এসেছিল, জোর করে চোখদুটো খুলে পাঁচুকাকা বললেন।

—তুমি জিকে জানো?

—জিকে? এবারে পাঁচুকাকার চোখ দুখানা পুরোই খুলে যায়।

—হ্যাঁ, জিকে মানে জেনারেল নলেজ।

—ও, তাই বলো, জেনারেল নলেজ। জেনারেল নলেজ কাকে বলে জানো দাদুভাই?

—হ্যাঁ, জিকেটাই তো আমার ফেভারিট সাবজেক্ট। লংগেস্ট, স্মলেস্ট, টলেস্ট, ফাস্টেস্ট এই সবই জিকে।

—ঠিক বলেছ, জিকে মানে সাধারণ জ্ঞান, যে জ্ঞান সবার থাকা উচিত।

—ঠিক আছে। তোমার জিকে কেমন দাদু?

—খুব ভাল নয়, আবার খারাপও নয়, মোটামুটি।

—বেশ, তা হলে বলো তো, রবীন্দ্রনাথের বাবার নাম কী ছিল?

—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তুমি দেবেন্দ্রনাথের লেখা পড়েছ? কী সুন্দর গদ্য? এখনও পড়লে মনে হয় হিমালয়কে যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।

টুকটুক বিরক্ত হয়। জিকের মধ্যে অন্য কিছু এসে পড়লে টুকটুকের মোটেও ভাল লাগে না।

—আচ্ছা, দাদু, তুমি জওহরলাল নেহরুর বাবার নাম জানো?

—কেন জানব না? মতিলাল নেহরু। বিরাট ল-ইয়ার ছিলেন। ওঁর নামে একটা রাস্তা...

—সুভাষচন্দ্র, নেতাজি সুভাষচন্দ্রের বাবার নাম?

—জানকীনাথ বসু। ওঁরা অবশ্য সেইসময় প্রবাসী বাঙালি ছিলেন। নেতাজি কটকের র‍্যাভেনশ কলেজ থেকে...

—জর্জ বার্নাড শ?

—অ্যাঁ? বিষম খেলেন পাঁচুকাকা।

খাটের কোনায় পা মুড়ে বসেছিল মিতালি। কাছেই একটা মোড়া পেতে সমীরণ। সমীরণের বুকের মধ্যে রক্ত ছলাত করল, মিতালি ঠোঁটের কোনায় মৃদু হাসি। খেলাটা শুরু হয়েছে। পেরেন্টস্। ওটাই লেটেস্ট চ্যাপ্টার। যত গ্রেট মেন তাদের বাবা। কারও কারও মা-ও। সমস্ত ঠোঁটস্থ টুকটুকের। আজ পাঁচুকাকার কপাল খারাপ।

—বলছি, জর্জ বার্নাড শ'র বাবার নাম কী?

—জানি না তো!

—নেপোলিয়ান? নেপোলিয়ান বোনাপার্ট-এর বাবার নাম?

—এটাও জানি না, ঠোঁট উলটে বলেন পাঁচুকাকা।

নিষ্ঠুর একটা হাসি খেলে যায় টুকটুকের মুখে, স্যার অ্যালবার্ট আইনস্টাইন, দ্য ফেমাস সায়েনটিস্ট, তাঁর বাবার নাম জানো দাদু?

পাঁচুকাকা এলিয়ে পড়েন। ঘনঘন ঘাড় নাড়তে থাকেন, না, দাদুভাই, জানি না, জানি না।

উল্লাসে চোখ চকচক করতে থাকে টুকটুকের। শিকারি শিকারকে কোণঠাসা করে ফেলেছে। এবারে শেষ অস্ত্রের ঘা, সেটাই ঝুলি থেকে বের করতে যাবে টুকটুক, হঠাৎ পাঁচুকাকা উঠে বসলেন।

—আমি তোমাকে দু'চারটে প্রশ্ন করতে পারি দাদুভাই?

—ওহ্ সিওর, ঘাড় কাত করে তাকায় টুকটুক।

পাঁচুকাকা চোখ ছুঁচলো করে তাকালেন টুকটুকের দিকে,

—আচ্ছা, দাদুভাই, বলো তো তোমার বাবার নাম কী?

—শ্রী সমীরণ আচার্য।

—ভেরি গুড, আজকাল তো ছেলেরা বাবার নামের আগে শ্রী-ট্রি বসায় না। বেশ, তা হলে বলো তোমার মায়ের নাম কী?

—শ্রীমতী মিতালি আচার্য।

—ফুল মার্কস। একটু থামলেন, পাঁচুকাকা, তারপর টুকটুকের কাছে মুখ নামিয়ে বললেন, বলো তো এবার, তোমার বাবার বাবার নাম কী?

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে টুকটুক, তাকায় মিতালির দিকে।

মিতালি ঝাঁপিয়ে পড়ে, ও ওর ঠাকুর্দার নাম কোথা থেকে জানবে পাঁচুকাকা, তিনি তো শেষ এসেছিলেন ওর তখন চারবছর বয়েস। যোগাযোগই নেই, দেখা সাক্ষাৎ হয় না। ওর আর দোষ কী?

—বেশ। আবার বললেন পাঁচুকাকা, তা হলে দাদুভাই বলে ফেলো তোমার মায়ের বাবার নামটা।

টুকটুকের মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায়, টোকা দিলেই ওর দু-চোখ বেয়ে ঝরঝর করে জল ঝরে পড়বে। ওকে কোলে টেনে নিল মিতালি।

—আপনি না পাঁচুকাকা...আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না। আমার বাবা সেই কবে

কোনকালে মারা গেছেন, ওর কি আর মনে আছে?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, পাঁচুকাকা, মিতালির দিকে ফিরে বললেন, খুবই ন্যায্য কথা, তোমার ছেলে তার ঠাকুর্দা-দাদামশাইকে দেখেনি। নামও জানে না সেইজন্যেই। তা মা মিতালি, নেপোলিয়নের বাবা বার্নার্ড শ'র বাবা, আইনস্টাইনের বাবা, এদের সঙ্গে তোমার ছেলে কি রোজ বিকেলে লেকের ধারে হাওয়া খেতে যায়?

আগুন চোখে তাকাল মিতালি। পাঁচুকাকা দেখেও দেখলেন না। উঠে চলে গেল টুকটুক। পেছন পেছন মিতালিও। দু' একটা এলোমেলো কথার পর পাঁচুকাকা বিদায় নিলেন। সমীরণ ভাবল, ভাগ্যিস পাঁচুকাকা মিতালির কাকা, সমীরণের নন, নইলে আর রক্ষা ছিল না।

অন্তিম দৃশ্য

রাত ঘন হয়েছে। অনেক ডাকাডাকি করেও খাওয়ানো যাচ্ছে না টুকটুককে। শেষ অবধি মিতালি গিয়ে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে বলল, অনেক রাত হয়েছে বাবা, খাবি চল্।

টুকটুকের চোখ লাল। সমীরণের পাশে দাঁড়িয়ে। মার দিকে চোখ তুলে অনেকক্ষণ পর টুকটুক বলল, মা, আমি যে দুটো বাবা বলতে পারলাম না।

জড়িয়ে ধরল মিতালি, কপালে ঠোঁট ছোঁয়াল। ফিসফিস করে বলল, চিন্তা করিস না সোনা, অত কঠিন প্রশ্ন আসবে না।

পরিযায়ী

তিনজনের দিকেই একে একে তাকালেন শ্রীময়ী। বড় আনন্দ সোফায় হেলান দিয়ে বসা, দু'পা-ই সামনে টান টান ছড়ানো, ফর্সা মুখটা ঈষৎ লাল, উত্তেজনায়, অবশ্য নিয়মিত মদ্যপানেও হওয়া অসম্ভব নয়, প্রাইভেট এয়ারলাইনস-এ ওর পদাধিকার কিছু কর্তব্যের জন্ম দেয়। তার মধ্যে একটি সপ্তাহান্তে ক্লাব বা পার্টিতে হাতের পাঁচ আঙুলে একটি সফেন পানপাত্র ধারণ, কিন্তু সভ্যতা, যার অন্য নাম আবরণ, তা-ই আনন্দকে অনুভূতি আড়াল করতে শিখিয়েছে, অতএব সামান্য উত্তেজনার আঁচটুকু ছাড়া অবশিষ্ট সমস্ত কিছুই আপাতত অন্তরালে।

আলোক অবশ্য চেহারা ও চরিত্রে আনন্দের বিপরীত। টানটান পেটানো চেহারা, চৌকো চোয়াল ও ঝাঁকড়া চুলে ওর স্পোর্টিং ইউনিয়নের হয়ে চারখানা সেঞ্চুরি এখনও ছাপমারা রয়েছে। দাদার মতো অনুভূতিকে গোপন করার চেষ্টাও ও করছে না। জানালার ধারে একটা চেয়ার টেনে পা দুটো তুলে দিয়েছে সামনের মোড়ায়। আঙুলের ফাঁকে জ্বলতে থাকা সিগারেটের ধোঁয়ায় সমস্ত দায়িত্বই ও উড়িয়ে দিচ্ছে বাইরে।

আর্তি মাটিতে হাঁটু মুড়ে বসে। ওর দেড় বছরের মেয়ে পুটুস একটা পুতুলের পেট টিপে গান বের করার চেষ্টা করছে। 'দিদির পুতুল নষ্ট কোরো না পুটুস' বলে মাঝে মাঝে ওর হাত থেকে কেড়ে নেবার নকল চেষ্টা করছে। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে আর্তি। অবশ্য সে ক্ষমতাও ওর বিশেষ নেই। শ্বশুরবাড়িতে কথাটা হয়তো তুলেছিল। অথবা তুলতে হয়নি, ঢেউয়ে ঢেউয়ে কথাটা পৌঁছেছিল। তৎক্ষণাৎ নাকচ হয়ে নেমে এসেছে। তাতে ওর অসহায়ত্বটা কমেনি।

চতুর্থজন, অণিমা আজ উপস্থিত নেই। শ্রীময়ী যখন ফোন করেছিলেন, অণিমা থাকবেন না বলেননি শ্রীময়ীকে। আজ দোতলায় উঠে ডাকাডাকি করতে ছেলে-মেয়েরা এগিয়ে এল। মা নেই দেখে শ্রীময়ী জানতে চেয়েছিলেন। আনন্দ জবাব দিয়েছিল আজ কী যেন পুজো আছে, মা আশ্রমে গেছে।

অণিমা নেই, কিন্তু শ্রীময়ী বুঝতে পারেন, আনন্দ আলোক এবং আর্তির মধ্যে, ওদের সমস্ত প্রশ্ন ও উত্তরের মধ্যে অণিমার প্রবল উপস্থিতি। তাই সবাইকে ড্রয়িংরুমে ডেকে বসিয়ে কথা শুরু করার আগে শ্রীময়ীর এটাই মনে হল যে একটা ছায়াযুদ্ধ শুরু হতে চলেছে। আর যে কোনও যুদ্ধে, প্রতিপক্ষকে সামনে না পেলে যা হয়, যুদ্ধটা শুরু হবার আগেই শেষ হয়ে যায়, শ্রীময়ীর সেরকমই একটা পরাজয়ের অনুভূতি হল।

তবু, কথাগুলো না বললেই নয়, আর আজ রবিবার, মাঝে একটা মাত্র দিন, ভেবে কার্পেটের ওপর থাবা গেড়ে বসে থাকা নভেম্বরের রোদ্দুরের দিকে তাকিয়ে কথাটা শুরু করে দিলেন শ্রীময়ী।

—খবরটা ধরে নিচ্ছি তোমরা পেয়েছ। তা হলেও আমার কর্তব্য তোমাদের জানানো। তোমাদের বাবা আমাকে একটা চিঠি লিখেছেন। কেন তোমাদের না লিখে

আমাকেই লিখলেন আমার জানা নেই। আমার সঙ্গে তাঁর তো কোনও যোগাযোগও বহুকাল ছিল না। হতে পারে ঠিকানাটা হঠাৎ-ই খুঁজে পেয়েছেন। যা-ই হোক আমি চিঠিটা সঙ্গে নিয়ে এসেছি। তোমাদের সামনেই পড়ে শোনাচ্ছি। ছোট চিঠি পড়তে বেশিক্ষণ লাগবে না।

কারও তেমন ভাবান্তর লক্ষ করা গেল না। চশমার খাপ খুলে চশমা বের করে চিঠিটা পড়তে শুরু করলেন শ্রীময়ী।

—বহুদিন যোগাযোগ না রাখার জন্য প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। জানি খুবই অবাক করে দিয়েছি, কিন্তু সেটা যে আমার স্বভাব, তুমি তো জানোই। একটা আশ্রমে ছিলাম। ধর্মের আশ্রম নয়, কর্মের আখড়া,—ধর্মে আমার কোনওদিনই মতি নেই সেটাও তোমার অজানা নয়। এখন অথর্ব হয়েছি। কর্মে আর সামর্থ্য নেই। চাইলে এরা আমাকে রাখবে। কিন্তু গলগ্রহ হয়ে থাকতে ইচ্ছা করে না। তা ছাড়া অকাজের লোক কাজের জায়গায় পড়ে থাকবেই বা কেন? এককালে যখন সামর্থ্য ছিল দু হাতে উড়িয়েছি। এখন হোটেলে বা বাড়িভাড়া করে একা থাকব সে সঙ্গতিও নেই। তোমার ঘাটে নৌকা ভেড়াব বলে মনস্থির করেছি। ভাইফোঁটা পর্যন্ত উৎসব, তারপর সব ঝিমিয়ে যায়। তাই সাতই নভেম্বর মঙ্গলবার ভাইফোঁটার পরদিন তোমার কাছে পৌঁছব। দিল্লি থেকে যাচ্ছি, রাজধানী এক্সপ্রেস-এ, কাউকে স্টেশনে পাঠালে বড় উপকার হয়।

চিঠিটা শেষ করে চুপ করে রইলেন শ্রীময়ী। সম্ভাষণের জায়গাটা ইচ্ছে করেই পড়েননি। শ্রীময়ী বড্ড খটোমটো নাম, আমি সুন্দরী বলে ডাকব, প্রথম আলাপেই বলেছিল। তারপর থেকে জনান্তিকে তো বটেই সর্বসমক্ষেও ওই নামেই ডেকে এসেছে। এতদিন পরে ওদের সামনে সেটা উচ্চারণ করতে বাধো বাধো ঠেকল শ্রীময়ীর।

চিঠিটা একবারই পড়েছিলেন আগে। আজ সকলের সামনে পড়তে গিয়ে আরও কয়েকটা কথা মনে হচ্ছিল। কিছুই নেই, অর্থ নেই, প্রতিপত্তি নেই, শারীরিক ক্ষমতাও চলে গেছে। অথচ অহংকার এতটুকুও মরেনি। চিঠিতে এখনও যে ঔদ্ধত্য। যেন সবকিছুই গ্রান্টেড বলে ধরে নেওয়া। এই যে লিখেছে, রাজধানীতে আসবে, স্টেশনে কেউ থাকলে ভাল হয়, এটাও যেন একটা অধিকারের দাবি। যেন জেনে বসে আছে, ইচ্ছেটা প্রকাশ করলেই হল—পাদ্যঅর্ঘ্য দিয়ে বরণ করে নেবার জন্য কেউ না কেউ হাওড়া স্টেশনে ঠিক দাঁড়িয়ে থাকবে।

অবশ্য সেয়ানাবুদ্ধিও কম নেই। চিঠিটা তাকেই লিখেছে, জানে যে এখনও ঠিক নিজে অথবা কাউকে পাঠিয়ে স্টেশন থেকে তুলে নিয়ে যাবে। যাদের কাছে দাবিটা পেশ করা উচিত তাদের সম্বন্ধে একটা কথাও চিঠিতে নেই।

কিন্তু শ্রীময়ী কি পারেন তাদের না জানিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে? তারাই তো ওর আপন-জন। শ্রীময়ী কে? এমন এক সুতোর মতো সম্পর্ক, যাকে আজকাল লোকে গুরুত্বই দেয় না। শ্রীময়ী বলেই এখনও যাওয়া-আসাটা আছে, অন্নপ্রাশন, বিয়ে-পৈতের যোগাযোগ আছে। শ্রীময়ী বলেই চিঠি পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ওদের সবার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। চিঠি পড়া হয়ে গেছে। এখন উত্তরের জন্য অপেক্ষা।

তাকিয়ে দেখলেন ছেলেমেয়েদের সামান্য ভাবান্তর হয়েছে। আলোক উসখুস করছে। আর্তির মুখচোখে একটা অসহায়তা, আনন্দ দেয়ালে টাঙানো ঘড়ির কাঁটা গুনছে।

আলোকই শুরু করল।

—আমার দিক থেকে কিছু বলার নেই। মানুষটারও কোনও এক্সিসটেন্স-ই নেই আমার কাছে। কেন যে এতদিন পরে আসছে, কী মতলব আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

—ছিঃ দাদা, আর্তি ধমকে উঠল, ও সব বলতে যাচ্ছিস কেন? জেঠিমার তো কোনও দোষ নেই! চিঠি পেয়েছে কী করবে, আমাদের জিজ্ঞেস করতে এসেছে। একটা সলিউশন বাতলাতে হবে, ভেবেচিন্তে জবাব দে।

—সারাটা জীবন জ্বালিয়েছে, ওই মানুষটার জন্যে আমরা মুখ দেখাতে পারিনি; যেখানেই যেতাম মনে হত লোকে আড়ালে ফিসফিস করছে, বাকিটা শেষ না করেই চুপ করে গেল আলোক।

শ্রীময়ী এবারে মুখ খুললেন, ও তোমাদের উপদ্রব করতে তো চায়নি। চায়নি বলেই আমার কাছে আসছে, তোমাদের জানায়নি। আমি তোমাদের কাছে এসেছি বলে ভেবো না কোনও দায় নিতে বলছি। তোমরা ওর ছেলে-মেয়ে। তোমাদের খবরটা দিতে এসেছি। যাতে ভবিষ্যতে তোমরা কিছু না বলো। হাজার হোক, তোমাদেরই তো বাবা।

—বাবা!

নাক দিয়ে একটা শব্দ করে উঠে ব্যালকনিতে চলে গেল আলোক। বাচ্চাটা কী একটা ধরে টানাটানি করছিল। উঠে গেল আর্তিও। আনন্দ বসে রইল। ওর জন্যই আসা। আনন্দর কথাই আসল। ওর মাথা স্থির। তা ছাড়া আনন্দর কথা মানেই অণিমার কথা।

অন্যমনস্ক চোখে আনন্দ তাকাল শ্রীময়ীর দিকে। ভাবনাটা চোখে বসে আছে, এখনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি।

—তুমি কী ঠিক করেছ? রাখবে?

—কী করব নইলে? ফেলে দেব? তাতে কি কারও সম্মান বাড়বে?

ইচ্ছে করেই 'কারও' বললেন শ্রীময়ী। মুখে এসে গিয়েছিল তোমাদের।

ঘাড় নাড়ল আনন্দ, না, ফেলে দেবার কথা হচ্ছে না। প্রশ্নটা বাড়িতে রাখবে না অন্য কোথাও। হোম টোম। কলকাতায় তো হয়েছে অনেক। আমরাও না হয় ফিনান্সিয়াল রেসপন্সিবিলিটি কিছুটা শেয়ার করলাম।

চুপ করে রইলেন শ্রীময়ী, এইরকম আন্দাজ করেছিলেন। জবাবটাও তৈরি করে এসেছিলেন।

—দেখো, ওর চিঠি পড়ে মনে হয় না খুব কিছু টাকা পয়সার টানাটানিতে রয়েছে ও। ওল্ড এজ হোমে ও নিজেও ব্যবস্থা একটা করে নিতে পারত হয়তো। তা সত্ত্বেও যে আমার কাছে আসতে চাইছে, আমার ধারণা, তার কারণ এখন ও একা হয়ে গেছে। সঙ্গী চাইছে। কথা বলার মানুষ।

মলিন হাসল আনন্দ। বলল, আতশ চৌধুরীরও তা হলে লোনলি ফিলিং হয়, তারও কাউকে কাছে পেতে লাগে। এখন এই জীবনের শেষ প্রান্তে এসে যাকগে, পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে কী লাভ? যখন ঠিক করেই ফেলেছ রাখবে, আর তো কিছু বলার নেই।

শ্রীময়ী গলায় একটু জোর আনলেন, না বলার আছে। আমি যতটুকু বুঝেছি, ও এখানে যে ক'দিন থাকবে তোমাদের বিরক্ত করবে না, এমন হতেই পারে, ক'দিন বাদে ও নিজেই আবার চলে গেল। কোনও ওল্ডএজ হোমেও যেতে পারে। আমার একটাই অনুরোধ, যে কটা দিন ও আমার কাছে থাকবে, আমার সাধ্যমতো আমি রাখব, তোমাদের কোনও ইনটারফিয়ারেন্স আমি চাই না।

আনন্দ কি অবাক হল? ও কি ভেবেছিল ওদের কাছে সাহায্য চাইবেন শ্রীময়ী? অসম্ভব নয়। আজকাল সম্পর্কগুলোর ওপরের রং পালিশ সরালে ভেতরের যে খড়ের কাঠামোটা বেরোয় সেখানে লেনদেন টাকা পয়সা ছাড়া কিছুই থাকে না। শ্রীময়ীকে তার ব্যতিক্রম ভাবার কোনও কারণ নেই।

শ্রীময়ী আবার বললেন, এমনকী ও যে আমার কাছে আছে, মানে আমার কাছেই আছে সে নিয়ে কোনও আলোচনা হোক এও আমি চাই না। একটা ঘর আলাদা করে রেখেছি, আগে ঠাকুরঘর ছিল ও পাঠ তো আমি দু' বছর হল তুলে দিয়েছি,—সেখানেই রাখব ওকে।

আনন্দ উঠে পড়ল, ঘড়ির দিকে তাকাল।

—ঠিক আছে। মাকেও বলে রাখব। ভয় আলোকটাকে নিয়ে, ওর মুখের কোনও আগল নেই।

—সেটা তোমার দায়িত্ব।

—গুরু দায়িত্ব। হাসল আনন্দ।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে শ্রীময়ী ভাবলেন, এ বাড়িতে আর বোধহয় আসা হবে না।

—আতশ! কী অদ্ভুত নাম!

—মানুষটাও অদ্ভুত, আলাপ হলে বুঝতে পারবে।

অদ্ভুত কথাটাই গোলমেলে। ভাল-মন্দ দুই-ই হতে পারে, রহস্য তাতে কমে না। বিয়েবাড়ির হট্টগোলের মধ্যে যেটুকু দেখেছিলেন, ছিপছিপে লম্বা ফর্সা তীক্ষ্ণ দু চোখ সবসময় কী যেন খুঁজছে। তাঁর দিকে স্পষ্ট তাকিয়ে গলায় কৌতুক মিশিয়ে বলেছিল, শ্রীময়ী? বড্ড সেকেলে নাম।

অস্বস্তি হয়েছিল। একটু অবাকও লেগেছিল। প্রথম আলাপেই কেউ যে অত খোলামেলা কথা বলতে পারে, আগে কখনও দেখেননি। পরে আদিনাথকে জিজ্ঞেস করেছিলেন। আদিনাথ মাথার ওপর দিয়ে হাত গলিয়ে পাঞ্জাবি খুলতে খুলতে বলেছিলেন, মানুষটা অদ্ভুত, আলাপ হলে বুঝবে।

সরস্বতী এসে দাঁড়িয়েছে কখন, খেয়াল করেননি। রোদ্দুরে ছায়া পড়তে মুখ ফিরিয়ে তাকালেন, কিছু বলবে?

—খাবার পড়ে আছে, আজও খাননি।

আশ্চর্য! কী যে ভাল লাগে এই এক সপ্তাহে কিছুই বুঝে ওঠা গেল না। পায়েস দিয়েছিলেন, ছুঁয়েও দেখেনি। পরিজ দিলেন, চেছেপুঁছে খেয়ে নিল। ভাবলেন বোধহয় বহুকাল বিদেশে কাটিয়েছে, সাহেবসুবো মানুষ। দিশি খাবার পছন্দ নয়। ব্রেড-জ্যাম-অমলেট দিলেন, যেমনকার তেমনি পড়ে রইল। জিজ্ঞেস না করেই লুচি তরকারি দিয়েছিল সরস্বতী, প্লেট খালি করে খেয়েছে।

মাঝে মাঝে মনে হয় মানুষটা ইচ্ছা করেই অত্যাচার করছে। যেন ফার্স্টইয়ারে র‍্যাগিং, নতুন বউয়ের ওপর অত্যাচার। যেন পরীক্ষা নিতে এসেছে। আমি কে যে আমার ওপর এত কিছু? রাগ হয়ে গেছে। পরে নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছেন নিজের লোকের ওপরই তো মানুষ অত্যাচার করে, আবদার-অভিমান করে, হয়তো নিজের ভাবে এখনও।

সত্যিকারের নিজের লোক তো আর এত ঝঞ্ঝাট সহ্য করত না।

যাব না যাব না করেও হাওড়া স্টেশনে গিয়েছিলেন, না হোক চল্লিশ বছর দেখা-সাক্ষাৎ নেই। চিনতে পারবেন কি না সন্দেহ ছিল। আদিনাথের চেয়ে দু'বছরের ছোট। তার মানে আটাত্তর। সেই ভেবেই ভিড় হাঁটকাচ্ছিলেন।

ঝামেলায় যেতে হল না। কুলির মাথায় সুটকেশ চাপিয়ে সুট-টাই, পাক্কা সাহেবি পোশাকে এক বৃদ্ধকে সবার শেষে গলায় 'আতশবাজি' ঝুলিয়ে আসতে দেখে গিরিকে ইশারা করলেন সুটকেশটা গাড়িতে তুলে নিতে।

আরও রোগা হয়েছে, রোগা বলেই আরও লম্বা দেখায়। বয়েস শিরদাঁড়াটাকে দুমড়ে দিয়েছে। তাই ঝুঁকে হাঁটে। দাড়ি রেখেছে, বুক অবধি সাদা দাড়ি পতপত করে উড়ছে। ঝকঝকে চোখদুটো চশমার আড়ালে ম্লান নির্জীব।

শ্রীময়ী হাসলেন। মানুষটা দাঁড়িয়ে পড়ল। কোনও অনুভূতি কি ছায়া ফেলল চোখে? শ্রীময়ী যা খুঁজছিলেন পেলেন না। কোনও কথা নয়। একটা সম্ভাষণ অবধি নয়। বাধ্য ছেলের মতো আস্তে আস্তে শ্রীময়ীর পাশাপাশি হেঁটে গাড়িতে উঠল। আর তারপরেই ঘুমিয়ে পড়ল।

—আতশ মানে কী?

চোখে চোখ পেতে উত্তর দিয়েছিল, আতশ মানে আগুন। আগুনের উত্তাপ, আরও ঠিকঠাক বলতে গেলে ঝাঁঝ।

বুকের ভেতর শিরশির করে উঠেছিল। কাঁপা কাঁপা গলায় শ্রীময়ী জিজ্ঞেস করেছিলেন, কে দিয়েছিল এই নাম?

আমার ঠাকুমা। না জেনে-বুঝেই অবশ্য। বেঁচে থাকলে গর্ব করত। নাতি নামের মান রেখেছে।

—কেন ওকথা বলছেন?

চোখ দিয়ে ঘন হয়ে এসেছিল তাঁর দেওর। বলেছিল, ওইটাই তো আমার রোগ। কেউ কাছে থাকতে পারে না। ঝাঁঝ সহ্য করতে পারে না। পুড়ে যায়।

আদিনাথের পিসতুতো ভাই। বহুদিন যোগাযোগ ছিল না। হঠাৎ-ই দেখা হয়ে যায় নিউমার্কেটে। সম্পর্কটা জোড়া লাগে।

আদিনাথ কিন্তু ভাইকে পছন্দ করতেন না। মুখে প্রকাশ করেননি কখনও। কিন্তু শ্রীময়ী বুঝতে পারতেন। পরে, আস্তে আস্তে মানুষটাকে চিনতে শুরু করলেন যখন। হঠাৎ হয়তো বলেছেন, নিজেও শান্তি পেল না, অন্যকেও শান্তি দিল না। অথবা—সুখ পেতে গেলে সুখ ভাগ করে নিতে হয়। কিংবা,—কী যে খুঁজে গেল ও-ই জানে।

গাড়িতে বসে আদিনাথের কথাগুলোই ভাবছিলেন শ্রীময়ী। মানুষটা কি সত্যিই জানে ও কী চায়? এই যে চিঠি দিল, সমস্ত ক্ষতি স্বীকার করেও শ্রীময়ী ছুটে এলেন, এখন সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছেন, ওর যেন তাপোত্তাপই নেই। যেন জানেই না কোথায় যাচ্ছে। চেনেই না শ্রীময়ীকে। দেখে বোঝার উপায় নেই যে ও নিজেই আসতে চেয়েছিল। মনে হচ্ছে যেন গরজটা শ্রীময়ীর। ওকে কাছে নিয়ে না রাখলে শ্রীময়ীকেই লোক ছি ছি করবে।

অভিমান হয়েছিল। গাড়িতে বসেছিলেন পাশাপাশি। পাশাপাশি ঠিক নয়, দুজনে দুটো জানলার পাশে, মাঝখানে জায়গা ছেড়ে। বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়ালে, দরজা খুলে

নেমে ও পুরনো বাড়িটার দিকে তাকিয়েছিল। তারপর কোনও কথা না বলে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করেছিল।

শ্রীময়ীর দু পায়ে হঠাৎই ক্লান্তি ভর করেছিল। সরস্বতীকে ডেকে বলেছিলেন ঘর দেখিয়ে দিতে। সুটকেশটা ঘরে তুলে দিয়ে আসা হয়েছিল। বিছানাপত্র, নতুন তোয়ালে সাবান টুথব্রাশ সব দেখিয়ে এসেছিল সরস্বতীই। শ্রীময়ী শুধু একবার জানতে চেয়েছিলেন, কিছু বলল? সব ঠিকঠাক আছে তো?

সরস্বতী জবাব দিয়েছিল, কিছুই তো বললেন না উনি, তবে মনে হল কোনও অসুবিধা নেই।...আচ্ছা দিদি, উনি কথা বলতে পারেন না?

শ্রীময়ী এ প্রশ্নের উত্তর জানেন না। প্রশ্নটা তাঁর মধ্যেও পাক খাচ্ছে ক'দিন ধরেই। সরস্বতীর প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ওকে পাঠিয়ে দিলেন অন্য একটা কাজে।

আজ বাইরে রোদ্দুরে পা মেলে মোড়ায় বসে থাকতে থাকতে মনে হল, মানুষটা কী কথা বলতে ভুলে গেছে?

সকালে উঠে বাইরে তাকিয়েই মন খারাপ হয়ে গেল। ঝিরঝিরে বৃষ্টি, সঙ্গে ঠাণ্ডা হাওয়া। আসব আসব করেও শীত আসছিল না। বৃষ্টি থেমে গেলেই কনকনে ঠাণ্ডা পড়বে। অবশ্য বৃষ্টির জন্যে এমনিতেই বেশ ঠাণ্ডা ভাব। শ্রীময়ী চিরকালই শীতকাতুরে। শীতের সময়টা হাত-পা কেমন ভেতরে ঢুকে পড়তে চায়, কাজকর্ম করতে ইচ্ছে করে না।

কিন্তু বৃষ্টি নয়, ঠাণ্ডাও নয়। মন খারাপ হয়ে গেল অন্য কারণে। শুধু ক্যালেন্ডারে কালির দাগই নয়, মেঘ-বৃষ্টি হাওয়া সবসুদ্ধ সেই দিনটা যেন উঠে এসেছে।

ঘুম ভেঙেই বাথরুমে ঢুকে পড়েন শ্রীময়ী। একেবারে স্নান সেরে বেরোন, বরাবরের অভ্যেস। আজ বসে থাকতে দেখে সরস্বতী একবার জিজ্ঞেস করল, স্নানে যাবেন না? 'এই যাই' শুনে সরস্বতীও আর কথা বাড়ায়নি। বহুদিন আছে, আজকের দিনটার তাৎপর্য ওর অজানা নয়।

বাবলু বলেছিল, জানো, মাঝে মাঝে মনে হয় যা করেছি সব বিফলে গেছে।

দূরে কারখানার চিমনি আকাশের দিকে মুখ করে আগুন ছুড়ে ছুড়ে দিচ্ছিল। সেইদিকে তাকিয়ে শ্রীময়ীর মনে হয়েছিল, আকাশ এত দূরে আর উঁচুতে, কোনও আগুনই ওই অবধি পৌঁছয় না।

সেইটাই বাবলু বলেছিল, আজ এতদিন পরে, বিশটা বছর পার করে মনে হয়, দেশটা এত বড় আর বিচিত্র, এখানে কিছু করা খুব কঠিন। ছোটখাটো চেষ্টায় কিছু হবার নয়। খুব দীর্ঘমেয়াদী, খুব ছড়ানো আর প্ল্যানড মুভমেন্ট হলে তবেই ও গন্ধমাদন নড়বে।

শ্রীময়ীর কানে আসছিল পাশের কুলি-বস্তি থেকে হই হল্লা, কাদের বাড়িতে ঘণ্টা বাজিয়ে পুজো হচ্ছে, সুর করে তুলসীদাসী রামায়ণ পড়ছে কেউ।

বাবলুর গলা খাদে নেমে এসেছিল, এখানে না এলে ভারতবর্ষকে চিনতে পারতাম না মা। এখানে টিভিতে রামায়ণ হলে ফুলের মালা চড়ায় মানুষ, হাতজোড় করে বসে থাকে, সীতার দুঃখে কেঁদে ভাসায়, দশেরায় রাবণ বধ হয় ফি বছর। অথচ জীবনের অলিতে গলিতে যেসব রাবণ দাঁড়িয়ে আছে—মুখিয়ার বেশে, সর্দারের বেশে, মালিকের চেহারায়

তাদের পায়ে প্রতিনিয়ত লুটিয়ে পড়তে পড়তে এদের শিরদাঁড়া দুমড়ে গেছে।

—সেইজন্যই হয়তো রাবণ বধে এত আনন্দ পায় ওরা। বাস্তবে যা পারে না, কল্পনায় সেটারই আশ মিটিয়ে নেওয়া। শ্রীময়ী বলেছিলেন।

তিনদিনের না-কাটা দাড়ি আর ঝাঁকার মতো একমাথা চুলের আড়াল থেকে একটা হেরে যাওয়া স্বর শ্রীময়ী অবধি পৌঁছেছিল, না মা, হাজার বছরের কুসংস্কার এই দেশটার পরতে পরতে। আগে শিক্ষা। সেই জায়গাটায় না পৌঁছতে পারলে, বিপ্লব টিপ্লব ও সব শুধুই কথার কথা।

বাবলুর কথাগুলোই ভাবছিলেন সেদিন ঘুম থেকে উঠে। ছেলেটাকে একলা অত দূরে রেখে এলেন, কী খায় কখন ঘুমোয় একটা চিন্তা সবসময়ই তাড়া করে। তার ওপর এবারে বাড়তি দুশ্চিন্তা, অতখানি দুর্বল ওকে কখনও দেখেননি। যেন হাল ছেড়ে দিয়েছে। ভাল লাগেনি।

ব্যালকনিতে জামাকাপড়গুলো মেলা ছিল, বৃষ্টির ছাঁটে ভিজছে, তুলে আনতে যাবেন, হঠাৎ-ই ফোনটা বাজল। ভেতরে কে যেন বলল, খারাপ কিছু, কোনও দুঃসংবাদ। মা-রা কী সব বুঝতে পারে?

গলাটা চিনতে পারলেন না।

—এটা কি শুভজিৎ সরকারের বাড়ি?

—হ্যাঁ, আমি ওর মা। আপনি কে বলছেন?

—আমার নাম তন্ময়, ওর অফিস-কলিগ। শুভজিৎ হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে। হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, বাড়ি থেকে কেউ এলে ভাল হয়।

কথা বলতে বলতেই লাইনটা কেটে গেল। হাত কাঁপছিল। ফোন রেখে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করছেন, আবার রিং হল। তাড়াতাড়ি রিসিভার তুলে কানে ঠেকালেন। না, এবারে শ্যামলী।

সাধারণত বলেন না। নিজের অসুখ বিসুখ দুঃখ-যন্ত্রণা আড়াল করে রাখতেই ভালবাসেন। কিন্তু সেদিন আর ধরে রাখতে পারেননি। টেলিফোনেই ভেঙে পড়েছিলেন।

—অত ঘাবড়াচ্ছ কেন মা? অসুখবিসুখ তো হতেই পারে, আর দাদার যা চেহারা, খাওয়াদাওয়াও তো ঠিকমতো করে না। আমি এখনই তোমার জামাইকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে আসুক। দু'দিন আদর-যত্নে থাকলেই...

শ্রীময়ী বলেছিলেন, নারে, আমার ভেতরে কুডাক দিচ্ছে। ভাল ঠেকছে না। যখন ওকে পুলিশে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, রাতের অন্ধকারে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল, তখনও আমার এমনি হয়নি। বাবলু আর নেই রে!

এক ধমকে থামিয়ে দিয়েছিল শ্যামলী। শাশ্বতকে ডেকে দিয়েছিল। শাশ্বত ঠিকানা, কেমন করে যেতে হয় জেনে ফোন নামিয়ে রেখেছিল।

শাশ্বত কি ঝরিয়া থেকে ফোন করে ওদের খবর দিয়েছিল? সম্ভবত। কারণ সন্ধে হতে না হতেই শ্যামলী আর সুনন্দা কাছে চলে এল। কাছ-ঘেঁষে রইল সব সময়। গল্পে-কথায় যেন ভুলিয়ে রাখতে চাইছিল শ্রীময়ীকে। একসময় খাইয়ে-দাইয়ে ঘুমোতে পাঠিয়ে দিল।

ঘুম আসছিল না, ছটফট করছিলেন। এপাশ ওপাশ করছিলেন বিছানায়। আদিনাথকে

বারবার মনে পড়ছিল। ভোরের দিকে একটু চোখ লেগে এসেছিল, একটা লরি এসে দাঁড়াল রাস্তায়, আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। তাকিয়ে দেখলেন, ঘর ভর্তি লোক। সামনে শাশ্বত।

সাড়ে সাতটা। সত্যিই বেলা হয়ে গেল। স্নান সেরে বাবলুর ছবিটা নিয়ে বসবেন শ্রীময়ী। পরিষ্কার কাপড় দিয়ে মুছে চন্দনের ফোঁটা দেবেন। সরস্বতী বেলফুল এনে রেখেছে রাতে, জলে ভিজিয়ে রেখেছে। বেলফুল ভালবাসত বাবলু, একটা মালা গাঁথবেন নিজের হাতে। ছবিতে পরিয়ে দিয়ে রান্নাঘরে ঢুকবেন। ছোলার ডাল খেতে ভালবাসত, নারকেল দিয়ে। কুচোনো নারকেল নয়, ডুমো ডুমো করে কাটা। আর নরম ময়ানের লুচি। রাবড়ি আনিয়ে রেখেছেন, মনোমোহন থেকে। সাজিয়ে দেবেন ছবির সামনে।

ঠাকুরের পাঠ তুলে দিয়েছেন সেই থেকে। তবু ভেতরে ভেতরে একটা তীব্র অভিমান পাক খায়। কেন এই অবিচার? তাঁর তো থেকে যাওয়ার কোনও কারণ ছিল না। অথচ যার সারাটা জীবন সামনে পড়েছিল, তাকেই টেনে নিলে তুমি? তুমি কে? তুমি কি সত্যিই আছ? এত প্রশ্ন নিয়ে আর যার সামনে দাঁড়ানো যেত সেই আদিনাথও এখন ছবি।

কাজ একটু হালকা হলেই মেয়েরা চলে আসবে। প্রথমে মেয়েরাই শুধু। একে একে জামাই, নাতি-নাতনি, এখন তো নাতজামাইও হয়েছে, দীপ্ত, শ্যামলীর বড় মেয়ে শাওনের বর। শ্রীময়ীকে একা একা কাটাতে দেবে না দিনটা। কেউ গান গাইবে, কেউ আবৃত্তি করবে, কেউ ক্যারিকেচার করবে। যেন শোক-দুঃখ করার দিন নয়। বাবলু থাকবে, আড়ালে। অথচ সকলের মধ্যে। দিনটা পার করে সবাই মিলে খাওয়া-দাওয়া করে গালে কপালে চুমু দিয়ে যে যার ফিরে যাবে। বড্ড দেরি হয়ে গেল আজ। তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন শ্রীময়ী।

—ফুল মালা চন্দন সবই আছে, একটা জিনিসের কেবল অভাব।

সবাই দীপ্তর দিকে তাকাল। ছেলেটা এমনিতে বেশ ঝকঝকে, কিন্তু মাঝে মাঝে শ্রীময়ীর মনে হয় একটু ওপর-চালাক। সব কিছুতে যেন শেষ কথা বলার হক ওর একার।

সকলের মুখের দিকে একবার চোখ ফেলে দীপ্ত বলল, ধূপ। ছবির সামনে একটা ধূপ জ্বাললে ভাল লাগত। বেশ পুজো পুজো ভাব।

জানলা দিয়ে বাইরে তাকালেন শ্রীময়ী। একঝাঁক নক্ষত্র, পুরনো অভ্যেসে মিটমিট করছে। বাবলুকে দেখাতেন ছোটবেলায়, যখন আমি থাকব না, ওই তারাদের মধ্যে মিশে থাকব, তারা হয়ে যাব, তখন একা একা আকাশের দিকে তাকাস, তাহলেই আমাকে দেখতে পাবি। এখন কি বাবলুই তারা হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। বাইরে আজ ঠাণ্ডা, মেঘ কেটে গেছে। বিকেলেই আকাশ ঝকঝকে পরিষ্কার, বাবলুর ঠাণ্ডা লাগছে না? তাঁরই মতো শীতকাতুরে ছিল ছেলেটা।

শ্যামলীই জবাব দিল, না দীপ্ত, ধূপ জ্বালাই না আমরা। দাদা ধূপ পছন্দ করত না। বলত ধূপ জ্বালালে কেমন শ্মশান শ্মশান গন্ধ বেরোয়। ধূপের সঙ্গে পুজো নয়, মৃত্যুর সম্পর্ক পেত দাদা।

আশ্চর্য! ধূপের গন্ধে মৃত্যু! ভদ্রলোক খুবই অন্যরকম ছিলেন।

হ্যাঁ, এবার শাওন বলল, মামা সবার থেকে আলাদা ছিল। একদম অন্যরকম। থাকলে তোমারও খুব ভাল লাগত।

শ্রীময়ীর ভাল লাগছিল না। মনে হচ্ছিল বাবলু তাঁর নিজস্ব, একান্ত ব্যক্তিগত। তাকে নিয়ে টানা হেঁচড়া না করাই উচিত। বাবলুর ইচ্ছা-অনিচ্ছা পছন্দ-অপছন্দ নিয়ে কথা বলার অধিকার এদের কারও নেই।

'আকাশ ভরা সূর্য তারা...'

দেবব্রত। শাওন কি? না, সুনন্দা। কখন উঠে চালিয়ে দিয়েছে। বাবলু বলত মা দেখেছ, 'আকাশভরা' বললে সমস্ত আকাশ ভরে ওঠে কেমন! এটা আর কারও গানে হয় না।

পরপর কয়েকটা গান হয়ে শেষ হল এক পিঠ। সুনন্দা আর উঠল না ওলটাতে। শাওন বলল, তুমি একটা আবৃত্তি করো না?

দীপ্ত জবাব না দিয়ে হঠাৎ বলল, আচ্ছা দিদা, শুনেছি আপনাদের বাড়িতে নতুন একজন অতিথি এসেছেন, তাঁকে দেখছি না।

শ্রীময়ীর কী যেন হয়ে গেল! যেন এক গোপন কথা আড়াল করে রেখেছিলেন, সবার সামনে ঘোষণা করে দিল দীপ্ত। একটা তিক্ততা যেন ছড়িয়ে যাচ্ছিল ভেতরে। দীপ্তর ওপর রাগ হচ্ছিল। কৃতী ছাত্র, নামকরা ইনস্টিটিউট থেকে ম্যানেজমেন্ট পাশ করে বিদেশি ব্যাঙ্কে টাকা গোনে। আজকাল যেমনটি হওয়া দরকার, চোখেমুখে কথা, খবরাখবর রাখে, যে কাউকে ঝটপট ইমপ্রেস করতে পারে। কিন্তু সবসময় শ্রীময়ী তুলনা করেন আর একজনের সঙ্গে। মুখচোরা, নিজেকে আড়াল করে রাখতেই পছন্দ করত। অথচ গভীর অনুভূতির মধ্যে গা ডুবিয়ে বসে থাকত সবসময়। এখন, ওই যে, মালা চন্দন পরে ছবি হয়ে আছে!

সকলেই চুপ করে আছে দেখে শ্রীময়ী মুখ খুললেন, উনি একা থাকতেই ভালবাসেন। কথাবার্তাও বিশেষ বলেন না। হই হট্টগোল হয়তো ভাল লাগবে না। তাই আর আনিনি তোমাদের মধ্যে।

—তা হলে তো আমাদেরই উচিত আলাপ করে আসা, বলে তড়াক করে উঠে পড়ল দীপ্ত, কাউকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই দরজা খুলে পা রাখল ভেতরের ঘরে।

এখান থেকে ভাল দেখা যাচ্ছিল না। দীপ্তকেই আবছা দেখা যাচ্ছিল। দীপ্ত ঘরে ঢুকেই দাঁড়িয়ে পড়েছে বোঝা যাচ্ছিল। তারপর একটু একটু করে দীপ্তর আড়াল থেকে আত্মপ্রকাশ করল মানুষটা। ধীরে, যেন শরীরটা টেনে টেনে ঘরে ঢুকল ও, তারপর সোফার এক কোনায় ফাঁকা জায়গা দেখে বসে পড়ল।

দীপ্ত চেয়ার টেনে মুখোমুখি বসল, আমি আপনাকেই ডাকতে যাচ্ছিলাম। শুনলাম আপনি এসেছেন, আমরা সবাই এখানে...ইচ্ছে হল আপনাকেও আমাদের মধ্যে নিয়ে আসি।...আমি দীপ্ত, শাওনের বর। শাওন, ওই যে ছবির সামনে হাঁটু মুড়ে, শাওনকে চেনেন তো...।

শ্রীময়ী দেখলেন। দীপ্তকে নার্ভাস দেখাচ্ছে। যেন ও ঠিক বোঝাতে পারছে না। যেন ওর স্মার্টনেস ঠিকরে ফিরে আসছে। ওর আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরছে।

উল্টোদিকে সোফায় বসে আছে ও। দু'হাত কোলের ওপর জড়ো করা।

ড্রেসিংগাউনে সমস্ত শরীর ঢাকা, নীচ থেকে ফর্সা দুখানা পা বেরিয়ে আছে। উজ্জ্বল দুচোখে উপচে পড়ছে কৌতুক। সকলের মুখে ঘুরে ঘুরে দৃষ্টি এসে স্থির হল শ্রীময়ীর ওপর। শ্রীময়ী চোখ সরিয়ে নিলেন।

'লক্ষ্মী যখন আসবে।' কণিকা, আবার চালিয়ে দিয়েছে সুনন্দা। মানুষটার কি ঠোঁট কেঁপে উঠল? চোখ বন্ধ হয়ে গেল। কোলের ওপর রাখা হাত কি নড়ছে তালের সঙ্গে সঙ্গে?

'পদ্মটি নাই', না-ই এর মূর্ছনায় হঠাৎ চোখ খুলে গেল ওর। দৃষ্টির কৌতুক, তীব্রতা সরে গিয়ে এক হাহাকার যেন বিরাজ করছে দুচোখে। সামনে থেকে সকলে যেন হারিয়ে গিয়েছে। সকলের অলক্ষে শ্রীময়ী সেই চোখে চোখ রাখলেন।

এক সময় গান শেষ হল। সবাইকে চমকে দিয়ে যেমন এসেছিল তেমনই হঠাৎ উঠে চলে গেল ও। যেন দীপুর কথা ফুরিয়ে গেছে, শাওনই জিজ্ঞেস করল, উনি কি অসুস্থ?

সরস্বতী কখন এসে দাঁড়িয়েছিল পেছনে। শ্রীময়ীর হয়ে সেই বলল, অসুখ বিসুখ জানি না, কিন্তু উনি কথা বলেন না।

শ্রীময়ী ভাবছিলেন অন্য কথা। বাবলুর কথা। বাবলু বলত, কখনও কখনও হাজারটা শব্দের চেয়েও নৈঃশব্দ অনেক বাঙ্ময়। যারা সভ্যতার আদি থেকে ভাষাহীন, তাদের মুখের দিকে আমরা চেয়ে রয়েছি মা।

এ অবশ্য তা নয়। শব্দের অপচয় ঘটাতে ঘটাতে একসময় স্বর সংবরণ করে নিয়েছে এই মানুষ।

বাবলু থাকলে আজ বেশ হত।

হঠাৎ-ই যেন উবে গিয়েছিল। অনেক খোঁজাখুঁজি হয়েছিল। সবাই যখন প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছে, তখনই হঠাৎ জানা গেল বাবু লন্ডনে আছেন। এবং যে সে জায়গায় নয়, ভারতীয় দূতাবাসে। কীভাবে গেল, কী করে অতদূরে এবং অত ওপরে পৌঁছল কেউ জানতে পারেনি। শুধু আদিনাথ ছোট করে বলেছিলেন, ও সব পারে।

ফিরল মেম বিয়ে করে। অ্যান, সঙ্গে দুবছরের ফুটফুটে মেরি। দেশে ফিরে দিল্লির বিদেশ-দপ্তরে চাকরি। তবে প্রথমে বাড়ি এসেছিল সকলের সঙ্গে দেখা করতে।

বাবা মুখ দেখতে চাননি। ছেলে মেম বিয়ে করেছে শুনে পুরোহিত ডেকে শান্তিযজ্ঞ না কী সব করেছিলেন। উঠেছিলেন হোটেলে। যোগাযোগ করেছিল আদিনাথের সঙ্গে। আদিনাথই একদিন বাড়িতে ডেকে আপ্যায়ন করে খাইয়েছিলেন। শ্রীময়ীর ওপর ভার পড়েছিল লোকজনকে খবর দেবার।

অনেকেই ভিড় করে দেখতে এসেছিল। মেয়েরা গায়ে হাত বুলিয়ে চুলের গোড়া টেনে পরীক্ষা করেছিল চামড়া আর চুলের রং নকল কি না।

খাওয়াদাওয়ার আয়োজনও করেছিলেন শ্রীময়ীই। চামচ দিয়ে কাঁটা বেছে মাছ খেয়েছিল অ্যান। রাত্তিরে কুকুরের ডাকে ঘুম ভেঙে পরিত্রাহী চিৎকার জুড়েছিল মেরি। কোলে নিয়ে ঘুম পাড়িয়েছিলেন শ্রীময়ী। শ্রীময়ীর সঙ্গে অ্যানের পরিচয় করিয়ে ও বলেছিল, মাই বিউটিফুল সিস্টার ইন-ল। অ্যান ঘাড় নেড়ে বলেছিল, শি ইজ ইনডিড বিউটিফুল। হাহা করে হাসতে হাসতে ও বলেছিল, হার নেম ইজ শ্রীময়ী, হুইচ মিনস গ্রেসফুল। আই কল হার বিউটিফুল।

ওরা ফিরে যেতে আদিনাথ হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিলেন। কটা দিন ওঁর সমস্ত রুটিন তছনছ হয়ে গিয়েছিল। শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনে বিশ্বাসী মানুষটার দম আটকে গিয়েছিল। শ্রীময়ীর কিন্তু খালিখালি লেগেছিল বেশ কটা দিন। অ্যানকেও বেশ লেগেছিল। মেরি তো একটা দম দেওয়া পুতুল। বাবলুও যখন তখন গাল টিপে ওকে কাঁদিয়ে দিয়ে মজা পেত।

শ্রীময়ী একদিন আদিনাথের কাছে কথাটা পেড়েছিলেন, অ্যানকে একটা চিঠি লিখব ভাবছি।

আদিনাথ কী একটা পড়ছিলেন। প্রথমে মন দিয়ে শোনেননি। বলেছিলেন লেখো না আমাকে জিজ্ঞেস করার কী আছে?

—না, মানে ইংরেজিতে লিখব তো, একটু দেখেশুনে দিয়ো। ভুলভাল থেকে যায় যদি।

কাগজ নামিয়ে চশমা খুলে রেখেছিলেন আদিনাথ, কাকে চিঠি লিখবে বললে?

—অ্যানকে।

আদিনাথ অবাক হয়েছিলেন। কিছুক্ষণ সময় নিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন—হঠাৎ?

আঙুলে শাড়ির খুঁট জড়াচ্ছিলেন শ্রীময়ী, বলেছিলেন, হঠাৎ নয়। ও যাবার সময় বারবার করে বলে গেছে, চিঠি লিখি যেন। না লিখলে যদি কিছু মনে করে?

—ওরা ওই রকম বলে, ওটাই ওদের আদব। চিঠি লিখলেই বরং অবাক হবে। অন্যরকম ভাববে।

উঠে আসছিলেন শ্রীময়ী, পেছন থেকে আদিনাথ ডেকেছিলেন, ঠিক আছে লিখো।

সেই থেকে চিঠির একটা সম্পর্ক তৈরি হল অ্যানের সঙ্গে। ভাষার ব্যবধান কোনও বাধা তৈরি করেনি।

বেলা দরজা খুলে বাইরে এল, শ্রীময়ী তাকালেন। বেলা বলল, লুজ স্টুলটা হয়েই যাচ্ছে। এবারে একটু ব্লাডও এসেছে। ডাক্তারকে খবর দেওয়া দরকার মনে হচ্ছে।

বেলা নার্স। ট্রেইনড নার্স হয়তো নয়, তবে পাড়ায় পাড়ায় আজকাল এদের সমবায় হয়েছে। অল্পস্বল্প ট্রেনিং নেয় কোথাও থেকে একটা সার্টিফিকেট জোগাড় করে, তারপর কাজে নেমে পড়ে। নার্সিংহোমগুলোয় তো বটেই, বাড়িতেও ভাল ডিমান্ড। পায়ও মন্দ নয়। বাধ্য হয়েই ফোন করেছিলেন শ্রীময়ী। বেলাকে ওরা পাঠিয়ে দিয়েছে।

মেয়েটা ভাল। স্বভাবটাও মিষ্টি। যত্ন করতে পারে। কিন্তু মনে হচ্ছে এবার ওর আওতার বাইরে চলে যাচ্ছে। ডাক্তার বিশ্বাসকে ফোন করতে গেলেন শ্রীময়ী।

ওকে হাতের মুঠোয় ধরে রাখাই ছিল সমস্যা। অ্যানও সেটা টের পেয়েছিল। অবশ্য প্রথমে নয়। তখন হাবুডুবু খাবার সময়। যাকে সবাই বলে ভালবাসা।

দূতাবাসে রিসেপশনিস্ট-এর চাকরি করত অ্যান। আতশ ছিল কেরানি। পিওন-আর্দালিও হতে পারে। কিন্তু ওর হাবভাব কথাবার্তায় তা বোঝা যেত না। দ্রুত সকলের সঙ্গে মিশে যেতে পারত। যে কোনও দরকারে হাত বাড়িয়ে দিত।

অ্যান-এর বাবা বাস থেকে নামতে গিয়ে পিছলে পড়ে মাথায় চোট পেয়েছিলেন। অ্যান অথৈ জলে পড়ে গিয়েছিল। তখন দেখা গেল লন্ডন শহরটা অ্যানের চেয়েও ওরই বেশি পরিচিত।

বাবাকে সুস্থ করে ফিরিয়ে আনল অ্যান। অ্যানের বাবা ফিরে এসে দেখলেন তাঁর

বাড়ির গেস্টরুম দখল করে বসে আছে এক কালা ইন্ডিয়ান। হাসপাতালবাসের সময়টা তাঁর স্মৃতি থেকে মুছে গিয়েছিল। অ্যানকে হাসপাতালে যেতে দেখেছেন, কদাচিৎ কালো লোকটাকে সঙ্গে যেতে দেখেছেন, কিন্তু সে যে এতদূর ধাওয়া করতে পারে স্বপ্নেও ভাবেননি। ভাবার চেষ্টা করতে গিয়েই মস্তিষ্কের ভেতর একটা রক্ত ডেলা পাকিয়ে গেল। ও ব্যাপারটা আন্দাজ করেছিল। তাই এবার আর ফিরিয়ে আনার জন্যে চেষ্টা করল না।

শ্রীময়ী লিখেছিলেন, অত ফর্সা মানুষটাকেও তোমার বাবা কালো দেখলেন?

অ্যান জবাব দিয়েছিল, ভারতবাসী মাত্রেই কালো। তা ছাড়া ওরা নেটিভ। বাবার রক্তে কোথায় যেন একটা নাইটহুডের গন্ধ ছিল। সেখান থেকে বাবা বেরুতে পারেনি।

অ্যানের মা আগেই মারা গিয়েছিলেন। কোনও পিছটান নেই। হাতে হাত লাগিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ততদিনে এসে পড়েছে মেরি।

বিয়েটা কি সত্যিই হয়েছিল?

অ্যান খুলে বলেনি, কিন্তু ও যেমন গোঁড়া ক্যাথলিক, একবার অন্তত চার্চ থেকে না ঘুরিয়ে ও বিছানায় যেতে রাজি হয়েছিল মনে হয় না।

—আমার পরামর্শ যদি নেন তো বলব নার্সিংহোমে শিফট করুন।

আগে বলা হত হাসপাতাল। আজকাল হাসপাতাল বলাটা উঠে গেছে। নার্সিংহোম। পাড়ায় পাড়ায়, অলিতে গলিতে।

দ্রুত ভাবছিলেন শ্রীময়ী। নার্সিংহোম মানে খরচ; কিন্তু সেটার চেয়েও বড় কথা তখন কি আর দায়িত্বের পুরোটা নিজের ওপর রাখা ঠিক হবে? জানালেও বিপদ। ওরা হয়তো ভাববে, এখন ঝামেলায় পড়েছে, তাই দায় ঝেড়ে ফেলতে চাইছে।

—অতটাই খারাপ দেখলেন? বাড়িতে রেখে কিছু হবে না?

ডাক্তারবাবু বেসিনে হাত ধুচ্ছিলেন, পাশ থেকে বেলা টাওয়েল এগিয়ে দিল। এইসব ব্যাপারে ওদের বোধহয় ট্রেনিং থাকে। তা ছাড়া ডাক্তারবাবু খুশি হলে অন্য কারও বাড়ি অথবা নার্সিংহোমে কাজ জুটে যাবে।

—দেখুন, বয়েসটা তো বিপক্ষে। তাছাড়া একটা সময় শরীরের ওপর যথেচ্ছ অত্যাচার করেছেন। লিভারের অবস্থা ভাল নয়। ফুসফুসেরও গোলমাল আছে। বলছেন, ওষুধ লিখে দিয়ে যাচ্ছি। ড্রিপ দিতে হবে, আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট পঙ্কজকে পাঠিয়ে দেব, ওই চালিয়ে দিয়ে যাবে। এই মেয়েটি তো ভাল কাজ জানে, ও বোতল পাল্টে দেবে সময়মতো। তবে, আবার বলছি যা করা উচিত, যতখানি করলে ভাল হয়, এখানে তা হবার নয়।

ডাক্তার চলে যেতে ফোন করলেন শ্রীময়ী আনন্দকে। ফোন ধরলেন অণিমা। গলা শুনেই দমে গেলেন শ্রীময়ী। কিন্তু তখন আর ফোন নামিয়ে রাখা যায় না। বলতেই হল।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে অণিমা জবাব দিলেন, তা আমাদের কী করতে বলছ?

এইটাই আশঙ্কা করেছিলেন শ্রীময়ী। কোনও পরামর্শ নয়। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার ভাগ নেওয়া তো নয়ই। বরং তাঁর কাছ থেকেই জানতে চাওয়া, কী করা উচিত। খুবই অসহায় লাগল শ্রীময়ীর।

বললেন, তোমাদের কোনও মতামত আছে কিনা জানতে চাইছি, ডাক্তারবাবু

নার্সিংহোমের কথা বলে গেলেন।
অণিমা উত্তর দিলেন, সে তো অনেক খরচের ব্যাপার।
—খরচটা বড় কথা নয়। কষ্ট করে ওটুকু আমি করতে পারব। কিন্তু ও কি নার্সিংহোমে যেতে চাইবে?
—সেটা ওকেই জিজ্ঞেস করা ভাল।
অণিমা কথা বাড়াতে চাইছিলেন না। শ্রীময়ীরও মনে হল, অনর্থক লম্বা করে লাভ নেই। যা সিদ্ধান্ত তাঁকেই নিতে হবে। অণিমাকে কী করে বলবেন, এসে অবধি ও তাঁর সঙ্গে একটা কথাও বলেনি! তা ছাড়া এখন তো প্রায় অচেতন। কথা বলারই অবস্থায় নেই।
ডাক্তার লোক পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। স্যালাইন দেওয়া হচ্ছে। শিরার মধ্যে ইনজেকশন পড়ছে। বেলাকে দেখিয়ে দিয়ে গেছে। বেলা-ই দিচ্ছে। নাইটশিফটের মেয়েটা আসেনি। বেলা থেকে গেছে রাত্তিরে। ওর বাড়ির কাছে একটা ওষুধের দোকানে ফোন করে জানিয়ে দিয়েছেন শ্রীময়ী, বেলার কথামতো।
ঘুম আসছিল না। বিছানায় এ-পাশ এ-পাশ করতে করতে শ্রীময়ীর হঠাৎ মনে হল, ও কি চিকিৎসার জন্য তাঁর কাছে এসেছিল? না। থাকতে এসেছিল। আর কোথাও যাবার জায়গা নেই বলেই এসেছিল। নার্সিংহোমে ফেলে দিয়ে এলে সেই বিশ্বাসের অমর্যাদা করা হবে। যাদের জানানোর জানিয়ে দিয়েছেন। এখন নিজের কাছে রেখেই যতটুকু সাধ্য করবেন।
খুঁজে খুঁজে ঠিক পেয়ে গেলেন। আলমারিতে জামাকাপড়ের পেছনে একটা বটুয়ার মধ্যে রাখা ছিল। হলুদ বিবর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু পড়া যাচ্ছে। চশমা পরে ভাল করে খুঁটিয়ে দেখে ঠিকানাটাও পড়তে পারলেন, তারপর গিরিধারীকে দিয়ে পোস্টঅফিস থেকে চিঠি আনিয়ে লিখতে বসলেন।
লিখতে গিয়ে হাত থেমে গেল। অ্যানকে লিখেছেন বন্ধুর মতো। তা ছাড়া তখন দুজনেরই লেখার অনেক কিছু ছিল। ভুল ভাল লিখলে দেখিয়ে নেবার আদিনাথ ছিলেন, এখন লিখছেন মেরিকে। মেরি কয়েকবছর আগে একটা চিঠি লিখেছিল অ্যানের মৃত্যুসংবাদ জানিয়ে। মায়ের ইচ্ছা অনুযায়ী যে চিঠি, তাও লিখেছিল। অ্যানের ক্যানসার হয়েছিল। কিন্তু মৃত্যুকে খুব শান্তভাবে বরণ করেছে মা মেরি লিখেছিল।
শ্রীময়ীও অল্প কথায় লিখলেন, তোমার বাবা অসুস্থ, হয়তো মৃত্যুশয্যায়, তোমাকে জানানো কর্তব্য বলে মনে হল। ডাক্তার নার্সিংহোমে ভর্তি হতে বলেছেন। কিন্তু আমার ইচ্ছা আমার কাছেই রাখি। সারাটা জীবন একা একা কাটিয়েছে। মৃত্যুর সময় কেউ পাশে থাক, হয়তো ও নিজেও এটাই চেয়েছিল। তোমার অভিমত জানিও।
চিঠির সঙ্গে ফোন নম্বরটাও দিলেন শ্রীময়ী, আজকাল তো টেলিফোন অনেক সহজ হয়ে গেছে। শাশ্বত সিঙ্গাপুর-হংকং থেকেও অনবরত ফোনে খবর নেয়।
দোনামনা করেও শেষপর্যন্ত ও ঘরে একবার ঢুকলেন। ঢুকেই মনে হল আর কিছু করার নেই। রোগা শরীরটা বিছানায় মিশে গেছে। চোখগুলো ঢুকে গেছে ভেতরে। মুখটা ফ্যাকাশে। নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বুকের খাঁচাটা নড়বড় করে উঠছে। জীবন এই শরীরকে ছেড়ে গেছে।
অথচ কী তীব্রভাবে জীবনকে দেখেছে এই মানুষ। ছোটবেলায় টেনিসনের কবিতায়

পড়েছিলেন ড্রিংক লাইফ টু দ্য লীস্।

ও কি টেনিসন পড়েছিল?

দিল্লিতে শেষদিকে অ্যানের চিঠিগুলো অন্যরকম হয়ে যাচ্ছিল। ততদিনে শ্যাম এসে গেছে ওদের মধ্যে। নামটাও ওরই দেওয়া। মনেপ্রাণে অ্যান ততদিনে ভারতীয় হয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। মন্দিরে যেত। পুজো আচ্চায় মন দিয়েছিল। অথচ যার জন্য অ্যানের এই রূপান্তর সে জীবনযাত্রায় আরও বেশি বেশি পশ্চিমি হয়ে উঠছিল।

—জানো তো ও আজকাল সন্ধে হলেই, মদের গ্লাস নিয়ে বসে।

—ও ছেলে-মেয়ের বার্থডেও মনে রাখতে পারে না।

—মাঝে মাঝেই রাত্তিরে কাজের জন্য বাইরে কাটাতে হচ্ছে ওকে।

কাজের জন্যটা কি ইচ্ছে করেই লিখেছিল অ্যান? নিজের দুঃখটা খুলে দেখাতে চায়নি পুরো?

তারপর হঠাৎই চিঠি লেখা বন্ধ করে দিয়েছিল অ্যান। পরের চিঠি এসেছিল প্রায় দুবছর পর। ততদিনে ইংল্যান্ডে ফিরে গিয়েছে অ্যান। তাতে মেরির কথা, শ্যামের কথা, নিজের কথা থাকলেও ওর ফিরে যাওয়া, ওর ছেড়ে যাওয়া সম্বন্ধে অ্যান ছিল আশ্চর্য রকম নীরব।

ও-ও কোনও যোগাযোগ করেনি। দিল্লি থেকে চেনাজানা কেউ এলে ওর সম্বন্ধে অনেক কথা বলত। সত্যি-মিথ্যে মেশানো গল্প। আদিনাথ চুপ করে শুনতেন, জবাব দিতেন না। শ্রীময়ীর কষ্ট হত। ইচ্ছে হত আদিনাথকে একবার বলেন, খোঁজখবর নিতে। সাহস হত না।

শেষ অবধি আদিনাথকে অবশ্য দিল্লি যেতে হল! চিঠি পেয়ে। অণিমার বাবার চিঠি।

কে অণিমা, কার চিঠি ভেঙে বলেননি আদিনাথ, এমনকী কেন দিল্লি যাচ্ছেন সেটাও খোলসা করেননি। শুধু বলেছিলেন দিল্লি যাচ্ছি একটু কাজে ফিরে এসে সব বলব। আদিনাথ সাধারণত সবই বলে যেতেন। একটু অবাকই হয়েছিলেন শ্রীময়ী। তবে চাপাচাপি করেননি।

ফিরে শ্রীময়ীকে সব বলেছিলেন।

অণিমার বাবা দিল্লিতে বড় ব্যবসায়ী, ক্ষমতার অলিন্দে ঘোরাফেরা। সেই সুবাদেই ওর সঙ্গে আলাপ। আলাপি বন্ধুবৎসল কথাবার্তায় চমৎকার। তারপর বাঙালি। স্বদেশে যে যতই পেছনে লাগুক, প্রবাসে সকলেই বিপদে এ ওর পাশে দাঁড়ায়। যখন যে দরকারে গেছেন সাহায্য পেয়েছেন। আস্তে আস্তে সম্পর্কটা নিবিড় হয়েছে, বাড়িতে ডেকেছেন। অণিমা তখন মিরান্ডা হাউসের ছাত্রী। গনগন করছে। ওরও চারপাশে আলোর ছটা। যা হবার তা ঘটে যেতে দেরি হল না।

আলাপটা কি অ্যান চলে যাবার আগেই হয়েছিল?

আদিনাথ জবাব দিতে পারেননি। বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, আমার অতশত জিজ্ঞেস করা পোষায় না। দেখা হলে তুমি না হয় জানতে চেয়ো।

প্রশ্নটা মনেই থেকে গিয়েছিল শ্রীময়ীর, কাউকে নয়, এমনকী অ্যানকেও চিঠিতে কোনওদিন লিখে উঠতে পারেননি। বারবারই ভেবেছেন, অ্যান-এর ফিরে যাওয়া,—অণিমাই কি, অণিমার জন্যেই কি?

আদিনাথ বরং সাবধান করেছিলেন। ও আত্মীয়-স্বজন আর কারও নাম করেনি।

বলেছিল ডাকতে হলে আমার দাদা-বৌদিকে ডাকুন। অণিমার বাবা দুজনকেই যেতে লিখেছিলেন। চাইলে এসে নিয়ে যাবেন তাও বলেছিলেন, আদিনাথ নিজে থেকেই গিয়েছিলেন।

গিয়ে দেখলেন বিয়ের আয়োজন সব শেষ পর্যায়ে। নাম-ছাপানো, নিমন্ত্রণপত্র বিলির কাজও শেষ। আদিনাথ জানতে চেয়েছিলেন, কী জন্য ডেকেছেন আমাকে?

অণিমার বাবা বলেছিলেন এমনিই, ওর বিশেষ ইচ্ছা তাই।

কোনও খোঁজখবর নিতে নয়। তা ছাড়া ও কেমন, ওর ব্যাকগ্রাউন্ড দিল্লিতে বসে ভদ্রলোক কি কিছুই জানতেন না? অশিক্ষিত মূর্খ বোকাসোকা তো নন। দিল্লির মতো জায়গায় এক্সপোর্ট-ইম্পপোর্ট-এর ব্যবসা করতে গেলে দস্তুরমতো মানুষ চরিয়ে খেতে হয়। ওর সম্মোহনে তখন শুধু অণিমা নয়, অণিমার বাবাও হাবুডুবু খাচ্ছেন।

আদিনাথের তবু মনে হয়েছিল, জানানোটা তাঁর নৈতিক দায়িত্ব। অণিমা তখন খুবই ছোট, কুড়িও পেরোয়নি। আদিনাথের মনে হয়েছিল মেয়েটার বোঝবার বয়েস হয়নি। তাই ছোট করে অণিমার বাবাকে বলেছিলেন, ওর আগের বিয়েটার কথা তো জানেন?

তটস্থ হয়ে অণিমার বাবা বলেছিলেন হ্যাঁ হ্যাঁ, ও সবই বলেছে।

আদিনাথ ছাড়েননি। জানতে চেয়েছিলেন, সেই বিয়েটা কি অবস্থায় আছে, অফিসিয়ালি ডিভোর্স হয়েছে কি না...,

আদিনাথকে থামিয়ে দিয়ে অণিমার বাবা তাড়াতাড়ি অন্য প্রসঙ্গে চলে গিয়েছিলেন, আদিনাথের মনে হয়েছিল, প্রসঙ্গটা তুলে অন্যায় করে ফেলেছেন। অণিমাদের বাড়ির কেউই চায় না এই সময় কথাগুলো উঠুক, কথা না বাড়িয়ে ফিরে এসেছিলেন।

ফ্যান-এর সুইচ ঘুরিয়ে অন্‌.করে দিতে দিতে আদিনাথ বলেছিলেন, আমার বিবেকের কাছে আমি পরিষ্কার। জানাতে চেষ্টা করেছি। এর পর আমাকে কেউ দোষ দিতে পারবে না।

আদিনাথ ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, অনেক রাত অবধি জেগেছিলেন শ্রীময়ী, বিয়েতে কেউই যাননি।

বাইরের ঘরে সোফায় বসেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। বেলা এসে ডাকল, মাসিমা একবার আসুন।

বেলার মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পেরেছিলেন, ওর সঙ্গে ভেতরে গেলেন। পাখি ডাকছে, ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া জানলার ফাঁক গলে আসছে অল্প অল্প। তবে অন্ধকার কাটেনি, শীতের রাত, ফুরোতে এখনও ঘণ্টাখানেক তো বটেই।

মুখখানা ডান দিকে কাত হয়ে আছে, বালিশ থেকে মাথাটা গড়িয়ে পড়েছে নীচে। বেলাকে বললেন মাথাটা ঠিক করে দিতে। শরীরের সমস্ত যন্ত্রণা মুছে গেছে মুখ থেকে, সেখানে এখন প্রশান্তি। শ্রীময়ী এসে ওর পাশে দাঁড়িয়েছেন, শ্রীময়ীর চোখের কোল ভিজে যাচ্ছে। ও দেখতে পাচ্ছে না।

সরস্বতী ফোন করে দিয়েছিল। ছুটে এল শাশ্বত। ও-ই সব ব্যবস্থা করল। একবার শ্রীময়ীর মনে হল মুখাগ্নি কে করবে? পরমুহূর্তেই আশ্বস্ত হলেন ভেবে, বিদ্যুৎ-চুল্লি হওয়ায় ওই অমানবিক প্রক্রিয়াটা বন্ধ হয়েছে।

ইচ্ছে ছিল না, তবু শবদেহ গাড়িতে তোলার আগে ফোন করলেন একবার। আনন্দ ধরল। খবরটা দিলেন। আনন্দ বলল ঠিক আছে, আমাদের কেউ একজন শ্মশানে যাবে।

কেওড়াতলা তো?

ফোন নামিয়ে রেখে শ্রীময়ী ভাবলেন, ও কি চেয়েছিল ওর মরদেহ চুল্লিতে ঢোকার আগে আনন্দ-অনিমা বা ওদের কেউ থাকে? জানানোটা কি ঠিক হল?

ঘরখালি করে ওকে নিয়ে যখন শাশ্বতরা চলে গেল, শ্রীময়ীর ভীষণ বাবলুর কথা মনে পড়তে লাগল। ওর ছবির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

জোড়াসনে নয়, হাঁটু ভাঁজ করে অনেকটা সন্ন্যাসিনীদের মতো বসেছে মেরি। আজ ঘরে অন্য কেউ নেই, দেয়ালে বাবলুর ছবি শ্রীময়ীর মুখোমুখি। কার্পেটের ওপর ছড়ানো একটা ডায়েরি, কয়েকটা বিবর্ণ হয়ে যাওয়া ছবি। বেগুনি ভেলভেট কাপড়ে মোড়া একটা গয়নার বাক্স।

মেরি দুদিনেই চমকে দিয়েছে শ্রীময়ীকে। লুচি-বেগুনভাজা খেয়েছে চেয়ে চেয়ে, সরস্বতীকে কুটনো কুটে দিয়েছে, শ্রীময়ীকে বেটে দিয়েছে চন্দন। সবচেয়ে অবাক ব্যাপার, কাল বিকেলে সূর্যাস্তের সময় পশ্চিমদিকে তাকিয়ে গেয়ে উঠেছে 'আগুনের পরশমণি' শ্রীময়ী বলেছেন, এসব কে শিখিয়েছে তোমাকে, বাবা?

মেরি জবাব দিয়েছে, না, মা।

শ্রীময়ীর কথা আটকে গেছে। বলেছেন, অ্যান তোমাকেই এই সমস্ত শিখিয়েছে? কবে? ছোটবেলায়? দিল্লিতে ছিলে যখন?

মেরি বলেছে, না, তখন তো আমি খুব ছোট, কিছুই ভাল মনে নেই। শুধু মনে আছে গভীর রাতে ঘুম ভেঙ্গে গেলে দেখতাম বাবার সঙ্গে মার খুব ঝগড়া হচ্ছে। একসময় মা কাঁদতে শুরু করত। বাবা রাগ করে উঠে পাশের ঘরে চলে যেত। মা উঠে মাঝখানের দরজা বন্ধ করে দিয়ে আসত।...মার কাছে এই সমস্ত, চন্দন বাটা, ফল কাটা, পুজোর উপচার সাজানো, পুজোর গান, সব শিখেছি দেশে ফিরে গিয়ে।

কানে খট করে বাজল 'দেশ' কথাটা। মেরির দেশ এটা নয়। ওর এই বসা, গান, মন্ত্রোচ্চারণ সব কিছুর সঙ্গে চমৎকার মিলে যেত ভারতীয়ত্ব। বাবা নয়, মা যেটা ওকে শিখিয়েছে।

হিসেব অনুযায়ী নিয়মভঙ্গ। আনন্দরা কিছু পালন করেছে কি না শ্রীময়ী জানেন না। আনন্দ শ্মশানে নিজেই এসেছিল। ছিলও কিছুক্ষণ। কাউকে না বলেই চলে গেছে। তারপর কোনও যোগাযোগ করেনি। শ্রীময়ীও ওদের বিরক্ত করেননি।

পরে ভাবতে বসে শ্রীময়ীর মনে হয়েছে, বাবাকে স্বীকার করা ওদের পক্ষে সম্ভব নয়। অনিমার ওকে বুঝতে কেন পাঁচটা বছর লেগে গেল সেটাই রহস্য। কিন্তু তখন অনিমার পক্ষে দিল্লিতে থেকে যাওয়া ছিল একরকম অসম্ভব। অনিমার বাবার একটা সামাজিক পরিচিতি ছিল। আর ও যা করত কোনওদিনই লুকিয়ে চুরিয়ে করত না। 'আ' খসিয়ে নিজেকে করে নিয়েছিল 'টস্'। কিন্তু 'আতশ' ওর শরীরে ও সত্তায় মিশে গিয়েছিল। অনিমার পক্ষে তার উত্তাপ অসহনীয় হয়ে উঠেছিল।

অণিমা একা নয়, ব্যবসাপত্র জলের দামে বেচে ওর বাবাও কলকাতা চলে এলেন। নিউ আলিপুরে জায়গা কিনে বাড়ি করলেন, কিছু টাকা শেয়ারে রাখলেন, কিছুদিন হোটেলের ব্যবসায় ভাগ্য ফেরাবার চেষ্টা করলেন, তারপর সাঁকো পেরিয়ে টালিগঞ্জে আসতে গিয়ে বুক চেপে বসে পড়লেন। আদিগঙ্গার ধার থেকে নিউ আলিপুর পি-ব্লক

তখন অনেক দূর, ততদিনে শরীরের মধ্যে সঙ্গে করে আনা আর্তি অণিমার থেকে আলাদা হয়েছে। তিন ছেলে মেয়ে নিয়ে অণিমার জায়গায় অন্য যে কেউ হলে তার মাথায় আকাশ পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যেত। অণিমা তিনতলা বাড়ির দুটো তলা ভাড়া দিয়ে দিল। শেয়ারের কাগজগুলো উদ্ধার করে ভাঙিয়ে টাকা ব্যাঙ্কে রাখল, গুনে গুনে খরচ করে ছেলেমেয়েদের মানুষ করল। এবং এই সমস্ত প্রক্রিয়ার মধ্যে না ছেলেমেয়ের বাবা, না বাবা সম্পর্কের কেউ, কারও কাছে কোনওদিন কোনও ভাবেই ভিক্ষার হাত বাড়িয়ে দিল না।

অত্যন্ত স্বাভাবিক ও ন্যায্য কারণেই ওর অস্তিত্ব অণিমা ও তার ছেলেমেয়েদের কাছে মুছে গিয়েছিল। বরং এখন ওকে স্বীকার করার অর্থ অনেক প্রশ্ন নতুন করে সামনে নিয়ে আসা। বাস্তব বুদ্ধিই ওদের প্ররোচিত করল সেই জটিলতায় না যেতে।

শ্রীময়ী অবাক হয়ে গিয়েছিলেন ফোন তুলে, কেউ ঝরঝর করে ইংরেজিতে তাঁর সঙ্গে কথা বলছে। কিছুক্ষণ সময় চলে গিয়েছিল বুঝতে। তারপর যখন পরিচয় পেলেন মেরি, অ্যানের মেয়ে সেই ইংল্যান্ড থেকে তাঁকে ফোন করছে, চোখে জল এসে গিয়েছিল শ্রীময়ীর। ওইভাবে অত দ্রুত গুছিয়ে ইংরেজি বলা অভ্যেস নেই শ্রীময়ীর। একটু কথা বলেই ধরতে পেরেছিল বুদ্ধিমতী মেয়ে। আস্তে আস্তে দরকারি খবরগুলো জেনে নিয়েছিল। শ্রীময়ী ভেবেছিলেন বাবার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে দুচারটে কেজো কথা বলে ফোন নামিয়ে রাখবে। তার ধার দিয়েও গেল না। জানতে চাইল রিচুয়াল কী হবে, কবে হবে, কোথায় হবে। তারপর দুম করে বলে বসল, ডোন্ট ওঅরি, আমি আসছি। শ্রীময়ীকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই লাইন কেটে দিল।

মেরি শোনাচ্ছিল অ্যানের কাহিনী, রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর, বিছানায় লেপের নীচে দু'পা গুঁজে।

—দেশে ফিরে মা একদিনের জন্যেও লন্ডনে ছিল না। চলে গিয়েছিল কান্ট্রিসাইডে। একটা ক্যাথলিক চার্চের সঙ্গে অ্যাটাচড হয়েছিল। স্কুলে পড়াত, নার্সারিতে। গান শেখাত, সানডে অ্যাসেম্বলিতেও গান গাইত। আমরাও ওই স্কুলে পড়েছি। আমি আর স্যাম।

—স্যাম।

মা ওকে শ্যাম বলেই ডাকত। নামটা ওর পছন্দ ছিল না। উঁচু ক্লাসে উঠেই ও শ্যামকে স্যাম করে নিয়েছিল। টাইটেলটাও ছিল ওর দু'চোখের বিষ। বাবার যে কোনও মেমারিই ওর কাছে অসহ্য ছিল। শেষ পর্যন্ত মার সঙ্গে তুলকালাম করে ও আলাদা হয়ে যায়। তখন ওর বয়স সবে উনিশ। সেই থেকে ও আলাদাই থাকে। বিয়ে করেছে ওর চেয়ে চার বছরের বড় জেনিকে। ওদের দুটো বাচ্চা।

—অ্যানের কথা বলো।

—হ্যাঁ, মার শরীরটা ছিল ইংল্যান্ডে, আর মন পড়ে থাকত ইন্ডিয়ায়। কত কিছু শিখিয়েছিল আমাকে! হিন্দু গডেস, হাউ টু ওয়ারশিপ। মা সিঁথিতে সিঁদুর লাগাত জানো। বিয়ের আংটিও ছিল একটা। হাত থেকে খুলত না। মুখ ফুটে বলেনি, কিন্তু মার মনের ইচ্ছা আমি জানতাম। তাই মারা যাবার পরেও আংটিটা আমি খুলতে দিইনি।

—মারা যাবার সময় তুমি কাছে ছিলে?

—হ্যাঁ। এমনিতেই কম কথা বলত। অসুখ হবার পর আরও গুটিয়ে গিয়েছিল। আমারও ডিভোর্স হয়ে গেল, মার কাছে ফিরে এলাম, মা যেন নিজেকেই অপরাধী

ভাবতে লাগল। শেষ পর্যন্ত মার মারা যাওয়াটা এমন চুপচাপ, এমন নিঃশব্দ যে গাছের পাতা পড়লেও তার চেয়ে জোরে শব্দ হয়।

—বাবার কথা কখনও বলত না?

—কখনও না। একটা স্যুটকেশ ছিল। তার মধ্যে বাবার ছবি-টবি কিছু ছিল বোধহয়। মারা যাবার আগে সমস্ত ডেস্ট্রয় করে দিয়েছিল। পরে কিছুই খুঁজে পাইনি। একবার আমার বয়স তখন বছর দশ-বারো হবে, হঠাৎ মা খুব চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। আমাদের নিয়ে আরও ইন্টিরিয়রে, একটা পাহাড়ি গ্রামে চলে গিয়েছিল। মাস খানেক ছিলাম আমরা। পরে জেনেছিলাম, বাবা এসেছিল। অবশ্য লন্ডন অবধিই। আমাদের যেসব আত্মীয়-স্বজন লন্ডনে ছিল তাদের কাছে খোঁজ খবর নিয়েছিল। মার শেখানো ছিল। তারা বলেছিল, মার কোনও খবরই তারা জানে না।

—ও গিয়েছিল লন্ডনে, তোমাদের খোঁজ করতে? আশ্চর্য!

—হ্যাঁ খুবই স্ট্রেঞ্জ, বাবা তো পরে বিয়ে করেছিল, নতুন ফ্যামিলি হয়েছিল। মা সবই খবর রাখত, তবু কেন যে ওখানে গিয়েছিল! মা কোনও যোগাযোগই রাখতে চায়নি।

—বাবার ব্যাপারে তোমার কোনও কৌতূহল ছিল না?

—ছিল। কিন্তু স্যাম এত ভায়োলেন্টলি রিঅ্যাক্ট করত যে বেশি কথা বলার সুযোগ হত না। আমার খুব জানতে ইচ্ছে করত, এমনকী ইন্ডিয়াতে যেতে, বাবার সঙ্গে মিট করতেও ইচ্ছা করত। কিন্তু মনে হত, মা তাতে খুশি হবে না। কোথাও মার অহঙ্কারে লাগবে।

কথায় কথায় অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল কাল। আজ মেরি চলে যাবে। শ্রীময়ীরও মেরিকে কিছু বলার ছিল। কিছু দেবার। সেইসব নিয়েই বসেছেন এখন।

মেরির চোখে মুখে আগ্রহ।

শ্রীময়ী প্রথমে ছবির তাড়াটা খুললেন। এলোমেলো ছবি। পরপর নয়। বিবর্ণ। কিন্তু বুঝতে অসুবিধা হয় না। অ্যান আর ওর বিয়ের ছবি। অ্যান বেনারসী পরে, হাতে-গায়ে গয়না। সাদাকালো ছবি, তবু বুঝতে অসুবিধা হয় না। মেরি ওর কোলে, ঘাড় কাত করে অ্যানকে দেখছে। একটা পাহাড়ের ছবি, কোথাও বেড়াতে গিয়েছিল বোধহয়। আগ্রহভরে ছবিটা তুলে নিয়ে মেরি দেখতে লাগল।

—সিমলা, আমরা সবাই মিলে গিয়েছিলাম। ফিরে যাবার আগে সামারে। ওটাই আমাদের লাস্ট আউটিং। আমার আবছা মনে আছে। পাহাড় থেকে নামার সময়ে মা বারবার ফিরে দেখছিল। কালকায় এসে গাড়ি দাঁড় করিয়ে চা খেয়েছিলাম আমরা। একটা মন্দির ছিল। মা পুজো দিয়েছিল। এখন মনে হয় মা বোধহয় তখনই একটা ডিসিশন নিয়ে ফেলেছিল।

কেন কী সিচুয়েশনে অ্যান তোমাদের নিয়ে দেশে ফিরে গিয়েছিল কোনওদিন বলেনি?

—নেভার। ওই বিষয়ে কথা তুললে একদম চুপ করে যেত। তখন বেশ কটা দিন লেগে যেত মাকে ফিরিয়ে আনতে।

—অ্যান যখন দেশে ফিরে যায় খুবই অল্প বয়েস তখন ওর। নট ইভন থার্টি। বয়েসটা তো কিছুই নয়। নতুন করে জীবন শুরু করতেই পারত। সেরকম কোনও সম্ভাবনা, কোনও মানুষ...তোমরা কিছু টের পাওনি।

—অসম্ভব। ফিরে গিয়ে মা একটা সেইন্টলি লাইফ লিড করত। ভীষণ পবিত্র, খুব সেক্রেড। বলা তো দূরের কথা, আমরা চিন্তাও করিনি ওরকম কথা। এখন মনে হয়, মা বাবার স্মৃতিটুকু নিয়েই বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে চেয়েছিল।

শ্রীময়ী তখন ডায়েরিটা খুললেন। একটার পর একটা চিঠি লিখেছে আতশ। সাল তারিখ দেওয়া নেই। অ্যান চলে যাবার বেশ কিছুদিন পরে লেখা মনে হয়। সব কটা চিঠিই অ্যানকে লেখা। খুব পার্সোনাল প্যাশনেট চিঠি প্রত্যেকটা।

মেরি অবাক হয়ে শুনছিল। তারপর শ্রীময়ীর হাত থেকে ডায়েরিটা কেড়ে নিয়ে উল্টে উল্টে পুরোটা পড়ল। কম করে পঁচিশ তিরিশটা চিঠি। একটা দুটোর বেশি শ্রীময়ীও পড়েননি। পড়তে অস্বস্তি হয়েছে।

সরস্বতীই বাক্সটা এনে দিয়েছিল। একবার ভেবেছিলেন আনন্দরাই জিনিসটার মালিক, ওদের ডেকে দিয়ে দেবেন। পরে ভেবেছেন, না, ওদের এর ওপর কোনও অধিকার নেই। মেয়েলি কৌতূহলও ছিল। সুটকেশে লক লাগানো ছিল না। খুলে সামান্য কিছু টাকাপয়সার সঙ্গে এইগুলো পেয়েছিলেন। ডায়েরিটা ওলটাতে গিয়েই থমকে গিয়েছিলেন শ্রীময়ী। মনে হয়েছিল, নিষিদ্ধ কিছু পড়ছেন, অনধিকার চর্চা। বন্ধ করে রেখেছিলেন। তখনি ফোন এসেছিল মেরির।

—আশ্চর্য! বাবা তো কখনও এই চিঠিগুলো মাকে পাঠায়নি?

—ঠিকানা জানত না তাই হয়তো! অথবা তাও নয়। তোমার মা যেমন সারাজীবন ওর প্রতি বিশ্বস্ত থেকে গেছে, ও-ও একজনকেই ভালবেসে গেছে শেষ পর্যন্ত। অথচ দুজনের কেউই অন্যের খবরটা জানত না।

মেরি জানালার দিকে তাকিয়ে, আলশেয় বসা শালিখ পাখির দিকে তাকিয়ে বহুদূর পেছনে দেখার চেষ্টা করছিল। ওর ভঙ্গিতে ছিল একটা অসহায়ত্ব। খুব দামি জিনিস অসাবধানে হারিয়ে ফেললে মানুষ যেমন পা ছড়িয়ে ভাবে।

আলগোছে গয়নার বাক্সটা খুলে মেরির সামনে ধরলেন শ্রীময়ী। নেকলেশটা ঝলমল করে উঠল।

মেরি মুগ্ধ চোখে নেকলেশটা তুলে ধরল।

শ্রীময়ী বললেন, এটা কি অ্যানের ছিল? তোমার মনে পড়ে?

ঘাড় নাড়ল মেরি, না, মনে নেই।

শ্রীময়ী বললেন যারই হোক তোমাদের কারও জন্যেই রেখে দিয়েছিল ও। সমস্ত গিয়েছে। ধরে নিচ্ছি বেচেই দিয়েছিল বাকি সবকিছু। শুধু যখের ধনের মতো এই একটা জিনিস আগলে বেরিয়েছে ও। এখন আমি এটার জিম্মাদার। তুমি নিয়ে আমাকে ভারমুক্ত কর।

আস্তে আস্তে নেকলেশটা বাক্সে নামিয়ে রাখল মেরি। ঢাকনা বন্ধ করল। তারপর বলল, সরি তোমাকে দুঃখ দিচ্ছি হয়তো, কিন্তু আমার উপায় নেই। মা তো কোনও দিন বাবার কাছ থেকে কিছু চায়নি। আমরা নিই সেটাও মার ইচ্ছা ছিল না। বাবার দেওয়া এই নেকলেশ নিলে সেটা হবে মার স্মৃতির প্রতি অবিচার। আমার পক্ষে নেওয়া সম্ভব নয়। আমাকে মার্জনা কোরো।

মেরি চলে গেছে। ডায়েরিটা নিয়ে গেছে। সুটকেশটা গয়নাসুদ্ধ থেকে গেল

শ্রীময়ীরই কাছে।

অনেক কিছুই বোঝা গেল। একা সবাই ছেড়ে গেছে তখনও ও অ্যানের স্মৃতিকে জড়িয়ে ধরেই বাঁচতে চেয়েছে। অবশ্য ওর নিজের মতো বাঁচা, আতশবাজির জীবন।

কিন্তু যে প্রশ্নটার উত্তর পাওয়া গেল না, সেটা হল ও শেষ পর্যন্ত শ্রীময়ীর কাছে এল কেন? শ্রীময়ী ওঁর কে? নেকলেশটাই বা কার জন্য রেখেছিল?

শ্রীময়ীর হঠাৎই মনে হল, কথা বন্ধ করে দেওয়া ছিল ওর একটা ছল। অথবা আত্মরক্ষার বর্ম। বলতে গেলে তো অনেক কথা, কথার পিঠে কথা, কথার টানে আরও আরও কথা। তার চেয়ে এ-ই ভাল হল। যেটুকু জানা হল, তার চেয়েও বেশি অনুমান করে নেবেন শ্রীময়ী। তাতে প্রশান্তি, সেটুকুতেই আনন্দ।

ঘর অন্ধকার হয়ে এসেছিল। আলো জ্বেলে দিয়ে গেল সরস্বতী। শ্রীময়ী দেখলেন বাবলুর ছবির সামনে বসে আছেন তিনি, একা।

সত্যি প্রেমের গল্প

আর একবার হিসাব করে নেয় নবনীতা।

বোনলেস চিকেনগুলো ম্যারিনেট করে ফ্রিজে ঢুকিয়েছে, শাশ্বতী এসেই বলবে, চিকেনফ্রাই করিসনি? আগে তো সিঁড়ি থেকেই চেঁচাত, নীতা, মাসিমাকে বল ফ্রাইগুলো রেডি রাখতে।

শাশ্বতীর কিন্তু ছোটবেলাটা—স্কুলটুল সবই জলপাইগুড়িতে। বরং মেঘনাই, কলকাতার গন্ধ, কাছের বাটানগর থেকে ঠেঙিয়ে আসত রোজ, অথচ গাঁইয়াদের মতো চানাচুর দেখলে হামলে পড়ত,—উজ্জ্বলা? চিরশ্রী চোখ টিপে বলত, দেখিস বাবা, কে কবে উজ্জ্বলার চানাচুরের লোভ দেখাল, আর সব দিয়েটিয়ে বসে থাকলি!

—আর তোর বেলা? তেড়ে আসত মেঘনা, দুখানা আইসক্রিম খাইয়ে পলা তোর কাছ থেকে জেবির নোটস্‌গুলো ঝেড়ে দেয়নি?

চিকেন আর আইস্‌ক্রিম ফ্রিজে, উজ্জ্বলার চানাচুর বয়ামে। নিশ্চিন্ত। অন্যগুলোও ভেবে নেয়।

শান্ত অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়বে। পাপাইকে স্কুল থেকে পিক আপ করে ভবানীপুর যাবে দাদার বাড়ি। বাবা-মা, শান্তর, অবশ্য নবনীতাও ছ'বছরে অভ্যেস করে ফেলেছে—ওখানেই, এক সপ্তাহ হল। ভবানীপুরে গুরুদেবের আশ্রম, এই সময়ে কীসব যাগযজ্ঞ হয়, ওঁরা ওখানেই থাকেন। শান্ত সন্ধ্যা অবধি ভবানীপুরেই কাটিয়ে আসবে। পাপাইটা দু'দিন হল দাদাই দাদাই করছে, আর শান্তর বাবা এমনিতেই চারবেলা ফোনে খোঁজখবর নিচ্ছেন, পাপাইকে কাছে পেলে বর্তে যাবেন।

শান্ত-পাপাই-শ্বশুর-শাশুড়ি। সব্বাই আউট। নবনীতা একা এবং থ্রি মাস্কেটিয়ার্স।

চিরশ্রী, মেঘনা, শাশ্বতী। ছোট করে শ্রী, মেঘ, আর সতী। হিস্ট্রি, পলসায়েন্স, ইকনমিক্স। এক জায়গার মেয়ে নয়, সাবজেক্টও আলাদা। কেমন করে যে এক জায়গায় জুটল! ক্যান্টিন-কফিহাউস-কার্জন পার্ক-রবীন্দ্রসদন। যেখানে দেখবে, তিনটে একসঙ্গে। আর, আগে থাকতেই প্ল্যান করে কিনা কে জানে, এক পোশাক পরে ঘুরত। একদিন তো তিন জনে মিনিস্কার্ট পরে কলেজে ঢুকে হইহই ফেলে দিল। ক্যান্টিনে কবে যেন এষা ফস্‌ করে সিগারেট ধরিয়ে বলেছিল, সে কী রে, তোরা এখনও টেস্ট করিসনি? পরের দিনই তিন জনে ফিল্টার উইলস ঠোঁটে ঝুলিয়ে ক্যান্টিনে ঢুকেছিল। নবনীতা চোখ গোল করে জিজ্ঞেস করেছিল, তোরা খেতিস? শ্রী গলা নামিয়ে বলেছিল, পাগল! কাল সারারাত হোস্টেলে শাশ্বতীর ঘরে প্র্যাক্টিস করেছি। কাশিটা আর আসছে না। দেখেছিস, এষার চোয়াল কেমন ঝুলে গেছে!

নবনীতাকে তুলেছিল মেঘনা। কলেজ সোশ্যাল, শ্রুতিনাটক। হাততালি-টাততালি হয়ে গেলে মেঘনা এক পাশে টেনেছিল,—অ্যাই, চললি কোথায়? ক্যান্টিনে আমাদের সঙ্গে বসবি আয়।

ভয়ই পেয়েছিল নবনীতা। ওদের সম্বন্ধে এত কিছু শোনা যেত তখন! পালাবে কিনা ভাবছে, দু'পাশ থেকে এসে গিয়েছিল চিরশ্রী আর শাশ্বতী।

আলাপ হবার পর ভুল ভেঙে গিয়েছিল। দেখেছিল, মেয়েগুলোর দুর্দান্ত কয়েকটা কোয়ালিটি আছে। পরনিন্দা-পরচর্চা করে না, লেখাপড়ায় ব্রিলিয়ান্ট, সাহিত্য-সংস্কৃতি-রাজনীতির ভাল খবর রাখে। সবচেয়ে বড় কথা বাইরে থেকে যাই-ই মনে হোক স্নব বা স্নুটি নয়। নবনীতা যে বাংলা অনার্স, ওকেও কাছে টেনে নিতে অসুবিধে হল না। বরং অন্যদের চোখ টাটাল। অরুন্ধতী একদিন গায়ে পড়ে বলল, শুনেছিস, পলাশ কী বলছিল?

—কী বলছিল? অবাক হয়েছিল নবনীতা।

লাইব্রেরির রাস্তায় করিডোরে অন্ধকারে এক পাশে টেনে নিয়ে গিয়েছিল অরুন্ধতী। চোখ বড় বড় করে বলেছিল, ওই যে রে, থ্রি মাস্কেটিয়ার্স। কত কীই তো শোনা যায় ওদের সম্বন্ধে। কাল পলাশ ক্যান্টিনে বলছিল, ভালই হয়েছে, তিনজন ছিল চারজন হল, আর কোনও অসুবিধা হবে না।

—কীসের অসুবিধা? তাও বুঝতে পারেনি নবনীতা।

—বুঝিস না যেন, ন্যাকা! বলে একটা ধাক্কা মেরে চোখ টিপে হাসতে হাসতে চলে গিয়েছিল অরুন্ধতী।

কোথা থেকে যেন খবরটা চিরশ্রীর কানে গিয়েছিল। দুদিন পরেই, পাস-এর ক্লাস, দেড়শ ছেলেমেয়ে, সকলের সামনে পলাশকে ধরল।

—এই পলাশ, কাল ফ্রি আছিস?

পলাশ ঢোঁক গিলল, কেন কী ব্যাপার?

—কাল আমাদের বিয়ে, তোকে সাক্ষী দিতে হবে।

—বিয়ে? কার?

—আমার আর নবনীতার।

পালিয়ে বেঁচেছিল পলাশ। দু'খানা আইসক্রিম খাইয়েছিল চিরশ্রীকে মেঘনা।

এখন ভাবলে অবাকই লাগে। নবনীতা বাংলা, নরমসরম, শাড়ি-বাস-উত্তর কলকাতা। ওদের মতো ডাকাবুকো নয়। তবু যে কেন ওরা দলে নিয়েছিল!

—শুতে যাবে না? কখন শান্ত উঠে এসেছে টের পায়নি নবনীতা।

—হ্যাঁ, যাচ্ছি। তুমি শুয়ে পড়ো, আমি আর একবার ভেবে নিই, কিছু বাদ পড়ে গেল কিনা।

তবু গেল না শান্ত। সোফায় বসে একটা সিগারেট ধরাল।

অবাক হল নবনীতা।

—কী হল, শুতে গেলে না?

—যাব, তোমার সঙ্গে যাব।

—আমার দেরি আছে।

—হোক দেরি। আমি জেগে আছি।

এবারে রাগই হয়ে গেল নবনীতার,—কী ব্যাপার বলো তো? আমার শুতে যাবার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক?

একটা ধোঁয়ার রিং বানাল শান্ত, ভাসিয়ে দিল ওপরে। মুচকি হেসে বলল, বলা তো

যায় না, অদ্যই হয়তো শেষ রজনী। তিন তিনটে লাভার আসছে। কাল রাত অবধি বউটার কতটুকু পড়ে থাকবে আমার জন্যে কে জানে? আজকের রাতটা আমি কিছুতেই নষ্ট হতে দিতে চাই না।

উঠে গেল নবনীতা, খামচে ধরল শান্তর চুল।—অসভ্য!

দুই

যা ভেবেছিল ঠিক তা-ই। যেদিন বেশি দরকার, বেছে বেছে ঠিক সেই দিনগুলোতেই মঙ্গলা ডোবায়। পাপাইকে স্কুল-বাসে তুলে দিয়ে এল, বোঁচার মা বাসন মেজে ঘর ঝাঁট দিয়ে চলে গেল, শান্তও বেরিয়ে গেল, মঙ্গলার পাত্তা নেই। ঘড়ির দিকে তাকাতে তাকাতে চোখ ব্যথা হয়ে গেল। যখন ভাবছে আর অপেক্ষা করে লাভ নেই, এবারে নিজেই হাত লাগানো উচিত, দরজায় বেল।

—কী ব্যাপার মঙ্গলা?

কোনও জবাব না দিয়ে, যেন কিছুই হয়নি, যেন কাল সন্ধেবেলা নবনীতা মঙ্গলাকে আধঘণ্টা ধরে কিছুই বোঝায়নি, যেন আজও অন্য যে কোনও একটা দিন, নবনীতাকে পাশ কাটিয়ে মঙ্গলা রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল।

সব গুলিয়ে গেল নবনীতার। ধপাস করে বসে পড়ল সোফায়। আর বসতেই আবার চোখ গেল ঘড়িতে। সর্বনাশ! পৌনে দশটা! ঠিক এক ঘণ্টা পনেরো মিনিট বাকি! ধড়মড় করে উঠে বাথরুমে ঢুকে গেল নবনীতা।

চার বছর। এটা তো ফাল্গুন মাস! হ্যাঁ, ঠিক চার বছর আগেই শেষ দেখা। মেঘনার বিয়েতে। মেঘনার বিয়েটাই হয়েছিল সবার শেষে। খুব হইহই করেছিল তিনজনে। মেঘনাটা হাত কামড়েছিল—ইস্, সেজেগুজে বসে না থাকলে কত মজা করতাম বল তো!

চিরশ্রী বলেছিল, আর কি আমাদের সঙ্গে মজা করা পোষাবে তোমার?

শাশ্বতী চশমা নামিয়েছিল; চশমার ওপর দিয়ে সোজা তাকিয়ে বলেছিল, মজা না আরও কিছু তা অবশ্য ক্রমশ প্রকাশ্য।

মেঘনা কাছ ঘেঁষে এসেছিল। চিরশ্রীর কানের কাছে মুখ এনে বলেছিল, বল না বাবা, একটু টিপস দে। তুইই তো সবচেয়ে সিনিয়ার।

শ্রী হাঁ করার আগেই হই হই করে এসে গিয়েছিলেন বড়রা,—ব্যস ব্যস, অনেক গুজগুজ ফুসফুস হয়েছে। ওদিকে লগ্ন বয়ে যাচ্ছে, শিগগির চলো।

কথাটা অবশ্য সত্যি। চিরশ্রীই সিনিয়ার। অর্পণের সঙ্গে ওর প্রেম, ওরই ভাষায়, ইজের পরার বয়েস থেকে। পাশাপাশি বাড়ি; কো-এড স্কুলে একসঙ্গে পড়াশুনা। ফাইভ-সিক্স থেকেই নাকি চিঠি-চালাচালি।

—কী পাকা ছিলি রে তোরা?

—চিঠি তো কোন ছার। ক্লাস এইটেই একদিন, টয়লেট যাবার রাস্তায়, অন্ধকারে জড়িয়ে ধরে...। কী বুক ঢিব্‌ঢিব্। তিনদিন ভয়ে স্কুলে যাইনি তারপর।

কলেজে শ্রী আর অর্পণকে একসঙ্গে অর্পণশ্রী বলা হত। অর্পণ পড়ত যাদবপুরে। কী

পড়ত ও-ই জানে। দিনরাত পড়ে থাকত প্রেসিডেন্সির পোর্টিকোতে। আর কাঁধে চব্বিশ ঘণ্টা ঝুলত একটা ট্রাভেলাইট ব্যাগ।

—ওই ব্যাগে কী আছে জানিস?

মেঘনার প্রশ্নে বোকার মতো ঘাড় নেড়েছিল নবনীতা।

—একটা শতরঞ্চি। যেখানে সেখানে পেতে শুয়ে পড়ার জন্যে।

মাঝেমাঝেই ক্লাস কেটে উধাও হয়ে যেত ওরা দু'জন। রাতটাতও নাকি কাটিয়েছে কোথায় কোথায়। একবার ডায়মন্ডহারবার না বকখালি কোথায় যেন গিয়ে কী কাণ্ড!

—অর্পণের মামার বন্ধু, দেখেই চিনেছে। খপ্ করে হাত ধরে জিজ্ঞেস করেছে, অর্পণ না?

—তারপর? তিন জনে একসঙ্গে বলে উঠেছে।

চিরশ্রী মুখে রুমাল চাপা দিয়ে বলেছে, ও অম্লানবদনে বলল, ভুল করছেন, আমার নাম সুজিত হালদার।

অর্পণ পাশ করে চাকরি পেল, আর তার ছ'মাসের মধ্যেই বিয়ে করল ওরা। মেঘনার বিয়ের সময় সেই বিয়ের বয়েস চার।

তবে সরকারি হিসেবে কিন্তু শাশ্বতীই সিনিয়ার। প্রদীপ্তর সঙ্গে ওর ব্যাপারটা ছিল ইনটেলেকচুয়াল লেভেলে। স্টুডেন্ট হিসেবে দু' জনেই তুখোড়, দু' জনেই ইকনমিক্স, প্রদীপ্ত এক ইয়ার ওপরে। একবার ডিবেটে দু' জনে মুখোমুখি। খ্যাপা কুকুরের মতো লড়েও প্রদীপ্ত পারল না। উঠে এসে শাশ্বতীকে কনগ্রাচুলেট করেছিল। শাশ্বতী হাসেনি, কেমন ছলছলে চোখে তাকিয়েছিল। তিনদিন বাদে পোর্টিকোতে দেখে কাছে গিয়েছিল, —পি এস বলছিলেন প্রদীপ্ত একটা আনসার লিখেছে, আমাকে বসিয়ে দিলেও আমি ওইরকম পারতাম না। একটু দেখা যাবে?

মেঘনা কাছে ছিল। পরে এসে ওদের বলেছিল, মুখখানা তো দেখিসনি? হয়ে গেছে। ওর আর কিছু পড়েটড়ে নেই।

রেজিস্ট্রেশন গ্র্যাজুয়েশনের পরেই সেরে ফেলেছিল। আনুষ্ঠানিক ব্যাপারটা করল ওরা যখন দিল্লিতে। মেঘনার বিয়ের সময় প্রদীপ্ত থিসিস সাবমিট করেছে, শাশ্বতীরও শেষের দিকে।

নবনীতা আর মেঘনা দু' জনেরটাই দেখেশুনে। নবনীতার কিছু আগে। পড়াশুনায় মাঝারি, বাড়ির অবস্থা চলনসই, রূপ দেখে রাজপুত্র গাড়ি থামিয়ে রথে তুলে নেবে এমন নয়। চিরশ্রী শুধু গাল টিপে বলত, ডল একটা! আমারই ইচ্ছে করে ইলোপ করি, আর ছেলেদের তো...। জ্যাঠতুতো দিদি অনুশীলার বিয়েতে শান্তনুর বাবা-মা এসেছিলেন। ক'দিন পরেই কথাটা নবনীতার মা হয়ে বাবা অবধি পৌঁছল। ছেলেদের জন্যে অপেক্ষা করা হয়ে উঠল না নবনীতার।

বাথরুমের জানলা দিয়ে বাইরে পায়রা দেখছিল। গায়ে সাবান শুকিয়ে খরখরে। তাড়াতাড়ি জল ঢেলে গা মুছে বাইরে বেরোবার আগেই নবনীতা শুনল ফোন বাজছে।

ফোনটা দু'বার বেজেই বন্ধ হয়ে গেল। মা কি? মা-র দেওয়া টাঙ্গাইলটা পরতে পরতে মন খারাপ হয়ে গেল। হাতিবাগান থেকে কসবা, ভাবতে গেলে কতই বা দূর। অথচ সেই বিজয়ার পর এতদিন কেটে গেল একবার খোঁজ নিতেও যেতে পারল না।

রান্নাঘরে ঢোকার মুখেই আবার ঘুরল নবনীতা। ফোন। শাশুড়ি।

—বউমা? ওরা কি বেরিয়ে গেছে? শরীর-টরির ঠিক আছে তো? দাদুভাই কখন আসছে? তোমার বন্ধুরা, যাদের আসার কথা ছিল, এসে গেছে?

এক নিশ্বাসে সবগুলো প্রশ্ন আউড়ে গেলেন। ধরে ধরে জবাব দিল নবনীতা। মানুষটা খারাপ নন, ভেতর-বাইরে সমান। শ্বশুরও স্নেহ করেন। নিজে থেকেই বলেন, যাও না, ঘুরে এসো হাতিবাগান থেকে। অত করে বলেন বলেই কেমন বাধো বাধো লাগে নবনীতার। ফোনেই খোঁজ-খবর নেয়। দাদাকে বলে সময়মতো চেকআপ করাতে।

ফোন রেখে ঘড়ির দিকে তাকাতেই বুকটা ধক্ করে উঠল। পৌনে এগারোটা। ছুটে রান্নাঘরে ঢুকল।

এইজন্যেই মঙ্গলা মঙ্গলা। এতবার ভেবেছে, এবারে ছাড়িয়ে দেব, তাও যে শেষ অবধি পারেনি, তার কারণ, কাজটা করে ভীষণ পরিপাটি। মেনু তো বিরাট কিছু নয়,— বিরিয়ানি, চিকেন ফ্রাই আর আইসক্রিম। আইসক্রিম ফ্রিজে, ফ্রাইটা গরমগরম দেবে। বিরিয়ানির সমস্ত রেডি। তাও যেটুকু ইনস্ট্রাকশন দেবার দিয়ে বাইরে এসে বসল।

কপালে ভুরুতে ঘাম জমছিল। তেমন কিছু গরম নয়, টেনশন-সোয়েট। শাড়ির আঁচলে মুখ মুছতে গিয়ে মনে হল শাড়িটায় বড্ড মাড়। তার চেয়ে আস্তে করে ফ্যানটা চালিয়ে দিলেই হয়।

উঠতে গিয়ে আবার ঘড়ি দেখল। এগারোটা পাঁচ। চোখ বুলিয়ে কাগজটা টেবিলেই ফেলে রেখে গেছে শান্ত। তুলে পড়ার চেষ্টা করল নবনীতা। রাজনীতি আর রাজনীতি। শান্তই ভাল করে। পেছন থেকে শুরু করে। ওই পাতাটা খেলার। খেলায় ইন্টারেস্ট নেই নবনীতার।

কাগজ রেখে সোফায় হেলান দিল।

শাশ্বতীর জলপাইগুড়ি, চিরশ্রীর ব্যাঙ্গালোর, মেঘনার বাটানগর। ঠিকানা আছে। ফোন নম্বরও। ইচ্ছে করলেই যোগাযোগ করা যায়। তবু করে উঠতে পারেনি নবনীতা। বেধেছে। বরং ওরাই নিজেদের মধ্যে কনট্যাক্ট করেছে, প্ল্যান করেছে, তারপর চিঠি লিখেছে।

চিঠিটা অবশ্য শাশ্বতীর, তিন জনের হয়ে।—বহুদিন কোনও খবর পাই না। কেমন আছিস? ক'দিন আগে আমরা মিট করেছিলাম। তোর কথা উঠল। ঠিক হল সবাই মিলে তোর ওখানে হামলা করব। মার্চ-এর এগারো তারিখ। মঙ্গলবার। এই ধর এগারোটা নাগাদ পৌঁছব, সারাটা দিন নরকগুলজার করে সন্ধেবেলা ফিরে আসব। ওইদিন থাকছিস তো? কোনও অসুবিধে থাকলে মেঘনাকে ফোন করে জানিয়ে দিস। খবর না পেলে ধরে নেব থাকছিস। তাও মেঘনা পারলে ফোনে দুয়েকদিন আগে কনফার্ম করে নেবে।

কেজো চিঠি। কাঠকাঠ। শাশ্বতীটা চিরকালই এমনি। এমনকী একবার মেঘনার চাপাচাপিতে দেখিয়েছিল, প্রদীপ্তকে লেখা চিঠিতেও এর চেয়ে একফোঁটা বেশি রসকষ ছিল না।

এগারোটা কুড়ি, আসবে তো? একবার ফোন করবে না!কি মেঘনাকে? কোথায় যেন রেখেছে নম্বরটা?

বেল বাজল। পরপর তিনবার। চিরশ্রী। বরাবরের অভ্যেস। ছুটে গিয়ে দরজা খুলল নবনীতা।

—ডল্! কী সুইট হয়েছিস রে তুই! মুটিয়েছিস অল্প। তাতে আরও ডার্লিং দেখাচ্ছে।

তিনদিক থেকে তিন জনে জড়িয়ে ধরে দু'গালে চকাচক চুমু খাচ্ছে, মঙ্গলা রান্নাঘর থেকে হাত মুছতে মুছতে বেরিয়ে ওই দৃশ্য দেখে তাড়াতাড়ি আঁচলে হাসি আড়াল করে আবার ঢুকে গেল; নবনীতা পায়ের ধাক্কায় দরজা ঠেলে বন্ধ করে হাঁসফাঁস করতে করতে সোফা অবধি এসে কোনওরকমে বসে পড়ে বলল, এবার থামবি?

—থামব? কেন থামব? থামার জন্যে কি ব্যাঙ্গালোর থেকে ছুটে এসেছি? আমার ডার্লিং, সুইটহার্ট...বলতে বলতে আবার জড়িয়ে ধরল চিরশ্রী।

শাশ্বতীর উচ্ছ্বাসটুচ্ছ্বাস কম। ও-ই আগে সামলে নিল। সোজা হয়ে বসে চারিদিকে চোখ বুলিয়ে বলল, গ্র্যান্ড। চমৎকার ঘর সাজিয়েছিস। কোথাও বাড়াবাড়ি নেই। একদম ঠিকঠাক।

মেঘনা লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল, কোথায়, সেই গুণ্ডাটা কই? কী যেন নাম? পাপাই?

—স্কুলে গেছে।

—স্কুলে গেছে? আমরা, ওর তিন তিনটে মাসি ওকে দেখতে আসছি, আর সব জেনেশুনেও তুই ওকে স্কুলে পাঠালি? কী নির্মম রে তুই...কখন ফিরবে?

—ফিরবে না। ওর বাবা ওকে স্কুল থেকে পিক আপ করে ওর জেঠুর বাড়ি নিয়ে যাবে, ভবানীপুর। ওখানেই থাকবে।

—ক্রিমিনাল অফেন্স। তোকে এখনই আমরা মৃত্যুদণ্ড দিলাম। টু বি হ্যাংগড টিল ডেথ।

শাশ্বতী জানতে চাইল, কেন রে, আজকের দিনটায় ওকে না পাঠালেই চলত না?

এবারে মিথ্যে বলল নবনীতা, নারে, ক্লাসটেস্ট, পরে অসুখবিসুখ করলে মুশকিল হবে।

—কোন ক্লাস হল যেন?

—ক্লাস ওয়ান।

—ক্লাস ওয়ান, তার আবার ক্লাসটেস্ট! দেখালি বটে! আমরা যেন লেখাপড়া শিখিনি।

মেঘনা উঠে ডিনার-ওয়াগনের ওপর থেকে ছবিটা তুলে আনল,—কী মিষ্টি হয়েছে রে! মুখটা বিশেষ করে নীচের দিকটা, বসানো তুই। চোখদুটো কি ওর বাবার মতন?

চিরশ্রীর কাঁধে একটা চিকনের কাজ করা কাপড়ের বোঝা ছিল, রেখেছিল সোফার ওপর। এবারে চেন খুলে সেটা থেকে বের করল,—এই দ্যাখ শাশ্বতী ওর জন্যে নিয়ে এসেছে সোয়েটার; মেঘনা একগাদা ফেয়ারিটেল-এর বই কিনেছে; আমি ব্যাঙ্গালোরের কম্পিউটার পয়েন্ট-এ গিয়েছিলাম, দেখলাম বাচ্চাদের জন্যে দারুণ পাজল গেম বানায় ওরা। হ্যাঁরে, ওর পাজল গেম আছে?

—কী করেছিস তোরা? এই সব নিয়ে এসেছিস ঘাড়ে করে? কী পাগলামি করেছিস বল তো?

—সোয়েটারটা পিওর উলের। ওর ফিট করবে?—শাশ্বতী।

—একদম ঠিকঠাক। আর কী দুর্দান্ত কালারটারে! ভীষণ আনইউজুয়াল।...বল্, এখন কী খাবি, চা না কফি?

—কিচ্ছু নয়, তুই এখানে বোস চুপটি করে। খিদে পেলে তোকেই খাব গপগপ করে।

চিরশ্রীর কথার মধ্যিখানে নাকিনাকি সুরে মেঘনা বলল, আমার একটু একটু চানাচুর

খিদে পাচ্ছে রে নীতা।

—আছে। উজ্জ্বলার চানাচুর। বোস, এনে দিচ্ছি।

—আর আমার আইসক্রিম? চিরশ্রী চেঁচাল।

—লাঞ্চের পর। ডিপফ্রিজ-এ ঢুকিয়ে রেখেছি। লাঞ্চে চিকেন ফ্রাই,—শাশ্বতী, হাঁ করতে যাচ্ছিল, মুখ বন্ধ করে ফেলল,—আর শেষে ডেসার্ট আইসক্রিম। সমস্ত আনা আছে।

—আমাদের ডার্লিং! আবার তিন জনের জড়িয়ে ধরা এবং চুমু খাওয়া ছাড়িয়ে নবনীতা উঠল চানাচুর আনতে।

—অ্যাই নীতা! তোর হাবি, শান্ত না প্রশান্ত, ওর কোনও ছবি দেখছি না? তোদের কোনও গ্রুপ ফটো নেই?

ছিল। কালরাতেই সরিয়ে রেখেছে ওদের বিয়ের পরের এনলার্জ করা ছবিটা। শাশ্বতীর কথাগুলো যেন শুনতে পায়নি এমন ভান করল নবনীতা।

চিরশ্রী বলল, হ্যাঁরে, মাসিমা-মেসোমশাই কেমন আছেন?

—আছে ভালয়মন্দয়। বাবার চোখে ছানি, প্রেসারটা কন্ট্রোলে না এলে কাটানো যাচ্ছে না। মার সুগার ধরা পড়েছে. কিছুই মানে না, যা খুশি তাই খায়; তাই নিয়ে বাবার সঙ্গে দিনরাত খিটিরমিটির।

—আছেন কোথায়?

—দাদার কাছে, হাতিবাগানে।

—দাদা? তোর সেই ক্যাবলাকান্ত দাদা? হিহি করে হাসল চিরশ্রী। শাশ্বতী বলল, এখন তোর দাদা যদি চিরশ্রীকে রাস্তায় দেখে, আমি বাজি ফেলে বলতে পারি, ও সেই আগের মতো টয়লেটে ঢুকে বসে থাকবে।

—আহা, দাদার কী দোষ? অমনি করে দাঁড় করিয়ে কেউ যদি একটার পর একটা প্রশ্ন করে যায়, খুব সাহসী মানুষও...

—দ্যাখ, ফালতু ফালতু আমার ঘাড়ে দোষ চাপাবি না, চিরশ্রী গলা তোলে, ওর বরাবরই মেঘনার ওপর একটু দুর্বলতা ছিল। আমি শুধু একটু পালিশ করে দিয়েছিলাম। সিম্পল দু'-তিনটে কোয়েশ্চন,—বলুন তো লেনিনের আসল নাম কী, চে গেভারা পেশায় কী ছিলেন, এব্রাহাম লিঙ্কন কোন সালে ক্ষমতায় আসেন! পলসায়েন্স-এর সঙ্গে প্রেম করার জন্য গলা চুলকোবে, আর এইসব বেসিক কোয়েশ্চন-এর আনসাব জানবে না, তা তো হতে পারে না।

—কী করছে রে দাদা এখন? নরম করে জিজ্ঞেস করে মেঘনা।

—কলেজে পড়ায়, সুরেন্দ্রনাথ, বটানি।

—ছেলেমেয়ে?

—দুই মেয়ে। ব্রাহ্ম গার্লস, ক্লাস ফোর, বড়টা। ছোটটা এখনও নার্সারি।

ঘড়ি দেখছিল নবনীতা, সওয়া বারো।

—তোরা কি বাথরুমে যাবি? সাবান তোয়ালে সব রাখা আছে।

—হ্যাঁ, রাতটা ট্রেনে কেটেছে, একবার বাথরুমে যেতে হবে। শাশ্বতী উঠল।

নবনীতা আর একবার রান্নাঘরে গিয়ে সব চেক করে নিল।

তিন

—জানলাটা খুলে দে না, চারিদিক বন্ধ, কেমন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কচমচ করে পান চিবোতে চিবোতে মেঘনা বলল।

খেয়ে উঠে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল।

—কিছু খুঁজছিস? নবনীতা জানতে চেয়েছিল।

—পানটান মুখশুদ্ধি কিছু নেই?

—এটা আবার কবে থেকে ধরলি?

—শাশুড়ি। নিজের ইন্টারেস্টেই আমাকে ধরিয়েছিল। তা আছে কিছু?

বাটা থেকে পান বের করতে করতে নবনীতা ভাবছিল, তারও শাশুড়ি। তবে কখনও জোর করেননি। তা ছাড়া পান চিবোনো দেখলেই নবনীতার গা ঘিনঘিন করে। কেমন জাবরকাটা জাবরকাটা লাগে।

—এদিকটা পশ্চিম। তা ছাড়া নীচেই রাস্তা, ভীষণ আওয়াজ। জানলাটা রাত না হলে খুলি না। সন্ধের পর অবশ্য আস্তে আস্তে ফাঁকা হয়ে যায়, এখনও তেমন বাড়িঘর হয়নি তো! জানলা খুলতে খুলতে নবনীতা বলল।

বিছানায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসেছে ওরা। ঠিক বসা নয়—চিরশ্রী পাশবালিশে কনুই ঠেকিয়ে আধশোয়া, শাশ্বতী দেয়ালে পিঠ হেলিয়ে সোজা, মেঘনা বুকে বালিশ নিয়ে উপুড়। নবনীতা এসে বসল ওদের দিকে ফিরে, সামান্য দূরত্বে।

—সত্যি, তুই কবে যে এত ভাল রান্না করতে শিখলি...

—সারাদিন আর তো কিচ্ছু করার নেই। তোদের মতো স্কুলকলেজে পড়াই না, চাকরি করি না। বাচ্চা সামলাই, টিভি দেখি, শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা করি। আর কাজের মধ্যে ওই, রান্না। তাও মঙ্গলাই করে, আমি শুধু দেখিয়ে দিই।

চিরশ্রী মিষ্টি হেসে বলল, কেমন সুন্দর গুছিয়ে সংসার করছিস নবনীতা। আগে হলে লোকে বলত, রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী।

—তোরা কি আজ আমার পেছনে লাগবি ঠিক করেছিস? রূপ-রূপ করছিস, নিজের মুখখানা একবার আয়নায় দেখেছিস? অমন দুর্গাপ্রতিমার মতো ঢলঢলে একখানা মুখ হাজার ঢুঁড়লেও পাওয়া যাবে না।

এতক্ষণ হাসছিল। হঠাৎই দপ করে নিভে গেল চিরশ্রী। গলা নামিয়ে বলল, অন্যে কে কী বলল তাতে কী যায় আসে রে? যে সুন্দর দেখলে ধন্য হয়ে যেতাম তার চোখেই তো...। আমি কি খুব মোটা হয়ে গেছি?

নবনীতা একবার দেখার ভান করল। বলল, তুই তো চিরকালই একটু প্লাম্প আছিস। সেটাই তোর বিউটি। আর অর্পণ তোকে আজ নতুন দেখছে না।

—মানুষ কত পালটায়! দেখার চোখও বদলায়। তখন একা আমাকে দেখত। এখন চোখের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে রিটা কামাথ্। স্লিম, স্মার্ট সেক্রেটারি।

—বললেই পারত।

—বলেছে। কাছে গেলে ঠেলে সরিয়ে দিত। রেগে গেলে বলত মুটকি, জলহস্তী, এ হিপ অব ফ্লেশ।

—তুইও তো একটু চেষ্টা করতে পারতিস?

—করেছি। জিম-এ ভর্তি হলাম। তিনমাস অনেক ঘাম ঝরিয়ে দু কেজি কমালাম। তারপর একদিন রাতে গেলাম দেখাতে।

একটু চুপ করে থাকল চিরশ্রী। তারপর বলল, অতখানি এফর্ট, ওর জন্যেই তো। একটাও কথা বলল না, উঠে চলে গেল। আমারও মাথায় রক্ত চড়ে গেল। একটা ফ্লাওয়ারভাস ভাঙলাম; যে অ্যাশট্রেটা দিয়েছিলাম অ্যানিভার্সারিতে, ছুড়ে মারলাম ওকে লক্ষ্য করে। ও-ও এসে আমার হাত মুচড়ে দিল। চিৎকার করে ধাক্কা মারতে মারতে দরজার কাছে নিয়ে গিয়ে বলল, গেট আউট।

বালিশে মুখ গুঁজেছিল চিরশ্রী। পিঠটা কাঁপছিল অল্প অল্প।

—অনেকেই বলেছিল, রাগ করেছে, দু'দিন পরেই ঠিক হয়ে যাবে। ফিরে যা, গিয়ে একটু আদরটাদর করে দে, রাগ পড়ে যাবে। আমি যাইনি। কী করে যাব? সেই রাতে আমি অর্পণের চোখে এতটুকু ভালবাসা, এতটুকু সিমপ্যাথি দেখিনি। যা ছিল তার সবটাই ঘৃণা, হেট্রেড।...মাসখানেক পর উকিলের চিঠি এল। আমি কনটেস্ট করিনি।

—তোর তো তবু থার্ডপার্সন কেউ এসে গিয়েছিল, তোর সম্বন্ধেও কিছু না কিছু অভিযোগ ছিল অর্পণের, আমার কী হল?

মেঘনার কথায় মাথা তুলল চিরশ্রী।

—ভাবতে পারিস, বত্রিশ বছরের একটা পুরুষ মানুষ, সে কী খাবে পরবে কখন বেরুবে কখন ফিরবে, এমনকী বউয়ের সঙ্গে রাতে শোবে কিনা সেটাও ঠিক করে দেবে তার মা।

তিন জনের মুখের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে মেঘনা বলে চলল, বিয়ের পর লোকে হানিমুন করতে যায়, আমরাও যাব পুরী, আনন্দে নাচছি, ওমা দেখি সবাই বাক্স গুছোচ্ছে। ছুটে গেলাম ওর কাছে, একি, আমরা একা যাচ্ছি না? ও চোখ পাকিয়ে বলল, ছিছি, লোকে কী ভাববে? পুরীতে হোটেলে একঘরে ও আর আমার শ্বশুর। অন্যঘরে একপাশে ননদ অন্যপাশে শাশুড়িকে নিয়ে শুয়ে আমি হানিমুন এনজয় করছি।

মঙ্গলা খাবার নিয়ে চলে গেছে, বাড়ি নিঝুম। এতক্ষণ দু'টো পায়রা বকবক করছিল। ওরাও উড়ে গিয়ে বসল পাশের ছাদে। আলশেয় রোদ সরে যাচ্ছে। নবনীতার একটা দুপুরকে ভরিয়ে দিতে এসেছে তিন বন্ধু।

—বেহালা থেকে বাটানগর; তাও যেতে দিত না। পড়ে গিয়ে পা ভাঙল বাবার, জানিস তো মা নেই, যেতে চাইলাম, শাশুড়ি বলল, ছোটলোকের বাড়ি কীসের যাওয়া? আড়ালে বলেছিল, কানে এসেছিল। স্কুল-মাস্টারি করে বাড়িটুকু করেছিল, আর আমার বিয়ে। তাতেই বাবা ফতুর। বছর বছর পুজোয় জামাকাপড়, বিয়ে-অন্নপ্রাশন-পৈতেয় উপহার, কোনওটাই দিয়ে উঠতে পারত না। তাই ছোটলোক। এত কষ্ট হল! একদিন দুপুরে, কাউকে কিছু না বলে, মাঝেরহাট স্টেশন থেকে বজবজ লাইনের ট্রেন ধরে সোজা বাড়ি।

নিশ্বাস নেবার জন্যে থামল মেঘনা। নিমগাছের মাথায় জড়ো হচ্ছে পাখিরা। তাদের কিচিরমিচিরে মেঘনার গলা ডুবে যাচ্ছিল।

—আমাকে দেখে কী যে খুশি হল বাবা! একা তো, খাওয়াদাওয়া যত্ন কিছুই ঠিকমতো হচ্ছিল না। মাসখানেকের মধ্যেই বাবা একটু একটু করে হাঁটতে শুরু করল। তারপর একদিন জিজ্ঞেস করল, কী ব্যাপার চিন্ময় তো একদিনও এল না। আমি কিছুই

বলিনি। নিজেই একদিন চুপিচুপি বেহালা গেল।

জানলা গলে বাইরের হিম গড়িয়ে ঢুকছে ঘরে। ঠান্ডা ঠান্ডা লাগছে। বন্ধ করে দেবে? মেঘনার যে খোলা জানলাই পছন্দ।

—ফিরে এসে শুয়ে পড়েছিল বাবা। একটা কথাও বলেনি।...ডাক্তার বলেছিল স্ট্রোক। আমি তো জানি আসলে কী।...বি.এডটা করা ছিল বাবারও একটা পরিচিতি ছিল শহরে। প্রথমে লিভ ভ্যাকেন্সিতে ঢুকলাম, পরে সেটাই পার্মানেন্ট হয়ে গেল।

—পরে খোঁজ নিসনি?

—নিয়েছি। আত্মীয়স্বজনের কাছে খুব দুর্নাম করেছে আমার। চরিত্রটরিত্র নিয়েও কালি ছিটোতে ছাড়েনি। ইদানীং শোনা যাচ্ছে শাশুড়ি নাকি আবার বিয়ে দেবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে।

—বাচ্চাটাচ্চার কথা ভাবিসনি তোরা? শাশ্বতী এতক্ষণ চুপ করে ছিল।

—এসেছিল তো একটা, বিয়ের পরে পরেই। ও জোর করল। বলল, আমরা এখন প্রিপেয়ার্ড নই। খালাস হয়ে এলাম।...ও-ই শেষ।

—একদিক থেকে অবশ্য বেঁচে গিয়েছিস তোরা, শাশ্বতী বলল। একটা সন্তানকে, তার শৈশবকে চোখের সামনে থেঁতলে যেতে দেখিসনি। মুম্বাকে নিয়ে যে যন্ত্রণায় আমি ভুগেছি, এখনও ভুগছি।

সবাই ঘুরে শাশ্বতীর দিকে ফিরল।

—কী অপরাধ ওরা করেছে বল তো? আমরাই তো ওদের পৃথিবীতে এনেছি। অথচ দ্যাখ, স্বার্থপরের মতো নিজেরটা ভাবতে গিয়ে ভুলে গেলাম, ওদেরও কিছু পাওয়ার আছে।...পোস্টডক করার আগেই মুম্বা এসে গেল। ওকে ক্রেশে রেখে দু'জনেই চলে যেতাম ইনস্টিটিউটে। রাত গভীর হলে যখন ফিরতাম, ও ঘুমিয়ে কাদা। বহুদিন হয়েছে, ঘুম থেকে তুলে টানতে টানতে নিয়ে গেছি, তখনও ঢুলছে, ফিরেছেও ঘুমোতে ঘুমোতে। আমি মা, আমাকেই চিনল না, বাবা তো বহুদূর।

—প্রদীপ্তর স্ট্রাইক করেনি কখনও?

—ও তখন উঠছে। একটা নতুন প্রজেক্ট শুরু হচ্ছে, তার মডিউল করছে, রোজ ওয়ার্কশপ নয় সেমিনার নয় কনফারেন্স। থাকতে না পেরে একদিন রাতে, বিরল সেই রাতগুলোর একটা বুঝলি, যখন আমরা ইনটিমেট হতাম, প্রদীপ্তকে বলে ফেললাম কথাটা। ও চমকে উঠল। রেগে গেল। বলল, পাগল। এই এখন? সবে ওপেনিংগুলো খুলতে শুরু করেছে, সবে পায়ের তলায় মাটি পাচ্ছি, লোকে আমার কথা শুনছে, এখন ফিরে যাব? আমি ছাড়লাম না। লেগে রইলাম। সুযোগ পেলেই কথাটা তুলতে লাগলাম। শেষ অবধি ও বলল, বেশ, তোমরা ফিরে যাও। আমি একটু গুছিয়ে নিই। একটা ভাল ওপেনিং পেলেই আমিও চলে যাব।

—চলে এলি?

—চলে এলাম। ভেতরে ভেতরে সিদ্ধান্তটা অনেক আগেই নিয়েছিলাম। মুম্বার দিকে তাকাতে পারতাম না, আয়নায় নিজেকে দেখলে স্বার্থপর দৈত্যের মতো মনে হত। ফিরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। বাবা-মা জলপাইগুড়িতে সেটলড। নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটির অফারটা পেয়ে সুবিধা হল। মুম্বাকে কনভেন্টে দিলাম। প্রদীপ্তর সঙ্গে কথা হত ই-মেইলে।

হঠাৎ কথা থামিয়ে দিল শাশ্বতী। গাছের ডালে মা পাখি ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ঘুম পাড়াচ্ছে ছোটদের, স্তিমিত হয়ে আসছে তাদের ডাক। এখনও রাস্তার আলো জ্বলেনি। ভেতরে জমাট বেঁধে যাচ্ছে অন্ধকার। আবছা দেখা যাচ্ছে শাশ্বতীকে।

—তারপর?

—তারপর কমতে লাগল সব। প্রথম দিকে কথা হত রোজ। ছ মাস যেতে না যেতেই সেটা নেমে এল সপ্তাহে। তারপর মাস, বছর। দেড় বছর হল আর যোগাযোগ নেই।...জে এন ইউর এক বন্ধু রিসেন্টলি ফিরেছে, দেখা হল। বলতে চায়নি; জোর করতে বলল, প্রদীপ্ত এখন মেক্সিকান একটা মেয়ের সঙ্গে লিভ টুগেদার করছে। ফ্যাকাল্টি পজিশন পেয়ে গেছে। ওপরে উঠে যাচ্ছে প্রদীপ্ত, ধরাছোঁয়ার বাইরে, অনেক ওপরে।

শাশ্বতী গান গাইত। ওর গান শোনার জন্যে সোশ্যালে রিইউনিয়নে ভিড় জমে যেত। প্রদীপ্তও ছিল তার মধ্যে। শেষ কথাগুলো গানের সুরের মতো অন্ধকার ঘরে রিনরিন করছিল অনেকক্ষণ। ওরা শুনল তিনজনে। প্রদীপ্ত শুনতে পেল না।

ওদের বলা শেষ হয়ে গেছে। তিনবন্ধু। তিন জনে মিলে এসেছে নবনীতার কাছে কতদিনের কত জমে থাকা কথা বলে ফেলল ওরা। এবারে নবনীতা। নবনীতার গল্প।

কী বলবে নবনীতা? অন্ধকার। দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু নবনীতা বুঝতে পারছে তিনজোড়া চোখ বিঁধে আছে তার মুখে। তিনটে মানুষ উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করছে। নবনীতার গল্পটা এবার শুরু করা উচিত।

কিন্তু কেমন হবে নবনীতার গল্প? কাল রাতেও অসহ্য সুখ শয্যা পেতেছিল এই বিছানায়! আজ সকালে পাপাইকে বাসে তুলে দেবার সময় পাপাই যখন নবনীতাকে জড়িয়ে ধরেছিল, দেরি হবে অনেকক্ষণ দেখবে না মাকে, তাই ঠোঁট ফুলিয়েছিল, বুকের মধ্যে যে ক্ষরণ শুরু হয়েছিল, সেটুকুর জন্যেই তো বেঁচে থাকা যায়। এই তো একটু আগেই শান্তর মা ফোন করেছিলেন, তাঁর স্নেহে তো কোনও খাদ ছিল না। এই ঘর-বারান্দা-ড্রয়িংরুম-কিচেনের প্রতিটি নির্মাণ তার সৃষ্টি, প্রতিটি রূপে তার তুলির স্পর্শ, প্রতিটি সৌন্দর্যে তার আবেগ। কী বলবে নবনীতা?

তিনটি মানুষ অপেক্ষা করে আছে। ক্ষতবিক্ষত তিন জন। এরা কি নবনীতার সৃষ্টির আনন্দ শুনতে এসেছে? নবনীতার পূর্ণতা কি এরা আস্বাদন করতে পারবে? অথবা নবনীতা কি তার নিজের সুখ থালায় ভরে এদের সামনে সাজিয়ে দিতে পারে?

তার চেয়ে সংসারে থাকতে থাকতে সামান্য যে ঠোকাঠুকি, দুখানা থালা-বাসনেও যে শব্দ হয় তারই একটা-দুটো বরং শুনিয়ে দেওয়া যাক।

ভাবছিল নবনীতা।

হঠাৎ অন্ধকার ছিন্ন করে চিরশ্রী বলে উঠল, কী ভাবছিস নীতা? আমরা তোর কাছে কী শুনতে এসেছি?

—আমরা দেখেছি নীতা। মানুষগুলোকে দেখা হল না। তোর সংসার দেখলাম; তোকেও। মেঘনা ফিসফিস করল।

শাশ্বতী শুরু করল, এখন মনে হয়, না-ই যদি ফিরে আসতাম। ওর কাছে কাছে থাকতাম। আমার চাকরিটা ছেড়ে দিতাম। ওকে আগলে রাখতাম। ওকে সঙ্গ দিতাম, আমি-মুগ্ধা। আসলে আমিও নিজের কথাই ভেবেছি। ভেবেছি, ও আমাকে ইগনোর

করল? ঠিক আছে, আমিও শাস্তি দেব। কত বড় শাস্তি বল তো? আমার তো না হয় মুখ্বা রইল। ওর?

—এখন ভাবি, ওইভাবে কাউকে কিছু না জানিয়ে চলে আসাটা কত বড় ভুল হয়েছিল! নিশ্চয়ই পাড়াপ্রতিবেশী-আত্মীয়স্বজনের কাছে মুখ দেখাতে পারেনি ওরা। আর এলাম যদি বা, বাবা সুস্থ হলে ফিরেও তো যেতে পারতাম। পারিনি,তার কারণ, ওই যে জেদ, আমার ইগো। এসো, আমাকে নিয়ে যাও।...আরও পিছিয়ে ভাবলে মনে হয়, ওরই বা কী দোষ বল? রাবা-মা-ভাই-বোনকে নিয়ে অতগুলো বছর কাটিয়েছে। ফেলে দেবে? আমিই কি পেরেছি? আর কটাই বা দিন? ওরা তো চিরকাল থাকবে না। থাকতামই না হয় কষ্ট করে। মেঘনা শেষ করল।

—চাইলেই কি আর একটু স্লিম হওয়া যেত না, চিরশ্রী বলল, আসলে ওইটাই, অভিমান এসে আড়াল করে দাঁড়াল। মোটা বলেই আমি খারাপ, ভালবাসাটাসা কিছু নয়? রাগ করে আরও বেশি খেয়ে আরও ওজন বাড়িয়ে ফেললাম। ও যত দূরে সরে যেতে থাকল, আমিও যেন দু'হাতে ওকে ঠেলতে লাগলাম। তারপর তো আর ফিরে যাওয়াই গেল না।

কথা থামিয়ে তিনজনেই তাকিয়ে আছে নবনীতার দিকে। রাস্তার আলো জ্বলে উঠেছে। জানলা টপকে এক কুচি আলো এসে পড়েছে। শাশ্বতীর চশমায়, মেঘনার চুলে, চিরশ্রীর কপালে। আবছা আলোয় তিজনের চোখ দেখা যাচ্ছে। টলটল করছে জল।

শাশ্বতী বলে উঠল, থেমে থেমে, যেন গান,— আমাদের চটকে যাওয়া প্রেম। শুরুটা আমরাও ভালই করেছিলাম। শেষরক্ষা করতে পারিনি। আমরা ভুলে গিয়েছিলাম, ভালবাসায় যেমন হিসেব করে তুলে নিতে হয়, ছাড়তে হয় তার চেয়ে অনেক বেশি। সেইজন্যেই তোর কাছে আসা। আমাদের অপূর্ণতা, আমাদের না পারা, আমাদের হেরে যাওয়ার গল্প,—একটা কনফেশন কোথাও না কোথাও তো করতেই হত। তুই পেরেছিস। তোর কাছেই সেগুলো বলে ফেলে আমরা হালকা হলাম।...এবারে তোর গল্পটা শুরু কর। একটা জিতে যাওয়ার গল্প। একটা সত্যি প্রেমের গল্প।

উঠে আলোগুলো জ্বেলে দিয়ে আসে নবনীতা।

বসে, তিনজনের মুখোমুখি।

গল্পটা শুরু করে দেয়।

জবরখবর

—কী হল, শুনছ? ডেকে ডেকে গলায় যে রক্ত উঠে গেল! কানে কি তুলো গুঁজে আছ?

ডেকে ডেকে নয়, গজানন পরিষ্কার শুনেছেন। আগের 'শুনছ'টা যোগ করলে এটা দ্বিতীয় বার। তাতে অবশ্য কিছু যায় আসে না। সাড়া দেবার জন্য গজানন মুখ খুললেন। আওয়াজ হল—ম্যাও।

রংটা ফর্সার দিকে, জোড়া ভুরু, চুল খুলে দিলে পিঠের ওপর ইচ্ছামতী। গজাননেরও তখন ছাব্বিশ। অগ্রপশ্চাৎ না ভেবেই ঘাড়টা নব্বই ডিগ্রি কাত করে দিয়েছিলেন। বাসরে মলিনা ডান হাতে বেলো বাজিয়ে বাঁ হাত জানলার দিকে বাড়িয়ে গেয়েছিল, জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে। ততক্ষণে বসন্তের মাতাল সমীরণ খোলা জানলা দিয়ে মাখো মাখো চাঁদের আলো বইয়ে দিচ্ছে মলিনা ও গজাননের দিকে।

চাঁদের আলো শুকিয়ে খটখটে হতে মাস দু'য়েক লাগল। সেই থেকে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক।

—সাতকড়ির ছেলের মুখেভাত। শুধু আংটি দিলে লোকে ছিছি করবে।

—পুরী কিংবা দার্জিলিং? ভূ-ভারতে বেড়াবার আর জায়গা নেই? এ বার আমরা দক্ষিণ ভারত যাব। ব্যবস্থা করো।

এমনকী রাত্তিরেও।

—ওয়াক থুঃ। মাথা থেকে পচা পাঁকের গন্ধ বেরোচ্ছে। যাও। আগে শ্যাম্পু দিয়ে মাথা পরিষ্কার করো। তারপর ড্রেসিং টেবিলের ওপর রাখা সেন্ট গায়ে ঢেলে বিছানায় এসো।

দাঁড়ানো অবস্থা থেকে নতজানু হয়েছেন গজানন। তিরিশ বছরে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতও শিখে গিয়েছেন। শরীরেও নানাবিধ পরিবর্তন লক্ষ করছেন। হাঁটাটা বদলে গিয়েছে, হাতদুটো সামনে ঝুঁকে পড়েছে, মাটিতে ঠেকাতে পারলেই যেন ভাল হয়। পিঠের নীচে শিরদাঁড়ার শেষ সীমানায় একটা কিছু গজাচ্ছে, ভয়টয় পেলে সেটা দু'পায়ের ফাঁকে ঢুকে পড়ে। গলার স্বরটাও বদলে যাচ্ছে, মলিনা ডাকলে এইমাত্র যেমন জবাব দিলেন, মিহি ও আদুরে গলায়, ম্যাও।

খাদ্যাভ্যাসেও বদল ঘটছে। পা টেনে টেনে দু'দিকে মাথা দোলাতে দোলাতে রান্নাঘরের সামনে দিয়ে যেতে যেতে একবার উঁকি দিতে ভুললেন না। কড়াইতে দুধ অথবা মাছ পড়ে থাকলে আজকাল আর সামলাতে পারেন না। মলিনা কয়েক বারই চেঁচামেচি করেছে। কোথা থেকে যে আসে বেড়ালটা! একদিন ধরতে পাই, দেখিয়ে দেব আমারই একদিন কী তোরই একদিন।

বারান্দায় মোড়া পেতে বসেছিল মলিনা। গজাননকে দাঁত দেখাল,—কাবেরী একটু আগে ফোন করেছিল। রাতেই আমি অবশ্য দেখে নিয়েছি। ঝাড়া ছ মিনিট। এটাই রেকর্ড।

মাটিতে থেবড়ে বসে পড়লেন গজানন। বাঁ হাতে জাঁতিতে সুপুরি কাটছে মলিনা, শব্দ হচ্ছে খচ খচ। আওয়াজটা বুকের মধ্যে গিয়ে ধাক্কা মারছে।

পঞ্চানন। ওরও হয়ে গেল। কাবেরী সেটাই জানিয়েছে। পড়ে রইলেন একা গজানন।

পাশাপাশি থানা। পঞ্চানন আর গজানন। দুই বউ কাবেরী আর মলিনার যত গলাগলিই থাক, গজানন আর পঞ্চাননের মধ্যে আকচাআকচি আজকের নয়। শেষ অবধি পঞ্চাননই মেরে বেরিয়ে গেল। শালা!

অবশ্য পঞ্চাননই লাস্ট। তার আগে ষষ্ঠীতলার বিভূতি, রসিকপুরের বলাই, মাচানতলার মদন। তল্লাটে কেউ বাকি নেই। আশপাশের যতগুলো থানা। কেউ বড়বাবু, কেউ মেজো, সেজো, ছোট। সরাফগঞ্জের কনস্টেবল নটবরও তো মুখ দেখিয়ে ফেলল। অবশ্য এক আধ মিনিটের বেশি কেউ নয়। পঞ্চাননই রেকর্ড। ছ ছ মিনিট।

গজাননের পাথরচাপা কপাল। খুনজখম-রাহাজানি-ডাকাতি, ওপরওলার নির্দেশমতোই গজাননেরও নির্দেশ, শতং বদ মা লিখ। খাতায় তুলো না। নো এফ আই আর। রেকর্ড বিলকুল পরিষ্কার। অঞ্চলের সমস্ত দাগি ক্রিমিনাল খোল-করতাল নিয়ে ভজন গাইছে। আইনশৃঙ্খলার হাল অতি মনোরম। যে দু-একটা চোর-গুণ্ডা-ডাকাত-ধর্ষক গাইতে জানে না, তারাও রোজ বিকেলে মাঠে মাঠে ফুটবল খেলছে। তার মানে কি গজাননের এলাকা নন্দনকানন হয়ে গেছে? মোটেই নয়। বরং অন্যান্য থানার তুলনায় গজাননের এলাকায় ওই সব দুষ্কর্ম বেশিই হয়। আসলে এখানকার মানুষগুলোই কেমন যেন!

শ্বশুরবাড়ির লোকজন বউকে মেরে ঝুলিয়ে দিয়েছে। মেয়ের বাবা পান চিবোতে চিবোতে এসে জামাইয়ের পিঠ চাপড়ে বলল, বেশ করেছ বাবাজীবন, আপদ গেছে।

পাশাপাশি তিন বাড়ি ডাকাতি এক রাতে। পরের হপ্তায় আবার ডাকাতি। সে দিন পাড়াসুদ্ধ সকলে হাজির। ওই তো জনাকয়েক খুদে প্যাকাটি মার্কা ডাকাত। ঘিরে ধরে তাড়া করে নালায় নিয়ে গিয়ে ফেলা। তারপর গণপিটুনি। ঝাড়সুদ্ধ নিকেশ। কোথায় কী! ডাকাতদের পাত পেড়ে বসিয়ে ভূরিভোজ খাইয়ে গয়নাগাটি টাকাপয়সা দিয়ে বিদেয় করতে পারলে যেন বাঁচে।

মারতে নাই যদি পারিস একটা ফোন করতে কে মাথার দিব্যি দিয়েছিল? হ্যাঁ, একটা ফোনের দূরত্ব বই তো নয়! নম্বরটা জোগাড় করে গজাননও একবার ট্রাই করেছেন। রিং হতেই ও পাশ থেকে গম্ভীর গলা,—হ্যালো, জবরখবর থেকে বলছি। বলুন কী ঘটনা? বধূহত্যা? খুন-ডাকাতি-ছিনতাই-ধর্ষণ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলে যান লিখে নিচ্ছি। ডিরেকশনটা? চিন্তা নেই, আধঘণ্টার মধ্যে আমাদের লোক পৌঁছে যাবে।

তাড়াতাড়ি ফোন নামিয়ে রেখেছেন। যদি জানাজানি হয়ে যায় ফোনটা গজাননই করেছিলেন? রিটায়ারমেন্টের আর সাত বছর।

সুকন্যার পিলানি, সবে থার্ড ইয়ার। রাজারহাটটাও বাকি। যাকগে, সবার ভাগ্যে কি সব কিছু হয়? আগে তবু সন্ধেবেলা, নিদেন পক্ষে রাত্তিরে, একবার গুটি গুটি মলিনার পায়ের কাছে বসে টিভিতে চোখ ঠেকাতেন। আজকাল এড়িয়ে চলেন। পঞ্চাননেরও হয়ে গেল। ছ ছ মিনিট জবরখবরে মুখ দেখানো বলে কথা! নাঃ, নিরাপত্তার খাতিরেই আর মলিনার পায়ের কাছে বসে টিভি দেখা যাবে না।

ক্রমশ মলিনার জাঁতির শব্দ জোরালো হচ্ছে। চোখেও কেমন হিংস্র ভাব। ধড়মড় করে উঠে পড়লেন গজানন।

—আসতে পারি?

ডান কানে দেশলাইয়ের কাঠি, ডান চোখটা খোলা মুশকিল। বাঁ চোখটা এক চতুর্থাংশ খুলে আবার বন্ধ করে ফেললেন, জ্বালাল। ছ'মাস আগে হলেও অন্য গজানন দেখে বাড়ি ফিরত লোকটা। কিন্তু উপায় নেই। একে তো গজাননের পরিবর্তনটা আজকাল দ্রুত হচ্ছে, তার চেয়েও বড় কথা মাসে মাসে এক বুকনি, না না, পুলিশ সম্বন্ধে দুর্নামটা আমাদের ঘোচাতেই হবে। জানি কিছুই পারা যাবে না, তবু ব্যবহারটা তো ভাল করতে দোষ নেই।

অফিসারের কথা শুনে টুপি নামিয়ে মুচকি হেসেছিল সকলে। ভাল ব্যবহার! তারও পাত্রভেদ আছে। এই ছেঁড়া ধুতি পাম্পশু ভাঁজকরা ছাতাকে ভাল ব্যবহার?

উত্তর দিলেন না গজানন। দেশলাইয়ের কাঠি ডান থেকে বাঁ কানে স্থানান্তরিত করার ফাঁকে ডান চোখটা অর্ধেক খুললেন।

—আজ্ঞে একটু দরকারে এসেছিলাম।

চোখের অর্ধেক খোলাতেই সাহস পেয়ে যায় লোকটা।

—বলে ফেলুন।

বলেই অবাক হয়ে দুটো চোখই খুলে ফেললেন গজানন। হল কী? কাল রাতের ধোঁকার ডালনা? পেটগরম? না হলে সাত সকালে এই ছারপোকাকে গজানন বলছেন বলে ফেলুন। এরপর তো চেয়ার এগিয়ে দেবেন, সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দেবেন, চাই কি খাতায় খচখচ অভিযোগও লিপিবদ্ধ করতে পারেন।

অবশ্য বসল না মানুষটা। মাথা নামিয়ে বলল, আমার মেয়ে শম্পা, কাছেই সুভাষনগর কলেজে পড়ে, বটানি অনার্স, সেকেন্ড ইয়ার, একা একাই কলেজে যায়, মর্নিং কলেজ...

এই আর এক জ্বালা। কোথায় শুরু করতে হয়, কতখানি বলতে হয়, আশিভাগ লোকই জানে না। পেসেন্স, গজানন পেসেন্স, পাবলিক সার্ভেন্ট তুমি, মেজাজ সংযত করো, বলতে দাও, বলে বলে সব বিষ বেরিয়ে যাক, দরকার হলে দরজা অবধি এগিয়ে দাও।

—হ্যাঁ, যা বলছিলাম, শম্পা একা যায়, ফেরেও একাই। একটা ছেলে কিছু দিন হল, যেখানে যায় পেছন পেছন বাইক নিয়ে ধাওয়া করছে। মেয়ের কলেজে যাওয়া বন্ধ। দিনরাত ঘরের ভেতর ঠকঠক করে কাঁপছে। আপনি বাঁচান দারোগাবাবু।

—বিয়ে দিয়ে দিন।

—অ্যাঁ?

—বলছি, বিয়ে দিয়ে দিন।

—চেষ্টা তো করছি। ভাল পাত্র পাওয়া কি মুখের কথা? তা ছাড়া ছেলেটা ভয় দেখিয়েছে, বিয়ের চেষ্টা করলে তুলে নিয়ে যাবে।

—অত চেষ্টাচরিত্রের দরকার কী? ওই ছেলেটার সঙ্গেই বিয়ে দিয়ে দিন।

হাঁ হয়ে গেল শম্পার বাবা।

—বলছেন কী দারোগাবাবু? ক্লাস সিক্সের বিদ্যে, বাবা সাট্টার পেন্সিলার। ওই

ছেলের সঙ্গে আমার শম্পার বিয়ে দেব?

—আলবত দেবেন, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন গজানন, অনেক সহ্য করা হয়েছে, সাত সকালে নাটক করা কাঁহাতক আর ভাল লাগে? —শুনুন মশাই, পাত্র হিসাবে এই রকম ছেলেরই আজকাল বাজারদর সব চেয়ে চড়া। আর ছোটখাটো এ সব ব্যাপারে অনর্থক থানাপুলিশ জড়াবেন না তো, আপসে মিটিয়ে নিন।

চলে গেল। যাবার আগে বলে গেল, দেশ থেকে কি আইন কানুন উঠে গেছে? আগে জানলে আসতাম না।

আইনকানুন? চেয়ারে বসতে বসতে গজানন নিজেকে শুনিয়ে বললেন, আমার এলাকায় আইনকানুন পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। এখানে আইনকানুন চিত্তমাস্টার। যে সে মাস্টার নয়, ডান বগলে হাতকাটা জগাই বাঁ চোখে বোমার টুকরো, পাজামা-পাঞ্জাবি, হাওয়াইচটি, দেশাতত্ববোধ, কাঁধে শান্তিনিকেতন, স্বাধীন ভারতবর্ষের আদর্শ মাস্টার। কোথাকার কে শম্পার বাবা...সকালের আমেজটা...মরুকগে...।

ভুলে গিয়েছিলেন। বালিতে জলের দাগ থাকে না। দুপুরে বাজার থেকে তোলা টোলা আদায় করে গাড়িতে উঠতে যাচ্ছেন বেমক্কা মুখোমুখি।

—প্রণাম কর, প্রণাম কর, দারোগাবাবু।

থাক থাক বলতে বলতেই প্রণাম শেষ। ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে, মুখের দিকে তাকাতেই বুকের ভেতর ধক করে উঠল। সুকন্যা।

শনিবারই চিঠি পেয়েছেন। পিলানিতে ভীষণ গরম বাবা, দুপুরে বেরোনো যায় না। আইসক্রিম খাচ্ছি রোজ, হি হি।

বাড়ি ফিরে ভাত নিয়ে নাড়াচাড়া করে উঠে পড়লেন। অতবড় পাবদা, ফি শনিবার কালীপদ পাঠায়, তাও কেমন বিস্বাদ ঠেকল। ঘুমটাও ভেঙে গেল বারবার।

নিজেকে বোঝালেন গজানন। এ সব ঠিক নয়। সিরিয়াল দেখে দেখে তোমার মাথাটা গেছে। এ সব সিনেমা থিয়েটারে হয়। সুকন্যা, সুকন্যা, শম্পা শম্পা। তুমিও গজানন দারোগা। সার্ভিস রুলে তোমার জন্য যা যা লেখা আছে, ওপরওয়ালার হুকুম তামিল, শিষ্টের দমন ও দুষ্টের তোষণ, মাসান্তে নিয়মিত তোলা সংগ্রহ এবং তার বিভিন্ন ভগ্নাংশ চিত্তমাস্টার ও অন্যান্য উপযুক্ত তহবিলে প্রদান, এর বাইরে তোমার কিছু করার নেই। এর পরেই লক্ষ্মণরেখা। পেরোলেই বিপদ।

অনেক বুঝিয়ে নিজেকে শান্ত করে দু'দিন পরে বেরোলেন বিকেলের হাওয়া খেতে।

ভজহরি চালায় ভাল। জোরে নয়, আস্তেও নয়। গাড়ির দুলুনি, দক্ষিণের হাওয়া, দুপুরের কাঁকড়ার ঝাল—চোখ দুটো সবে জুড়ে এসেছে, দড়াম করে ব্রেক কষল ভজহরি। মাথাটা ঠুকে গেল সামনের কাচে। দাঁতমুখ খিঁচিয়ে ভজহরিকে গালমন্দ দিতে যাচ্ছেন, চোখ আটকে গেল সামনে। একটা বডি, রাস্তা জুড়ে আড়াআড়ি শুয়ে।

ভজহরি ততক্ষণে নেমে পড়েছে। হেঁচড়ে হেঁচড়ে গজাননও নামলেন পেছুন পেছুন। অন্ধকার হয়ে এসেছে, গঙ্গার এ দিকটা নির্জন। মুখে পাঁচ ব্যাটারির টর্চটা মেরে ভজহরি বলে উঠল, লাশ নয় স্যার, জিন্দা!

গজানন ঝুঁকে পড়েছেন, ভজহরি ততক্ষণে লোকটাকে চিত করে ফেলেছে। টর্চের আলোতে গজানন চমকে উঠলেন, সেই...শম্পার বাবা।

লোকজন দেখেই কি না কে জানে! লোকটা হঠাৎই গোঙাতে শুরু করল...শম্পাকে

নিয়ে ওরা...খালের দিকে...ভাঙা গ্যারেজের দিকে...আঃ ব্যথা।

ভজহরিই লোকটাকে তুলে ফেলল পিছনের সিটে। ভারী কিছু দিয়ে মেরেছে মাথায়, কেটেকুটে গেছে, কাতরাচ্ছে, তবে মারাত্মক কিছু নয়। তা ছাড়া এ সব চিমড়ে চেহারার লোকগুলো মরে না সহজে।

—খালের ধার, ভাঙা গ্যারেজ চিনিস?

গজাননও আবছা চেনেন, ভুলেও ও দিকটা মাড়াননি কোনও দিন। ভজহরি ইতস্তত করছিল। তারও পুলিশের চাকরি কম দিন হল না। পৈতৃক প্রাণের দাম এতদিনে তারও সুদেমূলে বোঝা হয়ে গেছে। গজানন ধমক লাগালেন, হাঁ করে দেখছিস কী? চালা।

হেঁচকি তুলে গাড়ি ছুটতে লাগল উদ্দাম। পেছনের সিট থেকে ঝড়ঝড়ে গাড়ির আওয়াজ ছাপিয়ে কাতরানির আওয়াজ আসছে। হঠাৎই ভজহরি স্টার্ট বন্ধ করে দিল। পুরনো গ্যারেজ, অন্ধকারের মধ্যে অশরীরীর মতো দাঁড়িয়ে। লাফিয়ে নামলেন গজানন। বাঁ হাঁটুটা খচ করে উঠল । হোলস্টার থেকে রিভলভারটা বের করলেন। হাত ঘামছে। তিরিশ বছর যন্ত্রটায় হাত পড়েনি। ট্রিগার টিপলে গুলি বেরোয় না। বেরোলেও সামনে না গিয়ে পেছনে আসার সম্ভাবনাই বেশি। তবুও রিভলভারটা হাতে নিয়ে গ্যারেজের সামনে দাঁড়িয়ে একটা হুঙ্কার দিলেন।

গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। থার্ড ইয়ারে পড়তে সোসালে থিয়েটার করেছিলেন, দস্যু রত্নাকর। কত বছর পর এই হুঙ্কার! কেমন যেন হচ্ছে শরীরটার মধ্যে ! কাদের পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। ছুটে পালাবার শব্দ। বাইরের দরজায় একটা লাথি মারলেন। পাটা ঝনঝন করে উঠল। যন্ত্রণায় বসে পড়তে গিয়েও দেখলেন দরজাটা খুলে গেল হাঁ করে। ভেতরে ঢুকলেন। দুটো তিনটে ঘর পার হয়ে আলো। ছোট আরও একটা ঘর। ওই তো শম্পা। হাত বাঁধা, মুখে কাপড় চাপা একটা চেয়ারে কাত হয়ে বসে আছে, ওই তো সুকন্যা!

ততক্ষণে ঘরের ভেতর গিয়ে দাঁড়িয়েছেন গজানন, এক পা নড়েছ কী...।

সত্যিই ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। ভজহরির দুখানা রদ্দা গজাননের একটা থাপ্পড়। তাতেই ছেলেটা এমন কেতড়ে পড়ল, তাড়াতাড়ি ভজহরিকে বললেন দ্যাখ বাবা, বেঁচেটেচে আছে তো! শেষকালে হিউম্যান রাইটস-এ না পড়ে যাই।

ভজহরি ঘুরে এসে অভয় দিল, না স্যার! লাইনে নতুন, ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে। ঠিক হয়ে যাবে।

চেয়ারে বসে দ্রুত হিসাব করে নিচ্ছিলেন। বঙ্কিম হালদার, শম্পার বাবা, ওর ইনজুরির একটা রিপোর্ট হাসপাতালেই করিয়ে রেখেছেন, গ্রিভার্স হার্ট, সেটা সকালেই আনিয়ে নিতে হবে। ওর এজাহারটাও নেওয়া হয়নি। ওরও একটা স্টেটমেন্ট। শ্লীলতাহানি? হানি, না চেষ্টা? না না কেসটা দাঁড় করানো খুব জরুরি। নইলে কোর্টে তুললে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধরে রাখা, রংফুল কনফাইনমেন্ট, এটুকুতে জামিন অনিবার্য।

ভজহরি একবার এসে দাঁড়িয়েছিল। ওকে অনেক মনের কথা বলেন গজানন। সেই সুবাদেই ঘাড় চুলকে বলল, ইয়ে মানে জবরখবরকে একবার...

কথাটা যে গজাননেরও মাথায় আসেনি তা নয়। হ্যাঁ না কিছুই বললেন না।

বেরোতে যাবেন ফোন, চিন্তু মাস্টার।

—বলুন স্যার।

—খবর কী দারোগাবাবু?

পেটের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল গজাননের। আমাশা আমাশা ভাব। চিত্ত মাস্টারের গলা শুনে গজাননের এমনই হয়।

—খবর সব ঠিকঠাকই আছে।

—কীসের ঠিকঠাক? ভোলার ছেলেকে তুলে এনেছেন, আর বলছেন সব ঠিকঠাক?

—ভোলা? কোন ভোলা?

—সাট্টাবাজ ভোলা, রংপট্টির ভোলা পরামানিক। আপনাকে মাসে মাসে পাঁচ হাজার প্রণামী দেয়, ভুলে গেলেন? ভোলার ছেলে শম্ভুকে পুরনো গ্যারেজ থেকে আজ সন্ধেবেলা তুলে আনেননি?

শম্ভু? ভোলার ছেলে? ডান হাতটা কাঁপছে, রিসিভারটা ধরে রাখতে পারছেন না, অন্য হাতে চালান করলেন।

—কিন্তু ও তো একটা মেয়েকে অ্যাবডাক্ট করে নিয়ে গিয়েছিল। মেয়েটার বাবাকে মেরেছে, হেড ইনজুরি...

—বেশ করেছে। ইয়ং বয়সে ছেলেরা অমন একটু আধটু করেই থাকে।...ঠিক আছে, ধরে এনেছেন রাতটা থাক, দেখবেন অযত্ন যেন না হয়। কাল সকালে গাড়ি দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেবেন।

—কিন্তু, ওর নামে যে এফ আই আর করে গেছে ওরা। মিথ্যে বললেন গজানন।

—ছিঁড়ে ফেলে দিন। গর্জে উঠলেন চিত্ত, কালকেই যাতে জামিন পেয়ে যায় তার ব্যবস্থা করুন।

সারা রাত গজাননের ঘুম হল না। তিরিশ বার জল খেলেন। বাইশ বার জল বিয়োগ করলেন, বারবার পেটের চাপ হালকা করতে বাথরুমে ঢুকলেন। বার দুই গলায় আঙুল দিয়ে বমি করলেন। শেষ কালে মলিনার ঘুম ভেঙে যাবে এই ভয়ে, বারান্দায় গিয়ে বসে রইলেন।

সিনেমায় দেখা ছবির মতো বঙ্কিম চিত্ত শম্ভু মাথার মধ্যে পটাপট আসতে ও যেতে লাগল। ভোরের দিকটায় চেয়ারে বসে বসেই চোখটা জুড়ে এল। হঠাৎই শম্পাকে দেখতে পেলেন। পিলানি থেকে চিঠি লিখছে, বাবা রাত্তিরে সিনেমা দেখে ফিরছিলাম, তিনটে ছেলে গাড়ি থামিয়ে...।

ঘুম ভেঙে ধড়মড় করে উঠে বসে গজানন দেখলেন আলসেয় একটা চড়াই পাখি বসে, ঘাড় কাত করে তাঁকে দেখছে। লজ্জা পেয়ে চড়াইটাকে বলে ফেললেন, পিলানিতে শম্পা নয়, সুকন্যা থাকে।

শম্ভু জামিন পেল না।

বঙ্কিমকে একদিন ডেকে পাঠালেন গজানন। বাড়িতে রাত ঘন হলে। মলিনা কোথায় যেন গিয়েছিল, বাড়ি ফাঁকা। পরিষ্কার জিজ্ঞেস করলেন, কত তাড়াতাড়ি বিয়েটা দিতে পারবেন?

বঙ্কিম ঘাড় চুলকাল,—বলছেন দূরের পাত্র হলেই ভাল হয়। তা সে রকম একজনই আছে। প্রবাসী বাঙালি, বিলাসপুরে ওদের তিন পুরুষের ব্যবসা। দাবি দাওয়াও বিশেষ নেই। একটাই সমস্যা, বরযাত্রী আসবে একশো জন। আমার অবস্থা তো জানেন। এত কম সময়ে...

—লেগে পড়ুন। যেখানে যেটুকু কম পড়বে বলবেন, আমি আছি। মানে এখন ধার দিচ্ছি..., কথা কেড়ে নিল বঙ্কিম, 'কথা দিচ্ছি, এক বছরের মধ্যে শোধ করে দেব।'

ভজহরি আবার মনে করিয়ে দিল। ঠিকই, জবরখবর লুফে নেবে। চুলটা শেপ করে নিতে হবে, অবশ্য টুপি পরা থাকলে না হলেও চলবে। কতক্ষণ দেখাবে খবরটা? ছ'মিনিটের কম নিশ্চয়ই নয়। মলিনা কী বলবে? সুকন্যা কি খবরটা পাবে? ফোন অবধি হাত এগিয়ে গিয়েছিল, সুকন্যার মুখটা মনে আসতেই হাত টেনে নিলেন।

টিভি। বঙ্কিম-গজানন-শম্ভু হয়ে শম্পা। অপহরণ। শ্লীলতাহানির চেষ্টা। চেষ্টা না শ্লীলতাহানি? টিভিতে চেষ্টাটুকুই দেখায়। ঘটনা কি আর টিভি ক্যামেরার সামনে ঘটে? চেষ্টাতে কি খবর হয়? খবরটা হাওয়ায় উড়তে উড়তে বিলাসপুর। বিয়েটা ভেঙে যাবে। তত দিনে চিত্তমাস্টারের লম্বা হাত গারদের ভেতর থেকে টেনে বের করে এনেছে শম্ভুকে। শম্পাও যেতে শুরু করেছে কলেজে। আর একটা দুপুর। কিংবা বিকেল। রাস্তা আটকে দাঁড়াল একটা মোটর সাইকেল।...ফোন করা হল না গজাননের।

পনেরো দিন। গজাননের নির্দেশে ছবির মতো সমস্ত হয়ে গেল। গজানন অবশ্য রইলেন উইংসের আড়ালে। কেবল যাওয়ার সময় বেনারসীমোড়া শম্পা গজাননকে মস্ত একটা প্রণাম করে কেঁদে ভাসাল। গজাননও তাড়াতাড়ি রোদ-চশমায় চোখ আড়াল করে বললেন, সুখে থাকো মা।

জানতেন চিঠিটা টেবিলেই পড়েছিল। এসে খুললেন। ট্রান্সফার।

জায়গাটা মনোরম। কাছে-দূরে বন্ধু বন্ধু পাহাড়, উঁচু উঁচু গাছ, গাঢ় নীল আকাশ। বাতাসে শীত শীত ভাব, নরম রোদ্দুরে পা বাড়িয়ে বাগানে বসেছিলেন গজানন।

বড়দিনের ছুটিতে সুকন্যা আসবে। তারপরে শম্পাও। দু'জনেই চিঠি লিখেছে। শম্পা অবশ্য এখানে নয়, বাবার কাছে। চিঠি পাওয়া ইস্তক গজাননের মনটা ভাল হয়ে গেছে।

মলিনা ভাল নেই। মুখ শুকনো করে ঘুরে বেড়ায়। ঠিকই, কলকাতা থেকে এত দূর উজিয়ে কোন জবরখবর আর গজানন অবধি আসবে!

জবরখবর আসবে না, কিন্তু গজানন জানেন খবর একটা হয়েছে। হাঁটাটা বদলে গিয়েছে গজাননের, বেশ শিরদাঁড়া সোজা করে লম্বা লম্বা পা ফেলে মাথা উঁচু করে হাঁটছেন আজকাল। খাদ্যাভ্যাসে বদল ঘটেছে, হাড় চিবিয়ে মাংস খাচ্ছেন দু'বেলা। এ দিকে অপরাধ টপরাধ কমই হয়, তবু প্রয়োজন হলে ঘটনাস্থলে পৌঁছে হুঙ্কার দেন একটা, ওতেই যা কাজ হবার হয়ে যায়।

আর এই যেমন এখন, মলিনা ডাকছে, শুনেছেন আগেই, সাড়া দেওয়া হয়নি। এ বার জবাব না দিলেই নয়। দিলেন,—হালুম।

সঙ্কেত

ওকে প্রথম দেখেছিলাম, সেদিনটার কথা আমার আজও মনে আছে।

ওর চেহারায় যে তেমন কিছু বিশেষত্ব ছিল তা নয়, কথা বলার ভঙ্গিটাও ছিল খুবই বিনীত। বরং একটু বেশি নিরীহ বলে মনে হয়েছিল আমার। অবশ্য ওর ব্যাকগ্রাউন্ড, শিক্ষাদীক্ষা, সামাজিক পরিবেশ, যার কিছুই না জেনেও আমি কল্পনা করে নিতে পারি, ওকে নিরীহ ছাড়া আর কী-ই বা করতে পারত?

কিন্তু ওর সম্বন্ধে আমার এই সব ভাবনাই তো আসলে পিছিয়ে গিয়ে ভাবা, রেট্রসপেক্টিভ চিন্তা, কারণ প্রথম দর্শনে এসব কিছুই আমি ভাবিনি। তবে একটা জিনিস আমাকে ধাক্কা দিয়েছিল, হ্যাঁ, ধাক্কা কথাটাই এখানে সবচেয়ে উপযুক্ত, সেটা হল ওর চোখ।

ওর চোখের রং ছিল নীল। নীল চোখ আমি আগেও দেখেছি। টিভিতে সিনেমায় দেখেছি, বিদেশে থাকার সময় এবং পরে সাদা চামড়ার মানুষদের অনেকেরই চোখের তারায় নীলাভ ভাব লক্ষ করেছি, কিন্তু এ নীল একেবারেই আলাদা। যে দুটো নীল আমরা সচরাচর দেখে থাকি, সমুদ্রের নীল আর আকাশের নীল, তার সঙ্গেও এর কোনও মিল নেই। সমুদ্র একটু বেশি গাঢ়, আর আকাশ হালকা এভাবে বললেও সেটা অতি সরলীকরণ হয়ে যাবে। বরং এইটুকু বলা যাক ওর চোখের তারার নীল ছিল নিজস্ব।

এবং চোখের ভাষা। চোখের ভাষা পড়তে আমি চিরকালই সিদ্ধহস্ত। তাই নিয়ে জয়িতা অল্পবয়সে কম পেছনে লাগেনি। কিন্তু ওর চোখের ভাষা আমি বুঝতে পারিনি। সেখানে শোক-দুঃখ-বেদনা-আর্তি-আবেদন কিছুই ছিল না। ছিল একটা অতল ভাষাহীনতা। ওর চোখের সেই নির্ভাষ সঙ্কেত আমি বুঝতে পারিনি।

একটা মানুষের চোখ, তার মণির রং, ভেতরের ভাষা নিয়ে এতখানি কচকচি নিশ্চয়ই এতক্ষণে আপনাকে চূড়ান্ত বিরক্ত করে তুলেছে। তা হলে প্রথম পরিচয়ের মানুষটাকে দিয়েই শুরু করি।

গেটের ঠিক বাইরে ফুটপাথের ওপর বসে যে মুচি, তার সঙ্গে আমার এক ধরনের হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল। ক্রমশ সম্পর্কটা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেল। গাড়ি ছেড়ে দিয়ে ভেতরে ঢোকার আগে একবার ওর কাছে দাঁড়াতাম। ও দুবার ব্রাশ বুলিয়ে দরকার হলে এক খাবলা রং লাগিয়ে জুতোটা চকচকে করে দিত। রোজ হাত পাতত তাও নয়। যখন যা দিতাম খুশি হয়ে নিত।

সেদিন গেটের বাইরে মুচিকে দেখতে পেলাম না। জিনিসপত্র সবই যেমনকার গোছানো, মুচি নেই। একটু ইতস্তত করে ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছি, একটা আঠারো-উনিশ বছরের ছেলে এসে দাঁড়াল।

—বাবা, রাস্তার ওপারে গেছে, খইনি কিনতে। আমাকে বলে গেছে। আসুন স্যার, আমি করে দিচ্ছি।

বাবার মতোই অভ্যস্ত হাতে কালি-ক্রিম-পালিশ করে দিল। দুটো টাকা দিতে গেলাম, হাত সরিয়ে নিল।

—বাবাকেই দেবেন।

ভেতরে ঢুকে গেলাম।

ঢুকতেই যে চিন্তাটা সকাল থেকে, তাই বা কেন, বেশ কয়েকদিন আচ্ছন্ন করে রেখেছে, সেটাই আমাকে অধিকার করে নিল। মুচি, তার অনুপস্থিতি এবং ছেলে এ সবই মন থেকে মুছে গেল।

অত্রি, হ্যাঁ, ছেলেটার নাম এখনও মনে আছে। সুন্দর বাচ্চা আমরা অনেক দেখেছি, কিন্তু অমন প্রাণবন্ত ছটফটে শিশু সচরাচর নজরে পড়ে না। ভর্তি হয়েছে দিন কয়েক, কিন্তু এর মধ্যেই সবার মন জয় করে নিয়েছে।

সেভাবে ভাবতে গেলে অপারেশনটা জটিল, কয়েক ধাপে করতে হয়। খুব বেশি সার্জেন যে করতে পারে তাও নয়। কিন্তু এই জাতীয় অপারেশনই, যাকে বলে আমার চায়ের কাপ, বিদেশে যে ইউনিটে কাজ করতাম সেখানেই এই অপারেশন-এর পদ্ধতিগুলো সরলীকৃত করা হয়েছে। বছর ছয়েক ওখানে থাকার পর দেশে ফিরেও না হোক চল্লিশটা এই জাতীয় রিপেয়ার আমি করেছি। হার্ট-এর জন্মগত ত্রুটি নিয়ে যে শিশুরা এসেছে তারা ত্রুটিমুক্ত হৃদয় এবং বাবা-মায়েরা চিন্তামুক্ত হাসি নিয়ে ফিরে গেছে। আস্তে আস্তে আমার নাম বিশেষজ্ঞ হিসেবে ছড়িয়ে পড়েছে।

অত্রির আজ অপারেশন। ওর বাবা-মা'র সঙ্গে দেখা হল। ঝকঝকে হাসি ছড়িয়ে কালো মেঘ উড়িয়ে দিতে চাইলাম।

অত্রির মা বললেন, ও ভাল হয়ে যাবে তো ডাক্তারবাবু?

—নিশ্চয়ই। সেইজন্যেই তো অপারেশন।

—কোনও রিস্ক নেই তো?

প্রশ্নটা জটিল, উত্তরও আমাদের সাবধানে দিতে হয়।

বললাম, এমন কোনও অপারেশন আছে যেটায় রিস্ক নেই? টনসিল কাটতে গিয়ে রোগীর মৃত্যু হতে পারে।

অত্রির বাবা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলেন—ওভাবে জিজ্ঞেস করছ কেন? ডক্টর সরকার তো আমাদের রিস্ক বেনিফিট বুঝিয়েই দিয়েছেন। সরি ডক্টর, কিছু মনে করবেন না, মায়ের মন তো।

—জানি, সেই জন্যেই বলছি, মনকে শক্ত করুন। ভাবুন, আমরা সবাই একটা টিম। খেলতে নামছি। প্রাণপণ চেষ্টা করব, ফলের ওপর আমাদের কোনও হাত নেই।

চোখের জল চাপতে চাপতে অত্রির মা বেরিয়ে গেলেন।

সৌর এসে ডাকল, স্যার, ওরা রেডি হয়ে গেছে, আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি।

অপারেশনে কোথাও কোনও খুঁত ছিল না। আমি জানি হৃদযন্ত্রের ত্রুটিগুলো ঠিকই মেরামত করেছিলাম আমি। সব যে ঠিকঠাক হয়েছে তা চেকও করে নিয়েছিলাম। কিন্তু হঠাৎই ওর ব্লাড-প্রেসার পড়ে যেতে থাকল। অ্যানাসথেসিয়া দিচ্ছিলেন ডক্টর অধিকারী। আমাকে সতর্ক করলেন। আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করলাম। শেষে আবার খুলে দেখলাম কোনও অজ্ঞাত জায়গা থেকে রক্তপাত হচ্ছে কি না। কিছুই পাওয়া গেল না। একসময় অত্রি আমাদের সমস্ত চেষ্টার বাইরে চলে গেল।

বাইরে অপেক্ষা করছিলেন অত্রির বাবা-মা।

খারাপ খবরটা জানানোর ভার আমারই ওপর। আস্তে আস্তে সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। মাথা নিচু করলাম। আমার মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছিলেন। শুধু মা নন, বাবাও কান্নায় ভেঙে পড়লেন। পরাজিত, অবসন্ন আমি ফিরে গেলাম নিজের চেম্বারে।

পরদিন সকালে যথারীতি মুচির সামনে পা বাড়িয়ে দিয়েছি, মনটা বিষণ্ণ, জুতোয় ব্রাশ চালাতে চালাতে মুচি বলল, কাল এলেন না স্যার?

—এসেছিলাম তো! তোমার ছেলে জুতো পালিশ করে দিল। টাকা দিতে গেলাম, নিল না, বলল, বাবাকে দিয়ে দেবেন।

পকেটে হাত দিয়ে পার্স বের করছি, মুচির মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেলাম। কাজ বন্ধ করে অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে মুচি।

—আমার ছেলে? কী বলছেন স্যার?

—হ্যাঁ, তোমার ছেলে। কাল তোমার ছেলে এখানে বসেনি? যখন তুমি রাস্তার ওপারে খইনি না কি কিনতে গিয়েছিলে?

—খইনি কিনতে আমি গিয়েছিলাম, ও বাত তো ঠিক আছে। লেকিন আমার তো কোনও ছেলে নেই স্যার। আমার দুই লেড়কি। তারাও আছে বিহারে, সাসারামে। আমার ছেলে কী বলছেন স্যার।

হাসপাতালে ঢুকে দরজা খুলে নিজের চেয়ারে বসতে বসতে একটা অদ্ভুত অস্বস্তিতে ভেতরটা শিরশির করে উঠল।

মিথ্যে পরিচয় দিল, জুতো পালিশ করে দিল, পয়সাও নিতে চাইল না। কে ও?

দুই

আড়াইটে বাজল দেখে উঠে বললাম, আর দেরি করা ঠিক হবে না, আমিই গাড়ি বের করছি।

জয়িতা উল্টোদিকের সোফায় বসে ছিল, নড়াচড়ার লক্ষণ দেখাল না।

জিজ্ঞেস করলাম, কী হল? যাবে না?

—যাব। তবে তুমি চালালে সেই গাড়িতে চড়ব না। কমল না এলে ট্যাক্সি ডেকে দেবে, আমি একাই যেতে পারব।

গত বছর হঠাৎই অপারেশন করতে করতে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। ভাগ্যে সবাই সঙ্গে ছিল, ধরে করে পেসমেকার বসিয়ে দিল। সেই থেকে আমার গাড়ি চালানো বারণ। তেমন তেমন পরিস্থিতিতে জয়িতা ট্যাক্সি নিয়ে বেরোবে, তবু আমাকে স্টিয়ারিং-এ বসতে দেবে না।

কমল ছেলেটা এমনিতে ভালই। বছর চারেক হল আছে। কামাই-টামাই বিশেষ করে না। মাস দুয়েক হল বিয়ে হয়েছে। প্রথম দিকে জয়িতা ভয়ে ভয়ে ছিল, সেরেছে, এবারে নিশ্চয়ই বেনিয়ম করবে। জয়িতার আশঙ্কা শেষ অবধি অমূলক প্রমাণ হয়েছে।

আজ যে কী হল?

পইপই করে বলে দিয়েছিলাম, আড়াইটের মধ্যে না বেরোলে ট্রেন পাওয়া মুশকিল।

এতখানি রাস্তা। রাজধানী এক্সপ্রেস তো গেদে লোকাল নয়, আধঘণ্টা পরে গেলেও পাওয়া যাবে। খবরদার, লেট না হয়।

মিঠুন-ছাঁট মাথা জোরে জোরে নাড়িয়ে বলে গিয়েছিল, আমার কথার কোনওদিন খেলাপ দেখেছেন? দুটোর মধ্যে ঠিক ইন করে যাব। মালপত্র প্যাক করে দুখানা সুটকেস কার্পেটের ওপর সাজিয়ে সোফায় পা ছড়িয়ে বসে জয়িতা হাই তুলল।

—কী আর হবে? বাবুইকে ফোন করে জানিয়ে দেব, যাওয়া হল না, কাল সকালে আর স্টেশনে রিসিভ করতে আসবে না।

—খেপেছ? মেয়েটার অভিমান তো জানো। শেষে আমাদের সঙ্গেই সম্পর্ক চুকিয়ে দেবে।

—সর্বনাশ! আমি না হয় কোনওমতে মানিয়ে নেব, কিন্তু তুমি! মেয়েকে না দেখলে মেয়ের বাবা তো পাগল হয়ে যাবে?

ট্যাক্সি ডাকব বলে দরজার নবে হাত লাগিয়েছি, বেল। দরজা খুলে অবাক। কোথায় কমল?

—আমি কমলের ভাই। দাদার হঠাৎ পেট খারাপ হয়েছে, আসতে পারবে না। আমাকে বলল, শিগগির যা, নইলে ম্যাডামের আজ দিল্লি যাওয়াই হবে না...চাবিটা দিন স্যার।

জয়িতা পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

বলল, দেখেছ, কমলের কী সেন্স অব রেসপনসিবিলিটি? নিজে আসতে পারবে না, তাই ভাইকে পাঠিয়ে দিয়েছে। চলো চলো, সুটকেস দুটো একা নিতে পারবে, না আর কাউকে ডাকব?

কথা না বলে অবলীলায় দুখানা সুটকেস দু'হাতে ঝুলিয়ে ছেলেটা দরজা ঠেলে বেরিয়ে গেল।

কেন কে জানে আমার ভেতরে একটা অস্বস্তি হচ্ছিল। ছেলেটাকে পেছন থেকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার নাম কী ভাই?

ঘাড় না ঘুরিয়েই ও জবাব দিল, অমল।

—কমলের ভাই অমল, এক গাল হাসল জয়িতা।

জয়িতার দিকে তাকিয়ে বললাম, সাবধানে যেয়ো। ওকে বোলো যেন কম্পার্টমেন্টে তুলে দিয়ে আসে। আর গিয়েই ফোন কোরো।

—যেমন যেমন বলে দিয়েছি, সমস্ত ফ্রিজে রাখা আছে। সবিতা রান্না করে দেবে, কোনও অসুবিধা হলে ফোন করবে। আর রাত্তিরের ওষুধটা ভুলো না। যেতে যেতেও জয়িতা মনে করিয়ে দিল।

বহু বছর হয়ে গেল আলাদা থাকিনি। আগে হত না, এখন কেমন অসহায় লাগে, লিফটের দরজা দিয়ে আড়াল হয়ে যাওয়া অবধি জয়িতার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

দরজা বন্ধ করে ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই ফোন।

—স্যার, আমি কমল।

—কী ব্যাপার? তোমার পেট কেমন আছে?

—একটু ভাল। কিন্তু আপনি কী করে জানলেন স্যার?

—কেন, অমল, তোমার ভাই যে এসে বলল।

—কী বললেন? আমার ভাই? আমি তো বাবা-মা-র এক ছেলে স্যার। আমার কোনও ভাই-টাই...

কমলকে শেষ করতে না দিয়েই ঘটাং করে ফোন রেখে দিলাম। দরজা খুলে রেখেই লিফটের জন্য অপেক্ষা না করে ছুটতে ছুটতে নীচে নামলাম। হাঁপাতে হাঁপাতে সিকিওরিটি সদাশিবকে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, মেমসাহেবকে দেখেছ?

সেলাম করে সদাশিব বলল, হ্যাঁ সার। উনি তো এইমাত্র গাড়ি করে বেরিয়ে গেলেন।

দাঁড়িয়ে আছি, সদাশিব বলল, দু'খানা বড় বড় সুটকেস ছিল স্যার। ড্রাইভারটাও নতুন। আপনাদের কমল ছেড়ে দিয়েছে?

সদাশিবকে বললাম, শোনো গাড়ি ফিরলে ড্রাইভারকে বলবে, আমার সঙ্গে যেন দেখা করে তবে যায়। আলো না জ্বালিয়ে আচ্ছন্নের মতো বসেছিলাম, ঘণ্টাখানেক কি তারও বেশি সময়। বেল বাজতেই ছুটে গিয়ে দরজা খুললাম। সদাশিব।

আমার দিকে গাড়ির চাবি বাড়িয়ে দিয়ে বলল, আমি অনেক করে বলেছিলাম স্যার, কিছুতেই আসতে চাইল না। বলল, ভীষণ জরুরি দরকার, এখনি যেতে হবে। চাবিটা আমার হাতে দিয়ে গেল। এই নিন।

আলো জ্বালাইনি। সবিতার কাছে ডুপ্লিকেট চাবি থাকে, ঢুকে অন্ধকারে আমাকে বসে থাকতে দেখে ভূত দেখবার মতো চমকে উঠল।

—আলো না জ্বালিয়ে বসে আছেন দাদাবাবু? শরীর খারাপ?

—না, কিছু নয়, একটু চা করো সবিতা।

সবিতা চা করতে গেল। আমি টিভি অন করে নিউজ চ্যানেলে দিলাম। টিভির পর্দা জুড়ে তখন রাজধানী এক্সপ্রেস। ছিন্নভিন্ন শরীরগুলো গ্যাস কাটার দিয়ে কেটে বের করে আনছে।

প্রয়োজন ছিল না। তবু টিভিতে যে নম্বরগুলো দেখাচ্ছিল তার একটায় ফোন করলাম। পরের ফোনটা করলাম দিল্লিতে, বাবুইকে।

আর এই সমস্ত কিছুর মধ্যে আমার ভেতরে স্থির হয়ে তাকিয়েছিল অমল, তার অদ্ভুত নীল দৃষ্টি মেলে।

তিন

বাবুই ফোন করে জানিয়েছিল ওরা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, দেশে ফিরবে না। ওর স্বামী অনুভব ইউনিভার্সিটি অব মিনেসোটায় ফ্যাকাল্টি পজিশন পেয়ে গেছে। বাবুইও একটা প্রজেক্ট-এ কাজ করছে, শিগগিরই কোথাও না কোথাও অ্যাবসরবড হয়ে যাবে। আর ফিরে আসার কোনও মানে হয় না।

তারপরেই ইমেইল—জানি, তোমার একা থাকতে খুব কষ্ট হবে। তাই রোজ রাতে একটা করে মেইল পাঠাব। আর পাপড়িকে বলেছি, এভরি সানডে ও ফোনে দাদাইয়ের সঙ্গে কথা বলবে, ওকে?

জবাব দিইনি। কী বলব? তা ছাড়া তো ও অনুমতি চায়নি। সিদ্ধান্ত নিয়ে সেটা কমিউনিকেট করেছে। কষ্ট হবে পাপড়িটার জন্যে। এখন তিন। হয়তো এর পরে যখন

দেখা হবে, কে জানে কত বছর পরে, তখন চিনতেই পারবে না। ছোটদের স্মৃতি খুব পাতলা, দ্রুত বদলায়। দাদাই বলে কেউ আছে, তাই হয়তো ভুলে যাবে।

দাদাই কি থাকবে ততদিন পর্যন্ত?

আকাশ আড়াল করে মেঘ জমে থাকে, নীলটুকু আর দেখাই হয়ে ওঠে না। দিন যতখানি, রাত্রি এখন তার চেয়েও অনেক বেশি দীর্ঘ, দিনের বেলা জীবনের চলমান জলছবি চোখের সামনে দিয়ে গড়িয়ে যায়, দেখতে দেখতে সময় পার হয়ে যায়। মাথা তুলে আকাশ দেখার কথা মনেও থাকে না। রাতে তিন-চারখানা ওষুধ খেয়েও যখন ঘুমকে বশে আনতে পারি না, তখন চেয়ার টেনে ব্যালকনিতে গিয়ে বসি। আকাশের দিকে তাকালে অন্ধকার দেখতে পাই। কালো আকাশ, বারো ঘণ্টা আকাশ তো কালোই থাকে, তবু বাকি বারো ঘণ্টার পরিচয়ে আকাশ নীল। আকাশে ফুটে আছে অজস্র আলোর বিন্দু। জ্যোতির্বিজ্ঞানীর চোখে তাদের পরিচয় গ্রহ-নক্ষত্র-নীহারিকা। আমার কাছে তারা বহু দূরের, অনাত্মীয়।

আত্মীয়, এখন অনুভব করি, একজনই ছিল। হেঁটে লিফটে উঠে চলে গেল । বাবুই আইডেনটিফাই করে এসেছিল। আমি দেখতে যাইনি। এখনও ওর সেই চলে যেতে যেতে ফিরে দেখার দৃশ্যটাই আমার ভেতরে গাঁথা আছে। ওটুকুই আমার।

কখনও, মেঘ সরে গিয়ে যখন আকাশ উদোম হয়ে যায়, হঠাৎ তার তীব্র নীল এসে আমাকে নাড়িয়ে দেয়। আকাশ নয়, সমুদ্র তো নয়ই, অন্য এক নীল আমার অবচেতন থেকে মুখ বাড়ায়।

সেই দিনটা বারবার স্মৃতিতে ফিরে আসে। কমল এল না, তার বদলে এল অমল। ট্রেন ধরতে দেরি হয়ে যাচ্ছে, ড্রাইভার পৌঁছে গেছে, খুশি হবারই তো কথা। অথচ কী এক অস্বস্তি আমাকে আচ্ছন্ন করেছিল। তখন বুঝিনি। পরে চিন্তা করে দেখেছি, ভেতরে কোথাও একটা ঘণ্টা বাজছিল। মনে পড়ছিল অন্য একটা দিনের কথা। সেদিনও একজনের জায়গায় অন্য একজন কাজটা করে দিয়েছিল।

এবং আরও কিছু। প্রথম দিনটার কথা মনে পড়তেই স্মৃতির উজান বেয়ে উঠে আসছিল একটা চোখ। সেই চোখের রং নীলাভ। সেই চোখে কোনও ভাষা ছিল না। প্রথম দিন সেই চোখ দেখে কৌতূহল হয়েছিল। দ্বিতীয় দিন, যখন মনে পড়ল এই চোখ আমি আগেও দেখেছি, তখন এক তীব্র ভয় আমাকে গ্রাস করে ফেলেছিল। যেন সিদ্ধান্তে আমি পৌঁছেই গিয়েছিলাম। টিভি খুলে শুধু মিলিয়ে নেবার অপেক্ষা। টিভি আমাকে নিরাশ করেনি।

আকাশে চোখ মেলে দিই, সমুদ্রেও চোখ পেতে রাখি। সেই নীল কোথাও খুঁজে পাই না। মানুষেও। নতুন মানুষ, অচেনা কেউ, এলেই আলাপ হলেই, তার চোখের ভেতরে শুরু হয় আমার অন্বেষণ। সকলেই আমাকে নিরাশ করে।

তা হলে কি আমি মৃত্যুবিলাসী হয়ে উঠেছি? জীবন কি আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছে? বাকি ক'টা দিন কি শুধু মৃত্যুর প্রতীক্ষা করেই আমাকে কাটিয়ে দিতে হবে?

তা তো নয়। এখনও আমি হাসপাতালে যাই, রোগী দেখি, কনফারেন্স অ্যাটেন্ড করি, বিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কারে আমার সমান আগ্রহ। তার বাইরেও ভাল লেখা, ভাল সিনেমা, ভাল ছবি পড়লে বা দেখলে আমার তৃপ্তি হয়। বেঁচে থাকার সমস্ত লক্ষণই আমার অটুট। ভাবতে ভাবতে এক সময় মনে হয় আমার প্রশ্নের উত্তর আমি পেয়ে

গেছি। আমি বিজ্ঞানের ছাত্র, অনুসন্ধিৎসাই আমার চালিকাশক্তি। জীবনের দু'-দু'টো দিনে আশ্চর্য এই ঘটনা ঘটেছিল। একটি মানুষ আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল, তারপরেই ঘটে গিয়েছিল এক দুর্ঘটনা। এটা কি কেবলই কাকতালীয়, এক বিচিত্র সমাপতন? নাকি কেউ এসে আমাকে জানিয়ে দিয়েছিল, যা ঘটতে চলেছে, যা অবশ্যম্ভাবী, তার সম্ভাবনা। সে কি আমাকে সতর্ক করতে চেয়েছিল? নাকি আমাকে প্রস্তুত করতে চেয়েছিল ভয়ংকর ভবিষ্যতের জন্য?

সিঁড়ি ভাঙতে হাঁফ ধরছিল; কিংশুক আমার ছাত্র, ওর ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস, দেখে বলল, অ্যাঞ্জিওগ্রাফি করা দরকার স্যার, চিন্তা নেই, ব্যাপারটা এখন জলভাত। কবে আসবেন বলুন, আমি সব রেডি রাখব।

বাবুইকে মেইল করলাম। ও সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিল, আমার এখন মিডসেশন চলছে, যাওয়া প্রায় অসম্ভব। তাও চেষ্টা করছি। তোমার ওটা কি ডেফার করা যায় না?

জবাবে বললাম, অ্যাঞ্জিওগ্রাফি এখন একটা আউটপেশেন্ট প্রসিডিওর, অনেক জায়গায় সেইদিন ছেড়ে দেয়। সামান্য ব্যাপার, আসার কোনও দরকার নেই। পরে অপারেশন টপারেশন লাগলে জানাব, তখন আসিস।

রাত্তিরে পাপড়িকে ফোনে ধরিয়ে দিল বাবুই। অনেকক্ষণ কথা বলল, এত চমৎকার ফোন করতে পারে, তিন বছর বয়স ভাবাই যায় না।

ভারী ডোজের ওষুধ খেয়েও রাত্তিরে ঘুম এল না। বারান্দায় বসে সারারাত তারা গুনলাম। ভোরের হাওয়ায় চোখ বুজে এসেছিল, গায়ে রোদ পড়তে ঘুম ভেঙে গেল।

কিংশুক আমার জন্যেই অপেক্ষা করছিল। সামান্য যেটুকু প্রস্তুতি লাগে আগের রাতেই আমার নেওয়া ছিল। অন্যদের আগের রাতটা হাসপাতালেই কাটাতে হয়। আমার জন্যে বিশেষ ছাড়। প্রেসার পালস এসব দেখে ও নার্সকে বলল প্রিপেয়ার করে আমাকে ক্যাথল্যাব-এ পাঠিয়ে দিতে।

ট্রলিতে শুইয়ে নার্স নিয়ে যেতে চেয়েছিল। আমিই জোর করে নিজে হেঁটে গেলাম। ওটির ভেতর ঢুকে দেখলাম সবাই রেডি। টেবিলে শোয়াতে শোয়াতে কিংশুক বলল, এতদিন অন্যদের করেছেন, আজ নিজে শুতে কেমন লাগছে স্যার?

—অন্যরকম, বেশ অন্যরকম। বলে চিত হয়ে শুয়ে পড়লাম।

একজন আলো ঘুরিয়ে আনছিল আমার ওপরে।

হঠাৎই কিংশুক বলল, স্যার, আলাপ করিয়ে দিই, আমাদের নতুন টেকনিশিয়ান, অনিন্দ্যবাবু, অনিন্দ্য সেনগুপ্ত। খুব কোয়ালিফায়েড লোক, ভাস্ট এক্সপিরিয়েন্স। আজই জয়েন করলেন।

আলোর আড়াল থেকে একটা মুখ এগিয়ে এসে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। সেই নীল চোখের তারায় চোখ রেখে আমি হেসে ঘাড় নাড়লাম। চোখ ঢেকে দিল নার্স।

জীবিত

দাঁড়া তো দেখি! উঠে দাঁড়া একবার।

দাঁড়ালেন সত্যব্রত। বুক-চিতিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

—এখানে নয়, ওই রোদ্দুরে গিয়ে দাঁড়া।

বিকেলের রোদ ঘাসের ওপর শুয়ে। এগিয়ে রোদে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালেন। ছায়া পড়ল লম্বা। পৌঁছে গেল অনাদি-সুবোধ-শক্তি অবধি।

অনাদি একগাল হাসল,—আয়। এত ভাল ছায়া পড়েছে তোর, এত ঘন আর নিকষ কালো, তুই না বেঁচে পারিস?

সত্যব্রত কিছুই বুঝতে পারলেন না।

সুবোধ বলল, বেশ, ফাইনাল পরীক্ষাটা হয়ে যাক। যা, পুকুরে গিয়ে পা দুটো জলে ডুবিয়ে আয়।

শীতের বিকেল। একটু কোল্ড অ্যালার্জি আছে সত্যব্রতর। জলে পা ভিজিয়ে শেষকালে হেঁচে মরবেন নাকি! ইতস্তত করছেন, শক্তি ভরসা দিল। যা না, অত চিন্তার কী আছে?

জুতো খুললেন। মোজাও। তারপর গুটিগুটি খেলার মাঠের পেছনে বাঁধানো ঘাটে গিয়ে দু'পায়ের পাতা জলে ডুবিয়ে এলেন।

পেছন পেছন তিনজনেই এসেছিল। ভিজে পায়ে শানবাঁধানো ঘাটে উঠে আসতেই হুমড়ি খেয়ে পড়ল, হাঁট, হেঁটে দেখা একবার।

গুনে গুনে চার স্টেপ হাঁটলেন সত্যব্রত। ভিজে পা থেকে জল-ছাপ পড়ল সিমেন্টে। শার্লক হোম্‌স-এর মতো সেই দাগের তিন ইঞ্চি দূরত্বে চোখ নিয়ে গেল সুবোধ। মন দিয়ে কী দেখল; তারপর উঠে দাঁড়াল, মুখে বিজয়ীর হাসি।

—পাস।

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছিলেন সত্যব্রত। ছত্রিশ বছরের শিক্ষকজীবনে বহু পরীক্ষা নিয়েছেন। বন্ধুদের কাছে এইভাবে পরীক্ষা দিতে হবে কখনও ভাবেননি।

—বুঝতে পারলি না তো? দুটো পরীক্ষাতেই পাস করে গেলি, উইথ্ ফ্লাইং কালারস্।

—কীসের পরীক্ষা?

অনাদি বলল, প্রথম পরীক্ষা, ছায়া পড়ে কি না। যারা বেঁচে নেই তারা নিজেরাই তো ছায়া, তাদের আবার ছায়া পড়বে কী করে?

—আর পায়ের ছাপ, সুবোধ বলল, ওটাই ফাইনাল টেস্ট। ভূতেদের পায়ের ছাপ উল্টো উল্টো। তোর পায়ের ছাপ যে কোনও জীবিত মানুষের মতো, সোজা।

অতএব, তিনজনে একসঙ্গে বলে উঠল, আমরা তিনজন বিচারক, সর্বসম্মতভাবে ঘোষণা করছি, সত্যব্রত রায়, সন অব লেট পুণ্যব্রত রায়,—জীবিত।

বলেই হাসতে লাগল তিন বন্ধু।

পিত্তি জ্বলে গেল সত্যব্রতর। এই ব্যাপার! এতক্ষণ মশকরা হচ্ছিল? রেগেমেগে বাড়িমুখো হাঁটা দিলেন।

দেরিই হয়ে গেল আজ ফিরতে। শক্তি আর সুবোধ উল্টোদিকে থাকে, মাঠ থেকেই রাস্তা আলাদা হয়েছিল। অনাদি এল বটতলা অবধি। তারপর থেকে একা। কৃষ্ণপক্ষ। সূর্য ডুবে যেতেই অন্ধকার নেমে এল ঝুপ করে। ঠাণ্ডাটাও যেন বাঁশঝাড়ের ফাঁক দিয়ে গলে বেরিয়ে এল। ঝিঁঝির ডাক। রাস্তা ছেড়ে মেঠো পথ ধরবেন এবার, টর্চটা জ্বেলে নিলেন।

রিটায়ার করে কদিন মনটা খুব খারাপ হয়েছিল। হঠাৎ লোডশেডিং হলে যেমন হয়। সব অন্ধকার। চোখ সয়ে গেলে একটু একটু করে সব নজরে আসে। ক'মাসে রিটায়ার্ড লাইফটাও মানিয়ে নিয়েছেন। শক্তি-সুবোধরা আছে; বত্রিশ বছর জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে মায়া; সমাপ্তি, ছোটমেয়ে, ফাইনাল ইয়ার এম এ, লম্বা ছুটিতে হোস্টেল থেকে বাড়ি আসে; আর আছে ছাত্র-ছাত্রীরা। টিউশনি করেননি, বারো মাস তিনশো পঁয়ষট্টি দিন ওদের জন্যে দরজা খোলাই ছিল। সে দরজা বন্ধ করার প্রয়োজন হয়নি।

প্রেশারটা সামান্য বেড়েছে, সকালে একখানা বড়ি গেলায় মায়া জোর করে। তা ছাড়া সব কিছুই একদম ঠিকঠাক। তিন মাইল একদমে যেতে পারেন, আধসের মাংস একপাতে খেয়েও ঢেঁকুর তুলতে হয় না, কাগজ পড়তে চশমা একখানা লাগে বটে, কিন্তু এই যে ভরসন্ধেয় অন্ধকারে বাড়ি ফিরছেন, কোথাও ঠোকা-টোকা খেতে হয় না তো! দাঁত একখানাই নড়ছে কষের, একষট্টিতে যে-কটা চুল পাকার কথা তার চেয়ে একটাও বেশি পাকেনি। সপ্তাহে অন্তত একদিন রাত্তিরে মায়াকে জ্বালাতন করেন, শরীরের অন্য দিকটার স্বাস্থ্যও অটুট।

অবশ্য ডিপ্রেশন সামান্য হয়েছিল। মণীশ-রতীশ, দুই সন্তানই কৃতী, মণীশ পুনে, রতীশ ফিলাডেলফিয়া। দুজনেই নিয়মিত টাকা পাঠায়। সত্যব্রত নেবেন না, তাই টাকা আসে মায়ার নামে। কিন্তু নিজের উপার্জনের অর্থ, আর ছেলেদের পাঠানো টাকা, দুয়ের তফাত বুঝতে বয়েসটা একষট্টি বছর পার করতে হয় না। তা ছাড়া সমাপ্তির হোস্টেল—বইপত্র-পরীক্ষার ফি। বেশি বয়সের সন্তান, সাধ করে পৃথিবীতে যখন এনেছেন, দায়টা তাঁরই ওপর বর্তায়।

সমরেশ, এইট্টি টু-র ব্যাচ, এখন ডি আই অফিসে আছে, সত্যব্রত জানতেন না। দেখতে পেয়ে টেবিল ছেড়ে উঠে এসে প্রণাম করল। তারপর সত্যব্রতকে আর মাথা ঘামাতে হয়নি। বাড়িতে যেদিন চিঠিটা পৌঁছুল, বন্ধুরা দেখে অবাক,—বলিস কী? এক বছর পুরোতে না পুরোতেই পেনশন? তুই কি গিনেস বুকে নাম তুলবি নাকি রে সত্য?

মনটা হালকা হয়ে গিয়েছিল, ফুরফুরে। চিন্তামুক্তি। ফ্যাকড়া বাধাল একটা কাগজ। লাইফ সার্টিফিকেট। সত্যব্রত রায়, রিটায়ার্ড হেডমাস্টার নারাণপুর হাই স্কুল, তিনি যে এখনও জীবিত, তার প্রমাণ চাই।

সবাই অবশ্য অভয় দিয়েছে। চিন্তার কিছু নেই, নিছকই নিয়মরক্ষা। ট্রেজারি অফিসে একবার কষ্ট করে হাজিরা দিতে হবে। অফিসার, জিজ্ঞেস করতে হয় তাই, জানতে চাইবেন, আপনিই সত্যব্রত রায়? একবার ঘাড় নেড়ে দিলেই ব্যস, এক বছরের জন্য নিশ্চিন্ত। সরকারি পয়সা গড়গড় করে আসতে থাকবে।

চেনাজানার মধ্যে অনন্ত গোঁসাই, হরিমতী ইস্কুলের পণ্ডিতমশাই, গিয়ে সইসাবুদ করে টাকা পেতেও শুরু করেছে। সবই ঠিক আছে, তবু কেমন ভয় ভয় করছে সত্যব্রতর। ইন্টারভিউ? এই বয়সে? চিরটাকাল পরীক্ষা নিয়েই এসেছেন। পরীক্ষা দিতে গিয়ে বেফাঁস যদি কিছু বলে ফেলেন! ভাবতে গিয়ে মাঝে মাঝেই তালু ঘেমে জিভ শুকিয়ে একসা।

ভাবনাটা নিজের ভেতর চেপে রেখেছিলেন। আজ আর থাকতে না পেরে বিকেলের আড্ডায় বন্ধুদের বলে ফেললেন। ওরা কি আজকের বন্ধু? বলে হালকা লেগেছিল, ভেবেছিলেন বন্ধুরা অভয় দেবে। তা দিয়েছে। কিন্তু ওই যে পরীক্ষা নেওয়া! প্রথমে সিরিয়াসলি নিয়েছিলেন, যা বলেছে করে গেছেন। শেষকালে হাসি দেখেই বুঝতে পেরেছেন। সব মশকরা।

তবু এখন, এই একলা হাঁটতে হাঁটতে মনে হল, চিন্তার ভারটা সত্যিই অনেকখানি নেমে গেছে মাথা থেকে।

বাসটা ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেল। চলন্ত গাড়িতে ঘুমের এই দোষ, গাড়ি থামল ঘুমও গেল চটকে। বাইরে তাকিয়েই মন ভাল হয়ে গেল। কচি ডাবের মতো একটা সকাল এক্ষুনি কে যেন দায়ের এক কোপে কেটে জানলা দিয়ে বাড়িয়ে দিয়েছে। লোভে পড়ে গেলেন। গুটিগুটি বাস থেকে নেমে রোদে গিয়ে দাঁড়াতেই শীতটাও পেঁয়াজের কোয়ার মতো গা থেকে খসে পড়তে লাগল।

আসলে ওটা শীত ছিল না, ভয়; এখন বুঝতে পারছেন। রাত্তিরে কতবার যে উঠেছেন, জল খেয়েছেন, বাথরুমে গেছেন, আর ঘড়ি দেখেছেন। এপাশ ওপাশ করতে করতে ভেবে গেছেন, কী জিজ্ঞেস করবে? কেমন মানুষ হবে? যদি অপমানিত বোধ করেন? যদি গুলিয়ে ফেলেন?

এই করতে করতেই রাত পুরিয়ে ভোর। গরম জলে স্নান করে ধুতি-পাঞ্জাবির ওপর সোয়েটার-শাল জড়িয়েও শীতটা যেন কাটছিল না। বেরুনোর সময় মায়া মাফলারটাও দিয়ে দিল জোর করে; বলল, বাসের জানলা তুলে বোসো কান-গলা ঢেকে। বাইরে পা দিয়ে পেছনে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা মায়ার দিকে চেয়ে সত্যব্রতর তীব্র ইচ্ছা হল, ফিরে যান, কাজ নেই গিয়ে।

বাসে উঠে ঢেকে-ঢুকে বসে সত্যব্রত কিন্তু সাহস পেয়ে গেলেন। হঠাৎ মনে হল, কী এমন জলে পড়ে আছেন যে ভয় পেতে হবে? উলটোপালটা জিজ্ঞেস করলে সটান উঠে চলে আসবেন, রইল তোমাদের পেনশন। রাতের জাগরণ, বাসের দুলুনি, আর ফিরে পাওয়া সাহস, তিনে মিলে এক সময় সত্যব্রতর চোখের পাতা বন্ধ করে দিল। বাস থামতে ঘুম ভেঙে গেল।

চা-ফুলুরি-বেগুনি-আলুরচপ-ফুলকপি-সজনেডাটা-মুলো, এবং ছড়ানো-ছিটানো মানুষ। জায়গার নাম বারো মাইল। এখান থেকে সদর বারো মাইল, তাই সহজ নাম। গঞ্জ এলাকা, শনি-মঙ্গল হাট, কাছেই মাললক্ষ্মী হ্যাচারি, কলকাতায় মাল চালান যায়।

ড্রাইভারের চা-খাওয়া শেষ। তার অর্থ বাস ছাড়ার সময় হয়েছে। কন্ডাক্টর হেঁকে প্যাসেঞ্জার তুলছে, সত্যব্রত ভিড় হবার আগেই বাসে উঠে পড়লেন। ভেতরে ঢুকেই চোখ আটকে গেল।

—কী ভাই আপনারা নামলেন না? বলেই ফেললেন শেষ পর্যন্ত।

উসকো খুসকো চুল, না ঘুমনো লালচে চোখ, তিনদিনের খরখরে দাড়ি, তিরিশের আশপাশে দু'জনকে এদিককার মনে হয় না। তবু বাইরে অমন চমৎকার রোদ্দুর, দু'জনে যেন পাহারা দেবার জন্যে বাস আগলে বসে রইল। গ্রামের মানুষ সত্যব্রত, না বলে পারলেন না।

আধখানা হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে দুজনে তাকিয়ে রইল সত্যব্রতর দিকে, জবাব দিল না। অপ্রস্তুত হয়ে নিজের সিট খুঁজে বসে পড়লেন সত্যব্রত।

ঘুম ছেড়ে গেছে সবার। বাস চলেছে উত্তর থেকে দক্ষিণে। বাসের বাঁদিকে মেয়েরা বসেছে যে পাশটায়, জানলা গলে রোদ আসছে। হাওয়াতে শীতের কামড় এখন অনেক কম, জানলার পাল্লা নামিয়ে দিলেন সত্যব্রত।

এখান থেকে রাস্তার দু'পাশে জঙ্গল। শাল-শিশু-অশ্বত্থ-জারুল। ক্যানেলের দুধারে সামাজিক বনসৃজন—বাবলা, ইউক্যালিপটাস। কোনও কোনও জায়গায় ঘন গাছের মাথা টপকে রোদ পৌঁছচ্ছে না, রাস্তা ছায়ায় ঢাকা।

আবার ভাবনাটা ফিরে আসছিল। সেই এক ভাবনা। না এলেই ভাল হত। কী দরকার ছিল শুধু শুধু—?

অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন, বাসটা জোরে ব্রেক কষতেই ঠকাস করে মাথাটা ঠুকে গেল সামনের সিটে। অনেকে ছিটকে পড়েছে সিট থেকে। বাস দাঁড়িয়ে গেছে। ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে কেউ কেউ বকতে শুরু করেছে ড্রাইভারকে। ড্রাইভার কোনও জবাব দিচ্ছে না।

হঠাৎ সবার কথা বন্ধ হয়ে গেল। সামনের গেট খুলে উঠে এসেছে চারজন। মুখ রুমাল দিয়ে বাঁধা, হাতে যে জিনিসটা ধরা, ছবিতে বহুবার দেখেছেন, চিনতে অসুবিধা হল না।

কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই বাসের ভেতর বসে থাকা সেই দু'জনের একজন উঠে দাঁড়াল। অন্যজন লুকোতে গেল সিটের আড়ালে। ছুটে এল ওরা। কপালে নল ঠেকিয়ে বলল, ঝামেলা বাড়াস না, নেমে আয়। তারপর ধাক্কা দিতে দিতে দু'জনকে নামিয়ে নিয়ে গেল।

পাশ থেকে একজন ফিসফিস করল, দেখেছেন কীভাবে রাস্তা আটকে রেখেছে?

ঘাড় উঁচু করে সত্যব্রত দেখলেন, তিনটে মোটরবাইক আড়াআড়ি দাঁড় করানো রাস্তায়।

ততক্ষণে ছেলে দুটোকে রাস্তার ধারে এনে ফেলেছে ওরা। বাসের যেদিকে সত্যব্রতরা বসে আছেন সেই দিকে, কয়েক হাত দূরেই ঘটে যাচ্ছে সমস্ত। ঘিরে ফেলেছে ওদের। রাস্তার ধার থেকে জঙ্গল গড়িয়ে গেছে পশ্চিমে। তারই মধ্যে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে দু'জনকে। ছটফট করছে, হাত ছাড়িয়ে পালাতে চাইছে ওরা। শক্ত করে ধরে আছে পিছন থেকে। একজন ঘুরে দাঁড়িয়ে কী যেন বলতে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ওদের কেউ ছুটে গিয়ে লাথি কষাল পেটে। বসে পড়ল ছেলেটা, বমি করতে লাগল। সেই সুযোগে হাত ছাড়িয়ে পালাতে গেল অন্যজন।

ওরা আর দেরি করল না।

ছুটছিল যে, প্রথম গুলিটা তার পিঠে লাগল। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে, উঠতে

গেল, আবার গুলি। ততক্ষণে অন্যজনের কপালে নল ঠেকিয়ে ট্রিগার টেনে দিয়েছে আর একজন। বড় বড় গাছের নীচে অন্ধকার, ঝোপঝাড়ের ভেতরে কোথাও পড়ে আছে দুটো-শরীর, দেখা যাচ্ছে না। নিশ্চিন্ত হবার জন্যে ঝুঁকে পড়ে আরও কয়েকটা গুলি ভরে দিল ওরা। তারপর হাত মুছতে মুছতে রাস্তায় উঠে দাঁড় করানো মোটর সাইকেলে স্টার্ট দিয়ে উধাও হয়ে গেল দূরে।

পাঁচ মিনিট কি আরও কম সময়! একটাও গাড়ি এর মধ্যে যায়নি সামনে থেকে পিছনে বা উলটোদিকে। এই রাস্তায় এই সময় যান চলাচল এমনিই কম। রাস্তা ফাঁকা। পাতার ফাঁক দিয়ে আলো এসে পড়েছে রাস্তায়, পাখি ডাকছে। আকাশ তেমনি নীল, বয়ে আসছে ঝিরঝিরে হাওয়া।

বাসের ভেতর সবাই যেন নিশ্বাস বন্ধ করে বসে ছিল। মোটর সাইকেলের আওয়াজ মিলিয়ে যেতেই সকলে ধড়মড় করে উঠে বসল। একজন তেড়ে গেল ড্রাইভারের দিকে,—দেখছ কি হাবার মতো? রাস্তা ফাঁকা, জলদি চালাও।

বাসটাও যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ গর্জে উঠল, তারপর ছুটতে শুরু করল পাগলের মতো। চলে যেতে যেতে অন্য সকলের সঙ্গে সত্যব্রতও ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন, গাছের নীচে অন্ধকার, কোথাও এতটুকু আলোড়ন নেই, কোনও আর্তনাদও ভেসে আসছে না। পড়ে আছে দুটো মানুষ, মানুষ নয় এখন লাশ, রক্তে ভেসে যাচ্ছে চারদিক, যে রক্তে এখনও জীবনের উত্তাপ। শেষটুকু দেখা যাচ্ছে না, অথচ সকলেই দেখতে পাচ্ছিল পরিষ্কার।

উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে বাস যখন শহরে ঢুকল, তখনও সকলের চোখেমুখে আতঙ্ক। একটা পাক খেয়ে বাসটা স্ট্যান্ডে ঢুকতেই নামবার জন্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। যেন এখনও তাড়া করছে রুমালে মুখ ঢাকা ঘাতক। যেন এখনই না নেমে গেলে প্রত্যেকের ঘটে যাবে ওই রকমই ভয়ঙ্কর কিছু। ত্রস্ত একদল মানুষ এতটুকু সময় নষ্ট না করে বাস থেকে নেমে দ্রুত ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল। বসে রইলেন সত্যব্রত, একা।

বাস থামিয়েই নেমে গেছে ড্রাইভার। কনডাক্টর টিকিট, কাঁধের ব্যাগ রাখবার জন্যে বাসের কেবিনে ঢুকেছিল, সত্যব্রতকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল,—বাস আর যাবে না, নেমে পড়ুন।

সত্যব্রত যেন ঘোর থেকে উঠলেন,—এই যাই, বলে উঠে দাঁড়াতে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়লেন।

—শরীর খারাপ লাগছে? ধরব? ছেলেটা এগিয়ে এল।

—না না, ঠিক আছে, বলে চেষ্টা করে উঠে দাঁড়ালেন সত্যব্রত। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে পায়ে সামান্য জোর এল, আস্তে আস্তে গেটের দিকে এগোলেন। বাস থেকে নেমে মনে হল আর পারবেন না, দুখানা পায়ে যেন পাথর বাঁধা, এখনই বসা দরকার। সামনেই মিষ্টির দোকান, কয়েকটা চেয়ার পাতা, তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়লেন।

বসলেন, কিন্তু অস্বস্তিটা গেল না। বেশ গরম লাগছে। একে একে মাফলার, শাল, সোয়েটার সব খুলে পাশে রাখলেন। তবু গরমটা যেন কাটছে না। ঘাম হচ্ছে অল্প অল্প, ফ্যানটা চালিয়ে দিতে বলবেন?

হাতের ইশারায় টেবিল মুছছিল যে ছেলেটা তাকে ডাকলেন। এক গ্লাস জল দিতে বললেন। জল নিয়ে অন্য আর একজন এল, মাঝবয়েসী। টেবিলে গ্লাস নামিয়ে জিজ্ঞেস

করল, বলুন স্যার, কী দেব?

মাথা তুললেন সত্যব্রত। ঠিকই তো! বসতে জায়গা দিয়েছে, জল চাইতে জল এনে দিয়েছে, এখন কিছু না খেলেই যে নয়!

পেটটা বোঝাই, যেন গলার কাছে আটকে আছে সব; ভেবেচিন্তে এক ভাঁড় দই দিতে বললেন। তারপর গলা তুলে বললেন, ফ্রিজের নয়, বাইরে থেকে দেবেন। বাইরে রোদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ দৃশ্যটা মনে পড়ে গেল।

আচ্ছা, ছেলে দুটো কি বেঁচে ছিল তখনও?

হাত-পা যেন অবশ হয়ে গেল সত্যব্রতর।

এমনও তো হতে পারে, শরীরে প্রাণ ছিল। বাসে তুলে তাড়াতাড়ি শহরে এনে ফেললে, তখন তখনই হাসপাতালে ভর্তি করলে, বেঁচেও যেতে পারত ওরা।

অসম্ভব! নিজেকে বোঝান সত্যব্রত। অত কাছ থেকে অতগুলো গুলি, কেউ বাঁচে? তার ওপর বারো মাইল রাস্তা, কম করেও আধঘণ্টা, শরীরের সব রক্ত রাস্তাতেই ঝরে যেত। আর হাসপাতালে? রক্ত জোগাড়, ভর্তি, অপারেশন কম করেও তিন-চার ঘণ্টার ধাক্কা। না, কোনওভাবেই ওদের বাঁচানো সম্ভব ছিল না।

দই দিয়ে গেল লোকটা। বলল ফ্রিজের নয়, তবু কী ঠাণ্ডা! থাক্ গরম হোক, একটু একটু করে গলিয়ে গলিয়ে খাবেন।

দই থেকে চোখ সরাতেই ছেলে দুটো ফিরে এল। হ্যাঁ, ওরা মরতই। তুলে আনলেও মরত। নিজেরা তো মরতই, বিপদে ফেলে দিত বাসের সমস্ত যাত্রীকে। থানা-পুলিশ-জিজ্ঞাসাবাদ। দিনের সমস্ত কাজ পণ্ড হয়ে যেত। অতএব সেই মুহূর্তে যা করা উচিত ছিল তা-ই করা হয়েছে, ফুলস্পিডে গাড়ি চালিয়ে চলে আসা। এতে কোনও অন্যায় নেই।

কিন্তু তার আগে? যখন প্রাণ ছিল ছেলে দুটোর শরীরে? শরীর ঝাঁঝরা করে গুলি ঢোকেনি? কিংবা আরও আগে, বাস থেকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে যখন, সকলের চোখের সামনে?

বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল আবার। ভাঁড়টা টেনে নিয়ে খেতে গিয়েও আবার সরিয়ে রাখলেন।

ছেলে দুটো কি কিছু আন্দাজ করেছিল? বাস থেকে একবারও নামেনি, কথাও বলেনি কারও সঙ্গে। বসেছিল চুপচাপ, কেমন যেন সন্ত্রস্ত। ওরা কারা? কোথা থেকে এসেছিল?

—খাচ্ছেন না স্যার? দই খারাপ? কিছু পড়েছে? পাল্টে দেব?

মালিক নিজেই উঠে এসেছে, ঝুঁকে জিজ্ঞেস করছে, গলায় আত্মীয়তা। বিব্রত হলেন সত্যব্রত। বললেন, না না, ঠিক আছে, চমৎকার দই। আর এক গ্লাস জল দিতে বলবেন ভাই?

জল আনিয়ে মালিক আবার কাউন্টারে গিয়ে বসল, ঢক্‌ঢক্ করে গ্লাসের জল সবটুকু ভেতরে ঢেলে শান্তি হল। কাঠের চামচে সামান্য দই ভেঙে মুখে দিলেন।

ঠিক কতজন ছিল ওরা? চারজন ভেতরে এসেছিল। বাইরে দাঁড়িয়েছিল আরও জনা তিনেক। সব মিলিয়ে সাত-আটজনের বেশি হবে না। আর ভেতরে কতজন ছিলেন তাঁরা?

দইটা কি টক? গলার কাছে টকটক জল উঠে এল খানিকটা। পেটের ওপর দিকটা মুচড়ে উঠল।

জনা চল্লিশ প্যাসেঞ্জার, ড্রাইভার, হেলপার, কনডাক্টর, ড্রাইভারের কেবিনেও দু-তিনজন বসেছিল নিশ্চয়। সব মিলিয়ে প্রায় পঞ্চাশজন। পারা যেত না? পঞ্চাশজন তাড়া করলে পারত ওরা? ওই তো রোগা হাড়জিরজিরে চেহারা। সত্যব্রত যে সত্যব্রত, এই একষট্টি বছরেও যে কোনও একটাকে জাপটে ধরলে সাধ্য ছিল ছাড়িয়ে পালায়?

গলার টক জলটা এক চামচ দইয়ে নামিয়ে দিতে দিতে জোর গলায় সত্যব্রত নিজেকে বললেন, কোনও মতেই সম্ভব ছিল না। সাতজন বনাম পঞ্চাশজন। এই হিসাবটাই ভুল। শুধু সাতজন নয়, সশস্ত্র সাতজন। ওদের শক্তি যন্ত্রে। এক একটা অস্ত্র পাঁচ-ছ'জনের মহড়া নিয়ে নিত। কতজন মারা গেছে?—দু'জন। রুখে দাঁড়াতে গেলে বিশটা লাশ পড়ে থাকত ওইখানে। বাসের প্রত্যেকটা প্যাসেঞ্জার এই সহজ সত্যটা বুঝতে পেরেছিল। কেউ কোনও প্রতিবাদ করেনি। কেউ ঝুঁকি নিতে যায়নি। অপেক্ষা করেছে। সমস্ত ঘটে গেলে যত দ্রুত সম্ভব জায়গাটা ছেড়ে চলে যেতে চেয়েছে। এতে কোনও অন্যায় নেই।

বমিটা উঠেই এল শেষ পর্যন্ত। ছুটে বাইরে গেলেন। লাগোয়া কাঁচা নর্দমা, ধারে বসে ওয়াক ওয়াক করে খানিকটা ছানা-কাটা জল তুললেন। মালিক ছুটে এল। পিঠে হাত রেখে জিজ্ঞেস করল, শরীর খারাপ লাগছে? শোবেন একটু?

সত্যব্রত কথা বলতে পারছিলেন না। দরদর করে ঘাম হচ্ছিল। শালটা ভেতরেই খুলে এসেছিলেন। এখন মনে হচ্ছে জামা-গেঞ্জি সব খুলে ফেললেই ভাল হয়।

মালিক হাঁকডাক করে কয়েকটা টেবিল জড়ো করে ফেলল। ধরাধরি করে টেবিলে শোয়ানো হল তাঁকে। হাত-পাখা নিয়ে মাথায় হাওয়া করতে এল একজন। মালিক পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, কোনও চিন্তা নেই। পেট গরম হয়েছিল, সব বেরিয়ে গেছে। এবার দেহটা সুস্থির হবে। একটু জিরিয়ে নিন, ঘোলের শরবত করে রাখছি, খেলেই শরীর ঠাণ্ডা হবে।

ঘোরের মধ্যেও, শরীরময় এক অস্থির দাপাদাপি সামলাতে সামলাতে এক অদ্ভুত চিন্তা আচ্ছন্ন করে সত্যব্রতকে। মিষ্টির দোকানের মালিকের দিকে তাকান। কালো সাদামাঠা চেহারা, কাঁচাপাকা গোঁফ, মধ্যবয়সী মানুষটার চওড়া কপাল গিয়ে শেষ হয়েছে বিরলকেশ বেঢপ একটা মাথায়। কিন্তু কপালের নীচেই রয়েছে এক জোড়া চোখ, সেই চোখে অপরিচিত একটা মানুষের জন্য টলটল করছে সহানুভূতি। সত্যব্রতর মনে হয়, হঠাৎই এই লোকটা যদি বাসে তাদের সহযাত্রী হত, সেও কি একই রকম ব্যবহার করত? প্রাণ বাঁচাতে মরিয়া আর পঞ্চাশজনের মতো পালিয়ে আসত? নাকি বুক চিতিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলত, খবরদার, আমাকে না মেরে কেউ ওদের গায়ে হাত দিতে পারবে না।

কী যেন হতে থাকে ভেতরে। ছবির মতো দেখতে পান, ক্লাসে পড়াচ্ছেন সত্যব্রত, সামনে চল্লিশটা নিষ্পাপ শিশু। মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছে সবাই সত্যব্রত বলে চলেছেন, একটি জীবকোষ-প্রোটোপ্লাজম—তার গমন-চলন-বংশবৃদ্ধিই শুধু জীবনের লক্ষণ হতে পারে না। জীবনের লক্ষণ প্রতিবাদ। জীবিত প্রাণী মাত্রেই প্রতিবাদ করে। আর মানুষই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ প্রাণী।

একদিন নয়, বছরের পর বছর একই কথা আউড়ে গেছেন সত্যব্রত। মাথা নামিয়ে শুনে গেছে ছাত্রছাত্রীরা, শ্রদ্ধায় ভক্তিতে নুয়ে পড়েছে।

সত্যব্রতও কি পারতেন না ছেলে দুটোকে আড়াল করে উঠে দাঁড়াতে? বলতে, আগে

আমাকে মারো। এমন তো হতেও পারত, তাঁকে দেখেই বাসের অন্য সমস্ত যাত্রীও উঠে দাঁড়িয়েছে। একটা সমবেত গর্জন। ভয় পেয়ে যাচ্ছে ওরা। পিছিয়ে যাচ্ছে। নেমে যাচ্ছে বাস থেকে। বাইকের গর্জন, মিলিয়ে গেল দূরে। কাজ অসমাপ্ত রেখেই ফিরে গেল ওরা।

আর যদি তা না-ই হত? সকলে যদি বসেই থাকত স্থাণু হয়ে, কী এমন ইতরবিশেষ হত? একটা বেশি গুলি খরচ হত। ছেলে দুটোর পাশে তিনিও না হয় শুয়ে থাকতেন ঘাসের বিছানায়। একষট্টি বছরের এক বৃদ্ধের মৃত্যু, কতটুকু ক্ষতিবৃদ্ধি হত তাতে?

সত্যব্রত পারেননি। বন্ধ ঘরে বসে বাণী বিতরণ করেছেন। কিন্তু প্রয়োজন যখন হয়েছে, নিজের প্রাণ খাঁচায় আগলে পালিয়ে গেছেন সত্যব্রত, আর সেইজন্যই দু-দুটো তাজা প্রাণকে উপড়ে ফেলে সবার সামনে দিয়ে নিশ্চিন্তে হেঁটে গেছে ঘাতকের দল।

এবং বেঁচে আছেন সত্যব্রত এখনও।

সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে পড়লেন সত্যব্রত। ওপরে তাকালেন। অতখানি? অতগুলো সিঁড়ি? পারবেন?

হাঁটু দুটো নড়বড় করছে, বুকের ভেতরে হাতুড়ির আওয়াজ, বমি ভাবটা এখনও যায়নি। ফিরে যাবেন?

এত দূর এসে? এত কিছুর পরেও? ঘড়ি দেখলেন, সাড়ে এগারোটা। বেলা হয়ে যাচ্ছে। এরপর অফিসার বেরিয়ে গেলে আর ধরা যাবে না। দিনটাই নষ্ট।

কোনওরকমে রেলিং ধরে ধরে দোতলায় উঠলেন, দেয়াল ধরে খানিকক্ষণ দম নিলেন। সামনের বেঞ্চিতে বসে একজন বিড়ি টানছিল, তাঁকে দেখে দয়া হল বোধহয়, সরে গিয়ে জায়গা দিল। পাশে বসে খানিকক্ষণ বাদে দম ফিরে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন। মুখ থেকে বিড়ি নামিয়ে জবাব দিল, ওই যে বারান্দার শেষে সবুজ পর্দা, ওই ঘর। যান না, যান। স্যার লোক ভাল, কিছু বলবে না।

ভরসা পেয়ে পায়ে জোর এল খানিক। গুটিগুটি এগোলেন। পর্দা সরিয়ে ভেতরে উঁকি দিলেন। প্যান্টশার্ট, হাতকাটা সোয়েটার, চশমা, ফরসা গালে সবুজ আভা, চল্লিশের কোঠায় মানুষটার চোখ হাতের ফাইলে। এক পা ভেতরে ঢুকলেন, পায়ের আওয়াজে চোখ উঠল, দৃষ্টি স্নিগ্ধ।

সত্যব্রত কথা পাড়লেন,—একটু দরকারে এসেছিলাম।

—বলুন।

—একটা লাইফ সার্টিফিকেট,...পেনশনের ব্যাপারে।

হাত বাড়িয়ে কাগজখানা নিলেন অফিসার, পড়তে লাগলেন। সত্যব্রতও, যেন আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেন না, বসে পড়লেন সামনের চেয়ারে।

পড়তে কি বেশি সময় নিচ্ছেন অফিসার? ঘরটায় একখানাও জানলা নেই কেন? ফ্যানটাও চলছে না। কষ্টটা আবার ফিরে আসছে শরীরে।

পড়া হয়ে গেছে। অফিসার সোজা তাকালেন সত্যব্রতর দিকে,—আপনার?

যেন জবাব দিতেও ভুলে গেছেন, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন সত্যব্রত।

অফিসার একটু বিরক্তই হলেন। আবার জিজ্ঞেস করলেন, আপনিই তো সত্যব্রত রায়, রিটায়ার্ড হেডমাস্টার নারাণপুর হাই স্কুল? আপনি বেঁচে আছেন, সেটারই তো কাগজ এটা?

প্রশ্নটা কি অফিসারই করেছিলেন?

দীর্ঘশ্বাসের মতো, ঝোড়ো হাওয়ার মতো, একটাই প্রশ্ন যেন ঘুরতে ঘুরতে পাক খেতে খেতে সত্যব্রতর ভেতরে একটার পর একটা দরজা খুলতে খুলতে আর বন্ধ করতে করতে বয়ে যেতে থাকল।

জবাব দিতে গেলেন, স্বর ফুটল না। তৃষ্ণা। হাত বাড়িয়ে টেবিলে রাখা জলের গ্লাসটা ধরতে গেলেন, হাত পৌঁছুল না। কাত হয়ে চেয়ারসুদ্ধ হুড়মুড় করে পড়ে গেলেন সত্যব্রত।

গোল হয়ে দাঁড়িয়েছিল অফিসের সমস্ত মানুষ। নিস্পন্দ সত্যব্রতর দিকে তাকিয়ে সকলেই নীরবতা পালন করছিল।

স্তব্ধতা ভাঙলেন অফিসার নিজেই।

—আশ্চর্য মানুষের জীবন! ভদ্রলোক এলেন, বসলেন, কথা বললেন। পেনশনের কাগজ এগিয়ে দিলেন।...জলজ্যান্ত একটা মানুষ!...কে বলবে?...একটু আগেও বেঁচে ছিল, আর এখন দেখো...!

স্টোরি

স্টোরিটা ডাউন টু আর্থ হতে হবে। মাটির গন্ধ থাকা চাই বুঝেছ? মাটি নাহলে গোবর-ভুষি-পাঁক হলেও চলবে। কিন্তু কসমেটিকস্-পারফিউম-হেয়ারডাই যেন কোনও মতেই না ঢোকে। খেয়াল থাকবে?

ঘাড় নাড়ে সজল। নাড়তে নাড়তেই পেছন ফেরে। দরজার দিকে এগোতে যায়। পেছন থেকে ডাক পড়ে। ডাকেন সুকান্ত, সিনিয়ার সাব, আর হ্যাঁ, আসল কথাটা যেন খেয়াল থাকে। স্পেস। ছ'শো শব্দ। তার বেশি যেন না হয়। জায়গা দিতে পারব না।

এবারেও ঘাড় নাড়ে সজল। আর দাঁড়ায় না। কে জানে স্পেসিফিকেশনে আর কী কী কন্ডিশন আরোপ করবেন সুকান্তদা। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে দ্রুত করিডোরটুকু পার হয়ে যায়। নিজের ঘরে ঢুকে স্বস্তির নিশ্বাস ফ্যালে। ঘরটা অবশ্য ভাগের, আরও আটজনের সঙ্গে শেয়ার করতে হয়। তবু, টেবিলটা তো নিজের। ফ্যানের তলায় বসে মনে হয়, সুকান্তদার ঘরের এসিটাও এর চেয়ে বেশি গরম।

হাট। একটু দূরে তাঁবু ফেলেছে সজলরা। সজল, ফোটোগ্রাফার অমিয়। ড্রাইভার হারান। হারান লিখতে জানে। শ্রুতিলিখন অভ্যেস করিয়ে করিয়ে ওকেও তৈরি করে নিয়েছে সজল। গোকুল লোকাল ছেলে। ওকে হাত করেই এই গোবিন্দপুরের হাটে আজ আসা সজলদের।

তাঁবু মানে সিনেমায় দেখা সত্যিকারের তাঁবু নয়। একটা গাছের নীচে টেবিলচেয়ার, মাথার ওপর প্লাস্টিকের সিট,—রোদ, জল এবং পাখির বিষ্ঠা থেকে আড়াল করার জন্যে। চেয়ারে সজল এবং পাশের টুলে হারান। পেছনে ক্যামেরা তাক করে অমিয়।

গোকুল একে একে নিয়ে আসছে। কাগজের লোক, ছবি বেরুবে, শুনেই গুটিগুটি হাজির হচ্ছে হাটুরে মানুষ। তাদের প্রশ্ন করছে সজল।

—সমস্যা কী?

—সমস্যা কি একটা দাদাবাবু? এবারের গ্রীষ্মটা কী যে গেছে? নদী-বিল-পুকুর শুকিয়ে খটখটে। টিপকলে জল নাই। খাবার জলের জন্যে চার কোশ হেঁটে দে পাড়ায় গিয়ে লাইন দিয়েছে বৌঝিরা। তাও রেশনের জল, এক কলসির বেশি মেলে না। ফিবছর এক হাল। ভোট আসে ভোট যায়, ভোটপরব পার হলে নেতাদের টিকির দেখা মেলে না।

—ব্যস ব্যস। রেলগাড়ি চালিয়ে দিলে যে অনন্ত! হাত তুলে থামিয়ে দেয় সজল। সমস্যার কথা কি শেষ হয়েছে?

—শেষ? এই তো সবে শুরু! গতবছরের কথাটা এখনো ধরাই হয় নাই।

—থাক্। গোকুল পরের জন।

খালি গা—লুঙ্গি, হামিদ এসে দাঁড়ায়।

—কী হে! তোমার কী সমস্যা?

—আজ্ঞে বন্যা।

—সে কী? অনন্ত যে বলে গেল খরা?

—আজ্ঞে, সেটাও ঠিক। ক্যানেলের এ পাড়ে খরা তো ওই পাশে বন্যা। গতবছর ঘরবাড়ি সব ভেসে গেল। যেদিকে তাকাই থইথই শুধু পানি আর পানি। চার বছরের ছেলেটা ঘুমোচ্ছিল। তুলে আনার কথা মনে নাই, ভেসে গেল।

অবাক হয়ে তাকায় সজল। যেন পাশের বাড়ির পোষা ময়না উড়ে যাবার কথা বলছে, এমন অক্লেশে কথাগুলো বলে গেল হামিদ।

—তারপর? রুদ্ধশ্বাসে জানতে চায় সজল।

—বন্যার পর মানুষগুলো ঘরে ফেরে, আবাদ কেটে বসত করে। ফি বছর আশায় বুক বেঁধে, কিছু একটা হবে। মাঝে মাঝে গাড়ি আসে, মাপজোক হয়, বোল্ডার পড়ে। তা যেখানে হাজার বস্তা সিমেন্ট আসার কথা সেখানে আসে পঞ্চাশ বস্তা। পানির তোড়ে খড়কুটার মতো ভেসে যায়।

—শেষ?

—শেষ কি হয় বাবু? গরিবের দুঃখের কোনও শেষ নাই। ইনিয়ে বিনিয়ে বলেই যেতে থাকে হামিদ।

হারান হঠাৎ গলা বাড়ায়, ছ'শো চল্লিশ।

—আরে থামো থামো। তোমার গল্পের কতখানি বাকি?

—এই তো সবে শুরু।

গোকুলকে ইশারা করে সজল। হামিদকে, হামিদদের খেদিয়ে ভিড় হালকা করে গোকুল। খিদেটা চাগাড় দিচ্ছে। মাংস-পরোটা কিনে আনা হয়েছে গাড়িতে, গঞ্জে গাড়ি দাঁড় করিয়ে স্টক করে নিয়েছিল। খেতে যাবার আগে হারানকে রুটিনমাফিক জিজ্ঞেস করল সজল, শুনেছ?

—হ্যাঁ স্যার। সাতশো বাইশ, ছ'শো আটষট্টি, সাতশো পঁয়ত্রিশ, ছ'শো চল্লিশ...

—একজনেরও প্রিসিশন নেই, দেখেছ কাণ্ড? এ যেন পলতার জলের ট্যাঙ্ক, একবার লিক হয়েছে তো থইথই কারবার। হল না হারান। এ যাত্রা আমাদের স্টোরি করা হল না।

হারান ডিকি খুলে খাবারগুলো বের করে আনছে, অমিয় কাঁধ থেকে ক্যামেরা নামিয়ে হাওয়া খাচ্ছে, গোকুল দেওয়ালের ভরসায় দেহের বাড়তি জলটুকু ছেড়ে দিচ্ছে, ভিড় এখন হালকা, হঠাৎ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এক বুড়ি এসে হাজির।

—তোমার আবার কীসের গল্প বুড়িমা?

—গল্প? গল্পটা কোথায় দেখলে বাবা? আমার বাঁটুল, ওর শরিলটা কাল থেকে বেজায় খারাপ। হাতের জল শুকোচ্ছে না। খালি ছ্যারাচ্ছে। সকাল থেকে বেচারির নাড়ি ছেড়ে যাওয়ার দাখিল। উঠছে না, কুটোটাও দাঁতে কাটছে না। তোমাদের গাড়ি দেখে ভাবলাম, ওষুদ বিষুদ পাওয়া যাবে। হবে নাকি কিছু ওষুদ?

সজল বিরক্ত হচ্ছিল। খিদের মুখে একী অনাসৃষ্টি! অমিয় মজা পাচ্ছিল। বলল, কোথায় তোমার বাঁটুল, নিয়ে এসো, দেখি ওষুধ জোগাড় করে দিতে পারি কিনা!

—কোথায় আবার, ওই তো, নিমগাছে বাঁধা দেখতে পাচ্ছ না? দেখতে জোয়ান মরদ,

এর মধ্যেই চোকের মাথা খেয়ে বসে আছ?

চোখ গোল হয়ে যায় অমিয়র। বলে ওঠে, এই তোমার বাঁটুল? এ তো ছাগল, মানে পাঁঠা। এর জন্যে এসেছ?

—আসব না? ছাগল বলো, মানুষ বলো, নিজের বলতে আমার ওই একজনা। ...তা দিতে পারো কোনও ওষুদ?

হঠাৎই মাথার মধ্যে ঝাঁ করে টিউব লাইট জ্বলে ওঠে সজলের। হারানকে ডাকে, হারান, শুনেছিস?

—হ্যাঁ স্যার, একশো ছিয়াত্তর।

—ভাল করে দেখেছিস?

—দু'বার করে স্যার, একটাও বেশি নয়।

ছাগল, গা ভর্তি মাটি, ছাগলনাদির গন্ধ,—একেবারে ডাউন টু দ্য আর্থ। তার সঙ্গে তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকা বৃদ্ধা। একা। মানুষ ও মনুষ্যেতর প্রাণীর সম্পর্ক, তার জটিল টানাপোড়েন। অসুখ, গ্রামের পরিবেশে চিকিৎসার অপ্রতুলতা। এবং সর্বোপরি শব্দ সংখ্যা একশো ছিয়াত্তর।

—অমিয়!

—রেডি।

ক্যামেরা রেডি হয়। ফ্রেমে বন্দি হয়ে যায় সবাঁটুল বৃদ্ধা। খটাখট টাইপ করে ফেলে হারান। একটি বাস্তবসম্মত নিটোল স্টোরির জন্ম হয়।

আসল কথা

যুধিষ্ঠিরের আসল নাম যে চণ্ডী, চণ্ডীচরণ গড়াই সেটা শেষের দিকে আমাদের আর মনে থাকত না।

ওর দিক থেকে চেষ্টার অন্ত ছিল না।

যে কেউ, সে ক্লাসের নতুন অঙ্কের মাস্টারমশাই হোক অথবা খেলার মাঠে হাততালি দেওয়া কোনও অচেনা মানুষ, যদি ডেকে জিজ্ঞেস করত, তোর নাম কী রে ছোঁড়া, যুধিষ্ঠির মাথা ঝুঁকিয়ে হাত জোড় করে বলত, আজ্ঞে চণ্ডীচরণ গড়াই। তবে আসল কথাটা যদি জানতে চান, তা হলে হচ্ছে গিয়ে আমরা জাতে কলু, সর্ষে পিষে তেল বের করা আমাদের জাত-ব্যবসা।

চণ্ডী যে যুধিষ্ঠির হয়ে গেল, তার কারণ কিন্তু এই 'আসল কথা'। চণ্ডীর 'আসল কথা'র ঠেলায় জেরবার হয়ে বিশু নামটা চালু করেছিল। আস্তে আস্তে যুধিষ্ঠিরের আড়ালে চণ্ডী চাপা পড়ে গেল।

ক্লাসের কথা দিয়েই শুরু করা যাক। করালীবাবু, সংস্কৃতের, সন্ধের পর থেকে মা কালীর পায়ে নিজেকে সঁপে দিতেন। একেবারে তন্ত্রসাধনা। পট্টবস্ত্র থেকে হুংকারটা পর্যন্ত। সবাই জানত। আড়ালে ডাকাডাকি করত বোমকরালী বলে। করালীবাবু অনেক রাত অবধি তন্ত্রসাধনা করে ক্লান্ত হয়ে ক্লাসে বসে দুপুরের দিকটা একটু জিরিয়ে নিতেন। সেই সাধনার গর্জনও টিচার্স রুম অবধি পৌঁছে ফিরে আসত। হেডস্যারের কান অবধি পৌঁছত না।

কেষ্টা ছিল বদের ধাড়ি। ঘুমন্ত করালীবাবুর পিঠে সুন্দর করে লিখেছিল, বোমকরালী!

করালীবাবু টের পাননি। ঘণ্টা বাজলে ঘুম থেকে তুলে দেওয়া হল। যথারীতি নিজেকে গুছিয়ে বেরিয়ে গেলেন করালীবাবু। সমস্ত ক্লাসের টগবগে হাসি পিঠে নিয়ে করালীবাবু তো গেলেন, কিন্তু হাসি মুছে যেতে দু মিনিটও লাগল না। করালীবাবু আবার ঢুকলেন, পিছন পিছন হেডস্যার সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

—কে করেছে এই কাজ?

ক্লাস নিস্তব্ধ।

করালীবাবু মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে। দেখতে পাচ্ছি বৃদ্ধ মানুষটির চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছে। যতটা না লজ্জায়, তার চেয়েও বেশি ভয়ে। তাঁর ঘুমিয়ে পড়ার কথাটা যদি ফাঁস হয়ে যায়।

—কেউ যদি সত্যি কথা না বলো, ক্লাসের প্রত্যেকের গার্জিয়ানকে আমি ডেকে পাঠাব। মিথ্যেবাদী বদমায়েশ ছেলেদের আমার স্কুলে দরকার নেই।

ভয়ে সকলেরই বুক শুকিয়ে গেছে। কিন্তু তার চেয়েও চিন্তা, জানাজানি হলে কেষ্টার কী হবে!

চণ্ডী উঠে দাঁড়াল, আসল কথাটা যদি জানতে চান, কাজটা কেষ্টাই করেছে। তবে

কিনা ওই নামটা ক্লাসে চালু, সবাই বলে। আর স্যার যদি ঘুমিয়ে না পড়তেন, কেষ্টা কি আর লিখতে পারত?

ঘটনা অনেকদূর গড়াল। কেষ্টার বাবা এসে করালীবাবুর পা ধরে ক্ষমা চেয়ে ছেলেকে পেটালেন। বাড়িতে ও স্কুলে কেষ্টার ওপর দিয়ে কী গেল তা আর না বলাই ভাল।

তবে চণ্ডীর ওপর দিয়েও কম গেল না। মুখ বুজে সমস্ত সহ্য করল চণ্ডী। কেষ্টাকে বুকে জড়িয়ে আদর করল, ছোলার চটপটি খাওয়াল। আমরাও তত দিনে চণ্ডীকে চিনে গিয়েছি বলে ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত থিতিয়ে গেল।

খেলার মাঠেও চণ্ডী একরকম। পাশের টাউন স্কুলের সঙ্গে আমাদের জন্মশত্রুতা। ব্যাপারটা চরমে পৌঁছোয় খেলার মাঠে। সুন্দরী ট্রফির ফাইনাল, খেলা শেষ হতে দু মিনিট বাকি। আমরা এক গোলে হারছি। টাউনের ছেলেরা ব্যান্ড তাসা নিয়ে উদ্দাম নৃত্য করছে। আমাদের বুকের ভেতরটা কটকট করছে। হঠাৎ গোল পেলাম আমরা। ডানপাশ থেকে বলটা ভাসিয়ে দিল শম্ভু, ঝাঁপাল চণ্ডী, ফ্লাইং হেড। গোল।

লম্বা বাঁশি। গোল থেকে বল বের করে আনছে টাউনের গোলকিপার। রেফারি সেন্টার স্পটে বল বসাচ্ছেন, চণ্ডী দৌড়ে গেল রেফারির কাছে। আমরা থমকে গেলাম। কী বলছে চণ্ডী?

—আসল কথাটা যদি জানতে চান, বলটা আমার মাথায় লাগেনি। লেগেছে হাতে। ওটা গোল না।

খেলা শুরু হতেই শেষ। একগোলে হেরে গেলাম আমরা। চণ্ডীকে এতদিন ক্লাসের ছেলেরা শুধু চিনতাম, একদিনে সমস্ত স্কুলের কাছে ও হয়ে গেল যুধিষ্ঠির। আর ক্রমাগত ওর যুধিষ্ঠিরসুলভ কার্যকলাপে ঠাকুরদার দেওয়া নামটা কখন যেন আড়ালে তলিয়ে গেল। সবাই ওকে নিয়ে মজা করত। ওর সততা, অন্ধতা, গোঁয়ারতুমি। পৃথিবীটা সাদায়-কালোয়। ওর যেন প্রতিজ্ঞা সমস্ত কালো সাদা দিয়ে চুনকাম করে দেবে। কেন জানি আমার একটা দুর্বলতা জন্মে গিয়েছিল ওর ওপর। চেষ্টা করতাম, পড়াশোনাটা যেন করে। বইপত্র দিতাম। গরিবের সংসার, অন্তত স্কুল ফাইনালটা যদি পাশ করে। জেদ ছিল তো! উতরে গেল। পাশ করে বাবা-মাকে প্রণাম করে গেল। ওর বাবাও এসেছিলেন। মিষ্টির হাঁড়ি। বাবা জিজ্ঞেস করেছিল, এসব কেন?

যুধিষ্ঠির বলেছিল, আসল কথাটা যদি জানতে চান, সুরেশ না থাকলে আমার এত কিছু হতই না। যুধিষ্ঠিরকে মা খুব স্নেহ করত। পুজোয় জামাকাপড় বরাদ্দ ছিল। আমি পড়তে কলকাতায় চলে এলাম। যুধিষ্ঠিরের লেখাপড়া খুব বেশি এগোয়নি। বাবা তখন আমাদেরই স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির প্রেসিডেন্ট। বাবার সুপারিশে যুধিষ্ঠির পিওনের চাকরিতে স্কুলেই ঢুকে পড়ল।

ছুটিছাটায় বাড়ি আসতাম। অন্য বন্ধুরা এদিক-ওদিক ছিটকে গিয়েছিল। আমাদের আধা শহরটা লাফিয়ে লাফিয়ে বড় শহর হয়ে গেল। মিউনিসিপ্যালিটি, কলেজ, ব্যাঙ্ক, সিনেমাহল, হাসপাতাল। হাসপাতাল জড়িয়ে নার্সিং হোম। এদিকে নদীর ওপর বড় ব্রিজ তৈরি হল। যোগাযোগ বেড়ে গেল হু হু করে। কোল্ডস্টোরেজ, রাইসমিল তৈরি হতে থাকল বড় রাস্তা বরাবর।

বাবা চাইছিলেন ফিরে আসি। একা সামলাতে পারছিলেন না। ছড়িয়ে ফেলেছিলেন অনেকটা। আমারও লেখাপড়া একটা ধাপ অবধি এগিয়ে আর এগোতে চাইছিল না। তা

ছাড়া শহর কলকাতা ছিল। তার আকর্ষণ। বাবার পাকা চোখ, চিনতে ভুল হয়নি।

বাড়ি আসতে না আসতেই দেখলাম সামনে পুজো, এবং পুজো পেরোলেই বিয়ে। বিয়ে? হোস্টেলে খাটে শুয়ে চোখ খুলে দেখা একটা জরির পাড়ের স্বপ্ন। বাবার ইচ্ছেই আদেশ। বিয়ের আগে মেয়ে দেখব এমন সাধ্য ছিল না। ভবতারণ উকিল, একনম্বর ক্রিমিনাল ল-ইয়ার, বাবার বাল্যবন্ধু। ভবতারণের মেয়ে এবং সুনীলরঞ্জনের ছেলের যে বিয়ে হবে, সময়ে, তা সময়ের অনেক আগে, বলতে গেলে আমাদের জন্মের আগে থেকেই ঠিক করা ছিল।

বিয়েতে শুভদৃষ্টি বলে একটা ব্যাপার আছে। ঘোমটার নীচে সোজা আমার দিকে তাকিয়ে থাকা একজোড়া চোখের দৃষ্টিতে কতখানি শুভ ছিল বলতে পারব না, আমার নিশ্বাস সেই যে আটকে গেল, অনেকগুলো দিন পার হয়ে শেষ অবধি যখন বেরোনো শুরু করল, আশপাশের লোকজন সেগুলোকে দীর্ঘশ্বাস ছাড়া আর কিছুই ভাবল না।

তখন আর কিছু করার নেই। অন্য কেউ হলে তবু কথা ছিল, কাজলের বাবা হচ্ছেন ভবতারণ চাটুজ্যে এবং তাঁর একমাত্র মেয়ের স্বামীকে, মেয়ের এতটুকু অযত্ন হলে যে তিনি ফাঁসিতে চড়াবেন, সে সম্বন্ধে কোনওরকম ঢাক ঢাক গুড়গুড়ের অবকাশ তিনি রাখতেন না।

আমার একটাই উপায় ছিল—বাড়ি আসা কমিয়ে দেওয়া। বাবার নতুন রাইসমিলের ওপরে একখানা ঘর বানিয়ে দিনের পুরোটা এবং রাত্রের আধখানা কাটিয়ে ফিরে আসা অভ্যেস করে ফেললাম। ততক্ষণে কাজল তার আশি কেজির শরীরটা কাত করে গভীর নিদ্রায় আমগ্ন।

যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে হঠাৎই যোগাযোগ হল। এই সময়ে। ঠিকঠাক বলতে গেলে যুধিষ্ঠির তখন কথা বলার অবস্থায় ছিল না। যোগাযোগ করল ওর স্ত্রী ছায়া।

সকালবেলাটা রাইসমিলে খুব মনোরম। একটা পুকুর আছে ভিতরে, পাড় বাঁধিয়ে নিয়েছিলাম, শীতকালের বেলা ন-টা সাড়ে-নটা। রোদ উঠেছে, কিন্তু চড়েনি। দিনের কাগজটা সবে ওলটাচ্ছি, দারোয়ান এসে বলল, একজন মেয়েছেলে ডাকছে।

মহিলা যখন, বিস্ময় চেপে আসতে বললাম। যে এল তাকে দেখে চিনতে পারলাম না। পঁচিশের আশেপাশে বয়স, ছিপছিপে, রং ফরসার দিকেই, আটপৌরে একখানা শাড়ি, কিন্তু চোখেমুখে প্রখর দীপ্তি। গ্রামেগঞ্জে এরকম চেহারা দেখা যায় না।

দূরত্ব রেখে দাঁড়িয়েছিল। মাথা নামিয়ে নয়, সোজা চোখে চোখ ফেলে বলল, আমাকে আপনি চিনবেন না, আমি ছায়া। আপনার বন্ধু যুধিষ্ঠির আমার স্বামী। ও খুব অসুস্থ। হাসপাতালে ভর্তি। আপনার কথা খুব বলত। বলত, বিপদে পড়লে যেন আসি। আমার খুব বিপদ। আপনি কি একবার আসবেন?

তিন-চারটে বাক্যে এইভাবে পুরোটা বুঝিয়ে বলা, গ্রামের মেয়ের পক্ষে, নিতান্ত অসম্ভব। যুধিষ্ঠির তো বটেই, তার চেয়েও বেশি, হয়তো ছায়া, সঙ্গে নিয়ে হাসপাতালে গেলাম।

ডাক্তারবাবু দেখলাম পরিচিত। যত্ন করে বসালেন। বললেন, সেরিব্রাল। রক্তের চাপ বেশি ছিল, আগে চেক করায়নি। হঠাৎ রক্তের দলা মাথার মধ্যে আটকে গেছে। ক-টা দিন না গেলে বোঝা যাবে না।

ডাক্তারবাবু চেষ্টা করলেন। ওষুধপত্র যখন যা লাগল জোগাড় করে দিলাম। ছায়া নাম

কে দিয়েছিল জানি না, কিন্তু সত্যিই দুটো সপ্তাহ যুধিষ্ঠির আর তার ছায়াকে আলাদা করা গেল না।

শেষ অবধি ছুটি যখন হল, যুধিষ্ঠির তখনও হাঁটে পা টেনে টেনে, কথা বলতে গেলে জড়িয়ে যায়। ডাক্তারবাবু বললেন, ওটা সারতে সময় লাগবে, ফিজিয়োথেরাপি করতে হবে। আর ভালো খাওয়া-দাওয়া, প্রেশারটা ঠিক রাখা।

বাড়িতে যুধিষ্ঠির, ছায়া আর ওদের তিন বছরের ছেলে প্রান্তর। প্রান্তর? ছায়া হেসে সরে গিয়েছিল, নামটা আমার দেওয়া, কেন খারাপ হয়েছে?

ছায়াকে এতদিনে তুমি বলছি। দুজনে পাশাপাশি কাঁধে কাঁধ দিয়ে ফিরিয়ে এনেছি একটা মানুষকে, তার আনন্দ যুদ্ধজয়ের চেয়ে কিছু কম নয়। ছায়া অবশ্য আপনির দূরত্ব পার হয়নি।

যুধিষ্ঠিরের কথা ফুটতে সময় লাগল। নিয়ম করে প্রতিদিন বিকেলে গেছি। ফিজিয়োথেরাপির সময়টা বসে থেকে থেকে উৎসাহ দিয়েছি। যুধিষ্ঠির চেষ্টা করেছে। কখনও না পেরে ব্যাকুল হয়েছে। ছায়া এসে কপালের ঘাম মুছিয়ে দিয়েছে। তিনমাস লেগে গেল যুধিষ্ঠিরের সুস্থ হতে। সামান্য খুঁড়িয়ে চললেও, কথা কখনও কখনও জড়িয়ে গেলেও চাকরিতে যোগ দিতে অসুবিধা হল না। যেদিন দুজনে দু' দিক থেকে ধরে ওকে স্কুলে নিয়ে গেলাম, গেটে দাঁড়িয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিল যুধিষ্ঠির। বলেছিল, আসল কথাটা যদি বলতে হয়, এ জীবনটা আমার নিজের নয়। অর্ধেকটা তোর, বাকি অর্ধেক ছায়ার।

ছায়ার একটা অতীত ছিল। সেখানে আলোর চেয়ে অন্ধকার কম ছিল না। ছায়া নামটাও হয়তো নিজের নয়। যুধিষ্ঠির ওকে তুলে এনেছিল। ছায়া পুরোটা ভাঙেনি। যুধিষ্ঠিরের প্রতি ওর ঋণটুকুই উচ্চারণ করত। যুধিষ্ঠির কোনওদিনই বুঝতে দেয়নি। যুধিষ্ঠিরের ছোট সংসারে ছায়া ছিল সম্রাজ্ঞী।

বছরখানেক পর যুধিষ্ঠিরের মেয়ে হল। ফুলের মতো মেয়ে। ছেলের নাম রেখেছিল ছায়া। মেয়ের নাম রাখল যুধিষ্ঠির, সুকন্যা।

কাজের চাপ, ব্যবসার নতুন জটিলতা, বাবার মৃত্যু, আইন-আদালত সব কিছু মিলিয়ে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে যোগাযোগ কমে এল। তবু ওদের পরিবারের সমস্ত ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে আমিই ছিলাম শেষ কথা।

স্কুলের চাকরিটায় যুধিষ্ঠিরের কায়ক্লেশে চলত। ছায়া বুঝতে দিত না। ছায়া লেখাপড়া ভালই জানত। তবু ওকে চাকরি করতে দিতে যুধিষ্ঠিরের ঘোর আপত্তি। অনেকবার ভেবেছি, আমার কিছু একটাতে ওকে ঢুকিয়ে নেব, যুধিষ্ঠিরের কথা ভেবে আর সাহস করিনি।

প্রান্তর ভাল হল না। ব্যাপারটা খুবই আশ্চর্যের, যুধিষ্ঠিরের মতো বাবা, ছায়ার মতো মা। তবু যুধিষ্ঠির স্কুল ফাইনাল অবধি গিয়েছিল, প্রান্তর সেটাও পারল না।

ছায়ার মনোগত ইচ্ছাটা জানতাম। রেললাইনে একটা কনট্রাক্ট-এর কাজ হচ্ছিল। সেখানে তদারকির লোক দরকার। প্রান্তরকে একদিন আসতে বললাম। তারপর কাজ বুঝিয়ে পরদিন থেকে লেগে যেতে বললাম।

তিন দিনের মাথায় যুধিষ্ঠির এসে হাজির।

—এটা কী করেছ সুরেশ?

—কেন, কী হল?

—প্রান্তরকে কাজে লাগিয়েছ, আমাকে বলোনি কেন?

—বলাবলির কী আছে? ও বসে ছিল। বয়েস হয়ে যাচ্ছে। এখনি একটা কিছুতে না ঢুকলে পরে আর করে খেতে পারবে না। আর লাইনটা তো খারাপ নয়, শিখে নিতে পারলে...

—শিখুক না, শিখতে কে মানা করেছে? কিন্তু তোমার কাছে কেন?

—আমি ছাড়া ওকে কে কাজ দেবে বলো?

—সেইটাই তো কথা। আসল কথাটা যদি জানতে চাও, আমার ছেলের গুণ অনেক। বিড়ি খায়, গাঁজাও ধরেছে। মদ-মেয়েমানুষও আছে শুনেছি। কাজ ধরতে হয় অন্য লোকের ধরুক। তোমার সর্বনাশ হোক, এ আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারব না।

জোর করে প্রান্তরকে ছাড়িয়ে নিয়ে চলে গেল। যুধিষ্ঠিরকে চিনি বলেই প্রতিবাদ করা গেল না। ক-দিন পরে শুনলাম, প্রান্তর বাড়ি ছেড়ে রেললাইনের ওপারে ঘর ভাড়া নিয়েছে। তারপর রেললাইন-শান্টিং-ওয়াগন-কয়লা সবকিছুর আওয়াজ ছাপিয়ে প্রান্তরের নামটা কখন যেন সবার কানে কানে চাউর হয়ে গেল।

না যুধিষ্ঠির না ছায়া, কেউ কোনওদিন প্রান্তরের নাম আমার সামনে আর উচ্চারণ করেনি। তার একটা কারণ, সুকন্যা।

আশ্চর্য মেয়ে সুকন্যা।

ছায়ার সৌন্দর্য, যুধিষ্ঠিরের স্নিগ্ধতা। গান গায় পাখির মতো। মাধ্যমিকে স্টার পেল, উচ্চমাধ্যমিকেও তাই। কলেজে পড়তে গেল, অর্থনীতি। অনার্স এম এ দুটোতেই ফার্স্ট ক্লাস। পি এইচ ডি-তে নাম লেখাল। যুধিষ্ঠিরের ইচ্ছা বিয়ে, ছায়ারও আপত্তি নেই। সুকন্যা এতদিন না বলেছিল, এইবার রাজি হয়েছে।

সুনীতিবাবুর বড় ছেলেটি কৃতী। শিবপুর থেকে পাস করে ম্যানেজমেন্ট পড়ছে। চাকরিও পেয়েছে ভাল। আমিই ঘটকালি করলাম।

সুনীতিবাবুরা বনেদি মানুষ। দাবি-দাওয়া নেই। জাতপাতের বাধা মানেন না। ছেলে কোনও এক অনুষ্ঠানে সুকন্যার গান শুনেছে। নিজেই উৎসাহী। বাকিটা আমার উদ্যোগ। মেয়ে দেখতে এসেছেন সুনীতি, সঙ্গে ভায়রাভাই, শহরে অধ্যাপনা করেন।

বিরাট কিছু সাজগোজ করেনি, কিন্তু সুকন্যা ঘরে ঢুকল দীপশিখাটির মতো। শব্দ যেন থমকে রইল কিছুক্ষণ। সংবিৎ ফিরলে সুনীতিবাবু মামুলি দু-একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে বললেন, ঠিক আছে মা, তুমি এবার ভেতরে যাও। কথাবার্তা যা এতক্ষণ বলছিলাম, তা আমিই। যুধিষ্ঠির ছিল ভেতরে। তার সম্পূর্ণ সম্মতি নিয়েই আমি এগিয়েছি, নাহলে সব কিছুর পরে ও কখন সব ভেস্তে দেয়!

একবার আমার দিকে, একবার দরজার কাছে দাঁড়ানো ছায়ার দিকে তাকিয়ে সুনীতিবাবুর ভায়রা বললেন, সবই তো হল, তা কন্যার বাবার মতামতটা একবার জানা যাক।

ছায়া বলল, অসুস্থ মানুষ, ভিড়ভাট্টা এড়িয়ে চলেন। যদি আরও কিছু জানবার থাকে, বলুন, আমরাই জবাব দিচ্ছি। আমি বললাম, দাবিদাওয়ার কথা কিছু বলবেন নাকি সুনীতিবাবু? ওসব দায়িত্ব আমার।

জিব কাটলেন দুজনেই, বালাই ষাট। ভগবানের আশীর্বাদে আমাদের কিছু অভাব

নেই। আর অর্ণব নিজে থেকেই যখন মত জানিয়েছে...। আমরা কন্যার বাবার সঙ্গে শুধু একবার মুখের কথাটুকু বলতে চাই।

হাতজোড় করে ঘরে ঢুকল যুধিষ্ঠির। তার দাঁড়ানোয়, ভঙ্গিতে বিনয়ের ভাবটি স্পষ্ট।

—বলুন চণ্ডীবাবু, এ বিবাহে আপনার মত আছে তো?

—অবশ্যই, এ আমার পরম সৌভাগ্য!

—না, আসলে এটা রীতি। আপনি মেয়ের বাবা, আপনার মতামত ছাড়া তো আর এ কাজে এগোনো যায় না।

মাথা নামিয়ে কী যেন ভাবল যুধিষ্ঠির। তারপর বলল, আস্তে, কিন্তু স্পষ্ট, ঘরের সকলকে শুনিয়ে।

—আমার একবার বড় অসুখ হয়েছিল। প্রাণটাই যেতে বসেছিল। যমের দুয়ার থেকে ফিরিয়ে আনল আমার স্ত্রী, ওই ছায়া। আর সুরেশ আমার বন্ধু। তার পরেই আমার মেয়ের জন্ম। আসল কথাটা যদি জানতে চান, আমার মেয়ের বাবা বলতে ওই সুরেশই। পাল-পোষ, বড় করা, লেখাপড়া—ও না থাকলে কিছুই হত না। আমাকে আর শুধিয়ে কী করবেন? ও যেমন যা বলবে, সেটাই শেষকথা।

—আহাহা, কী বিনয়! কী ভদ্রতা! কী বন্ধুবাৎসল্য! ধন্য আপনাদের বন্ধুতা। বলতে বলতে এগোলেন অতিথিরা। যুধিষ্ঠির এগিয়ে দিতে গেল।

সুকন্যা ভেতরে ছিল, শোনেনি।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল ছায়া, ভেতরে চেয়ারে বসে ছিলাম আমি। কেউই চোখ তুলতে পারছিলাম না। আসল কথাটা এইমাত্র বলে বাইরে গেছে যুধিষ্ঠির। কথাটা ও যে জেনেছে, কোনওদিন জানতে দেয়নি। এখন, এইবার, এতদিনে মনে হল, আসল কথাটা ও না বললেও পারত।

জলপরি

ঘুম ভেঙে গিয়েছিল আগেই, উঠতে ইচ্ছে করছিল না। কাল শুতে রাত হয়েছে। খাওয়াদাওয়ারও অনিয়ম হয়েছে। হোটেলে ফিরে খানিকটা অ্যান্টাসিড গলায় ঢেলেছিলাম। তাও একটা ব্যথা পেট আর বুকের মাঝখানে থাবা গেড়ে বসে আছে।

প্রহ্লাদ এসে চা দিয়ে গেল। শুয়ে থাকতে দেখে চায়ের কাপ ঢেকে রাখতে রাখতে বলল, আজও সমুদ্রের ধারে যাবেন না স্যার?

চমৎকার বাংলা বলে ছেলেটা। এখানকার হেটেলে কাস্টমারের নব্বই ভাগ বাঙালি। অনেক হোটেল মালিক বাঙালি ছেলে নিয়োগ করে। স্থানীয় যারা তারাও বাংলা শিখে নেয় ঝটপট। ভাষা দুটো কাছাকাছি, শিখতে অসুবিধে হয় না। প্রহ্লাদের বাড়ি এদিকেই। দেখছে এসে অবধি ঠাণ্ডা ঘরে শুয়ে শুয়ে বই পড়ছি। ক্লায়েন্ট গাড়ি পাঠালে যাচ্ছি। কাজকর্ম সেরে ফিরে এসে আবার ঠ্যাং ছড়িয়ে লম্বা। জগন্নাথের মন্দির দেখতে গেলাম না, অনেকেই বোধহয় যায় না, সয়ে গেছে ওদের। কিন্তু সমুদ্র? প্রহ্লাদের সম্মানে লেগেছে বোঝা যাচ্ছে। ওদের সমুদ্রকে উপেক্ষা করে যেন প্রহ্লাদকেই অপমান করে ফেলেছি। একবার অন্তত সমুদ্র দর্শনে আমাকে না পাঠানো পর্যন্ত ওর শান্তি নেই।

পরোক্ষে সমুদ্র দর্শন অবশ্য আমার হয়ে যাচ্ছে। পাশের ঘরটাই কোনও এক হনুমন্ত রাওয়ালের। সূর্যোদয় থেকে তৈলমর্দন শুরু হয়। দেড়শো কেজির শরীরটা রোদ্দুরে শুকোতে দিয়ে তিনজন দশাশই জোয়ান শরীরের এক একটা অঙ্গে তেল মাখায়। কে জি দুয়েক সর্ষের তেল খরচ হয়ে যাওয়ার পর একটা ডুলিতে চাপিয়ে হনুমন্তজিকে সমুদ্রে নিয়ে যায় ওরা। সমুদ্র দূরে, গর্জনটুকুই কানে আসে, দৃষ্টি পৌঁছয় না। কিন্তু মনে মনে স্পষ্ট দেখতে পাই ডুলি সুদ্ধু জলে ডুবিয়ে হনুমন্তজির স্নান নিষ্পন্ন করে এই তিন মরদ। ভিজে গায়ে রামনাম জপ করতে করতে মহাশয় হোটেলের এসি রুমে প্রবিষ্ট হন।

এপাশ ওপাশ ওপর নীচ সমস্ত ঘরই বেলা বাড়লে ফাঁকা। সবাই চলেছে সমুদ্রস্নানে। আমিই একা উপন্যাসের নায়কের সঙ্গে শুয়ে থাকি হাওয়াইয়ের বালুকাবেলায়।

কাল ফিরে যাওয়া। দুপুরে হালকা খাবার নিলাম ঘরেই। স্যুপ আর স্যান্ডউইচ। প্রহ্লাদ খাবার সাজাতে সাজাতে বলল, স্যার, আজ পূর্ণিমা। বিকেলে একবার অন্তত স্বর্গদ্বারে যান। চাঁদ উঠলে ফিরে আসবেন।

প্রহ্লাদের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল, এবার ও কেঁদে ফেলবে। ওকে খুশি করার জন্যেও আমার একবার সমুদ্রের ধারে যাওয়া উচিত। আমার ঘাড় নাড়া দেখে ও যে কী খুশি হল কী বলব!

রিকশায় উঠে মনে হল ভুল করেছি। সারাদিন এসিতে থেকে বুঝতে পারিনি, বাইরেটা কী গরম! বিকেল পাঁচটাতেও হাওয়ায় আগুনের হলকা। আরও পরে বেরোনো উচিত ছিল। আসলে প্রহ্লাদ এমন করতে লাগল, ট্যাক্সি পেল না, বললাম, একটু অপেক্ষা করে দেখি। ও বলল, এইটুকু রাস্তা স্যার, দশ মিনিটও লাগবে না। রিকশা আমি ডেকেই

এনেছি। সাত তাড়াতাড়ি নেমে এলাম।

একটা মোড় ঘুরে স্বর্গদ্বারে ঢুকতেই কিন্তু শরীর জুড়িয়ে গেল। সমুদ্রের হাওয়া। ভিজে-ভিজে, নরম। সুগন্ধী নারীর ছোঁয়ার মতো। রিকশা নামিয়ে দিল পুরী হোটেলের ঠিক সামনে।

ভাড়া মিটিয়ে দিতে দিতে ঘুরে দেখলাম অনেক বদলে গেছে। পুরনো বাড়িটার সংলগ্ন নতুন আর একটা বাড়ি উঠেছে। তার সমস্ত ঘরই মনে হয় সমুদ্রমুখী। পুরনো বাড়িতে প্রথমে সকলকেই উঠতে হত পেছনে। সমুদ্র যেখানে চোখের আড়াল। আমরা দু'সপ্তাহ ছিলাম। দশ দিনের মাথায় এ পাশের ঘরে চলে এসেছিলাম। যেখানে জানলা খুললেই সমুদ্র।

বালিতে পা ডুবে যাচ্ছে। থই থই করছে মানুষ। তখনও মানুষ ছিল, কিন্তু এই রকম, বেলাভূমির বালুকণার চেয়েও অগুনতি, মনে হয় না এতখানি ছিল। কিংবা আজ পূর্ণিমা, গ্রীষ্মের ছুটি পড়ে গেছে স্কুলকলেজে। পুরো কলকাতাটাই উঠে এসেছে স্বর্গদ্বারে, ভিড় ঠেলে ঠেলে দক্ষিণ থেকে উত্তরে হেঁটে যাচ্ছি, হঠাৎ পা আটকে গেল।

ছেলেটার বয়স বেশি নয়, বাইশ-তেইশ, কমও হতে পারে। বালি জড়ো করে মূর্তি বানাচ্ছে। জলপরি। শরীরের ওপরটা মানবীর, উড়ন্ত চুল, মায়াবী চোখ, পুরন্ত বুক, দুখানা হাত ডানার মতো বাতাসে ভাসছে, কোমর থেকে নীচের অংশটা মাছ যেন, ভাঁজ খেয়ে ছড়ানো পাখনায় গিয়ে শেষ হয়েছে। সবাই অবাক হয়ে দেখছিল। কোনও কথা না বলে একমনে পরির অলঙ্কার গড়ছিল ভাস্কর।

—ওটা কে বাবা?

সবাই ঘুরে তাকাল।

শিশুর চোখে বিস্ময়। বাবার হাত ধরে দাঁড়িয়ে, পেছনে মা। বাবার জবাব: জলপরি।

—আমি জলপরি নেব।

—দেব। তুমি লক্ষ্মী ছেলে হয়ে থাকো। কথা শুনে চলো, আজে-বাজে কিছু খেতে চেয়ো না, বাবা তোমাকে জলপরি এনে দেবে। বোঝাতে বোঝাতে মা এগিয়ে গেল। পিছন পিছন বাবার হাত ধরে ছেলে।

দাঁড়ালাম। ঘুরে সমুদ্র দেখলাম। এইখানে। হ্যাঁ, এইখানেই বাবাই বালি দিয়ে পাহাড় বানিয়েছিল।

একটা নয়, দুটো উঁচু উঁচু বালির পাহাড়। মামকে ডেকে বলেছিল, দিদি, একটা তোর একটা আমার। কোনটা নিবি? মাম দুটো কাঠি পাহাড়ের মাথায় গুঁজতে গুঁজতে বলেছিল, জানিস না, পাহাড় জয় করলে তার মাথায় পতাকা গুঁজে দিতে হয়। যে দেশের পতাকা, পাহাড়টা তারই হয়ে যায়। দুখানা পতাকা বসিয়ে দিলাম, ব্যস। পাহাড় দুটো আমাদের হয়ে গেল।

আস্তে আস্তে হেঁটে যাচ্ছি। যত মানুষ সমুদ্র দেখতে এসেছে সবাই ক্ষুধার্ত। দশ পা হাঁটলেই ঝালমুড়ি, ডিমসেদ্ধ, বাদামভাজা, কেক-পেস্ট্রি, চকোলেট, রসগোল্লা কেউ না কেউ পথ আটকাচ্ছে। ঘাড় নাড়তে নাড়তে রাস্তা খুঁজতে খুঁজতে কোথাও সেই বৃদ্ধ মানুষটিকে পেলাম না, যাকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছিল মাম। এবং মৌসুমী। বুড়ির মাথার পাকা চুল। হাত বেয়ে গড়িয়ে নামছিল গোলাপি রস। চাটতে চাটতে মাম বলেছিল, আর একটা নেব বাবা?

ঘুড়িও ওড়াচ্ছে না কেউ। বিকেল থেকে ঘুড়ি ওড়াত কয়েকটা ছেলে। বড় হয়ে ওরাই নুলিয়া হবে। ছোটবেলায় আমারও ঘুড়ির নেশা ছিল। ওদের দলে ভিড়ে গিয়েছিলাম। এক লাটাই সুতো কিনেছিলাম। রোজ দুখানা ঘুড়ি কিনতাম। একদিন দুটো ঘুড়িই ভোকাট্টা হয়ে উড়ে গিয়েছিল সমুদ্রে। মুখ কালো করে হেঁটে এসে বালির ওপর থেবড়ে বসেছিলাম। মৌসুমী হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে দূরে তাকিয়েছিল। আমার দিকে দেখছিল না বলে, আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল না বলে রাগ হয়ে গিয়েছিল। মৌসুমী বোধহয় বুঝতে পেরেছিল। আমার দিকে ফিরে বলেছিল, সমুদ্র কিছুই নেয় না জানো? আকাশের নীলে মিশে যাওয়া ঘুড়ির দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছিল জিজ্ঞেস করি, আকাশও কি সমুদ্র? ফাঁকা হয়ে গেছে চারপাশ। ঝাউগাছের আড়ালে শুয়ে আছে বেলাভূমি। পকেটে পার্সে টাকা আছে। সূর্য ডুবে গেছে। অন্ধকার হয়ে আসছে। আর কি এগোনো উচিত হবে?

ফিরতে ফিরতে পৌঁছে গেলাম একটু আগে দেখা বালির জলপরির কাছে। নেই। জল উঠে এসেছে অনেকখানি। ধুয়ে মুছে নিয়ে গেছে। সেদিন বাবাইও কেঁদেছিল। মাম সান্ত্বনা দিয়েছিল। বোকা কোথাকার! বালির পাহাড় থাকে?

কতটুকু ছিল মাম? নয়? দশ? বালির পাহাড়। জলের দাগ। বুঝে ফেলেছিল মেয়েটা?

অনেকক্ষণ হাঁটা হয়ে গেছে। হাঁফ ধরছে একটু। বুকের ব্যথাটা যায়নি। হাঁটলে বাড়ছে। একটু বসলে ভাল লাগবে।

পাশাপাশি অজস্র মানুষ। হাঁটা থামিয়ে বসে পড়েছে সবাই। কথা থেমে গেছে। যেন কীসের প্রতীক্ষা। সকলেই তাকিয়ে আছে সামনে। যেদিকে সমুদ্র।

বালিতে বসে পড়লাম। পেছনে শহর। পেছনে সভ্যতা ও মানুষ। সামনে? আকাশ থেকে নীল মুছে যাচ্ছে দ্রুত। সমুদ্র যেন চিত হয়ে থাকা আরশি, সেও নীল থেকে হয়ে যাচ্ছে ঘন কৃষ্ণবর্ণ। সেই কালো শরীরে ফুলের মুকুটের মতো সাদা ঢেউয়ের ফেনা উঠছে, ভাঙছে, মিশে যাচ্ছে। নতুন আর একটা ঢেউ উঠছে।

সমুদ্র আমার আত্মীয় নয়। ফিরে ফিরে আসি না সমুদ্রের কাছে। মৌসুমী বলেছিল, সমুদ্র কিছুই নেয় না। মিথ্যা। বালির পাহাড়, খেলনাবাটি, আবাস ও আশ্রয়,—সংসার যার অন্য নাম,—ঢেউ আসে ঢেউ যায়, টেনে নিয়ে যায় সমস্ত কিছু। বালিতে দাগটুকুও থাকে না। মাম বুঝেছিল। ছোট্ট মাম।

ভাল ছবি আঁকত। পড়াশুনোতে খারাপ ছিল তা নয়, হায়ার সেকেন্ডারিটা তো ফার্স্ট ডিভিশনেই পাশ করেছিল! কাছে এসে আবদার করল, বাবা আমি আর্ট কলেজে ভর্তি হব।

তখন আমার চোখ তুলে তাকাবার সময় নেই। তা ছাড়া মেয়ে যখন অ্যাডাল্ট, আর ছবিটা ওর প্রাণের জিনিস, চাইছে, যাক। কলাভবনে ভর্তি হয়ে গেল মাম।

মৌসুমী আপত্তি করেছিল,—ওখানকার পরিবেশ তুমি জানো না। সব খোলামেলা। ছেলেমেয়ে একসঙ্গে থাকে।

গা করিনি। মাস ছয়েক বাদে মৌসুমীকে নিয়ে একবার ঘুরেও এলাম। চমৎকার পরিবেশ, ছবির মতো ক্যাম্পাস। শিল্পী হতে গেলে এর চেয়ে ভাল জায়গা হয় নাকি? ওখানেই একটা আস্তানা বানিয়ে বুড়ো বয়েসে থাকব, মৌসুমীর সঙ্গে প্ল্যানও ছকে ফেললাম।

বছর দুয়েক কেটে গেছে। অনেক রকম উড়ো কথা কানে আসছিল। একদিন খবর না দিয়ে বিকেলের ট্রেনে গিয়ে হাজির হলাম। খুঁজে খুঁজে মেয়েকে যখন পেলাম, তখন ওর আর দাঁড়াবার অবস্থা নেই।

পরে চিঠি দিল, বাবা, আমি এখন বড় হয়ে গেছি; আমাকে নিয়ে অত চিন্তা না-ই বা করলে।

পুনায় ও এখন একা থাকে। মাঝে মাঝে ছবির প্রদর্শনী হয়, কাগজে পড়ি। পণ্ডিচেরির আশ্রমে অনেকটা সময় কাটায়। চিঠি লিখলে জবাব দেয় না।

হঠাৎ একটা গুঞ্জন উঠল। সামনে ঘটে যাচ্ছে এক আশ্চর্য দৃশ্যান্তর। আকাশের সীমানায় সমুদ্রের বুক থেকে মাথা তুলছে এক রক্তিম গোলক। তার সর্বাঙ্গে লজ্জা। কুসুম কুসুম আলোয় বিস্তারিত সংশয়। আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে ঢেউয়ের কেশরে। সেখানে রঙের আবিরে হোলি খেলা।

বাবাই। কিচ্ছুটি জানতে দেয়নি। পরীক্ষা দিয়েছে, চিঠি-চাপাটি করেছে। মৌসুমী জানত, পরে বুঝতে পেরেছি। একেবারে সব ফাইনালাইজ করে বলতে এল,—এই ফল্ সেশনেই জয়েন করতে বলছে ওরা। ফুল অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ। তোমার কোনও ফিনানশিয়াল লায়াবিলিটি থাকবে না।

হায়রে! এত দিন এত কিছু করতে পারল, আর এইটুকু করতে গেলে ভিখিরি হয়ে যাবে তোর বাবা? ছেড়েছুড়ে অত দূরে চলে যাচ্ছিস, ফিরবি কি না ঠিক নেই, একবার জিজ্ঞেসও করলি না, বাবা তোমার কষ্ট হবে না তো?

মুখে বললাম, মার অনুমতি নিয়েছ?

ছেলে এত জোরে ঘাড় নাড়ল যে বুঝতে অসুবিধা হল না, ষড়যন্ত্রে মাও অংশীদার।

সে-ই চলে গেল। চার বছর পর চিঠি দিয়ে জানিয়েছিল, বিয়ে করছি, উইশ করে কার্ড পাঠিয়েছিলাম। দেশে নাকি এসেছিল মাঝে, মার সঙ্গে দেখা করে ফিরে গেছে।

না না, মৌসুমীর সঙ্গে, ওদের বাড়িতে। যাদবপুরে। নিউ আলিপুরে একবারও আসেনি।

ওদের বাড়ি মানে, অলোকের নতুন বাড়ি। অলোক সমাদ্দার আমার জুনিয়ার ছিল। বলিয়ে-কইয়ে তুখোড় ছেলে। ওর মধ্যে প্রসপেক্ট দেখতে পেয়েছিলাম। সেইভাবেই নারচার করতাম। অনেক ছোট, তা বছর কুড়ি তো বটেই। তার মানে মৌসুমীর চেয়েও বছর আটেকের ছোট, বাড়িতে একসঙ্গে ফিরতাম। অনেক রাত অবধি আলোচনা চলত, পরের দিনের ব্রিফ তৈরি করে রাখত অলোক। রাত বেশি হয়ে গেলে, কতদিন হয়েছে, আমার কাছেই থেকে গেছে, মৌসুমীর রান্না খেয়ে বাঃ বাঃ করেছে। সংসারের খুঁটিনাটি বাজার-দোকান সব কিছুতেই মৌসুমীর বল-ভরসা বলতে অলোক।

সুপ্রিম কোর্টে কেস ছিল। দু' দিনের মামলা সাত দিন গড়িয়ে গেল। কাগজপত্র জোগাড় করে সন্ধের ফ্লাইটে ফিরে তড়িঘড়ি করে বাড়ি এসে গাড়ি থেকে নেমেই মনে হল কোথায় যেন বেসুর। ড্রাইভার ভজহরি একটা কথাও বলেনি, পুরনো চাকর বলরাম মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে, সব যেন বেশি রকম চুপচাপ। ছুটে দোতলায় উঠে শোবার ঘরে ঢুকে দেখলাম মৌসুমীর হয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে পেপারওয়েট-চাপা চিঠি।

অলোক ততদিনে সিনিয়ার কাউন্সেল, যথাসময়ে আইনমাফিক চিঠি পাঠাল। আমি কনটেস্ট করিনি।

সমুদ্র কি থেমে গিয়েছিল? নাকি আমারই চোখ থেকে মুছে গিয়েছিল বর্তমান, যা ঘটমান? অতীত আচ্ছন্ন করেছিল আমাকে। শব্দরা বিদায় নিয়েছিল?

আলোর রং বদল ঘটে গেছে এতক্ষণে। তুষারশুভ্র জলকণায় রূপালি আলো জরির পাড় হয়ে নাচছে। ঢেউ এখন অশান্ত, ফুলে উঠছে। ছুঁতে চাইছে আকাশ ও জ্যোৎস্নাবর্ষী চন্দ্রমা। সমুদ্র যেন ধরে রাখতে পারছে না। ঢেউয়ের পরে ঢেউ ক্ষিপ্ত হয়ে ছুটে আসছে পাড়ে, ভেঙে গিয়ে ফিরে যাচ্ছে সমুদ্রের বুকে।

হঠাৎ সমুদ্রের গর্জন ছাপিয়ে শিশুর স্বর কানে এল,—তুমি জলপরি দেবে বলেছিলে! কোথায় বাবা জলপরি?

বালি দিয়ে পরি গড়েছিল শিল্পী। ঢেউ সব ধুয়ে মুছে নিয়ে গেছে। বালক জানে না।

অথচ বাবাকে জলপরি দেখাতেই হয়।

—জলের ওপর ঢেউ দেখতে পাচ্ছ?

—হ্যাঁ।

—ঢেউয়ের মাথায় সাদা ফুল?

—ফুল কোথায় বাবা?

—ঢেউয়ের ওপর চাঁদের আলো পড়ে চকচক করছে!

—হ্যাঁ।

—ওইখানে, ঢেউয়ের চূড়ায় ফুলের মুকুট পরে জলপরি, দেখতে পাচ্ছ না?

—না বাবা, শিশুর গলায় এবার কান্নার সুর।

—তাকিয়ে থাকো, তাকাও, চোখ সরিও না। জলপরিকে মনে করো, হাওয়ায় উড়ছে চুল, দু' হাত ডানার মতো ছড়ানো, মাছের মতো শরীর।

—তবুও দেখতে পাচ্ছি না বাবা।

—বেশ। এবারে ওই জলের দিকে, ঢেউয়ের দিকে, আলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখ বন্ধ করো।

—করেছি।

—এবারে কী দেখছ?

ফিসফিস করে শিশু জবাব দেয়, জলপরি! বাবা, জলপরি দেখতে পাচ্ছি, একদম পরিষ্কার।

হঠাৎ কী যেন হয়ে যায়। একটা ঘর, অন্ধকার। বহুকাল অবহেলায় পড়েছিল, কে যেন এসে আলো জ্বেলে দিয়ে যায়।

চোখ খুলেই তো তাকিয়েছিলাম। বাইরে।

সেখানে আলো, সেখানে ঢেউ, সেখানে অবারিত জ্যোৎস্নায় প্লাবিত চরাচর। সেখানে সুপ্রিম কোর্ট, বার অ্যাসোসিয়েশন, ক্যালকাটা ক্লাব, টিভির ইন্টারভিউ। বিদেশি গাড়ি, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, মরিশাসে গ্রীষ্মাবকাশ।

চোখ বন্ধ করলেই ভেতর।

বাবাই নেই, মাম নেই, মৌসুমীও চলে গেছে। ঠাণ্ডা ঘরে গ্লাস ভর্তি টলটলে পানীয়

ও একটি থ্রিলার ছাড়া সঙ্গ দেবার কেউ নেই। সেখানে আমি একা, বেআব্রু, অসহায়।

একটা যন্ত্রণা, যা কাল রাত থেকে সঙ্গ ছাড়েনি, পেট থেকে বুক থেকে গলা হয়ে ছড়িয়ে পড়তে লাগল সমস্ত শরীর। যন্ত্রণা, অথচ এক আশ্চর্য সুখ, যেন জড়িয়ে নিচ্ছে আমাকে, টেনে নিচ্ছে আলিঙ্গনে।

চোখ বন্ধ করে ফেললাম। জলপরি।

আর চোখ খুলতে ইচ্ছে করল না।

ফ্যাসাদ

ঢোকার সময় বাইরেটা দেখে কেমন গা ছমছম করছিল, ব্রজর মুখ দেখেই ভজহরি বুঝতে পারলেন, ব্যাপার গুরুতর।

—কী হয়েছে রে? গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

—পাশের ঘরে চলুন, কেস জন্ডিস।

ব্রজর পিছুন পিছুন পাশের ঘরে ঢুকল ভজহরি। ঢুকতেই গন্ধটা নাকে এসে লাগল। মরা ইঁদুর আর দিশি মাল পাঞ্চ করলে এই গন্ধ তৈরি হয়। ইঁদুর প্রচুরই আছে, দু-চারখানা মরলে খারাপ কিছু হবে না। আর ভজহরি সুদ্ধ সকলেই গলা ভেজাবার জন্য এ ঘরে মাঝে মাঝে আসেন। সেটাও দিনের আলোর মতো সত্যি; কিন্তু গন্ধ? খুন করো, কেউ বারণ করছে না, কিন্তু আঙুলের ছাপ রেখো না। ইঁদুর থাকবে, মরবেও। দিশি মালের বোতল গড়াগড়ি খাবে। কিন্তু গন্ধ বেরোনো চলবে না। এই গন্ধই ছড়াতে ছড়াতে পাশের ঘরে পৌঁছোবে। আর তারপরেই...

—শিগগির বল, বুকের ধড়াসটা গলার কাছাকাছি উঠে এসেছে, নীচে নামাতে নামাতে ভজহরি বললেন।

—টিভির লোক এসেছিল স্যার, ছবি তুলে নিয়ে গেছে। আজ রাত্তিরে দেখাবে—এবিসিডি সব চ্যানেলে। আপনাকে খুঁজছিল। আমি বলেছি ডাকাতি কেসের কিনারা করতে গেছেন। একটা মেয়েছেলে, ঘাড় ছাঁট চুল, এমন ঠ্যাঁটা বলে কিনা, কোন এলাকা বলুন তো, ওটাও কভার করে ফেলি। শুনতে পাইনি এমন ভান করে কাটিয়ে দিলাম।

এলিয়ে পড়লেন ভজহরি। টিভি। ওই ভয়টাই এতদিন করছিলেন। অথচ ক'টা দিন আগেও টিভিতে মুখ দেখানোর জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যেত। অনেক থানাদারই নিজে ফোন করে টিভির লোককে আনিয়ে মুখ দেখাত।

দিনকাল বদলে গেছে। টিভিতে আজ রাত্তিরে ছবি মানেই হয়ে গেল। কেন যে মরতে যেতে গেলাম। নিজের কপাল নিজেই চাপড়ালেন ভজহরি।

ঠিক এগারোটায় সাবিত্রীর ফোন, বউদি যন্ত্রণায় ছটফট করতেছে, শিগগির আসুন!

সাবিত্রী বহুকালের লোক, ওর গলায় উদ্বেগটা ধরতে অসুবিধা হল না। কিন্তু কোথায় যন্ত্রণা, কেন যন্ত্রণা জানার আগেই লাইন কেটে গেল।

সকালবেলা ভাল দেখে বেরোলেন, এই দু-ঘন্টার মধ্যে এমন কী ঘটে গেল যে সাবিত্রীকে দিয়ে ফোন করাতে হল? এমনিতে ক্ষমা শক্তপোক্ত মেয়ে, অল্পে টসকে যাবার লোক নয়। বরং ভজহরিই, যত ডাকাবুকোই দেখাক, ভেতরে ভেতরে দুর্বল প্রকৃতির মানুষ।

তাড়াতাড়ি গাড়ি বের করতে বললেন। রাস্তাতেও ভাবতে ভাবতে গেলেন, জলের বোতল আধখানা গলায় ঢেলেও তেষ্টা গেল না, গাড়ি থেকে নেমে একরকম ছুটেই ভিতরে ঢুকলেন, ঢুকে দেখলেন ক্ষমা চোখ বন্ধ করে মাথায় বালিশ চেপে শুয়ে, পায়ের

কাছে সাবিত্রী পাথরের মূর্তির মতো স্থির।

—কী ব্যাপার? কী হয়েছে?

হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করলেন ভজহরি।

সাবিত্রী ঠোঁটে আঙুল দিয়ে কথা বলতে নিষেধ করল। তারপর ফিসফিস করে বলল, দাঁতে ব্যথা, একটু আগেও কাটা পাঁঠার মতো ছটফট করছিল। খগেন ডাক্তারকে ফোন করে জেনে নিয়ে একটা ব্যথার ওষুধ খাওয়ানোতে সমস্যা কম পড়েছে, ব্যথার তাড়শে ঝিমিয়ে আছে, এখন ডাকাডাকি না করাই ভাল।

একটা মান্তর বউ, তা ছাড়া বয়েসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অভিমানটাও বাড়ছে। মিতুলের বিয়ে হয়ে চলে যাবার পর ভজহরিও চেষ্টা করেন ক্ষমাকে সময় দিতে।

থেকেই গেলেন ভজহরি। খেতে তো আসতেই হত, না হয় একেবারেই যাবেন।

উঠে ক্ষমা অবাক হল। খুশিও। ব্যথা অনেকটা কম। খেতে চাইছিল না। সাবিত্রী জোর করে একটু গলাভাত খাওয়াল। ভজহরিও সামনে বসে গেলেন। খেতে খেতেই ব্রজর ফোন। ভাতের শেষ দলাটা গলায় আটকে গেল ভজহরির। আজ যে কার মুখ দেখে উঠেছিলাম।

—কী নিয়ে লাগল?

—প্রথমে ঘি।

—ঘি? অত সরেস ঘি, তাই নিয়েও? ঘি নিয়ে কী?

—গন্ধ। পুরনো মাল।

ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন ভজহরি। নোংরার মধ্যেই বসে আছেন এতক্ষণ খেয়াল করেননি। ইউনিফর্ম থেকে ইঁদুর ইঁদুর গন্ধ বেরোচ্ছে।

নাক টিপে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, আর দ্বিতীয়টা?

ব্রজ প্রথমে বুঝতে পারেনি। ঘুরে তাকাল। তবে কয়েক সেকেন্ড। চোদ্দো বছরের স্যাঙাত বেশিক্ষণ লাগল না।

—হ্যাঁ, ঘিয়ের পরে ইলিশ।

—ইলিশেও? আর্তনাদ করে উঠলেন ভজহরি।

—হ্যাঁ স্যার, ইলিশটা নাকি গঙ্গারও না পদ্মারও নয়, চিল্কার। মাছের আড়তদার, প্রাণকেষ্ট, ওই যে বারো নম্বরে রয়েছে..., ও-ই হাওয়াটা তুলে দিল। ঘোড়ার মুখের খবর, তা কি আর মিথ্যে হয়, সবাই মিলে নাচতে লাগল, 'চিল্কার ইলিশ খাচ্ছি না খাব না।' হয়ে গেল।

—আর টিভি?

—মোবাইল স্যার, সেলফোন। শালারা মোবাইল নিয়ে ঘোরে। পায়খানা-পেচ্ছাপে বসলেও কান থেকে মোবাইল খসে না। ওদেরই কেউ খবর দিয়েছে।

অফিস ঘরে ফিরে যেতে যেতে ধাঁ করে একটা কথা মনে পড়ে গেল। আজ টিভিতে দেখাবে। সব চ্যানেলে। কী দেখাবে? না জেল হাজতে বন্দিদের বিক্ষোভ। কেন বিক্ষোভ না ঘি-তে গন্ধ এবং ইলিশের জাত নিচু। কোথায় ঘটনা? না সাতখিরা থানায়।

কিন্তু কোন সাতখিরা, কোথাকার সাতখিরা, কে সেই বড়বাবু? বড়বাবুর মন্তব্য? বড়বাবুর চেহারা?

ধন্য ক্ষমা। সতীসাধ্বী স্ত্রী একেই বলে। অনেক তপস্যায় এমন গৃহিণী জোটে। কী অলৌকিক ক্ষমতা!

ঠিক সময়ে দাঁতের যন্ত্রণার ছল করে যদি ডেকে না নিত আজ কী হত? ভজহরির টাকসমেত শ্রীমুখ এতক্ষণে টিভির ক্যামেরায় বন্দি হয়ে পৌঁছে যেত টিভির সেন্টারে। সন্ধে থেকেই ঘরে ঘরে সেই মুখ পর্দায় ঝলসাত। আত্মীয়স্বজন, মিতুলের শ্বশুরবাড়ি...।

বেঁচে গেছেন ভজহরি। অন্তত এ যাত্রা।

ধারণাটা কতখানি ভুল টের পেতে খুব বেশিক্ষণ লাগল না। দরজা ঠেলে ঢুকল মানস জোয়ারদার।

মানসকে চেনেন ভজহরি। দিনকাল পত্রিকার স্থানীয় সংবাদদাতা।

—নমস্কার দাদা।

—নমস্কার।

—আজ তো আপনার নাম একেবারে খবরের হেডলাইনে। হিরো হয়ে গেলেন মশাই। মানসকে চেনেন ভজহরি। ব্রজকে ডেকে এক প্যাকেট গোল্ডফ্লেক আনতে বললেন। ভজহরিকে নিরুত্তর দেখে নড়ে চড়ে বসল মানস।

—কেসটা কী নিয়ে দাদা?

বোবার শত্রু নেই। কতখানি খবর ওর হাতে আছে সেটাই আগে জানা দরকার। ভজহরি হাঁ করলেন না।

—খিচুড়িটা নাকি তিনদিনের বাসি? গরমকালে তিনদিনের বাসি খিচুড়ি?

—একদম বাজে কথা। আজকে সকালে বানানো। ইস্যুটা খিচুড়ি নয়, খিচুড়ির ঘি।

—যে ঘি দিয়ে খিচুড়ি রান্না হয়?

—আজ্ঞে না। মূর্খটা রান্নাবান্নার কিস্যু বোঝে না, আড়চোখে মানসের দিকে তাকিয়ে ভজহরি বললেন, পরিবেশনের সময় উপরে যে ঘি ছড়ানো হয়, সেটাই নাকি...

—খিচুড়ির উপর ঘি, বলেন কী?

—বহরমপুরে বন্দিরা অনশন করেছিল। তারপর থেকেই মহামান্য আদালত হাজতে ডায়েটের মেনু করে দিয়েছেন। খিচুড়িতে ঘি ঢালা বাধ্যতামূলক।

—বেশ বেশ, ডায়েরিতে নোট করল মানস,—তা ঘি নিয়ে অভিযোগটা কীরকম?

—ঘি-এ গন্ধ।

—গন্ধ? বলেন কী? কীসের গন্ধ?

—ওরাই জানে। ঘিয়ে ঘিয়ের গন্ধ আবার কী? বাপের জন্মে ঘি খেয়েছিস, যে খাঁটি ঘিয়ের গন্ধ জানবি? শালা হাভাতের দল।

—এটা কি আপনার মুখে বসাতে পারি?

মানসের হাঁটু দুটো জড়িয়ে ধরলেন ভজহরি।—প্লিজ। গোল্ড ফ্লেক আনতে দিয়েছি। ওটা দু-প্যাকেট করে দিচ্ছি, আমার মুখে ওইসব অসাংবিধানিক কথাবার্তা বসাবেন না।

কঠিন শব্দটা বলে ফেলে বেশ আত্মপ্রসাদ হল। গলায় জোরও ফিরে এল ভজহরির। সোজা হয়ে বসে বললেন, অথচ ঘি-টা দেখুন বাইরে থেকে কেনা নয়, সরকারি সমবায়িকার ঘি।

—বলেন কী? লাফিয়ে উঠল মানস, আমি তো ঘি-এ অনেক রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি।

থানা থেকে স্টোরিটা সমবায়িকা অবধি বিস্তৃত। সরকারি সমবায়িকা। কোন জায়গা?

ডায়েরিতে বিস্তারিত লিখে উঠে পড়ল মানস। মানসকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে নিজেই নিজের পিঠ চাপড়ে দিলেন ভজহরি। এক, ঘটনাটা সমবায়িকার দিকে ঘুরিয়ে দিতে পেরেছেন। দুই, ইলিশ মাছের ব্যাপারটা পুরো চেপে গেছেন। সন্ধের মুখে যে এল তাকে ভজহরি আগে দেখেননি। মুখভর্তি দাড়ির জঙ্গল, কাঁধে তেলচিটে ঝোলাব্যাগ, পায়ে হাওয়াই চপ্পল।

ব্রজ খেদিয়েই দিচ্ছিল, দিনকাল খারাপ, কী মনে করে ভিতরে নিয়ে এল।

—নমস্কার, আমার নাম তপন নস্কর।

—নমস্কার, আপনাকে তো ঠিক...

—চিনলেন না। চেনার কথাও নয়। আমি মানবাধিকার রক্ষণ সংগ্রাম সমিতির জেলা কমিটির সম্পাদক।

মানবাধিকার। শুনেই শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত নেমে গেল ভজহরির। ওই একটা শব্দই এখন পুলিশকুলের কাছে কেউটে সাপের চেয়েও খতরনাক।

—বলুন স্যার।

—জেল হাজতে রাখা বন্দিদের অধিকারগুলো সম্বন্ধে আপনি কি পুরোপুরি অ্যাওয়ার?

—অফ কোর্স। প্রত্যেকের জন্য একশো স্কোয়ার ফুট জায়গা, অ্যাটাচড বাথ, বাথরুমে গিজার-কমোড-শাওয়ার, গ্রীষ্মে এসি, কুলার, শীতে রুমহিটার, দু-সেট জামাকাপড়, কালারড টিভি উইথ রিমোট সঙ্গে মিনিমাম একশো চ্যানেলের কেবল কানেকশন, শেভিং সেট আফটার শেভ, মেয়েদের জন্য লিপস্টিক, আই লাইনার...

—থামুন, নস্করের এক দাবড়ানিতে চুপ করে গেলেন ভজহরি। ম্যানুয়াল দেখে আওড়াতে হবে না, কী কী করেছেন আর কতখানি পারেননি সেটা বলুন।

—রুম হিটারটা আনতে পারিনি, তবে এখন তো গরমকাল, শীত পড়ার আগেই এসে যাবে। বাকি যা যা মহামান্য আদালত ফর্দ বেঁধে দিয়েছেন সবই জোগাড় হয়ে গেছে।

—আসলটা?

—আজ্ঞে?

—খাবার। ওটাই তো আসল। সে ব্যাপারে কী স্টেপ নিয়েছেন?

—বাসমতী চাল, আরামবাগের চিকেন, সপ্তাহে দু-বেলা মাটন, ব্রেকফাস্টে লুচি-আলুর দম না হলে ব্রেড-বাটার-অমলেট...

—হ্যাঁ বাটার। কোয়ানটিটি?

—একদম ফিক্সড। ইচ্ছে হলে মেপে নিতে পারেন।

—কোয়ালিটি?

—অ্যাসিওরড। সমবায়িকার মাল।

—সমবায়িকা? আই সি।

দাড়ির জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ইংরেজি শব্দগুলো অক্লেশে বেরোচ্ছে। এ মাল দিশি নয়, সাক্ষাৎ বিলিতি।

—হ্যাঁ, আর মাছ?

—ফ্রেশ জিনিসই এখানে সাপ্লাই হয় স্যার, পুকুর-বিল নদীর তো অভাব নেই। টাটকা

ধরা মাছ কিনে আনা হয়। আমি যাচাই করে নিই।

—ইলিশও কি পুকুর থেকে আসে?

শালা সব জেনে এসেছে। ভজহরি দুর্বল হয়ে পড়েন।

—না, মানে ইলিশটা...

—হ্যাঁ, বলুন, ইলিশটা... উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়েন নস্কর। ভজহরির গলায় কান্নার দলা এসে আটকে যায়।

—ইলিশ আর এখানে কোথায় পাব স্যার? চালানের মাল, যখন যেমন আসে...

—ছি, ছি, ছি!

ঘেন্নায় ধিক্কারে টুকরো টুকরো হয়ে যান নস্কর। মাথা নাড়তে নাড়তে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে থাকেন। তারপর একসময় হঠাৎ থেমে গিয়ে ভজহরির দিকে ফিরে গর্জে ওঠেন, এজন্য আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে।

উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, ধপ করে চেয়ারে বসে পড়েন ভজহরি। নস্কর টেবিলের উপর থেকে ঝোলাটা গুছিয়ে নিয়ে দ্রুত ঘর ছেড়ে চলে যান।

টুপিটা খুলে ফেললেন ভজহরি। বিকেলের ঠাণ্ডা হাওয়া, জিপ ছুটছে দক্ষিণমুখো, টাকের ওপর জমে থাকা ঘামের বিন্দুগুলো আস্তে আস্তে মুছে গেল। শরীর জুড়োচ্ছে। ক্লান্তি ও টেনশনে চোখদুটো আস্তে আস্তে জুড়ে এল।

ঘুম ভাঙল ঝাঁকুনিতে। বাড়ি পৌঁছে গেছেন। নামতে নামতে ব্রজকে বললেন, কাল ঠিক ন-টায় হাজির হতে হবে, মনে থাকে যেন। ঘাড় নেড়ে ব্রজ চলে গেল।

ক্ষমার শরীরটা এখন অনেক সুস্থ। দাঁত উপড়ে ফেলা হয়েছে। হাসিতে সামান্য কলঙ্ক লেগেছে, তবে দন্তশূলের চেয়ে সেটা অনেকই ভাল। ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই লোডশেডিং। ইউনিফর্ম খুলে একটা তোয়ালে জড়িয়ে বারান্দায় এসে বসলেন। সাবিত্রী রান্নাঘরে। মাদুরে বসে ক্ষমা হাতপাখা নেড়ে হাওয়া করে দিতে লাগল।

—কতদূর হল?

এইসময় ক্ষমা সঙ্গ দেবার জন্য মাঝেমাঝে একটা-দুটো কথা জিজ্ঞেস করে। ভজহরিও জবাব দিয়ে আনন্দ পান।

—নদীর ধারে জমি দেখা হল। খাস জমি, প্রায় দু-বিঘে, ওইখানেই নতুন বিল্ডিং হবে। পাঁচিলঘেরা বাড়ি, অফিস। সব উঠে যাবে।

—পাঁচিল? পাঁচিল কী হবে?

ন্যায্য কথা বলেছে ক্ষমা। সত্যিই তো, পাঁচিল দিয়ে কী হবে? পাঁচিল থাকে আটকে রাখার জন্য, কেউ কি চলে যেতে চাইছে? যে একবার ঢুকছে সে আর বেরোচ্ছে না। কাতারে কাতারে মানুষ লাইন দিয়ে আছে ঢোকবার জন্যে।

ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল বছর কয়েক আগেই। বিচারধীন বন্দিদের ওপর থার্ড ডিগ্রি প্রয়োগ, এসবের প্রচলন তো আজ নয়। সেই ব্রিটিশ আমল থেকেই চলে আসছে। দু-একটা কেসে বাড়াবাড়ি হয়ে গেল। দু চারপিস রোগা হাজা কয়েদি, এমনিই মরত, সহ্য করতে না পেরে টেঁসে গেল।

ব্যস, লেগে গেল পেতনির ত্যানায় আগুন। ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রেস, খেপে গেল আদালত, মানবাধিকার রক্ষায় ব্যস্ত সংগঠনগুলো আইনের ঝুঁটি ধরে নাড়িয়ে আদায় করে নিয়ে এল একের পর এক অধিকার।

জেলখানা হয়ে গেল সংশোধনাগার। হাজতও তার পুরনো গৌরব হারাল। ফলে এখন চুরি-ডাকাতি-রাহাজানির আসামিকে গদি আঁটা চেয়ারে বসিয়ে শিঙারা-কফি খাইয়ে এজাহার নিতে হয়। তাদের থাকার জন্য এলাহি বন্দোবস্ত। আলাদা ঘর তো হয়েই গিয়েছিল, শোনা যাচ্ছে স্বামী বা স্ত্রী, এমনকী সঙ্গী সঙ্গিনীকেও থাকতে দেওয়া হবে।

বিপদটা এল অন্যদিক থেকে। জেলে বসেই সব পাওয়া যাচ্ছে, তাই জেল থেকে কেউ আর বেরোতে চাইছে না। যারা বাইরে তারাও জেলে ঢোকার জন্যে হত্যে দিয়ে পড়ে আছে। ছিঁচকে চোর বলছে ডাকাতি করেছি। যাতে তার শাস্তির মেয়াদ বাড়ে। হাভাতে না-খেতে পাওয়া মানুষরা ছোটোখাটো অপরাধ করে সংশোধনাগারে এসে মহা আনন্দে দিন কাটাচ্ছে।

ফলে একদিকে যেমন সমস্ত জেলখানা থই থই করছে ভিড়ে, তেমনই পুলিশ হেফাজত থেকে কোনও আসামিকেই জেলে পাঠানো হচ্ছে না। জেলহাজতেও আসামির সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। তৈরি করতে হচ্ছে নতুন নতুন বাড়ি, আবাস, সংশোধনাগার। জমি দেখা হচ্ছে, নেমে পড়েছে গৃহনির্মাণ দপ্তর।

অন্য সমস্ত দপ্তরে খরচাপাতি বন্ধ। সরকারি কর্মীদের মাইনের বদলে ডিউস্লিপ ধরানো হচ্ছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, রাস্তাঘাট নির্মাণে ব্যয়বরাদ্দ শূন্যে এসে ঠেকেছে। সরকারি দপ্তর বলতে এখন একটাই। সরকারি খরচা যেটুকু যা হয় সবই এইখাতে। অন্য কোনও দপ্তরে কোনও কাজ নেই।

ভজহরিদের মাথায় হাত। একদিকে অবশ্য সুবিধা হয়েছে, পুলিশের কাজ বলতে যা বোঝায় তা আর করতে হয় না। নতুন বাড়ি তৈরির তদারকি, ডায়েট-কনট্রাকটরের সঙ্গে দরাদরি, ফ্রিজ বা টিভির মডেল পছন্দ এসব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজে চব্বিশ ঘণ্টা ব্যস্ত থাকতে হয়। মল্লারপুরের বৃকোদর নন্দীর মতো অনেকেই এই সুযোগে নিজে তিনতলা বাড়ি করে টিভি-ভিসিআর, মাইক্রোওয়েভ দিয়ে ঘর বোঝাই করে ফেলেছে।

পরোটা আলুভাজা এসে গিয়েছিল। কামড় দিতে দিতে মাথা ঘুরিয়ে উপরটা দেখলেন ভজহরি। সামনে বর্ষা, ছাদে বহু জায়গায় ফাটল। না সারালেই নয়।

ফতুয়ার ভেতর থেকে বেরিয়ে থাকা শরীরের অংশগুলির দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন ভজহরি। গদার মতো দু-খানা হাত, ঘাড়ে থাকথাক মাংস, মুগুরের মতো পা। এমন তৈরি চেহারা আজকাল দেখা যায় না।

এবং মানুষটা উত্তেজিত।

আজকাল উত্তেজিত মানুষও দেখাই যায় না। থানার সকলেই এমন ভদ্র ও বিনীত ব্যবহার করে, চা-কফি-কোল্ড ড্রিংক-এ আপ্যায়ন করে যে তাবড় তাবড় ক্রিমিনালও গলে জল হয়ে যায়।

ছোটরা সবাই ভয়ে ভয়ে দেয়াল ঘেঁষে সিটিয়ে দাঁড়িয়ে, বেগতিক দেখে ভজহরি নিজেই চেয়ার টেনে বসলেন।

—কী হয়েছে?

—আর বলবেন না। এত করে বলছি, কেসটা লিখবেন না।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি দেখছি বলে ভজহরি ব্রজর দিকে চাইলেন।

ব্রজ এগিয়ে এসে বিনীতভাবে দাঁড়াল।—স্যার, ওনার বাড়িতে একটা তেরো-চোদ্দো বছরের মেয়ে ছিল। ঘরের কাজটাজ করত, গোসাবার ওদিকে বাড়ি। কাল রাত্তিরে ওনার স্ত্রী আর ছেলেমেয়ে বাইরে নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিল। সেই সুযোগে উনি, মানে মেয়েটাকে... যা হয় আর কী। তা মেয়েটা রাত্তিরে গলায় দড়ি দেয়। এখন মুশকিল হচ্ছে, মেয়েটা অল্পস্বল্প লেখাপড়া জানত। ও একটা লিখিত বয়ান দিয়ে গেছে। সকালে ঘরের দরজা ভেঙে যখন মেয়েটাকে বের করা হল তখন পাড়ার লোক থেকে আত্মীয়স্বজন সবারই চোখ পড়ে ওই বয়ানটার উপর। আমরা ওনাকে অ্যারেস্ট করতে বাধ্য হই।

—স্টেটমেন্টটা?

—আমাদের কাস্টডিতে। তবে ওর কপি প্রেস-এর হাতে চলে গেছে।

—বডি?

—পোস্টমর্টেমে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ভজহরি ঘুরলেন, হ্যাঁ বলুন আপনার কী বলার আছে?

রমেন মিত্তির, ততক্ষণে নামটা দেখে নিয়েছেন ভজহরি, দু-হাতের পাতা ওলটালেন, একটাই রিকোয়েস্ট, কেসটা আপনারা রেকর্ড করবেন না।

—কী করে মিস্টার মিত্তির? অকাট্য প্রমাণ আপনার বিরুদ্ধে।

—সব মানছি। কিন্তু আমি বলছি, কেসটা আপনি নেবেন না। আমি পুষিয়ে দেব।

. আগে হলে ভজহরি লাফিয়ে উঠে মিত্তিরের টুটি টিপে ধরতেন। সেদিন চলে গেছে। বেশি উত্তেজনা হলে আজকাল শরীর খারাপ লাগে। তুরুপের শেষ তাস ছাড়লেন এবার।

—আপনি কি জানেন আমরা বিচারাধীন আসামিদের, এমনকী জেলহাজতেও কী কী ফেসিলিটি দিই? রুম সার্ভিস, টিভি, অ্যাটাচড বাথ...

—থাক। ফাইভস্টার কমফর্ট দিলেও আমার পক্ষে থাকা সম্ভব নয়।

মনে মনে খুশিই হচ্ছিলেন ভজহরি। আজ যা অবস্থা, একে হাজতে ঢোকালে রুম-শেয়ারিং অনিবার্য। তার মানেই কাল মানবাধিকার, আদালত, ক্ষমাপ্রার্থনা।

বলি বলি করে শেষ অবধি, জিজ্ঞেস করেই ফেললেন ভজহরি।

—কেন মিস্টার মিত্তির? আজকাল তো এগুলো স্টেটাস সিম্বল। তা ছাড়া আপনার পৌরুষের এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কী হতে পারে। পিছিয়ে যাচ্ছেন কেন?

মিত্তির একটু ঢোঁক গিললেন, সামনে রাখা জলের গেলাস থেকে একঢোঁক খেলেন।

বললেন, দেখুন বড়বাবু, আমি সামনের ইলেকশনে নমিনেশন পাচ্ছি, পাচ্ছিই। আর দাঁড়ালে. কার ঘাড়ে ক'টা মাথা আমার এগেইনস্টে ক্যান্ডিডেট দেয়? একটাই বাধা। এই রেকর্ড। নিয়ম অনুযায়ী, রেপ বা মার্ডারের কনভিক্ট হলে আমার আবেদন ইলেকশন কমিশন খারিজ করে দেবে। দয়া করে আমার ভবিষ্যতের কথা ভেবে কেসটা আপনি রেকর্ড করবেন না।

একজন উদীয়মান জননেতা এবং ভবিষ্যৎ জনপ্রতিনিধির সামনে বসে ভজহরি আলোকিত ভবিষ্যতের কথা ভেবে পুলকিত হলেন।

আকাশের রং

থার্সডে দ্য ইলেভেন্‌থ্‌

জানতাম। ঠিক তাই। সঙ্গে সঙ্গে বাইরে গিয়ে বসেছে। গা ঘষছে। হেনরির মতো। হেনরি? কি নাম রেখেছিস রে? কুকুরের নাম কখনও হেনরি হয়? লালু, ভুলু এইসবই তো শুনেছি। তাও যদি হত ডোবারম্যান কিংবা অ্যালসেশিয়ান। এ তো রাস্তার আনঅ্যাডালটারেটেড খেঁকি কুকুর। আর হেনরি কোন রাজা ছিল না? হিস্ট্রিতে পড়েছি!

খিকখিক করে হেসেছিল চন্দ্রা,—ওইজন্যেই তো! যারা শুনবে তারা ভাববে এ নির্ঘাৎ ফরেন মাল। দেখিসনি দিশি পারফিউমেরও কেমন বিদেশি নাম দেয়। আর লোকে হামলে পড়ে কেনে। ওইটাই, ওই নামটাই ট্রেড সিক্রেট। আর তোদের জন্যে তো নয়। চোর-ডাকাত-গুণ্ডা-বদমাশ। হয়তো ঘুরছে আশেপাশে। ডাকলাম, হেনরি...ই। আর ল্যাজে একটু সুড়সুড়ি দিয়ে দিলাম। ডেকে উঠল ভৌ ভৌ। শুনেছিস তো ডাকটা, কেমন গম্ভীর। দেশি-বিদেশি তফাত করা যায় না। ওই ডাকেই হয়ে যাবে।

সে যেমনই ডাকুক, হেনরির মতো অমন রামভিতু আর আদরখেকো কুকুর জিন্দেগিতে দেখিনি। রাস্তা দিয়ে একটা লরি গেলেও আওয়াজ শুনে টেবিলের তলায় লুকোয়। খালি পা চাটবে, হাত চাটবে আর কোলে উঠে বসে থাকবে।

দেখেছ? কোথা থেকে কোথায় গিয়ে পড়লাম? ওই হয়েছে আমার দোষ। কিছুতেই একটা কিছুতে মন বসিয়ে রাখতে পারি না। একরকম ভাবতে ভাবতে একটা কাজ করতে করতে অন্যদিকে মন চলে যায়। আজকেও বকুনি খেলাম ওই জন্যেই।

দোষটা কিন্তু সম্পূর্ণ সুপর্ণার। খামোখা রাগিয়ে দিল। জানে আমার সেই বিট্‌ল্‌স্‌, অ্যাবা, এলভিসই পছন্দ। কোথা থেকে কী একটা কার, জন্মে নাম শুনিনি, ক্যাসেট এনে সাধাসাধি, একটিবার শুনে দ্যাখ। আমি শুনব না ও-ও শোনাবেই। মাথাটা এমন গরম হয়ে গেল। পরের ক্লাসেই ম্যাথস।

আচ্ছা আমাকে ম্যাথসটা দিল কে? তুমিই তো! বারবার বলেছি, ম্যাথস আমার আসে না, ওই নম্বরটা সত্যি নয়, অনেক জল মেশানো আছে। কে শোনে কার কথা? জোর করে ঘাড়ে চাপাল। তার ওপর ট্রিগোনোমেট্রি। পাঁচটা অঙ্ক করতে দিয়েছিল ম্যাম, চারটে ভুল। খাতায় আজেবাজে রিমার্কস লিখে দিল। সেই খাতাটা, যেমন ক্লাস ওয়ানে দেখত, এখনও খুলে দেখার বদভ্যেস যায় নি, যেই না দেখেছে হয়ে গেল।—আমাদের সকলের মুখে চুনকালি দিবি তুই? অঙ্ক ছাড়া আজকাল কিছু হয়? জেনারেল লাইনে পড়তে গেলেও ভাল ভাল যত সাবজেক্ট ইকনমিক্স, স্ট্যাটিসটিক্স, সবকিছুতেই অঙ্ক। আমাকে পাগল করে দিবি দেখছি। দাঁড়া সামনের মাসেই তোকে ম্যাথস্‌টিচারের কাছে পড়তে পাঠাব।

আধঘণ্টা ধরে উপদেশ ঝাড়ল। কে বলবে এখন দেখে? গড়াগড়ি খাচ্ছে। গা ঘষছে। হেনরি কোথাকার।

হেনরি! হিহি! হেনরি! বেশ নাম হয়েছে। কিন্তু মেয়েদের নাম কি হেনরি হয়? হেনরি তো পুরুষের নাম। যাক গে, ও সব অবশ্য আজকাল কেউ মানে টানে না। এখন ইউনিসেক্স ড্রেস-জিন্স্ আর টি শার্ট। ইউনিসেক্স নাম, হেনরি। আচ্ছা মিত্রা নামটাও তো ইউনিসেক্স, এম আই টি আর এ, মিত্র অথবা মিত্রা। মিতুলটা অবশ্য মেয়ে মেয়ে, কোথায় যেন পড়েছিলাম, মিতুল নামের পুতুলটি। মিতুল নামটা কে রেখেছিল? হেনরি? তাই হবে নিশ্চয়। দিনরাত যেরকম মেয়ে মেয়ে করে।

—মেয়েদের অত ধিঙ্গিপনা করতে নেই।

—মেয়েদের সন্ধের পর বাড়ির বাইরে থাকতে নেই।

—মেয়েদের বার্থডে পার্টিতে গিয়ে রাত করে বাড়ি ফিরতে নেই।

—মেয়েদের একা একা নিউ মার্কেট-চৌরঙ্গিতে ঘুরতে নেই।

—মেয়েদের অত গলা চড়িয়ে কথা বলতে নেই।

—মেয়েদের একটু আধটু রান্নাবান্না শিখে রাখতে হয়।

অসহ্য! মেয়ে আর মেয়ে। নিজে? শেফালিমাসির অ্যানিভার্সারি থেকে রাত এগারোটায় ফেরনি? একা একা সুযোগ পেলেই এই বুটিক সেই শোরুমে হামলে পড় না? আর গলা? পাড়াসুদ্ধ সমস্ত লোক তোমার গলা চেনে। ওইরকম হাস্কি আর ভাঙাভাঙা গলা এই তল্লাটে আর দুটো আছে? আসলে মেয়ে নয়, মিতুল। মিতুল, তুমি এটা করবে না। মিতুল তোমার ওটা করা উচিত নয়। অথবা মিতুল, আমি চাই তুমি এইটা করো, এইটাই করো আর কিছু নয়, যেন মিতুল নয়, পুতুল। সুতো টানবে, আর যা বলবে তাই করব আমি। বেশ, তাহলে এটাও জেনে রাখ, অনেক করেছি, এতদিন করছি। আর করব না।

হ্যাঁ, আমারও পছন্দ-অপছন্দ আছে। আর যেটা আমার ভাল লাগে না সেটা আমার করতে ইচ্ছে করে না। এ ব্যাপারে কোনওরকম হিপোক্রিসি আমার বরদাস্ত হয় না।

শাড়ি পরতে আমার মোটেও ভাল লাগে না। কেমন পুতুল পুতুল, জড়ভরত, কোনও ফ্লেক্সিবিলিটি নেই। ছোটা যায় না বাসে ওঠা যায় না। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে নামতেও মহা অনর্থ। বাইরে বেরুলে শাড়ি সামলাব না কাজ করব?

ম্যাথস আমার ভাল লাগে না। খালি ফর্মুলা মুখস্থ কর আর মিলিয়ে যাও। লেফট হ্যান্ড সাইড ইজ ইকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড সাইড। কখনও হয়? বাঁহাত আর ডানহাত সমান? বাঁদিক আর ডানদিক? ম্যাথস নয়, ওটার নামই ফেয়ারি টেলস হওয়া উচিত ছিল।

শশা খেতে আমার ভাল লাগে না। আমি নাকি মোটা হয়ে যাচ্ছি। তাই শশা, আর ঝিঙে, আর শাকপাতা আমার স্টেপ্‌ল্‌ফুড্। আমি কি ছাগল? অথচ মেপে দেখেছি, আমার ওয়েস্ট গত ছ'মাস ধরেই আটাশ, এক ইঞ্চিও বাড়েনি। ওয়েটও ফিক্সড অ্যাট ফিফটি এইট, উইথ এ হাইট অব ফাইভ ফাইভ। খুব খারাপ?

বাংলা গান শুনতে আমার অসহ্য লাগে। বাংলা ল্যাঙ্গোয়েজটাই কেমন যেন, স্পাইনলেস, আলুভাতে আলুভাতে। আর গান? এক দিকে ওই, কী যেন বলে, জীবনমুখী গান। সোশ্যালে গিয়েছিলাম শুনতে। ওরে বাবা! পাঁচ মিনিটের গান, তারপর আধঘণ্টা

গালাগালি। বাংলাতেও যে অমন গালাগালি দেওয়া যায়, না শুনলে বিশ্বাস করতাম না। বাজারের মাছওলা থেকে পার্টির নেতারা যার যার সঙ্গে শত্রুতা সক্কলকে ধুইয়ে দিল। আর গান? থাক। অন্যদিকে রবীন্দ্রসংগীত। মাগো। "ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ছি।" ওটা নাচ? গোল গোল করে হাত নাচানো। গানগুলো সমস্ত নাকিকান্না, প্যানপ্যানানি। রোবাস্ট ভাবটাই নেই। নেহাত হেনরি পাশের চেয়ারে বসে কটমট করে তাকিয়েছিল। নাহলে কখন উঠে চলে আসতাম।

কিন্তু একটা ব্যাপার। বাংলা গান, রবীন্দ্রসংগীত ভালবাসি না মানে যারা ওইসব পছন্দ করে তাদের সকলকে অপছন্দ করি তা কিন্তু নয়। তা হলে আর ওকে ভালবাসলাম কী করে?

ও, যে যাই বলুক, পুরোদস্তুর বাঙালি। অথচ সেটার মধ্যেও একটা দারুণ অ্যারিস্টোক্রেসি আছে। ফোনটা ধরে কখনও বলে না হ্যালো, বলে নমস্কার। কোনও বিয়েতে, পৈতেয়, অ্যানিভার্সারিতে প্যান্ট শার্ট পরে যায় না, পরে কোঁচানো ধুতি, গরদের পাঞ্জাবি। রাত্তিরে একা একা আলো নিভিয়ে গান শোনে। শুনতে শুনতে আমিও শিখে গেছি। রবীন্দ্রসংগীত। দেবব্রত বিশ্বাস, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবিনয় রায়, সুচিত্রা মিত্র। নামগুলো আমি পড়ে পড়ে শিখে নিয়েছি। অবশ্য গলা চিনে আলাদা করতে পারব না। আর ক্যাসেট শোনে না। পুরনো একটা রেকর্ডপ্লেয়ারে রেকর্ড চড়ায়, লংপ্লে। অনেকক্ষণ পর উঠে উঠে উল্টে দিয়ে আসে, অথবা রেকর্ড বদলায়। তখন কেমন যেন ওকে অনেক দূরের, অচেনা লাগে। কাছে যেতে ভয় করে। দূরে দূরে থাকি। দূর থেকে দেখি। তবুও ভেতরটা কেমন যেন করে। ভরে থাকে। ইচ্ছে করে কাছে যাই। ভীষণ একা তো। মাথাটা বুকে নিয়ে চুলে হাত বুলিয়ে দিতে ইচ্ছে করে।

উঠেছে। ব্যালকনিতে চেয়ার টানার শব্দ পাওয়া গেল। উঠে বাথরুমে গেল। বাথরুম থেকে বেরিয়ে একবার আমার কাছে আসবে। আসবেই। কিছুক্ষণ বসবে। দুটো কথা বলবে। একটু আদর করবে। আমার বুকের ভেতরটায় দুমদুম আওয়াজ হবে। হাসার চেষ্টা করব আমি। তারপর ও উঠে যাবে। ঘরে গিয়ে কাজ করবে। অনেক রাত অবধি। হেনরি একটু পরেই গিয়ে শুয়ে পড়বে। তখন বড় আলোটা নিভিয়ে টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালাবে ও। আমি খোলা বই সামনে রেখে জেগে থাকব। জেগে থাকব। রাত গড়িয়ে যাবে। কুকুরের ডাক। জাহাজের ভোঁ। ভোরের ট্রাম। এইভাবেই।

মানডে দ্য ফিফ্‌টিন্‌থ্‌

অঙ্কুরটা সহ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে।

আগের দিন লিখেছিলাম কী কী আমার ভাল লাগে না। সেদিন বলা হয়নি, এই সুযোগে লিখে রাখি, একটা জিনিসই আমার ভাল লাগে, ভাল লাগা বললে কম বলা হয়, ওই একটাতেই আমার সমস্ত রিলিফ, ভেন্ট, রিলিজ যাই বল, সেটা ছবি আঁকা। ইজেলের সামনে বসে রঙে তুলি ডুবিয়ে ডুবিয়ে ক্যানভাসে যখন একটু একটু করে একটা আস্ত দৃশ্য মনের ভেতর থেকে তুলে আনি, তখন ম্যাম থাকে না, হেনরি থাকে না, ম্যাথস থাকে না, কিচ্ছু থাকে না। ও থাকে অবশ্য। কনশাসে না হলেও সাবকনশাসে নিশ্চয়ই। নইলে কেন আমার পুরুষ মানুষগুলোর চুল সবসময় ব্যাকব্রাশ করা চোখে কেন চশমা

থাকে, হাতের আঙুলগুলো কেন লম্বা আর তাতে একটাও আংটি থাকে না? সে যাই হোক, ছবি আঁকা আমার চলছে অনেকদিন, ফর্মাল শেখাও হয়ে গেল ক'বছর। সামনের উইকে ফাইনাল পরীক্ষা। একটা ডিপ্লোমাও জুটে যাবে। দেখা যাক। লেখাপড়া ছেড়েছুড়ে দিয়ে এইসব নিয়েও থাকতে পারি।

আসলে ইচ্ছেটা মাঝেমাঝেই করে, কিন্তু শেষ অবধি দানা বাঁধে না তার কারণ অঙ্কুর। ভাল লাগা আর ভাল পারা যে এক জিনিস নয়, অঙ্কুরকে দেখলে বুঝতে পারি। ক'দিন আগে মেঘ করেছিল জোর, কালো মেঘের সিলুয়েটে সাদা ভিক্টোরিয়া। স্যার আমাদের নিয়ে বেরিয়েছিলেন। দাঁড়িয়ে পড়লেন, আঁকো তো! সবাই তাড়াতাড়ি বসে পড়লাম। প্রথমে পেন্সিলে ছবিটা ফুটিয়ে তোলা। তারপর রং। ছবি শেষের মুখে, আড়চোখে তাকিয়ে দেখি অঙ্কুর তখনও কিছুই সাজায়নি, তন্ময় হয়ে দেখেই যাচ্ছে। শেষ হল, একে একে স্যারকে দেখানো হচ্ছে, অঙ্কুর শুরু করল। দূর থেকেই বুঝতে পারছি ঝড়ের মতো তুলি আর ব্রাশের কাজ করছে। স্যারের দেখা শেষ হয়ে গেল। সকলের পেছনে অঙ্কুর। স্যার ছবিটার দিকে তাকিয়ে আছেন, তাকিয়ে আছেন, আমরা দেখতে পাচ্ছি না। অঙ্কুরকে দেখছি। ততক্ষণে মেঘের ওই পারে এক ফোঁটা রোদ্দুর বেরিয়েছে। সেইদিকে তাকিয়ে অঙ্কুর। ছবিটা কী হল, স্যার কী বললেন সেদিকে কোনও খেয়াল নেই। অনেকক্ষণ পরে স্যার ছবিটা আমাদের দিকে ঘোরালেন। কিছুই বলেনি কেউ, কিন্তু আমরা সকলে একই কথা ভাবলাম। তুলি টুলি সব ময়দানের ঝোপেঝাড়ে ফেলে দিয়ে আমাদের ফিরে যাওয়া উচিত। অবহেলায় অঙ্কুর ছবিটা ফেরত নিল। তারপর আমাকে অপমান করার জন্যেই মনে হয়, কাছে এসে ছবিটা বাড়িয়ে দিল,—এটা তোমার জন্যে, তুমি রেখে দাও। কেউ গালে জোরে থাপ্পড় মারলেও আমার অত লাগত না।—থাক, বলে ছুটে চলে এলাম।

ওইরকম। আগে ভ্যাবলার মতো তাকিয়ে থাকত। চোখ থেকে চোখ সরাত না। স্যার কী বলছেন শুনতে পেত না। আজকাল শুরু করেছে এইটা। ছবি এঁকে ওপরে লিখে দেবে "তুলির জন্য।" কোথা থেকে যে ডাকনামটা জেনেছে, আর মিতুল থেকে তুলি, তুলতুলি এইসব হাজারটা নাম বের করেছে, ও-ই জানে। ভয় করে কোনদিন আবার চিঠিটিঠি না লিখে বসে। কী করা যায়? দিনদিন এত বেড়ে যাচ্ছে। অন্যরা হাসাহাসি শুরু করেছে। এবার থামানো দরকার।

ফ্রাইডে দ্য নাইনটিনথ্

সন্ধে থেকেই হাঁচি শুরু হয়েছিল। পরে একটু গলা ব্যথা করতে লাগল। বাড়ি ফাঁকা ছিল। ডিনার ঢেকে রেখে ভারতীমাসি চলে গিয়েছিল। নিজেই গরম করে খেলাম। তারপর এক কাপ কফি বানালাম। কড়া করে। খেয়ে গলাটা খুলল। মেজাজটাও।

বিকেলবেলায় হেনরির সঙ্গে একচোট হয়ে গেল। আমি যে যাইনি, ফর্মও আনিনি, রূপশ্রী বলে দিয়েছিল। দাঁত নখ বের করে উইচদের মতো তেড়ে এল—কী ভেবেছিস তুই? ফর্মও তুলিসনি? ভাল হবে না বলছি মিতুল। এত টাকার শ্রাদ্ধ! সবার মুখ ডোবাবি?

ওইটা, আমি জানি, একটা ইনভেস্টমেন্ট। ম্যাথস, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি। পারসাবজেক্ট

ওয়ান থাউজেন্ড, অন অ্যাভারেজ। মুখে বলে—পারলে পারবি, নাহলে জেনারেল লাইন। ইকন্, স্ট্যাট, আসলে জয়েন্ট। ফর্ম আনিনি শুনে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে। সাফ সাফ বলে দিলাম, ওসব আমার দ্বারা হবে না।

আর একটাও ব্যাপার আছে। হেনরিকে বলিনি। যাদবপুর শিবপুর যদি না হয়? দুর্গাপুর, নর্থ বেঙ্গল, হলদিয়া? ওকে ছেড়ে মাসের পর মাস থাকতে হবে? অসম্ভব?

দাঁত মুখ খিঁচল অনেকক্ষণ। কেঁদে ভাসাল। জানি, ওগুলো ওর অ্যাকটিং, ড্রামাবাজি। ফাউন্ডেশন টাউন্ডেশন সব গলে গিয়েছিল। আবার যত্ন করে সাজগোজ করল। তড়িৎ কাকু যে লিপস্টিকটা সিঙ্গাপুর থেকে এনে দিয়েছে সেটাই লাগাল। তারপর গরগর করতে করতে নেমে গেল।

কিন্তু সেই যে মাথাটা ধরে রইল, বিকেল অবধি তেমনি রইল। কফিটা খেয়ে বেশ ফুরফুরে লাগছিল। একটা এলভিসের ক্যাসেট ওয়াকম্যানে লাগিয়ে কিছুক্ষণ শুয়ে রইলাম। এফ এম শুনলাম, তারপর টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে পড়তে বসলাম। এইচ এস টা তো ক্লিয়ার করতেই হবে, এবং মোটামুটি ভাল করে। বেশ মাথায় ঢুকছিল। ঘণ্টা দুয়েক পড়েই অনেকখানি ব্যাকলগ ক্লিয়ার করে ফেললাম। তারপর সুইচ অফ করে শুতে গেলাম।

শুলাম। কিন্তু ওই কড়া কফি। এপাশ ওপাশ করছি, ঘুম আর আসে না। হঠাৎ দরজা খোলার শব্দ। দু'জনে ঢুকেছে। একসঙ্গে। ড্রয়িংরুমে বসে কিছুক্ষণ বকবক করল। কথা শুনে বুঝতে পারলাম দুজনেই ড্রিংক করছে। ও-ই বলল, ঘর অন্ধকার, ঘুমিয়ে পড়েছে বোধহয়। চুপচাপ। তারপর ও দিকে বেডরুমের দরজা খোলার আওয়াজ।

আলো না জ্বালিয়ে চুপচাপ পড়ে রইলাম। তারপর কী মনে হল উঠে পা টিপে টিপে বাইরে গেলাম। বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস শব্দ হচ্ছে। দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। কথা।

হেনরি—আমি কোথায়? বলো? এখন আর আমি কোথায়? এখন খালি মিতুল আর মিতুল। তোমার সমস্তটা জুড়ে আছে কেবল মিতুল।

ও—পাগলি কোথাকার। তুমিই তো আমার সব।

হেনরি—বাজে কথা বোলো না। আমাকে তুমি সহ্য করতে পার না।

ও—তাই কখনও হয়? মিতুল মিতুল আর তুমি তুমি। মিতুলকে আমি স্নেহ করি। অ্যাফেকশন। বুঝতে পেরেছ? আর ভাল যদি কাউকে বেসে থাকি সে তুমি।

হাত পা কাঁপছিল। গলা শুকিয়ে কাঠ। ভয় হচ্ছিল পড়ে যাব। মনে হচ্ছিল গলা দিয়ে আওয়াজ বেরিয়ে যাবে। কোনওরকমে হাত দিয়ে মুখ চাপা দিয়ে ঘরে ফিরলাম। দরজা বন্ধ করে বিছানায় ছুড়ে দিলাম নিজেকে।

টুইসডে দ্য টুয়েন্টি থার্ড

সবকিছু কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে। সমস্তই অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। ভাবনাটা কিছুতেই ধরতে পারছি না। আমিই কি মিতুল?

অনেকদিন আগে একটা এক্সিবিশন হয়েছিল। সবাই ছবি এঁকেছিলাম। দুটো-তিনটে করে প্রত্যেকে। ছবি বিক্রিও হয়েছিল কিছু। অঙ্কুরের সবকটা বিক্রি হয়ে গিয়েছিল।

আমার দুটো ছবি ছিল। একটা রথের চাকা, সেটা অনেকে প্রশংসা করেছিল, কিনেছিলেন একজন অবাঙালি ভদ্রমহিলা। কেমন লাগছে জিজ্ঞেস করায় বলেছিলেন, পুরীতে রথ দেখতে যাবার ইচ্ছে ছিল, যাওয়া হয়নি, ছবিটা দেওয়ালে টাঙিয়ে রেখে শখ মেটাবেন। আর একটা ছবি এঁকেছিলাম, আকাশ, বিকেলের রং। ছবিটায় একটা এফেক্ট ছিল, অন্তত আমার মনে হয়েছিল। বিক্রি হয়নি। কিন্তু এক্সিবিশন হয়ে যাবার পর খুঁজে পাওয়া যায়নি। প্রথম দিকে খারাপ লেগেছিল পরে ভেবেছিলাম যাক গে যে-ই নিক, আমার তো সিগনেচার আছে ছবিতে।

পরশু আমাদের ডিপ্লোমার পরীক্ষা ছিল। তেমন আহামরি কিছু নয়। সকাল দশটা থেকে দুপুর তিনটে। যতগুলো খুশি ছবি আঁকা যায়, বিষয় "শোক"। শোক মানে ঠিক কী? গ্রিফ? দুটো ছবি আঁকলাম, একটা পেন্সিল স্কেচ, কয়েকটা মুখের কোলাজ। মরবিড লুক, পেনসিভ, প্রত্যেকটা মানুষের। আলাদা আলাদা। আর একটা ওয়াটার কালার। মৃতসন্তান কোলে নিয়ে বসে আছে মা। দৃষ্টিতে একটা ভয়েড, শূন্যতা। দুটো ছবিই ভাল লাগল এঁকে। সময়ের আগেই হয়ে গিয়েছিল। জমা দিয়েছিলাম।

একটা অ্যাওয়ার্ড আছে। প্রাইজ মানি। প্লাস জাহাঙ্গীর গ্যালারিতে এক্সিবিশন করার ইনভিটেশন। জাজ হিসেবে বিক্রম কাপুরকে আনা হয়েছিল। দুদিনে প্রায় পঞ্চাশটা ছবি দেখে উনি বিচার করে দিয়েছেন। আজ দুপুরে ছিল প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন।

অঙ্কুর একটাই ছবি এঁকেছিল। একা, একপাশে, আড়ালে বসে। এঁকে অনেক আগেই জমা দিয়ে চলে গিয়েছিল। সবাই আমাদের দুজনকে দেখছিল। তৃষ্ণা এসে বলে গেল কানে কানে, আমিই নাকি অ্যাওয়ার্ডটা পাচ্ছি, কোথা থেকে খবর পেয়েছে।

ঠিক তিনটেয় সিল্কের কুর্তা-পাঞ্জাবি পরে কাপুর এলেন। দুয়েকটা কথায় ওঁর ওভারঅল ইমপ্রেশন জানালেন, তারপর কাগজ দেখে অ্যানাউন্স করলেন ওঁর বিচার। উইনার, মিত্রা কাঞ্জিলাল।

উঠতে উঠতে অঙ্কুরকে আড়চোখে দেখে নিলাম। পেরেছি। শেষ পর্যন্ত পেরেছি ওর সমস্ত অহঙ্কার গুঁড়িয়ে দিতে। যেতে যেতে দেখলাম, হেরে গেছে, তবু ওর ঠোঁটের ভাঁজে লুকোনো হাসিটা যায়নি।

হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিলাম, কোনটা, কোন ছবিটা ভাল লাগল বিক্রম কাপুরের। ডায়াসে উঠে অ্যাওয়ার্ডটা নিলাম। একপাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। বিক্রম ইশারা করলেন ছবিটা এনে ডিসপ্লে করতে।

হার্টটা থেমে গেল আমার। এটা কোন ছবি? কার আঁকা? সেই যে হারিয়ে গিয়েছিল এক্সিবিশন থেকে, সেই ছবিটা, সেটাই দেখাচ্ছেন বিক্রম সকলকে। কিন্তু ওই অবধি। আমার ছবিটার ওপরে অনেক কিছু করা হয়েছে। নীচে একটা শ্মশানের আভাস। চিতা। আগুন। আগুন উঠে গেছে আকাশে। আকাশের রং কালচে নীল, সেখানে আগুনের আভা ফার্নেসের মতো জ্বলছে। চিতার পাশে বসে আছে একটা মেয়ে, সতেরো-আঠারো, কি আরও বেশি। মেয়েটার মুখে সমস্ত ছবিটার রিফ্লেকশন। স্তব্ধ হয়ে দেখতে হয়।

এটা আমার ছবি? অঙ্কুরের দিকে তাকালাম। ওর মুখে জ্বলজ্বল করছে হাসি। গলার কাছে কী যেন একটা দলা পাকিয়ে আটকে আছে আমার। সবাই আসছে। কনগ্র্যাচুলেট করছে। আমি তাকাতে পারছি না কারও চোখের দিকে। মাটি দেখছি। চেষ্টা করছি চোখের জল চাপতে। অঙ্কুর উঠে যাচ্ছে। চলে গেল। কোথায় গেল অঙ্কুর?

আকাশ দেখছি। অন্য আকাশ। পুব দিকটা লাল হল। একটা দুটো পাখি ডাকল। ট্রামের আওয়াজ। ট্রাম নাকি আর থাকবে না। কে কলকাতার ভোর হওয়া ডিক্লেয়ার করবে তখন? আকাশে টুকরো মেঘ। কালো আকাশ নীল হল। রং। আমার ছবির মতো মরবিড নয়। কত আলো।

অঙ্কুরকে আর খুঁজে পাইনি। আমার ছবি, অ্যাওয়ার্ড উইনিং ছবিটা বাড়িতে এনে রেখেছি। ওটা দিনসাতেক থাকবে। তারপর আমাদের গ্যালারিতে থেকে যাবে, পারম্যানেন্টলি। ছবিটায় আমার নাম জ্বলজ্বল করবে।

অঙ্কুর কোনও ছবি জমা দেয়নি, স্যার বলেছেন। আমার নামে তিনটে জমা পড়েছে। অ্যাওয়ার্ড উইনিং ছবিটা সুদ্ধ। কিন্তু ওকে তো সবাই আঁকতে দেখেছে। ওর ডিপ্লোমা পাওয়াও হত না। স্যার নিজে ইন্টারভিউ করে সেটুকুর ব্যবস্থা করেছেন। ডিপ্লোমা নিতে ও কাল আসবে। কাল বিকেলে। তখনই চিঠিটা দেব।

বাংলা লেখা আমার একদম আসে না। অঙ্কুরটা যে আবার ইংরিজি ভাল বোঝে না। সারারাত ডিকশনারি দেখে বানান ঠিক করে করে একটা চিঠি লিখেছি। আমার জীবনের প্রথম বাংলায় লেখা চিঠি। চিঠিটা বিশেষ বড় নয়। কিন্তু আমার সব কথাই ওতে লেখা আছে। কী লেখা? সেটা তো অঙ্কুরের জন্য, সবাইকে বলতে যাব কেন?

সকাল হয়ে গেল। বেল বাজল, দুধ। অন্যদিন হেনরি খোলে। আজ আমিই খুলে দিলাম। হেনরি বেরোল চোখ মুছতে মুছতে, কী-রে আজ এত তাড়াতাড়ি উঠে পড়েছিস?

চোখে মুখে জল দিয়ে টেবিলে গিয়ে বসলাম। ব্রেকফাস্ট সাজানো হয়েছে। আজ সানডে। ও সানডেতে আমার সঙ্গে ব্রেকফাস্ট খায়, চিরদিন। এসে বসল। শেভ করেছে। ফর্সা গালে নীলচে আভা। অন্য দিন হলে বুকের ভেতরটা কেমন করত। আড়চোখে দেখতাম বারবার। আজ আশ্চর্য, কিছু হচ্ছে না তো।

ও তাকাল। হাসল।

আমিও হাসলাম। একটা স্লাইজ তুলে জ্যাম মাখাতে মাখাতে বললাম, তোমার কোলেস্টেরলটা বেশি পাওয়া গেছে এবারের রিপোর্টে, বাটার দিলাম না, জ্যামই খাও।

হাত বাড়িয়ে নিল। নিউজ পেপারটা পাশে পড়ে ছিল, তুলতে গেল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, চা না কফি? কী খাবে বাবা?

থেমে গেল। ঘুরল। চার বছর পর ওকে বাবা বলে ডাকলাম। গলাটা পরিষ্কার করে বলল, চা।

গন্ধ

যমুনার অনেক কিছুই পছন্দ নয় এককড়ির। জলহস্তির মতো পেট, চেরা বাঁশের মতো গলার স্বর, হাড়িকাঠের মতো কপাল—সিঁদুরসুদ্ধ। তা সত্ত্বেও যে বত্রিশ বছর ধরে যমুনাকে সহ্য করে আসছেন তার একটাই কারণ। যমুনার হাত দু'খানা সোনা দিয়ে বাঁধানো। এককড়ি বিশ্বাস করেন, যমুনার হাত ধোয়া জল কড়াইতে ঢেলে নেড়েচেড়ে নিলেও সবাই খেয়ে অমৃত বলতে বলতে উঠে যাবে।

খিদেটা অনেকক্ষণ ধরেই পেটের মধ্যে ঘাই মারছে। অন্যমনস্ক ছিলেন, সকালে চার পাকের জায়গায় পাঁচ পাক হেঁটে ফেলেছেন। ফিরে ঘাম শুকিয়ে স্নান-টান সেরে বেরুতে বেরুতে দেখলেন জলখাবার খাওয়ার সময় পেরিয়েও পনেরো মিনিট। মেজাজটা খারাপ হতে যাচ্ছিল, তখনই চোখ পড়ল থালার ওপর। রাগ জল হয়ে গেল।

এক একজনের এক একটা স্পেশালিটি। কেউ রগরগে করে মাংস রান্না ভাল পারে, কেউ বা জিরেবাটা দিয়ে হালকা মাছের ঝোল। এককড়ির ধারণা, রাঁধুনির বিচার ডালে। মশলা নেই, তেল-ঝাল নেই। বাকিটা অনুপাতের খেলা। ডালে যে পারল, রান্নায় সে-ই চ্যাম্পিয়ন। আর যমুনার সেইখানেই জয়জয়কার।

বড় একখানা কাঁসার থালায় লুচি সাজিয়ে দিয়েছে যমুনা। প্রতিটাই চমৎকার ফুলেছে, কারওরই কানাভাঙা পেট-খোঁদলানো নয়। পাশে ছোট ছোট বাটিতে আলু-বরবটির ছেঁচকি, বোঁদের পায়েস, আর হ্যাঁ, ছোলার ডাল। ঘন, কিন্তু জমাট নয়; মিষ্টি কিন্তু মুখ মেরে দেওয়া মিষ্টত্ব নয়; ডালের দানাগুঁলো নরম, কিন্তু গলে মিশে যাওয়া নয়; আর তার গায়ে গায়ে লাগা মিহি নারকোলের কুচি। এককড়ি দেখেই বুঝলেন ঠাকুর নয়, আজ যমুনা হেঁসেলে ঢুকেছিল। তাড়াতাড়ি মাথা মুছে চুলে চিরুনি বুলিয়ে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে পড়লেন।

টেবিল-চেয়ার ঢুকেছে বাড়িতে, সবাই রপ্তও করে ফেলেছে, এককড়ির কাঠের পিঁড়িতে বসে না খেলে পেটটা খালি খালি লাগে, মনে হয় কী যেন বাদ পড়ে গেল।

খাবার সামনে নিয়ে দেরি সয় না এককড়ির। লুচির ফুলে থাকা পেটে বুড়ো আঙুল দিয়ে একটা টোকা মারলেন। ফুটো হয়ে খানিকটা ধোঁয়া বেরিয়ে এল। বাটি কাত করে একটু ডাল লুচির ভেতর ঢাললেন। তারপর আলগোছে দু' আঙুলে ফুচকার মতো লুচিটা ধরে হাঁ-এর মধ্যে চালান করে দিলেন। দুচোখ আবেশে বন্ধ হয়ে এল। জিভ দিয়ে গালের এপাশ থেকে ওপাশ অবধি নাড়াচাড়া করতে শুরু করলেন। ছোলার ডাল লুচির সঙ্গে মিশে লালায় জড়িয়ে মুখের মধ্যে ছড়িয়ে গেল।

আর তখনই দুর্ঘটনাটা ঘটে গেল। লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন এককড়ি। ডাইনিং টেবিলের একপাশে দেয়ালের গায়ে শখ করে বেসিন লাগিয়েছে যমুনা। ছুটে গিয়ে বেসিনের মধ্যে লুচিটুচি সব থুথু করে ফেলে দিয়ে বাঘের মতো গর্জে উঠলেন, ডালে কী মিশিয়েছ?

যমুনা অবাক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বলল, কেন, যা দিই তা-ই দিয়েছি।

—তা-ই? ডালের বাটিটা তুলে এনে যমুনার মুখে ঠেসে ধরেন এককড়ি—বেশ, খাও, খেয়ে দেখো একবার।

একটা চামচ দিয়ে অল্প একটু ডাল তুলে মুখে ফ্যালে যমুনা, তারিয়ে তারিয়ে খায়।

—কোথায়? খারাপ কিছু তো পাচ্ছি না। আয় তোরা খেয়ে দেখ,—বলে দাঁড়িয়ে থাকা সবাইকে এক এক চামচ মুখে তুলে দেয় যমুনা। ঠাকুর হরিহর, কাজের মেয়ে ছন্দা, সবাই মুখ চাওয়াচায়ি করে ভয়ে চুপ করে থাকে।

যমুনা এককড়িকে ঝাঁকায়, কী হয়েছে বলবে তো?

খিদেয় রাগে এককড়ির ব্রহ্মতালু জ্বলে যাচ্ছে। কোনও রকমে বলতে পারলেন,—গন্ধ, খাওয়া যাচ্ছে না।

যমুনা আরও কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই পাঞ্জাবিটা গলিয়ে হাঁই হাঁই করতে করতে এককড়ি বেরিয়ে গেলেন।

দ্বিতীয় বিয়েটাও চটকে গেছে, পরপর তিনটে ছবি ফ্লপ, টালিগঞ্জে রটে গেছে সুধাকে নেওয়া মানে ব্যবসায় লালবাতি, সেইসময়ই সুধার সঙ্গে এককড়ির প্রথম দেখা।

জীবনে অনেকবার রিস্ক নিয়েছেন এককড়ি, আর একবার সুধার ওপর বাজি ধরলেন। 'কাঁকন নিয়ো না খুলে' ছবিটা গ্রামবাংলায় হিট করে গেল। অল্প বাজেটের ছবি, টাকা উঠেও কিছুটা রয়ে গেল। সুধার হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার হল। আত্মবিশ্বাসও ফিরে পেল।

অতঃপর দ্বিতীয় ছবি, 'আকাশের রং লাল'; এবং সুপার ফ্লপ। সুধা বুঝে গেল নিজের বাজারদর। নিজেকে গুটিয়ে নিল, অবশ্য খানিকটা অপরাধবোধও কাজ করল। অতগুলো টাকা। অন্যভাবে পুষিয়ে দিতে চেষ্টা করল।

ওদিকে ততদিনে ছেলেমেয়েরা যমুনা-এককড়ির পঁচিশ বছর ঢাকঢোল পিটিয়ে পালন করেছে। এককড়িই শুধু জানেন, যমুনা এখন ভিজে পাশবালিশ। ফুলস্পিডে পাখা চালিয়েও এককড়ি সারারাত এপাশ-ওপাশ করেন।

ফাঁকা জায়গাটায় সুধা নিজেকে গলিয়ে দিল।

পেটে বিদ্যে যত কমই থাক, এসব ব্যাপার মেয়েরা ঠিকই টের পায়। যমুনা ক'দিন বাতিল স্টিম ইঞ্জিনের মতো ফোঁস ফোঁস করল। এককড়ি ঠোঁটে সেলাই মেরে পড়ে রইলেন। ক'দিন পরে হাওয়া শেষ হয়ে যেতে কিছুই হয়নি, ভাব করে যমুনা আবার সংসারে জুতে গেল।

সুধা থেকে গেল।

শেষধাপের সিঁড়ি দুটো ছোট-বড়। গত আট বছরের মতো আজও ঠিক হোঁচট খেলেন এককড়ি। আজও একটা খিস্তি করলেন আগের মতোই। তফাতের মধ্যে সকাল থেকে জমে থাকা রাগ খিস্তিটাকে গর্জনের মতো ঠিকরে দিল বাইরে।

বেলও বাজালেন মেজাজের সঙ্গে সঙ্গত করে, দরজা খুলে দিল সুধাই। দু'চোখে উদ্বেগ সাজিয়ে বলল, কী হল, শরীর খারাপ?

জবাব না দিয়ে দোতলার ফ্ল্যাটের দরজা ধড়াম করে খুলে সুধাকে একরকম ধাক্কা দিয়েই ভেতরে ঢুকলেন এককড়ি।

এককড়ির মেজাজের সঙ্গে সুধার বহুকাল সহবাস। আড়চোখে দেখে ঘোলের শরবত ফ্রিজ থেকে বের করে এককড়ির সামনে রেখে, বোসো, একটু স্নান করে আসি বলে

বাথরুমে ঢুকে গেল।

ঘোলের দিকে চোখ পড়তেই এককড়ির মুখের বিস্বাদভাবটা আবার ফিরে আসতে লাগল। ড্রয়িংরুমের একপাশে ছোট একটা সেলার মতো বানিয়ে নিয়েছেন। উঠে গিয়ে গ্লাস-সোডা-হুইস্কি সব এনে টেবিলে সাজিয়ে ফেললেন।

গ্লাসে ঢালতে ঢালতে সোফায় আধশোয়া হয়ে ড্রয়িংরুমের চারপাশে চোখ বোলাতে লাগলেন এককড়ি। সোফার কুশন-জানলার পর্দা, আলোর শেড-দেওয়ালের ডিসটেম্পার, ডাইনিং টেবিল, ডিনার ওয়াগন, সেন্টার টেবিল-বুকশেলফ সবকিছুর সঙ্গে সব কিছু আশ্চর্য মানানসই। পুবদিকের দেয়ালে একটা মস্ত ছবি, সুধা নাম বলেছিল শিল্পীর, দরকার নেই বলে মনে রাখেননি। ছবির বালক ঘাড় কাত করে এককড়িকে জরিপ করছে। যোগমায়াদেবী কলেজ থেকে বিএ পাশ করেছিল সুধা। খানিকটা কালচার তখন থেকেই সুধার আঁচলে বাঁধা।

খুট করে আওয়াজ হল। সুধা। কপালের পাশে ভিজে চুল লেপটে আছে, খোঁপায় বেলফুলের মালা, হাউসকোট ওপরে জড়িয়েছে নিতান্ত অনিচ্ছায়।

—শরবত খেলে না?

—তার বদলে অমৃত নিয়ে বসেছি। এরও নাম সুধা।

—দাঁড়াও তোমার জন্যে চিলি চিকেন আনিয়ে রেখেছি, খালি পেটে ওসব গিলো না।

মাইক্রোওয়েভ-এ গরম করে একটা বড় প্লেটে চিলি চিকেন সাজিয়ে পাশে সোফায় এসে বসল সুধা। একটা তুলে দাঁতে কাটলেন এককড়ি। পাশে সরিয়ে রাখলেন। হুইস্কির গ্লাসে এক চুমুক দিলেন। গ্লাস নামিয়ে রাখলেন টেবিলে।

এককড়ির মুখ দেখে সুধার সন্দেহ হল।

—কী হল, খেলে না?

—ভাল লাগছে না।

—সে কী কথা? তোমার ফেবারিট জিনিস, ভাল লাগছে না?

—গন্ধ।

—গন্ধ?

অবাক হয়ে একটা মাংসের টুকরো তুলে মুখে দিল সুধা। ওর চোখ বন্ধ হয়ে গেল। লালাভর্তি মুখে জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, কী ভাল গো? এরা চিলি চিকেনটা এত ভাল বানায়। আর একটা টেস্ট করে দেখো। দাঁড়াও আমি নিজে বেছে দিচ্ছি।

ঝুঁকে আসে সুধা, ওর হাউসকোটের ওপরের দু'টো বোতাম আলগা হয়ে যায়, ডান পায়ের গোছ বেরিয়ে আসে হাউসকোটের নীচ থেকে, নির্লোম পায়ে একটা নীল শিরা ফুটে ওঠে।

চিলি চিকেন সুদ্ধ সুধাকে কাছে টেনে ওর মুখের কাছে মুখ নিয়ে যান এককড়ি।

আর তখনই সেই গন্ধটা ভক করে এককড়ির নাকে এসে ঢোকে। ছটফট করে উঠে দাঁড়ান এককড়ি। ডাইনিং টেবিলের পাশেই বেসিন, ছুটে গিয়ে বেসিনে মুখ নামিয়ে ওয়াক ওয়াক করে টক জল তোলেন খানিকটা।

সুধা গিয়ে পাশে দাঁড়ায়। ঘাড়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। মুখচোখ মুছিয়ে দেয়। ধরে ধরে সোফায় এনে বসিয়ে জোরে ফ্যান চালিয়ে দেয়। তারপর জিজ্ঞেস করে, হলটা কী?

অসহায়ের মতো সুধার দিকে তাকিয়ে এককড়ি বলেন, গন্ধ।

ভয় পেয়ে গেলেন এককড়ি। প্রথমদিকের রাগটা আস্তে আস্তে জমে ভয় হয়ে গেলে এককড়ি ভাবতে বসলেন। আর ভাবতে গিয়েই বুঝতে পারলেন খাবারে যদি গন্ধই হবে, তা হলে অন্যরা পাচ্ছে না কেন? যে সব সুখাদ্য অন্য সবাই খেয়ে আহা উহু করছে, দু'বার তিনবার চেয়ে খাচ্ছে সেগুলোই এককড়ির অখাদ্য মনে হচ্ছে। খেতে গেলেই নাকে এসে লাগছে গন্ধ। তার মানে দোষটা খাবারের নয়, তাঁর নিজের। শরীর নিয়ে অনেক কসরত করলেন এককড়ি। পরিষ্কার তুলো জলে ভিজিয়ে নাকের ফুটোর মধ্যে ঢুকিয়ে অনেকক্ষণ ধরে গর্ত সাফ করলেন। এক নাক চেপে অন্য নাক দিয়ে জল টেনে বিষম খেলেন। তিনবার করে জিভ ছুললেন। দিনে চারবার দাঁত মাজা শুরু করলেন। কিছুতেই গন্ধ তাড়ানো গেল না।

ওদিকে যমুনা চিতলপেটি, গলদাচিংড়ি, ইলিশপাতুরি, মোচার ঘণ্ট পার্শের ঝোল—এককড়ির পছন্দের যাবতীয় খাদ্যসামগ্রী থালায় সাজিয়ে দিয়েও কিছুই খাওয়াতে পারল না। একটা ভয় এককড়ির শিরদাঁড়া বেয়ে ওঠা-নামা করতে লাগল। না খেয়েই মরে যাবেন নাকি শেষকালে?

তিনকড়ির কথায় তাই আর না করতে পারলেন না। তিনকড়ি বড় ছেলে, ব্যবসার ভার ওর ওপরই আস্তে আস্তে ছেড়ে দিচ্ছেন। ও সাফ সাফ বলল, ডক্টর চৌধুরীর অ্যাপয়েন্টমেন্ট তিন মাসের আগে পাওয়া যায় না। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে পেয়েছি। আজই সন্ধ্যায়। তোমাকে যেতেই হবে।

বাধ্য ছেলের মতো তিনকড়ির পেছন পেছন ডাক্তারের চেম্বারে গেলেন এককড়ি।

বসে বসে ঘাড় আর পিঠে ব্যথা বানিয়ে যখন ভাবছেন, এবার তিনকড়িকে বলে ফিরে যাবেন, তখনই ভেতরে ডাক পড়ল।

ডাক্তারবাবুকে দেখেই কিন্তু আর্ধেক রোগ সেরে গেল এককড়ির। কাঁচাপাকা চুল, গোল্ডফ্রেমের চশমা, চওড়া হাসি। ডাক্তারবাবু হাসি হাসি মুখে এককড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, বলুন কী কষ্ট?

ডাক্তার চৌধুরীর নরম গলার স্বর, আন্তরিক ভঙ্গিতে এককড়ির চোখে জল এসে গেল। কোনওরকমে সামলে নিয়ে বললেন, গন্ধ।

অবাক হয়ে গেলেন ডাক্তারবাবু। বললেন, গন্ধ? কোথায়? কীসে?

—সবকিছুতে ডাক্তারবাবু। কোনও কিছু মুখে রোচে না। যা খেতে যাই তাতেই গন্ধ লাগে। এক সপ্তাহ হয়ে গেল। একরকম উপোস করে আছি। আমাকে বাঁচান ডাক্তারবাবু।

—আহা, অত ভেঙে পড়ছেন কেন? আমরা আছি কী করতে? বলতে বলতে ডাক্তারবাবু উঠে এসে এককড়ির পিঠে হাত রাখলেন। এককড়ি মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।

ডাক্তারবাবু গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, কী হল, আমার দিকে ফিরুন। দেখি কী ব্যাপার!

—পারছি না ডাক্তারবাবু, গন্ধ। মুখ না ঘুরিয়েই এককড়ি বললেন।

—কোথায় গন্ধ? ডাক্তারবাবু ঝুঁকে এলেন।

কোনওরকমে নাক টিপে এককড়ি বললেন, আপনার গায়ে।

হাসলেন ডাক্তারবাবু, হ্যাঁ, একটা ফ্রেঞ্চকোলন ইউজ করেছি আজ, একদম নতুন। তার গন্ধ।

দু'পাশে জোরে জোরে ঘাড় নাড়তে লাগলেন এককড়ি, না ডাক্তারবাবু, পচা দুর্গন্ধ।

মুখ কালো হয়ে গেল ডাক্তার চৌধুরীর। খসখস করে একটা কাগজে দুলাইন লিখে কাগজটা তিনকড়ির দিকে এগিয়ে দিলেন, অলফ্যাক্টরি হ্যালিউসিনেশন। নিউরোলজিস্ট দেখান।

বলে মাছি তাড়ানোর মতো তাড়িয়ে দিলেন এককড়িকে। যেন গন্ধটা তাঁর নয়, এককড়িরই গা থেকে আসছে।

নিউরোলজিস্ট-এর কথামতো মাথার যাবতীয় স্ক্যান করানো হল। রিপোর্ট দেখে স্পেশালিস্ট গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন, নর্মাল। সমস্ত অ্যাবসলিউটলি নর্মাল। তারপর গলা নামিয়ে বললেন, সরি মিস্টার হালদার, আপনার অসুখের মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।

খুবই ভেঙে পড়েছিলেন এককড়ি। তিনকড়িরও মুখ শুকনো। কিন্তু হঠাৎই একটা জিনিস মনে পড়ে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল এককড়ির। তিনকড়ির দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, মনে পড়েছে।

তিনকড়ি অবাক হয়ে বলল, কী মনে পড়েছে?

এককড়ি লাজুক হেসে বললেন, গন্ধটা চিনতে পেরেছি।

নার্সিংহোমে চেম্বার করেন নিউরোলজিস্ট। ঢোকার মুখেই দেখেছিলেন ফুল দিয়ে সাজানো একটা খাট। বেরোবার সময় দেখলেন সেখানে একটা মড়া শোয়ানো। ফুলের গন্ধেও মৃতদেহের গন্ধ চাপা পড়ছে না।

তখনই মনে পড়ে গেল, ছোটবেলায় খেলতে যেতেন হাসপাতালের মাঠে, সবাই বলতে মেডিক্যাল মাঠ। পাশেই ছিল লাশকাটা ঘর। মাঝে মাঝে হাওয়ায় গন্ধ উড়ে আসত। শবদেহের গন্ধ। নাড়ি ওলটানো পচা একটা দুর্গন্ধ।

—মরা মানুষের গন্ধ। কথাগুলো তিনকড়িকে শুনিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলেন এককড়ি।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য যমুনার চিকিৎসাতেই কাজ হল।

না খেয়ে খেয়ে শরীর প্যাঁকাঠি, দু'পা হাঁটলেই মনে হয় প্রাণটা বেরিয়ে গেল, শয্যাশায়ী এককড়ি ফ্যালফ্যাল করে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিলেন, মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে যমুনা বলল, একবার হাওয়াবদল করে দেখো না।

যমুনার খরখরে হাতের ঘষায় কপালটা জ্বালা জ্বালা করছিল, প্রথমে কানে নেননি কথাগুলো। আবার শুরু করতে কান খাড়া করলেন।

—পুরী! সমুদ্রের হাওয়া! মনে নেই আগেরবার কী হয়েছিল?

আগেরবার? এক ঝটকায় পঁয়ত্রিশ বছর পিছিয়ে গেলেন এককড়ি।

জ্বালা! শুধু কপাল নয় সমস্ত শরীর জ্বলে যাচ্ছিল এককড়ির। কথা নয় তো ভীমরুলের হুল!

—মেয়ে আমার বড় লক্ষ্মীমন্ত! কোনওদিন গলা তুলে কেউ ওকে একটা কথা বলেনি বাবা! এমন শান্তশিষ্ট বাধ্য মেয়ে জগৎ ঢুঁড়লেও জুটবে না। যত্ন করে রেখো। ঠকবে না।

শ্বশুরের কথা শুনেছেন আর আড়চোখে যমুনাকে দেখেছেন। এ কী মাল গলায় ঝুলিয়ে দিলে বাপ? আধমিনিট তাকিয়ে থাকলে চোখে অন্ধকার নেমে আসে!

শ্বশুরই জোর করে দু'জনকে পুরী পাঠিয়েছিলেন। মধুচন্দ্রিমা। একটা সপ্তাহ যমুনার থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছেন। শেষ অবধি ঠাণ্ডা করল সেই সমুদ্রই।

ঢেউয়ের ওঠাপড়া দেখতে দেখতে, সমুদ্রের ঠাণ্ডা হাওয়ায় একসময় মাথা আবার কাজ করতে শুরু করল।

শ্বশুরের দান বরানগর আর কাশীপুরের দু'খানা বাড়ি, আটাকল, চারটে লরি, তেলের ঘানি, চাঁপদানিতে বিঘে চল্লিশেক ধান জমি। আর আলো নেভালে কে সীতা কে বা মন্দোদরী!

উঠে সমুদ্রের জল মাথায় ছিটিয়ে হোটেলের ঘরে ফিরে গিয়েছিলেন।

রোগ-উপশমের সেই ঐতিহাসিক ঘটনাই ঠিক সময়ে যমুনা মনে করিয়ে দিল।

এককড়ি ঠিক করলেন পুরী যাবেন। তবে যমুনার শত উপরোধেও ঢেঁকি গিললেন না। ভাল হোটেলে এসি ঘর বুক করে কেবলমাত্র অনুগত চাকর সনাতনকে সঙ্গে নিয়ে জগন্নাথধামে যাত্রা করলেন এককড়ি।

পুরী পৌঁছে কিন্তু দিন তিনেকের মধ্যেই তফাতটা ধরতে পারলেন। সকালে সমুদ্রে দাপাদাপি, বিকেলে স্বর্গদ্বারে মাইল দুয়েক হাঁটা কিছুটা কাজ তো করেই। হঠাৎই একদিন সকালে উঠে বেশ চনমনে খিদে পেল। তবু সাবধানের মার নেই। সনাতনের নিয়ে আসা একখানা মুচমুচে গজা নাক টিপে মুখে ফেলে নেড়েচেড়ে দেখলেন, নাঃ, বেশ গজা-গজাই লাগছে।

আনন্দে একটু নেচে নিলেন এককড়ি। টিভির নব ঘুরিয়ে উত্তম-সুচিত্রার হারানো সুরও দেখে নিলেন রাত্তিরে। ঘরে আনিয়ে মুরগির ঠ্যাং চিবোলেন একা বসে। মনে হল সেরেই গেছেন।

সন্দেহ নিরসনের জন্য একদিন গাড়ি ভাড়া করে জগন্নাথদেবের মন্দির দর্শনে গেলেন। পাণ্ডাকে উপযুক্ত ঘুষ দিতেই সে ঘটা করে ঠাকুরদর্শন করিয়ে গর্ভগৃহ থেকে বের করে আনল এককড়িকে। এবার মহাপ্রসাদ। এ ক'দিন নাক টিপে খাওয়া অভ্যেস করে ফেলেছেন। কিন্তু এ যে মহাপ্রসাদ! তা ছাড়া সামনেই সাক্ষাৎ জগন্নাথদেবের চ্যালা। সামান্য দ্বিধা করে এক চিমটি প্রসাদ মুখে চালান করে দিলেন। ব্যস! খেলখতম। মহাপ্রসাদ এককড়ির ভেতরে না ঢুকে ঠিকরে বাইরে বেরিয়ে এল। মন্দির-চাতালেই হড়হড় করে বমি করে দিলেন এককড়ি।

'মহাপাপী' 'মহাপাপী' চোখ দিয়ে বলতে বলতে ছুটে এল সমবেত ভক্তমণ্ডলী। পালিয়ে বাঁচলেন এককড়ি। বুঝলেন, রোগটা যায়নি।

রাত্তিরেই ফোন পেলেন তিনকড়ির।

—বাবা!

—কী খবর?

—কেস জনডিস।

হার্টটাও বেগড়বাঁই করছে টের পেলেন। ভেতরে যেন থেমে থেমে চলতে শুরু করেছে।

—কী হল?

—বেলেঘাটার গুদাম সার্চ করেছে পুলিশ। দু'লাখ ক্যাপসুল সিজ করেছে। সব সিল করে দিয়ে গেছে।

অচিন্ত্যকে খবর দিয়েছিস?

—সঙ্গে সঙ্গেই ফোন করেছিলাম। বলল, ওপর থেকে অর্ডার, স্পেশাল ফোর্স না কারা যেন করাচ্ছে। লোকাল থানার কিছু করার নেই।

—ঠিক আছে, আমি আসছি, বলে ফোন নামিয়ে রাখলেন এককড়ি।

ক্যাপসুল নয়, ক্যাপসুলের খাপ। দামি দামি ব্র্যান্ড। বারাসাতের কারখানায় তৈরি হয়, বেলেঘাটার গুদামে জমা থাকে। খেপে খেপে বাগড়ি মার্কেটে যায়। ওষুধের দোকানদাররা বাক্স বাক্স তুলে নিয়ে যায়। ধুলোবালি ভরে আসল ওষুধের সঙ্গে মিশিয়ে বিক্রি করে।

সমস্ত জায়গায় প্রণামী দেওয়া আছে। অসুবিধা হবার কথাই নয়। কী যে হল?

সময়টাই খারাপ যাচ্ছে!

দুটো ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে ঘুমোতে গেলেন এককড়ি। সারারাত ছটফট করলেন। ভোররাতে উঠে ফ্ল্যাপ ছিঁড়ে ওষুধ বের করে হাতের চেটোয় নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখলেন, না, এ তো তাঁর ব্র্যান্ড নয়।

পুপলুর অন্নপ্রাশনে মিলি এমন করে ধরল আর 'না' করতে পারলেন না।

ছোটমেয়ে বলে এমনিতেই একটু বেশি আদরের। রংটা তাঁর দিকেই ঘেঁষা। মেয়েরও যত আবদার বাবার কাছে। থেবড়ে বসে পড়ল মেঝেতে।

—তোমার জন্যে আমি শ্বশুরবাড়িতে মুখ দেখাতে পারি না জানো?

জবাব না দিয়ে হাসি হাসি মুখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন এককড়ি। মিলি বলে চলল।

—ছ'বছর হল বিয়ে হয়েছে, একটা দিনের জন্যেও মনে হল না, যাই মেয়েটা কেমন সংসার করছে একবার দেখে আসি?

বহু অভ্যেসে হাসিটা রপ্ত করেছেন এককড়ি। অনেক কঠিন পরিস্থিতি এই হাসি দিয়েই জয় করেছেন, কিন্তু মেয়ের সঙ্গে পারলেন না।

—তোমার এই হাসিমুখ দেখে আগেরবারও আমি ভুলেছিলাম। মৌ-এর বেলা সকলকে বলে বেড়িয়েছিলাম। বাবা কথা দিয়েছে, আমার কথা কখনও ফেলে না বাবা। লজ্জা লজ্জা! শেষে তোমার শরীর খারাপের অজুহাত দিয়ে সবার মুখ বন্ধ করি। পুপলুর নামটাও তোমার রাখা। এবারে যদি না যাও...

এককড়ি মুখ খুললেন, কিন্তু এবারে সত্যিই যে আমার শরীর খারাপ রে মা।

—জানি। মুখ ঝাপটা দিয়ে ওঠে মিলি, কিছু খেতে হবে না তোমায়। শুধু গিয়ে একবার দাঁড়াবে। পুপলুকে আশীর্বাদ করবে। ব্যস, ওতেই হবে।

মনটা ভাল ছিল। পুলিশের ব্যাপারটা অল্পের ওপর দিয়েই মিটে গেছে। ক্যাপসুলের রংটা পালটে ফেলতে হয়েছে, গুদামটা সন্তোষপুরে সরিয়ে নিয়ে গেছেন, ইনভেস্টিগেটিং অফিসারের ছেলেকে মণিপালে ভর্তি করে এসেছেন। এখন অন্তত বছর পাঁচেক নিশ্চিন্তে ব্যবসা করতে পারবেন। মিলিকে হ্যাঁ বলে দিলেন।

বাড়িভর্তি লোকজন, গাড়ি থেকে নেমে এককড়ি গিয়ে দাঁড়াতেই সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ল। কাগজে ছবি, টিভির খবর,—শিল্পপতিদের মধ্যমণি, চেম্বার অব কমার্স-এর মাথা সেই মানুষটাকে চোখে দেখার জন্য হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে গেল। ছুটে এল মিলি, কোলে

পুপলু। পুপলুর মাথায় হাত রেখে হিরের আংটিটা মিলির হাতে তুলে দিলেন এককড়ি। বাক্স খুলে সকলকে দেখিয়ে ডগমগ করতে লাগল মিলি।

ভিড়ের পেছনে একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল মৌ, মিলির চার বছরের মেয়ে। পাতলা ঠোঁট, একমাথা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, বড় বড় কালো চোখ মেলে অবাক হয়ে দেখছিল এককড়িকে।

চোখ পড়ল এককড়ির। দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে গেলেন,—আমার দিদিভাই না?

মিলি টেনে মেয়েকে সামনে এনে দাঁড় করাল,—ইংলিশ মিডিয়ামে পড়লে কী হবে, দিনদিন যা আনস্মার্ট তৈরি হচ্ছে তোমার নাতনি। যা, দাদুভাই, কাছে যা।

এককড়ি ঝুঁকে পড়ে মৌকে কোলে তুলে নিলেন, গালে চুমু খেয়ে বললেন, কী মিষ্টি হয়েছে আমার দিদিভাই। একেবারে রাজনন্দিনী।

বলতে বলতেই পকেট থেকে আর একটা বাক্স বের করে মিলির হাতে দিলেন। সোনার টিকলিটা জ্বলজ্বল করে উঠল।

মিলি পরাতে যাবে, এককড়ির কোলে মৌ ছটফট করে উঠল।

মিলি ধমকে উঠল, হচ্ছেটা কী? এক মুহূর্ত কোথাও স্থির হয়ে থাকার জো নেই? চুপটি করে দাদুর কোলে বসে থাকো, একদম নামবে না।

হঠাৎ ঠোঁট ফুলিয়ে কেঁদে উঠল মৌ। অপ্রস্তুত হয়ে তাড়াতাড়ি কোল থেকে নামিয়ে দিলেন এককড়ি। মেয়ের কান ধরে ঠাস করে একটা চড় কষিয়ে দিল মিলি। বলল, তর সইল না, না? মেরেছে না চিমটি কেটেছে দাদু যে অমনি করে নেমে আসতে হল?

চোখের জল মুছে ডান হাতের তর্জনী সোজা এককড়ির দিকে তুলে মৌ বলল, পচা গন্ধ! ওর গায়ে।

অট্টহাসি

সাতসকালেই কেষ্টর চাকরিটা চলে গেল।

ভুল হয়েছিল, তা ভুল মানুষমাত্রেরই হয়। ভুল স্বীকারও করেছিল কেষ্ট। তবে দেরি হয়ে গিয়েছিল। তা সেটাও কেষ্টর দোষ নয়। তখন তখনই যদি ধরা পড়বে, তা হলে ভুলটা আর হয় কেন। খেয়াল হতে হতে বন্দুকের গুলি বেরিয়ে গেছে। পরে অনেক কাকুতি-মিনতি, পায়ে ধরাধরি, কিছুই হল না। তলাপাত্রর এক রা, আমরা ঠিক করে ফেলেছি তোমাদের আর রাখা হবে না।

কেষ্ট জানে, কথাটায় মিথ্যের খাদ মেশানো আছে। কাল রাতে মিটিং হয়েছে, হাউসিং-এর চল্লিশটা ফ্ল্যাটের অন্তত তিরিশজন ছিল সে মিটিং-এ। সিকিউরিটি থাকতেও বাইশ নম্বরে চুরি হয়েছে, অতএব পুরনো সিকিউরিটি বাতিল। মিটিং থেকে সে খবর লিক হয়ে গিয়েছিল কাল রাত্তিরেও। হিসাব অনুযায়ী সেই নিয়মেই কেষ্টর চাকরি মুড়িয়ে যায়। কিন্তু সেইখানে একটু ঘোরপ্যাঁচ ছিল।

মিটিং-এ ঠিক হয়েছে পুরনো সিকিউরিটির লোকরা চলে যাবে। পুরনো মানে যারা ছ'মাস বা তার বেশি আছে—হরেন, পিল্টু, গজেন। কেষ্ট এসেছে দু'মাসও হয়নি। তাও সে লেগেছিল গাড়ি ধোয়ার কাজে। প্রফুল্ল দেশে যাচ্ছি বলে দিন পনেরো আগে সেই যে গেল আর ফিরে এল না। তখনই সেনসাহেব কেষ্টকে ডেকে বলেছিল, কাল থেকে তুই সিকিউরিটি, পরের মিটিংয়ে সেটা পাস করিয়ে নেব।

সেনসাহেব থাকলে হয়েও যেত। কাল রাতের মিটিং-এ নতুন কমিটি হয়েছে। সেনসাহেবের জায়গায় তলাপাত্র। লোকটাকে কোনওদিনই সুবিধের মনে হয়নি কেষ্টর। তাতেও কেষ্টর কিছু যেত আসত না। সকালে বেমালুম বড়সড় গোলমালটা বাধিয়ে ফেলল।

আটটা থেকে কেষ্টরই ডিউটি ছিল। বাবুরা একে একে লিফটে নামছে, সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে, ড্রাইভার বেসমেন্ট থেকে গাড়ি বের করে আনছে, দরজা খুলে দিতে দিতে কেষ্ট দু' গোড়ালি এক করে ডানহাতের চার আঙুল ক্যালেন্ডারের নেতাজির স্টাইলে কপালে ছোঁয়াচ্ছে। গাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে হুস করে।

সেনসাহেবের অ্যাম্বাসাডারটাই বেরোচ্ছিল তখন। কেষ্টর ভেতরে ভেতরে তখনও সেনসাহেবের জন্যেই সবচেয়ে বড় স্যালিউটটা জমে আছে। হাট করে দরজা খুলে, বেড়াল পার করে, আবার দরজা ঠেলে বন্ধ করছে, কানে কানে কে যেন ফিসফিস করল, একবার ছত্রিশ থেকে ঘুরে যেয়ো কৃষ্ণপদ। ঘুরে দেখল, তলাপাত্র।

লুঙ্গি, পাঞ্জাবি, না-কাটা দাড়ি, হাওয়াই চটি, দু'হাতে দু'খানা বাজারের থলি, বাসি মুখটা কেষ্টর কানের কাছে এনে যেন বীজমন্ত্র শোনাচ্ছে।

ঘাড় নেড়েছিল কেষ্ট। ততক্ষণে রঞ্জিত সাহেবের মারুতি জেনটা স্টার্ট দিয়েছে। গেট খুলে স্যালিউট মেরে গেট বন্ধ করে ঘুরতে ঘুরতে মাথার মধ্যে কারেন্ট মারল। তা-ই তো! কেলেঙ্কারি হয়ে গেছে! তলাপাত্র!

তলাপাত্রই তো এখন সব! অন্যদের জন্য ডানহাতের চার আঙুল বরাদ্দ হলে

তলাপাত্রর পাওনা দু'হাত দু'পা মিলিয়ে কুড়িটাই। আসলে সওয়ারি নয়, গাড়িকেই সেলাম মেরে মেরে কেষ্টর ভেতরটা এমন হয়ে গেছে যে গাড়ি ছাড়া মানুষকে আর মানুষ বলেই মনে হয় না। আর যে সে মানুষ? কাল রাত থেকেই যে কিনা তাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা!

রইল গেট, রইল সকালের কাজ। পড়িমড়ি করে ছুটল কেষ্ট। লিফটের জন্য অপেক্ষা না করে সিঁড়ি দিয়েই চারতলা উঠল। হাঁপাতে হাঁপাতে তলাপাত্রর ফ্ল্যাটের সামনে পৌঁছে বেল বাজাবে না দরজা ঠুকঠুক করবে দু'বার ভেবে নিল। তারপর আলগোছে দরজায় টোকা দিল।

তলাপাত্রই দরজা খুলল। একগালে সাবান অন্য হাতে ক্ষুর। কেষ্টদেরও তেমনি ভাগ্য। সেন-ঘোষ-বোসদের যেখানে ড্রেসিংগাউন-মেশিনে দাড়ি সেখানে এই লুঙ্গি-ক্ষুর তলাপাত্রই কিনা শেষ অবধি কপালে জুটল।

—হ্যাঁ, চিবিয়ে চিবিয়ে তলাপাত্র বলল, কাল থেকে তোমাদের আর না এলেও চলবে।

—কিন্তু শুনলাম যে পুরনোরা বাদ যাবে! আমার তো সবে...

ঝট করে চোখে লাল এনে ফেলল তলাপাত্র। গলা উঁচিয়ে বলল—শুনলে? মিটিং-এ তোমরাও ছিলে নাকি হে কৃষ্ণচন্দ্র?...অনেক হয়েছে। সাড়ে ন'টায় আমি নীচে নামব। তার মধ্যে পোঁটলা-পুঁটলি যা আছে নিয়ে বিদায় হও। তখনও যদি তোমাকে দেখতে পাই, পুলিশ ডেকে সব আদিগঙ্গায় ফেলে দিয়ে আসব।

কেষ্ট আর দাঁড়াল না। হাঁটুদুটো কাঁপছিল। তলাপাত্রর সামনে পড়ে-টড়ে গেলে অনর্থ হত। চাকরি গেছে বই তো নয়। আর চাকরিটাও তেমন কিছু পুরনো নয়। তবে মানুষ তো! মাস গেলে বারোশো টাকার লোভটা ক'দিনই ভোররাতে স্বপ্ন হয়ে ঘোরাফেরা করছিল। যাকগে!

নীচে নেমে একটু দোনামনা করল। তলাপাত্র কি আর বিছানা তোরঙ্গ হাঁটকাতে আসবে? বেসমেন্টের এককোনায় লাট করা জিনিসপত্তর। ভুলু কুকুর আর কেষ্টর ঠেক থাম্বার এপাশে ওর ওপাশে। কিছুই বলা যায় না, তলাপাত্রর নজর অনেকটাই নীচ অবধি পৌঁছয়। ভাগাড়, আস্তাকুঁড়, আদিগঙ্গা। চলেও আসতে পারে। তারপরই পরিত্রাহি চ্যাঁচাতে শুরু করবে। লোক জড়ো হয়ে যাবে। তার চেয়ে মানে মানে কেটে পড়াই ভাল।

বিছানাটা কাঁধে ফেলে গুটিগুটি হাঁটতে হাঁটতে ভেবে নিচ্ছিল কেষ্ট।

মাস পয়লায় পনেরো দিনের মাইনেটা এসে নিয়ে যাবে। সেটা না দিলে তলাপাত্রর টাক তাক করে একটা আধলা ঝেড়ে দেবে কেষ্ট। কিন্তু এখন? দুটো গাড়ি ধোয়ার চারশো টাকা। তা থেকে হিসেবমতো শ'খানেক থেকে যাওয়ার কথা। কিন্তু ওই যে বারোশো! লোভে লোভেই বেশি খরচা করে ফেলেছে। চল্লিশটা টাকা পড়ে আছে। মাসের বাকি ক'টা দিন ওতেই টানতে হবে।

খিদেটা অনেকক্ষণ ধরেই পেটের মধ্যে ঘাই মারছিল, কালোর দোকানের সামনে এসে কেষ্টকে পেড়ে ফেলল। কড়াইয়ে তেল ছেড়েছে কালো, তেলে সাঁতার কাটছে লাল হয়ে আসা ফুলুরি। এক ঠোঙা মুড়ি, দুটো ফুলুরি, একখানা লঙ্কা, এখনও দু' টাকায় দেয় কালো। দুটো টাকা খরচা করতেই পারে কেষ্ট। কিন্তু তাড়াতাড়ি ব্রেক কষল। দু'টাকার মুড়ি-ফুলুরি কতক্ষণ টানবে? জোর দুপুর অবধি। তারপর আবার দু'টাকা। সন্ধেয় আরও। রাত্তির। তিন দিনেই পকেট ফুটো হয়ে যাবে।

তার চেয়ে কচুরি। এক একটা কচুরি দু'টাকা। তরকারিসুদ্ধ। কালোর কচুরির গুণটা

পরে ফুটে বেরোয়, খারাপ অসুখের মতো। খেয়েছ, তার আধঘণ্টা পরে দু'খানা ঢেকুর, তাতে ডাল আর তেলের গন্ধ। এর পরেই খেলা শুরু। পেটটা ফুলতে শুরু করবে ঠিক একঘণ্টার মাথায়। দু'ঘণ্টা পর থেকে যে ঢেকুরগুলো উঠবে সেগুলোয় টোকো টোকো ভাব। তিন-চার ঘণ্টা পর চোঁয়া ঢেকুর, বুক অবধি আইঢাই। গলায় আঙুল দিয়ে বমি করতে ইচ্ছা হবে। চেষ্টাও করতে পার, কিন্তু ফল হবে না। কম করে চব্বিশ ঘণ্টার মামলা। কাল সকালে দু'বার পাতলা দাস্ত না হওয়া পর্যন্ত কুটোটাও দাঁতে কাটে কার বাপের সাধ্যি। কালোর কচুরি। এক একখানায় এক এক দিন। ভেবেচিন্তে একটা কচুরিই ইঞ্জিনে লোড করে নিল কেষ্ট।

এবারে বড় ভাবনা, কোথায় থাকবে। দুমদাম বৃষ্টি চলে আসছে। মাথার ওপর একখানা ঢাকা না থাকলেই নয়। শালা তলাপাত্র গরিবের মাথার চালটাও কেড়ে নিলি! যমেও ঠোকরাবে না তোকে! হাঁটছিল কেষ্ট। খেয়াল হতে দেখল, জগাদার বাড়ির দিকে যাচ্ছে। জগাদা! ওপরে তাকালে নীল আকাশে ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘ। দু'পাশে ঘেঁষাঘেঁষি বাড়ি, রাস্তায় ছুটন্ত গাড়ি, মানুষের স্রোত। কিচ্ছুই, কেউই কেষ্টর নিজের নয়। ওই একটাই মানুষ, যেন কেষ্ট হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারে। চেনা।

নইলে অত মানুষ হইহই করে বেরোচ্ছে, কে কার দিকে নজর দেবে? শিয়ালদা নয়, ওখানে রাতে থাকবার জন্যেও ভাড়া দিতে হয়, ধাক্কা খেতে খেতে কেষ্ট ততদিনে চলে এসেছে বজবজ লাইনে টালিগঞ্জ স্টেশন অবধি; প্ল্যাটফর্মটা উঁচুতে। দিনের বেলায় বিছানা গুটিয়ে একটা পানের দোকানে ডাঁই করে রাখে, রাত্তিরে ছাউনি দেখে তার নীচে শতরঞ্চি খুলে ফেলে। চলন্ত মানুষের ভেতর থেকে হঠাৎই একজন ছিটকে বেরিয়ে এসে হাত চেপে ধরেছিল, কেষ্ট না?

কোনও মানুষের গলায় অতখানি আত্মীয়তা থাকে তার আগে কোনওদিন ভাবতেও পারেনি কেষ্ট। মুখখানা মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে চায়ের দোকানের কেরোসিনের কুপিতে ভাল করে দেখতে দেখতে বলেছিল, জগাদা!

'আয়' বলে জগাদা তখনই তাকে টেনে তুলেছিল ডেরায়। ডেরা মানে তেমন কিছু রাজপ্রাসাদ নয়, টালিগঞ্জ স্টেশন থেকে হেঁটে পাঁচমিনিট, ঘিঞ্জি বস্তিতে, আদিগঙ্গার গায়ে। জগাদার চটকল বজবজ লাইনে, নুঙ্গি স্টেশনে নেমে দশমিনিট। শিফটের কাজ। একটাই ছোট ঘর, জুড়ে আছে তক্তপোশ, কিন্তু তার নীচেও শোবার জায়গা আছে খাসা! মাসে মাসে দেশ যায় জগাদা, কেষ্টরও দেশ সেটা, হাসনাবাদের কাছে—সোমপুর। জগাবউদি তিনটে ছেলেমেয়ে, চারখানা ছাগল, দুটো গাইগোরু নিয়ে সেখানে জগাদার ঘর-গেরস্থালি সামলায়।

জগাদার 'আয়'টাই ক্রমশ কেষ্টর একমাত্র ভরসা হয়ে দাঁড়ায়। রান্না করে রাখত কেষ্ট, রাত্তিরে চাঁদের আলোয় পা ছড়িয়ে আলুসেদ্ধ ভাত মেখে দাঁতে কাঁচালঙ্কা কাটতে কাটতে জগাদা বলত, কারখানায় পারবি না। সে ক্ষমতা ভগবান তোর শরীলে দেননি। তার চেয়ে ওই বড় বাড়িগুলোয় দ্যাখ, ওখানে পয়সা গড়াগড়ি খায়।

চোখ বড় বড় করে চাঁদ আড়াল করা বাড়িটার দিকে আঙুল তুলে কেষ্ট শুধোত, ওই বাড়ি? ওখানে পয়সা?

জগাদা ঝালে হেঁচকি তুলতে তুলতে ভাতের দলাটা জল দিয়ে নামিয়ে দিত। তারপর বলত—গেরামে মনে আছে, বর্ষায় ছাদ দিয়ে হু হু করে জল পড়ে, ছ্যাঁচা বেড়ার ফাঁক দিয়ে

শীত ছোবল মারে। ওইখানে দেয়ালগুলো পলকা, ফাঁক-ফাঁক। এপাশের মানুষ দেয়ালের ফাঁক গলে চাইলেই ওপাশের মানুষকে দেখতে পায়। ইচ্ছে করলে ছুঁতিও পারে। বিপদে-আপদে পাশে এসে দাঁড়ায়। এখানে দেয়ালগুলো নিরেট, ঠুকলেও ভাঙা যায় না। মানুষগুলো আলাদা আলাদা, কেউ কারেও চেনে না। একা। পয়সা আছে, কিন্তু বিপদে পড়লে কেউ কারও খোঁজ নেয় না।

কিন্তু সেখানটায় রোজগারের ধান্দাটা কেমন করে হবে ধরতে পারে না কেষ্ট। চেয়ে থাকে।

জগাদা বলে, সকালে দুধ এনে দেবে কে, লোক চাই। বাচ্চাকে ইস্কুল পৌঁছে দেবে, লোক চাই। বাজারহাট, ইলেকট্রিক বিল, টেলিফোন বিল, ধোপার বাড়ি সব কিছুতেই পরের ওপর নির্ভর। অনেক কাজ। লোকও আছে। তোর মতো কত ছেলে কাজ খুঁজে খুঁজে ঢুকে যাচ্ছে। তুইও সেঁধিয়ে যা। ছোটখাটো কিছু নিয়ে মাথাটা গলা। একসময় দেখবি, ঠিক সেঁটে গেছিস।

খাওয়া শেষ হয়ে গেছল। উঠে কুলকুচো করে দাঁতে সুপুরি কেটে জগাদা বলেছিল শেষ কথা—তবে মনে রাখবি, ওরা তোর কেউ নয়। তুইও ওখানকার নোস। কাজ করবি, পয়সা নিবি, ব্যস। ওখানেই শেষ।

সিকিউরিটির কাজটা পেয়ে জগাদাকে বলে গিয়েছিল, জগাদা খুশি হয়েছিল। নিজের হাতে চা বানিয়ে বিস্কুট দিয়ে খাইয়েছিল। বলেছিল, বউনিটা খারাপ হয়নি। লেগে থাক, হয়ে যাবে।

দিন পনেরো যোগাযোগ করতে পারেনি। জগাদার নাইট ডিউটি চলছিল। ওর ডিউটি পুরোতে পুরোতে জগাদা ডিউটি বেরিয়ে যায়।

ভাবতে ভাবতেই কেষ্ট দেখল সে জগাদার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। আর সেই দরজায় ঝুলে আছে মস্ত এক তালা।

অবাক হয়ে গেল। এই ভারিক্কি তালাটা জগাদা কোথ্থেকে জোগাড় করল? সেই পুরনো দুর্বল তালাটা কোথায় গেল? চাবি না থাকলেও যেটা খোলার কৌশল কেষ্ট অনেকদিনই রপ্ত করে ফেলেছিল?

এদিক-ওদিক দেখছে, শিউপ্রসাদ মিস্তিরি তাকে দেখে নিজের ঝোপড়ি থেকে বেরিয়ে এল। ঘড়ির মিস্তিরি, ঘরে বসে কাজ করে, ওর সঙ্গেও চেনা হয়ে গিয়েছিল কেষ্টর।

—মুলুক চলিয়ে গিয়েছে।

—জগাদা—মুলুক? এই ভরা মাসে? হলটা কী?

শিউপ্রসাদ প্রাঞ্জল করে—মিল বন্ধ হই গেল। জগাদাও চলিয়ে গেল।

মিল বন্ধ? জগাদা বেকার?

বুকটা ফাঁকা হয়ে গেল কেষ্টর। নিজের জন্য নয়, জগাদার জন্যেই কষ্ট হতে লাগল। কী হবে জগাদার? জগাবউদির? বাচ্চাগুলোর? মিল যদি আর না খোলে?

ভাঁজ করা বিছানাটা দরজার সামনে মাটিতে রেখে আস্তে আস্তে বসে পড়ল কেষ্ট। শিউপ্রসাদের তাকে দেখে বোধ হয় করুণা হল। বলল, হামার ঝোপড়িমে বিস্তারা রাখিয়ে দিন।

তারপর যেন মনে পড়ে গেল, ঘুরে বলল—আপকা ভি এক নোকরি মিলা থা না? উও নোকরির কী হল?

হাসল কেষ্ট। হাসিটা দেখেই বুঝে নিল শিউপ্রসাদ। চাকরি থাকা আর যাওয়া এপিঠ-ওপিঠ। থাকলে যেমন দুহাত তুলে নাচতে নেই, গেলেও পা ছড়িয়ে কাঁদবার ফুরসত নেই। আবার বলল শিউপ্রসাদ—বিস্তারা রাখিয়ে দিন, বাদ মে এসে লিয়ে যাবেন।

স্বাভাবিক। কেষ্ট ঘাড়ে চেপে বসলে শিউপ্রসাদের সমূহ বিপদ। তাই গোড়াতেই সাফ সাফ জানিয়ে দিল—আতান্তরে পড়েছ, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি। কিন্তু সেটা নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করলে পথ দ্যাখো।

জিনিসগুলো শিউপ্রসাদের ঝুপড়িতে শান্টিং করে কেষ্ট ধান্দায় বেরোল। ধান্দা একটা নয়। সবচেয়ে সহজ অথচ সবচেয়ে কঠিন যেটা, মেনকা সিনেমায় টিকিট ব্ল্যাক করা, সেটার কথাই প্রথম মনে পড়ল। গুটিগুটি এগোলও, হল না। ম্যানেজ করে দলে ঢুকেছিল, নগদ আসছিলও, কিন্তু একবার বেলাইন হলে ইঞ্জিনকে আর ওরা গাড়িতে জোতে না। লাথি মেরে বের করে দেবে।

বাক্সটা জগাদার ঝুপড়িতে পড়ে আছে। ও ধান্দাটাও খারাপ না। একটা বাক্সে সাদা কাগজ মুড়ে ওপরে লাল একখানা চিহ্ন। জগাদাই বলে দিয়েছিল, রেডক্রস। সঙ্গে ছাপানো জ্যালজেলে একটা কাগজ, তার লেখাগুলো উঠে গেছে। হাসপাতাল, রোগী। চলন্ত গাড়ি ট্রাফিকে দাঁড়িয়ে পড়লে জানলা গলিয়ে বাক্স বাড়িয়ে দিলে আধুলি-সিকি কি টাকাটাও বাক্সে পড়ত। পুলিশকে কিছু দিতে হত। রোজগার মন্দ নয়। তবে লোকজন সেয়ানা হয়ে যাচ্ছে। তলিয়ে জানতে চায়।

রোদ মরে আসছে। এগিয়ে লেকের ধারে ফাঁকা দেখে বসল কেষ্ট। এ সময় মুণ্ডুটা সোজা রাখতে হয়, এপাশ ওপাশ ঘুরতে নেই। তবু একটা চেহারা দেখে বুকের ভেতরটা ছ্যাঁত করে উঠল। আর তখনই ভেতরে বুড়বুড়ি কাটছিল যেটা, ধাঁ করে মনে পড়ে গেল।

তলাপাত্র। না, সকালের সেলাম নয়। ঘটনার সূত্রপাত আগেই। তখন থেকেই পুষছিল তলাপাত্র। আজ উশুল করে নিল।

ছেলেকে ইস্কুল-বাসে তুলে দিয়ে তলাপাত্র-গিন্নি অফিসে যায়। তলাপাত্র বেরোয় পরে। মাঝে মাঝে তলাপাত্র ভরদুপুরে বাড়ি ফেরে। সঙ্গে খুব গন্ধ-মাখা রং-করা একটা মেয়েছেলে। তিনকোয়ার্টার কী একঘণ্টা। আবার বেরিয়ে যায় তলাপাত্র। কেষ্ট ছাড়া খবরটা পাঁচকান হত না। তা পড়বি পড়, কেষ্টই জাঁতাকলে পড়ে গেল।

কী হয়েছিল বলতে পারবে না, সেদিন তলাপাত্র-গিন্নি হঠাৎ সকাল সকাল ফিরে এল। ওপরে গিয়ে ফ্ল্যাটে দরজায় চাবি ঢুকিয়ে মোচড় দিয়ে দেখে তালা খুলছে না। খারাপ? নীচে নেমে কাউকে না পেয়ে কেষ্টকেই জিজ্ঞেস করেছিল—দরজাটা খুলছে না! কী করা যায় বলো তো?

কেষ্ট অনেক কিছুই বলতে পারত। বলতে পারত—তালাটা খারাপ মনে হয়, আমার ঘরে বসুন, আমি দেখছি। তারপর চুপিচুপি ওপরে উঠে ঠুকঠুক করে অথবা বেল বাজিয়ে তলাপাত্রকে খবরটা জানিয়ে বলতে পারত—পেছন দিয়ে কেটে পড়ুন স্যার, আজ লক্ষণ ভাল নয়। সে সবের ধার দিয়েও যায়নি কেষ্ট। বদলে? অবাক মুখ করে বলেছিল, তালা খারাপ হবে কেন ম্যাডাম! ভেতরে সাহেব রয়েছেন!

সেইদিন। সেইদিন থেকেই আসলে চাকরিটা চলে গিয়েছিল কেষ্টর। খবর তলাপাত্র ঠিকই পেয়েছিল। চোখ দিয়ে ভস্ম করে অফিস গিয়েছিল পরদিন সকালে।

হাওয়ায় ধুলো উড়িয়ে আনে, সঙ্গে গাছের পাতা ময়লা কাগজ। পেছন পেছনই জগাদা।

মিল বন্ধ? কী হবে জগাদার? জগাদার কিছু হলে কেষ্টই বা কোথায় যায়?

কচুরিটায় হল না। রাত্তিরের দিকে খিদে পেয়ে গেল সে-ই। কোয়ার্টার পাউরুটি চায়ে ডুবিয়ে মেরে দিল প্ল্যাটফর্মে বসে। বিছানাটা সঙ্গে এনেছিল। খুলে পেতে ফেলল জায়গা বুঝে! চেনা লোক, অনেকেই ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, কথা বলল না। এমনি আসা-যাওয়া, নিত্যিকার অভ্যেস, লোকে গা করে না। আওয়াজে ঘুম আসছিল না। অনেকদিনের অনভ্যাস, এপাশ ওপাশ করে ঘুমোতে ঘুমোতে মাঝরাত হয়ে গেল। ঘুমটা জমে উঠতেই দেখল শ্রীদেবী মাথায় হাত দিয়ে কেষ্টকে ডাকছে। ওঠো ওঠো, তালা খুলতে পারছি না। ওপরে গিয়ে কেষ্ট তো অবাক! কোথায় কী? দরজা হাট করে খোলা! ফিরে জিজ্ঞেস করবে, হাত ধরে টেনে ভেতরে নিয়ে গেল শ্রীদেবী, পেছনে দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

ধড়মড় করে উঠে বসল কেষ্ট। পাখি ডাকছে, তবে এখনও আলো ফোটেনি। এই একটা ভাল অভ্যেস কেষ্টর, ঘুম ভাঙলেই তলপেটে মোচড় দেয়। তাড়াতাড়ি স্টেশনের গা বেয়ে লেকের ধারে নেমে গেল কেষ্ট। কালকের কচুরি তরকারি-চা-পাউরুটি হড়হড় করে নেমে গেল। গাড়ি ধোয়ার কাজটা ফসকে গেলে মুশকিল। পাউরুটি কচুরিও পিছলে যাবে। তার আগে বিছানাটা গুটিয়ে আবার শিউপ্রসাদের ডেরায় জমা করে দিতে হবে। রোদ ফুটলেই লোক দেখতে পাবে তার বেওয়ারিশ বিছানা, হাপিশ হতে দু'মিনিটও লাগবে না।

শর্টকাট করে মাঠের পাশ দিয়ে আসছিল, হঠাৎই দাঁড়িয়ে পড়ল। মেয়ে-পুরুষ, ছোকরা থেকে বুড়ো জনাতিরিশ মানুষ। পুবমুখো হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে। আকাশের সেই জায়গাটা লাল। ডিম ফেটে সূর্য বেরোচ্ছে। তাকিয়েই খিদে পেয়ে গেল কেষ্টর। একপাশে ডালা সাজিয়ে শশার আঁশ ছাড়াচ্ছিল যে লোকটা, তার দিকে দু'পা এগোতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল কেষ্ট।

হা হা হা, হি হি হি, হো হো হো।

তিরিশটা মানুষ লেকের জল চমকিয়ে হেসে উঠেছে। পাখিরা ডাকা থামিয়ে দিয়েছে, সূর্য উঠতে উঠতেও থমকে গেছে, এলোমেলো বাতাস বইছে কী করবে বুঝতে না পেরে।

কেষ্ট ততক্ষণে শশা অবধি পৌঁছে গেছে। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছে, ব্যাপার কী ভাই?

শশাওয়ালা একগাল হেসে জবাব দিয়েছে—জান না, এই মানুষগুলোর খুব দুঃখ। সেই দুঃখ ঘোচাতে এরা সকালে লেকে হাসতে আসে।

অবাক হয়ে দেখতে দেখতে, কেষ্ট হঠাৎ লক্ষ করে তল্পাপাত্র, লাইনের সামনে দাঁড়িয়ে দু'হাত সামনে বাড়িয়ে হেসে চলেছে, হো হো হো।

কী যেন হয়ে যায় কেষ্টর। পেটের ভেতর ভসভসিয়ে ওঠে অনেকক্ষণ থেকে জমে-থাকা একটা হাসি। মানুষগুলোর মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ায়। তারপর সবাইয়ের গলা ছাপিয়ে হেসে ওঠে—হা হা হা, হোহোহো, হিহিহি।

তিরিশজন মানুষ হাসি থামিয়ে কেষ্টকে দেখতে থাকে।

দুঃখ

আর একটু হলেই কেঁদে ফেলত তিতির। সত্যি, মেজোমামিটা যে কী! এতটুকু যদি আক্কেল থাকে। বয়েস তো কম হল না! কিছু কিছু মানুষ থাকে না, আশি বছরেও বুদ্ধি পাকে না, মেজোমামিটা হচ্ছে তাই।

এদিকে বড় মুখ করে বলতে এসেছিল, দ্যাখ, তিতির, তোর জন্যে কী দারুণ একটা শাড়ি এনেছি।

লাফিয়ে উঠেছিল তিতির, কই দেখি।

সুটকেশের ডালা খুলে নীচ থেকে প্যাকেট ছাড়িয়ে শাড়িটা বের করেছিল মেজোমামি, কালারটা কি আনইউজুয়াল না?

ফ্লুরেসেন্ট আলোয় শাড়িটা ঝলমল করছিল। হাত বুলোচ্ছিল তিতির। ব্লু আর পার্পল-এর মাঝামাঝি রং; ভেতরে ছোট ছোট বুটি, আঁচলটা আকাশনীল। খুশিটা ঢেঁকুর-এর মতো গলা দিয়ে উঠে আসছে, কোনওরকমে ঢোঁক গিলে তিতির জিজ্ঞেস করেছিল, ব্লাউজপিস আছে তো?

মামি ঠোঁট উল্টেছিল, সেইটাই সমস্যা। ব্লাউজপিস নেই। তা তোদের কলকাতায় একটা শাড়ির ম্যাচিং ব্লাউজপিস পাওয়া যাবে না, তাও কখনও হয়?

আকাশ ভেঙে পড়েছিল মাথায়, বলছ কী? ব্লাউজপিস নেই শাড়িটায়? তা হলে?

—তা হলে আর কী? অন্য কাউকে দিয়ে দিবি। গজগজ করতে করতে উঠে গিয়েছিল মেজোমামি। বজ্রাহতের মতো বসে থেকেছিল তিতির।

মেজোমামিরা কালই ফিরে গেছে আমেদাবাদ। এই ক'দিন পরপর ক্লাশ ছিল, বেরুতে পারেনি, আজ ছুটি আছে, মানে ক্লাশ কম আর কী, নিউমার্কেটে হত্যে দিয়ে পড়ে আছে সেই সকাল থেকে, এখন দুপুর বারোটা, সারাদিনের পরিশ্রমের ফল শূন্য।

হয় নীলটা একটু বেশি, না হলে কম। না জমি না পাড়। কোনওটারই ম্যাচ খুঁজে পেল না তিতির। তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে। শাড়িটা নিয়েই বেরিয়েছে। নিজের সন্দেহ হয়েছে, পাশের মহিলাকে দুটো পাশাপাশি রেখে জিজ্ঞেস করেছে, দেখুন তো দিদি, সেম কালার? চশমা নামিয়ে খুঁটিয়ে দেখে ভদ্রমহিলা জবাব দিয়েছেন, কাছাকাছি, কিন্তু সেম নয়। একটা দোকানে তো দোকানদার নিজেই শাড়িটা পরে ফেলল।

তারপর ব্লাউজপিসে বুক ঢেকে বলল, দেখুন ম্যাডাম। প্রায় কিনে ফেলেছিল। শেষ মুহূর্তে বলল, চলুন তো, বাইরে রোদে গিয়ে দেখি। বাইরে বেরিয়েই তফাতটা ধরা পড়ল। না কিনে বেরিয়ে এল। কান্নাটা শেষ পর্যন্ত আর চেপে রাখতে পারল না। এস্টিমের পেছনের সিটে শাড়িটা ছুড়ে দিয়ে কোকের ক্যানে ঠোঁট ডোবাতে গিয়ে ভসভস করে ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। ড্রাইভার শিশির অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল। জিজ্ঞেস করল, কেউ খারাপ কিছু বলেছে?

'না' বলে জানলার কাচ তুলে দিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ল তিতির। পাশে সিটের ওপর পড়ে রইল আমেদাবাদ থেকে মেজোমামির আনা দামি শাড়ি।

নয়নলাল সকাল থেকেই হাত কামড়াচ্ছিলেন। বার বার সাবধান করেছিলেন, ছগুয়া, ও বুড্ঢা ঢ্যামনা আছে। সিধা বাতে কুছু হোবে না। ক্যাশ ফেলে লাইন করে রাখ। নইলে ওই প্লট, ওই রাস্তা, অমন অ্যাপ্রোচ্ রোড। হাতছাড়া হলে থুথু ফেলে ডুবে মরবি রে হারামখোর।

তা-ই হল। শালা হারামির বাচ্চা দু'দিকেই তাল মেলাচ্ছিল। ছগু, ছগনলাল যখন গেছে, ঘরে বসে চা খাইয়েছে, বলেছে, বাড়ি আমি বিচবো না। বলেছে, বাপ পিতামোর ভিটে, বিচলে নরকেও ঠাঁই হবে না। ভুলটা নয়নেরই হয়েছে। ছগু ছোট ছেলে। বুড়োর কথায় ভিজে চলে এসেছে। তাও নয়ন সাবধান করেননি তা নয়। বার বার বলেছেন, নাকের সামনে ক্যাশ ধরে রাখ ছগু, টাকার গন্ধে কুত্তা আপসে আসবে। ছগু শোনেনি।

সেই রামলাল তুলে নিয়ে গেল। রাম একসময় নয়নের কাছেই কাজ শিখল। মশলা মাখা, হাসিল করা। এখন আলাদা দল। ছগুকে কলেজে পড়িয়েই কাল হয়েছে নয়নের।

কম্পিউটার নিয়ে সারাদিন খুটখাট করে; বিজনেস দ্যাখে না। যন্ত্রগুলো বসে বসে মরচে পড়ে গেল। এখন আর দাবালেও কথা শুনবে না।

দু কাঠা এগারো ছটাক। সাউথ-ইস্ট ওপেন। পেছনে একটা পুকুর, সামনে টালির বাড়ি। পুকুর বুজিয়ে বাড়িটা ডিমলিশ করে থ্রি প্লাস ওয়ান। অন্তত বারোশো স্কোয়ার ফুটের তিনখানা। ওইখানে যা রেট, এক একটা পঁচ্চিস লাখে ফেললেও পড়তে পাবে না। খরচ-খরচা বাদ দিলেও চোখ বুঁজে ফিফটি লাখ্স। হাফ ক্রোড়। বরবাদ করে দিলি ছগু!

গণেশের সামনে স্থির হয়ে বসেছিলেন নয়ন। না হোক আধ ঘণ্টা। দুবার ছগুর মা দেখে গেছেন। তিনবারের বার ঘোলের শরবত নাড়তে নাড়তে এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন, কী হল, তবিয়ত খারাপ?

আর চোখের জল ধরে রাখতে পারলেন না নয়ন। সমস্ত অভিমান গণেশ হয়ে ছগুর মার ওপরেই রিবাউন্ড করে এসে পড়ল,—তোমার জন্যে। তুমিই যত নষ্টের গোড়া। লিখাপড়া শিখাও। ছেলে পণ্ডিত হবে। কম্পিউটার নিয়ে দিনরাত মজাকি মারছে, হারামখোর! একটা কাজ পারে না...

বলতে বলতে গলা বুঁজে এল নয়নলালের। তাড়াতাড়ি মায়া এসে জড়িয়ে ধরে বৃদ্ধ মানুষটার শোক সামলালেন। বয়েস হয়েছে। শুগার-প্রেশার দুটোই খারাপ। কিছু হয়ে গেলে মুশকিল।

মায়াবতীর কাঁধে মাথা রেখে শোকে-দুঃখে গলে জল হয়ে গেলেন নয়ন।

এক একজনের না, ওই যে ইংরিজিতে বলে প্রোপোরশন, সেটারই এত অভাব। কোথায় কখন কাকে কী বলতে হবে সেটা একেবারেই খেয়াল করে না। গাম্বোর মেয়ে টুবলু, ওর চিরকালই মাথার স্ক্রুগুলো একটু ঢিলে। কিন্তু এত বড় হয়েছিস, তবু আক্কেল হল না?

পিউর বিয়েটা নিয়ে অনেকদিন ধরেই ভেবেছেন সুতপা। ওই জেনারেশনের শেষ

কাজ। সুতপাদের পরের জেনারেশন। মাসতুতো ভাই কমল, ওর ছোট মেয়ে পিউ। এর পরেই আসবে তিতাসের বড় মেয়ে রিঙ্কির বিয়ে। তার মানে সুতপা হয়ে যাবেন দিদিশাশুড়ি। পিউর বিয়েতেই তাঁকে দেখিয়ে পিউ বলবে, ওই যে আমার পিসি, কত বয়েস আন্দাজ কর তো। জামাই রনো অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকবে, বলবে, যাঃ, বিশ্বাস হচ্ছে না।

চুল, চোখ, ঠোঁট, নখ সব কটার আলাদা আলাদা প্রিপারেশান নিয়েছিলেন। ফেশিয়াল তো করেছেন দু'সপ্তাহ ধরে। কাবেরীর সাজানো ব্যাকডেটেড বলে ফারজিনা বলে মেয়েটাকে ডবল কবুল করে আনিয়ে নিয়েছিলেন। সব হয়ে টয়ে গেলে বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে ঘুরে ঘুরে দেখেও নিয়েছিলেন। পারফেক্ট। টেন আউট অব টেন। কে বলবে ফিফটি সিক্স? টুয়েনটি সিক্স বললেও কম বলা হয়। তারপর গিরিজাকে গাড়ি বের করতে বলে নতুন ফ্রেঞ্চ পারফিউমটা প্রায় উপুড় করে ঢেলেছিলেন গায়ে।

হাওয়ায় চুল উড়বে বলে জানলার কাচ তোলা ছিল। বন্ধ গাড়িতে পারফিউমের গন্ধে নিজেরই নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। শেষ অবধি এসিটাই অন করে দিতে বললেন গিরিকে। বিয়েবাড়িতে ঢেউ তুলে ঘুরছিলেন সুতপা। আড়চোখে দেখছিলেন চোখগুলো। এনভি। গান্ধারী, প্রথমা, সাবিত্রী সকলের চোখে। অ্যাডমিরেশন—সোহম, পার্থ, বিরলদের চোখে। ফিসফিস কথা, উড়ো মন্তব্য। গায়ে লেগে সব যেন ঠিকরে যাচ্ছিল। হাঁসের মতো সাঁতরে সাঁতরে এক জটলা থেকে অন্য জটলায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন, হঠাৎ মুখোমুখি টুবলু।

—একী পিসি? তুমি?

—কেন? আমাকে নতুন দেখছিস?

—নতুন কেন দেখব? তবে অনেকদিন পর দেখছি তো, তাই...

—তাই কী?

—বন্ধুদের সবাইকে তোমার কথা বলতাম। আমার তপু পিসির মতো সুন্দরী ভূভারতে নেই। অনেকদিন পর দেখলাম। তাই ভাবছি, বয়েস মানুষের কাছ থেকে কত কিছুই ছিনিয়ে নেয়।

হাঁটুদুটো হঠাৎ যেন লুজ হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি একটা প্লাস্টিকের চেয়ারে বসে পড়লেন। জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ছে। অনেকেই গোল হয়ে ঘিরে আছে।

টুবলু আবার বলল, কী চেহারা হয়েছে তোমার পিসি? চোখের নীচে কালি, গলার হাড় উঁচু হয়ে উঠেছে, হাতের শিরা বেরিয়ে পড়েছে। কী ভীষণ বুড়ি বুড়ি লাগছে তোমাকে।

ঠোঁট কাঁপছিল। চোখ জ্বালা করছিল। তবু সবার সামনে হাসি হাসি মুখে, তা বয়েস কি কম হল রে আমার? বলে স্মার্ট হবার চেষ্টা করলেন সুতপা।

তারপর কোনওরকমে এ কথা সে কথার পর সবার অলক্ষ্যে টুক করে কেটে পড়লেন বিয়েবাড়ি থেকে।

ফিরে এসে সব খুলে আয়নার সামনে নিজেকে দেখলেন। টুবলুটা মিথ্যেবাদী। টুবলুটা বোকা, দেখতে পায় না। এখনও আমার অনেক কিছু আছে।

বলতে বলতে বিছানায় লুটিয়ে পড়ে হঠাৎই কেঁদে ফেললেন সুতপা। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতেই থাকলেন।

ঘড়ি দেখল স্যাম্। মিডনাইট। বাজনার তাল আর উদ্দাম নয়, ধীর; সুর যেন ভেতর থেকে উঠে আসছে, ছড়িয়ে যাচ্ছে ঘরের কোণে কোণে; নিজের নিশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে, নিশ্বাসের আগুনের হল্‌কা; মানুষগুলোর শরীর এখন অনেক কাছাকাছি, চোখের তারায় ইচ্ছার কেঁপে যাওয়াও দেখতে পাওয়া যায়।

অবশ্য এসব কিছুই নয়, একজনকেই দেখছিল স্যাম। পিঙ্কি। আগুনের মতো হলকা ছড়াচ্ছে, উড়ে উড়ে আসছে ছাই হয়ে যেতে। একের পর এক। দেখেই যাচ্ছিল স্যাম। তিন মাস ধরে সুতো ছেড়েছে স্যাম। আজ গুটিয়ে নেবার পালা। ওই যে রবিনকে মিষ্টি হেসে থ্যাংক্স বলল পিঙ্কি, কাবার্ড থেকে নাম্বার মিলিয়ে পার্স আর কীসব টুকিটাকি নিয়ে নিল। গেটের দিকে এগোচ্ছে। কুইক্ স্যাম্, কুইক্। নাউ অর নেভার।

হিরো হন্ডায় লাথি মারতেই গরগর করে উঠল ইঞ্জিনটা। বাধ্য টেরিয়ারের মতো পায়ের নীচে শুয়ে আছে যন্ত্রটা। চার্জ নেবার জন্য তৈরি। গেট খুলে বেরিয়েছে পিঙ্কি। ডিস্কোথেকের চারটে সিঁড়ি ছোট ছোট স্টেপে পার হয়ে রাস্তায় নেমে দাঁড়িয়েছে। ডানদিক-বাঁদিক দেখছে, ট্যাক্সি খুঁজছে মনে হয়। অ্যাক্সিলারেটরে চাপ দিল স্যাম।

আর ঠিক তখনি ঘটে গেল ঘটনাটা। একটা মাতিজ। আকাশের মতো নীল। অন্ধকার থেকে হঠাৎ বেরিয়ে ঠিক স্যাম-এর হিরো হন্ডার পেছনে এসে দাঁড়াল। বাইক থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে স্যাম। ততক্ষণে মাতিজের দরজা খুলে হাত বাড়িয়ে নেমে এসেছে ভিকি। দুজনের দিকেই এক ঝলক তাকাল পিঙ্কি। তারপর স্যামকে বাই করে মিষ্টি হেসে ঢুকে পড়ল ভিকির মাতিজের ভেতর। অন্ধকার রাস্তায় স্যাম দাঁড়িয়ে রইল। একা।

কীভাবে বাড়ি ফিরে এল জানে না। নীচে পার্ক করা তিনটে গাড়ি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। বাবার ফোর্ড, মায়ের ওপেল-অ্যাস্ট্রা, দিদির মারুতি জেন। তার পাশে স্যাম-এর হিরো হন্ডা। বাইকটাকে একটা লাথি কষাল স্যাম। তারপর সিটের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়তে পড়তে কান্নায় ভেঙে পড়ল খান খান হয়ে।

পাখি ডাকছে। লেকের জল অন্ধকার থেকে যেন একটু একটু করে জেগে উঠছে। এই সময়টা দিনের আর সমস্তটা থেকে অন্য রকম। তিতির হালকা পোশাকে শরীরটা আলগা করে দিল।

গাড়ি থেকে নেমেই দু'বার বুক ভরে নিশ্বাস টানলেন নয়নলাল। আজকাল এইটা হয়েছে, সবকিছুতে কেমন একটা পচা পচা গন্ধ। শুধু এই একটা জায়গায় শুদ্ধ গন্ধ, বুকের ভেতরটা হালকা করে দেয়। আঃ।

রাস্তার আলোগুলো একটা একটা করে নিভে যাচ্ছে। অন্ধকার আকাশ ফিকে হচ্ছে পুব দিকে গাছের মাথায়। কেটে যাক, ভেতরের সমস্ত অন্ধকার কেটে আলো আসুক, রিল্যাক্স্‌ড হয়ে ভাবতে থাকলেন সুতপা।

শরীরটা একদম ছেড়ে দিতে হবে। মাথাটা একেবারে খালি। কোনও চিন্তাই যেন মাথায় না বসতে পায়। নো পিঙ্কি, নো ভিকি, নো মাতিজ। তারপর কনসেনট্রেশনটা টেনে আনতে হবে মাথায় ঠিক দুই ভুরুর মাঝখানে। রেডি হয়ে নিল স্যাম।

উঠছে। সূর্য উঠছে। পুব আকাশ আলো করে। পাশাপাশি তিরিশজন মানুষ। দুঃখী

মানুষ। দু'হাত বাড়িয়ে দিল সূর্যের দিকে। এসো। অন্ধকার ছিন্ন কর। আলো দাও। আনন্দ দাও।

তারপর তিরিশটা শরীরের ভেতর থেকে উদ্গত হল হাসি। বেরিয়ে এল। একসঙ্গে। তালে তালে। হা হা হা হা হো হো হো হো হি হি হি হি। স্বর ক্রমশ নিচু থেকে উঁচু পর্দায় উঠছে। আবার নেমে আসছে। হাসির সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে জমে থাকা গভীর দুঃখসমূহ— তিতিরের দুঃখ, নয়নলালের দুঃখের সঙ্গে মিলে গলে গলে বেরিয়ে আসছে, মিশে যাচ্ছে ভোরের প্রথম বাতাসে।

লোকটা সারারাত কাঠের বেঞ্চে শুয়ে শুয়ে ঠাণ্ডায় কেঁপেছে, তবু একবারও ওঠেনি। হঠাৎই সমবেত হাসির আওয়াজে খাড়া হয়ে উঠে বসল। অতগুলো হাস্যরত মানুষকে দেখে চোখ গোল হয়ে গেল বেচারার।

তারপর হাত তুলে ওদের দেখাতে দেখাতে রাস্তার লোক ডেকে ডেকে উদ্দাম হাসিতে ভেঙে পড়ল।

সবাই যেতে যেতে বলে গেল, পাগল!

মশকবৃত্তান্ত

এক

ঘুম ভেঙে ধড়মড় করে উঠে বসে মা জিজ্ঞেস করেছিল, কী হল ঘুমোসনি?

পরীক্ষার আগে রাত জেগে পড়া তৈরি করার বয়েস তখনও হয়নি। বাবা-মার সঙ্গে বিছানাও আলাদা হয়নি। বাবা সারাদিন কলম পিষে সন্ধেবেলা ছেলে পড়িয়ে ভাঙা সাইকেলে বার তিনেক আলগা চেন চাকায় লাগিয়ে রাত এগারোটায় ফিরে চারখানা রুটি ঝিঙের ছেঁচকি আর এক কাপ দুধে পরের দিনের শক্তি মজুত করে সবে শুতে গেছেন। ভুল হল, বাবার মাথাটা বালিশে ঠেকার আগেই নাক ডাকতে শুরু করত। নাক ডাকার তিনটে স্তর ছিল; এইমাত্র বাবা প্রথম থেকে দ্বিতীয় স্তরে প্রবেশ করেছেন। মাও রান্নাঘর গুছিয়ে আঁচলে হাত মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকে দক্ষিণ আর পুব দু'দিকের কুলঙ্গিতে সযত্নে বেড়ে ওঠা টিকটিকি ও আরশোলার বংশকে প্রণাম করে মশারি তুলে ভেতরে ঢুকেছে। একবার আমার কপালে হাত ছুঁইয়ে বালিশটা ঠিক করে দিয়েছে। শোবার আগে হিসি করেছি কি না জিজ্ঞেস করে নিয়েছে। তারপর আমার যে পাশে বাবা তার অন্য পাশে শুয়ে গুনগুন করে কীসের যেন পাঁচালি রোজকার মতো সুর করে গাইতে গাইতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

ঘুমিয়ে আমিও পড়েছিলাম। ঘুমিয়েই ছিলাম। থাকতামও। সুর করে অন্য কারও ঘোরাঘুরির আওয়াজ যদি না কানে ঢুকত। কেন যে, কী করে যে গভীর ঘুমের মধ্যেও শুনতে পেয়েছিলাম আজও জানি না।

আওয়াজটা কানে যেতেই ঘুম ভেঙে গেল।

একপাশে তাকালাম,—বাবা। ছ্যাঁচাবেড়ার মাথা টপকে আলশেয় হাঁটাহাঁটি করছে চাঁদ, তার আলো বাবার হাঁ করা মুখে ঢুকতে গিয়েও ভয়ে ভয়ে পিছলে সরে আসছে। নাকের আওয়াজ এখন মুদারায়। তার সপাট তানে চাঁদ কেন সূর্য থাকলেও দু'বার ভাবত। বাঁদিকে মা। দৃশ্য নয়, পান-মশলা-জিরে-হলুদ যাবতীয় গন্ধ নিয়ে মার ঘুমন্ত অস্তিত্ব।

কিন্তু বাবাও নয়, মাও নয়। মশারির ভেতর, বাবার ওই নির্ঘোষ পার হয়েও ক্ষীণ কিন্তু অমোঘ একটা শব্দ একবার কাছে আসছে, একবার দূরে সরে যাচ্ছে।

অসম্ভব। চুপিচুপি মাকে ডিঙিয়ে ওপাশে গিয়ে মশারি তুলে বাইরে নামলাম। অন্ধকার। ভয়ও করছে। প্রয়োজনের বেশি এক মিনিটও আলো জ্বালিয়ে রাখলে বাবার কানমলা। কিন্তু এখন ঘোর প্রয়োজন। পটাং করে সুইচ টিপে দিলাম।

আবার মশারির ভেতর। খুঁজছি। মার ঘুম ভেঙে গেছে। বাবার আওয়াজ থেমে গেছে।

মা উঠে আমাকে দেখে অবাক, কীরে ঘুমোসনি?

বাবারও চোখ পিটপিট করছে।

অন্যায় করে ফেলেছি। ভয়ে ভয়ে দু'জনের দিকেই তাকিয়ে ঢোঁক গিলছি।

মা-ই জিজ্ঞেস করল—কী হল, ভয় পেয়েছিস? পেট ব্যথা করছে?

ঘাড় নাড়লাম। ততক্ষণে বাবার দু'টো চোখই খুলে গেছে পুরো। চোখে বিরক্তি ও রাগ।

মাও বিরক্ত—কথা বলছিস না কেন? আলো জ্বেলে কী করছিস?

কান্না চাপতে চাপতে জবাব দিলম—মশা।

ভাল করে শুনতে পায়নি মা। জিজ্ঞেস করল, কী?

—ভেতরে মশা ঢুকেছে, তাই খুঁজছিলাম।

জবাবটা শেষ করার আগেই হুমড়ি খেয়ে মার কোলে ঢলে পড়লাম। বাবা। থাপ্পড়টায় আমার আট বছরের শরীরের তুলনায় যথেষ্ট জোর ছিল।

দুই

বন্ধুরা খ্যাপাত। দশটা থেকে চারটে ক্লাস, বিকেলে মাঠে যেতাম। ধরা যাক আরও দু'ঘণ্টা। দিনের ক'ঘণ্টা বাদে বাকি পুরোটাই আমার আবাস ছিল মশারি।

আমাদের কলেজের আশেপাশে ছিল কাঁচা ড্রেন। আবাসিক কলেজ, হোস্টেল। নিয়মে চলত। কিন্তু মশারা কোনও নিয়ম মানে না। সকালে, বিকেলে, রাত্তিরে—জলখাবার, মধ্যাহ্নভোজন, নৈশাহার সবকিছুর জন্যেই তাদের বেরোতে হত এবং কলেজের নিরীহ কয়েকটি মফস্‌সলি ছাত্র দেখলে তাদের নিজেদের মধ্যে হাসাহাসির হিড়িক পড়ে যেত। সেই সমবেত হাসির পিঁপিঁ আওয়াজ আমার মোটা চামড়ার বন্ধুরা প্রায় কেউই শুনতে পেত না।

খাটের চারদিকে দড়ি টাঙিয়ে পেরেক পুঁতে প্রথম দিনেই মশারিটা খাটিয়ে ফেলেছিলাম। সকালে মশারি থেকে বেরিয়ে হাতমুখ ধুয়ে কৌটো থেকে মুড়ি পাটালি ঢেলে আবার মশারির ভেতরেই ঢুকে পড়তাম। সকালের পড়াশুনো মশারির ভেতরে। সন্ধেবেলাও তাই। খাবার জন্যে একবার বেরোতে হত।

বন্ধুরা জিজ্ঞেস করত, হ্যাঁরে, মশায় কী হয়?

—কামড়ায়।

—সে তো আমাদেরও কামড়ায়।

—তোরা টের পাস না।

—আলবাত টের পাই, হাজারবার টের পাই, কিন্তু সামান্য মশার কামড়ে আমরা ভয় পাই না।

—ভয় নয়, জ্বালা।

—অত অল্পতেই ভয়? ফুলের ঘায়ে মুচ্ছো যাস?

—ফুল নয়, মশা। আর মূর্ছা নয়, জ্বালা।

—বেশ বেশ, ওই হল।

—হল নয়। জ্বালা, চামড়ায় গোটা গোটা দাগ, ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, ডেঙ্গু। বায়োলজি বইতে পড়িসনি?

—থাক শালা মশারির ভেতর সেঁধিয়ে। ডরপুক কাঁহিকা।

এগুলো কম কম। আমার পুরুষত্ব বিষয়ে সন্দেহ এবং আরও আরও বলা, লেখা ও শোনার অযোগ্য ভাষা প্রয়োগ করত বন্ধুরা। আমার কিছুই যায় আসত না। কারণ চামড়াটা যথেষ্ট পুরু করে নিয়েছিলাম। আসলে কামড়, জ্বলুনি ও অসুখের থেকেও যেটা আমাকে পীড়া দিত, সেটা মশার আওয়াজ। কামড়াবি কামড়া, কিন্তু তাই বলে ওই রকম আওয়াজ করে জানিয়ে শুনিয়ে এসে? মশার সংগীতে কিনা আছে,—হুঙ্কার, অবজ্ঞা, উপহাস সমস্ত কিছু। এইভাবেই কলেজের ক'টা বছর কেটে গেল।

তিন

জঙ্গল। শাল-মহুয়া-অর্জুন-শিশু-জারুল। গাছ চিনছি। গাছের পাতায়-ফুলে-রঙে প্রকৃতির অক্ষরপরিচয় হচ্ছে।

ঋতুবদল। কাজটা অবশ্য গাছের নয়। গাছ পেরিয়ে নদী, সেই নদীকে আড়াআড়ি বেঁধে ফেলা। গাছের মতোই সোজাসাপটা মানুষ। তাদের নিয়ে কাজ। বাঁধের মাথায় সারাদিন রোদ পিঠে নিয়ে দাঁড়িয়ে কখন তাদের সুখদুঃখের সঙ্গে মিশে গেছি।

যতক্ষণ দিনের আলো থাকত।

অন্ধকার নেমে এলেই জঙ্গল কাঁপিয়ে সুর করে গান গাইতে গাইতে ঝাঁপিয়ে আসত তারা। জঙ্গল ও নদীতে মানুষের অনধিকারপ্রবেশ যাদের না-পছন্দ। অতএব সন্ধে হলেই আবার সেই মশারি। হারুকে এখানেই পেয়েছি। ঠিক আদিবাসী নয়, মিশেল। হয়তো সাহেবরা এসেছিল ওদের পূর্বপুরুষ, সেইসব ফল। জানতে চাইনি, ও-ও জানে বলে মনে হয় না। সারাদিন সঙ্গে সঙ্গে থাকে, রাতে খানা পাকায়, দু'জনে পা ছড়িয়ে খাই। শুধু মশারির ভেতর বিছানায় কাগজ পেতে খাই বলে একটু গাঁইগুই করে। সময়ে মেনেও নেয়।

বাবা-মার ইচ্ছেয় বিয়েটা এখানে থাকতেই সেরে ফেললাম। প্রথম এসে তো মঞ্জু উচ্ছ্বসিত। বনদেবীর মতো ঘুরে বেড়াত। সন্ধে হলে মশারি দেখে ঘ্যানঘ্যান করত। হারুকে পাশের কোয়ার্টারে পাঠিয়ে রাত হলে ও-ও মশারির ভেতরে ঢুকে আসত।

আমার শাল-সেগুন-অর্জুনে মুখ ডুবিয়ে জিজ্ঞেস করত, কী হল গো মশায়?

—বলতে পারব না। কিন্তু একটা মশা কামড়ালেও আমি ঘুমোতে পারি না।

—কত তো ওষুধ বেরিয়েছে। রিপেল্যান্ট, ধুনো। ভাল করে তাড়িয়ে দিই যদি?

—ওরা ঢুকবেই, ঢুকলে আমার কানে আওয়াজ যাবেই, আর গেলে আমার ঘুমের বারোটা বাজবে।

মঞ্জুর বড় গুণ, খুব মানিয়ে নিতে পারে। ছোট অসুবিধেটা মানিয়ে নিতে এক মাসও লাগল না। তারপরেই পড়ল বড় অসুবিধেটা নিয়ে।

—অসম্ভব, এখানে দিনের পর দিন মানুষ থাকে? একটা মুখ দেখতে পাই না। দিনরাত গাছ আর জঙ্গল। মানুষ বলতে তোমার ওই ভূত হারু। চলো।

সময় হয়ে এসেছিল। ট্রান্সফার নিয়ে চলে এলাম।

চার

বিপদে যে পড়িনি, তা নয়।

একবার ছোট একটা ওয়ার্কশপে যোগ দিতে আমেরিকা যাচ্ছি, বম্বে থেকে প্লেন ছাড়ল, মধ্যরাত। চেয়ার হেলিয়ে কাত হয়েছি কি হইনি, পিঁ।

স্টুয়ার্ডকে ডাকলাম। বলল, ইমপসিবল।

খেপে গিয়ে এয়ার-হোস্টেসকে বললাম, সে আবার ইংরেজিটাও ভাল জানে না, এয়ার ফ্রান্স-এর ফ্লাইট, বলে, ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেছ।

সব আলো জ্বালিয়ে দিলে ঠিক খুঁজে বের করতাম। কিন্তু মানুষগুলোর বলিহারি যাই। সঙ্গে এক বা একাধিক মশা নিয়েও নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। সারারাত টিভির পর্দায় চোখ রেখে প্যারিস। প্লেন পালটে তবে নিশ্চিন্ত।

কোথায় নিশ্চিন্ত?

যেখানে গেলাম, সেই মিনেসোটাকে বলে হাজার হ্রদের দেশ। যাবার এক সপ্তাহের মধ্যেই সন্ধের নেমন্তন্ন, গেছি এক প্রবাসী বাঙালির বাড়ি। হ্রদের ধারে বাগানে ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বিশুদ্ধ বাংলায় গুলতানি হচ্ছে, হ্রদে নৌকা নিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে দুই যুবক, পেছনে আকাশের মালিকানা বদল হচ্ছে, সেই নিভন্ত দিনে হঠাৎ তাকিয়ে দেখি আমার বাড়ানো গোড়ালির ওপর ডানা গুটিয়ে সুন্দর বসে আছে একটি মশা।

—একী? এ কোথা থেকে এল?

ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে গেছে। ভাবছি প্লেনেই এ জামাকাপড়ের মধ্যে সেঁধিয়ে বসেছিল কিনা, জল দেখে বেরিয়ে এসেছে, ভাদুড়িদা পিঠ চাপড়ে দিলেন—দেখেছ ভায়া, এখানেও দিশি মালের সাপ্লাই রেখেছি। হ্যাঁ, আদি ও অকৃত্রিম মশা। হ্রদের জলে ভালই চাষ হয়। তবে বাঁচোয়া, কামড়ালে ম্যালেরিয়া হয় না।

ম্যালেরিয়া হওয়া না হওয়াতে আমার কিছু যায় আসে না। মশা যখন, ডাকে তো নিশ্চয়। বাড়ি, মানে আস্তানায় ফিরেই ল্যান্ডলেডিকে জিজ্ঞেস করলাম, সেখানেও একই অভয়বাণী, আছে, কামড়ায়ও ইচ্ছে করলে, তবে কিছু হয় না।

রাত্তিরেই মশারির সন্ধানে বেরোলাম। মূর্খ আমেরিকানরা জিনিসটার নামও শোনেনি। তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোথাও পেলাম না। এমনকী ইন্ডিয়ান শপ-এও দেখলাম। ওরা চাল-ডাল-মশলা মায় পোস্ত অবধি রাখে। মশারি রাখে না। মালিক এগিয়ে এসে লিখে নিলেন, বললেন, তিন মাসের মধ্যে এসে যাবে।

আর তিন মাস! আমার মেয়াদই দু'মাস। দু'টো মাস বিনিদ্র রাত যাপন করে টলতে টলতে দেশে ফিরে মশারির মধ্যে ঢুকে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

পাঁচ

মঞ্জুকে বললাম, যাবে নাকি?

ভয় ছিল, হয়তো রাজি হবে না। দেখলাম, রাজি হল। বলল, ভালই তো, ওখানেই জীবন শুরু হয়েছিল। চলো আর একবার দেখে আসি।

অনেক বদল হয়েছে। বাঁধ শেষ হয়ে গেছে। বসতি হয়েছে। জঙ্গল পেছনে হটতে হটতে গিয়ে ঠেকেছে পাহাড়ে। মানুষ এসেছে অনেক। জঙ্গল নয়, শহরের মানুষ। ফলে মদ-জুয়া-গাঁজা-বেশ্যারাও সাজিয়ে বসেছে পসরা নিয়ে। মন খারাপ হয়ে গেল।

মঞ্জুর বরং সুবিধা হল। বাজার আছে, দশ মাইল দূরে সপ্তাহে একদিন হাটের আশায় হা-পিত্যেশ করে বসে থাকতে হয় না। আলো আছে, টিভি আছে, এমনকী একটা সিনেমা হলও আছে। কাছাকাছি হারু তো আছেই।

আমাকে পাঠানোর মূল উদ্দেশ্য, কয়েকটা আলগা স্ক্রু টাইট করা। বাঁধ হয়েছে, রিজার্ভার—অ্যাপ্রোচ রোড এবং আরও কিছু দরকারি কনস্ট্রাকশনের কাজ থমকে আছে। হচ্ছে, কিন্তু ধীরে। যেটুকু হচ্ছে তার খরচ পড়ে যাচ্ছে অস্বাভাবিক। সেটাই খতিয়ে দেখতে আমার আসা।

ব্যাপারটা বুঝে নিতে বেশি সময় লাগল না। প্রবীর চৌধুরী। থাকেও না এখানে, মাইল বিশেক দূরে শহরে ওর বিরাট বাংলো, উর্দিপরা দারোয়ান, তিন প্রস্থ গাড়ি , কুকুর হইতে সাবধান। তবে না থাকলেও সর্বত্রই চৌধুরী। সিনেমা হল ভিডিও পার্লার থেকে টেলিফোনের খুঁটি অবধি। কোনও কাজের টেন্ডার হলে চৌধুরীই তিন নামে কাগজ জমা দেয়। চৌধুরী চাইছে জানলে আর কোনও কনট্রাক্টর খাতা খুলবে না। ফলে যে কাজ দশ হাজারে হয় সে কাজ দশ লাখেও ওঠে না। বাইরে থেকে দু'য়েকজন এসে চেষ্টা করেছিল, কনট্রাক্টরের লোক সাইট অবধি পৌঁছতেই পারেনি।

আমি এসেছি সেটা জানাজানি হতে সময় লাগল না। এও জানিয়ে দিলাম, প্রয়োজনে সমস্ত কাজ বন্ধ করে দেব। সমস্ত লাইসেন্সড কনট্রাক্টরের ক্রিডেনশিয়াল চেয়ে পাঠালাম। নামকরা হাউসগুলোকে পার্সোনালি চিঠি দিয়ে ইন্টারেস্ট নিতে বললাম।

চৌধুরী এল দেখা করতে।

অবাক হয়ে গেলাম। ঝোলা গোঁফ, দশাসই চেহারা, পাশে তিনজন বডিগার্ড, কোমরে রিভলভার—কোনওটাই নয়। ভদ্রমার্জিত মধ্য চল্লিশের এক যুবক, টিশার্ট-জিনস-সানগ্লাস। তাও ঘরে ঢুকে সানগ্লাস খুলে রাখল, ঢোকার আগে স্লিপ পাঠিয়েও দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, আসতে পারি।

দেখছি, চোখ তুলে দেখলাম, দেখছে ও পক্ষও। আশ্চর্য চোখ দু'টো। কথা না বলে চোখ দিয়ে কেউ হাসতে পারে জানা ছিল না।

বললাম, বলুন।

—কিছু বলতে আসিনি, শুনতে এসেছি।

—কী শুনতে এসেছেন সেটাই জানতে চাইছি।

—আমার অপরাধ?

—কেন, আপনি জানেন না?

—অনুমান করতে পারি। কিন্তু অপরাধ যেটা আপনার চোখে, আমার কাছে সেটা

তাই হলে কী আর করতাম? জায়গাটার চেহারা বদলে দিয়েছি আমি। আশিভাগ মানুষ খেতে পেত না, এখন বছরে ন'মাস কাজ পাচ্ছে। মানুষ আমাকে ভালবাসে।

—রবিনহুড?

—যদি তাই মনে করেন।

চেয়ার ঘুরিয়ে বাইরে তাকালাম। বললাম, প্রবীরবাবু, আপনি না থাকলেও এগুলো হত। আপনি নিমিত্ত মাত্র।

কিছুক্ষণ জবাব এল না। তারপর হঠাৎই বলল, আপনাকে জিজ্ঞেস করি, কী পেলে খুশি হন, অত স্পর্ধা আমার নেই। জানতে চাইছি, যা করতে চাইছেন পারবেন?

—দেখি চেষ্টা করে। কী আর হবে, প্রাণটাই যাবে হয়তো...

—প্রাণের থেকে দামিও তো কিছু থাকতে পারে। তাকিয়ে দেখলাম চৌধুরী উঠে যাচ্ছে, চোখভর্তি হাসি উপচে পড়ছে।

দারোয়ান রামচন্দ্র দুম করে সাপের কামড়ে মরে গেল। বউটা ছোট, দু'টো ছেলেমেয়ে নিয়ে মঞ্জুর পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। মঞ্জু রেখে দিল।

রবিবার। কয়েকটা ফাইল দেখছি, মঞ্জু গেছে বাজার করতে, হারুকে নিয়ে, ফিরতে সময় লাগবে। রামের বউ ফুলি এল চায়ের কাপ হাতে নিয়ে। চোখ না ঘুরিয়েই বললাম, রেখে যাও।

আওয়াজ শুনে ফিরে তাকালাম। দরজা বন্ধ, ভেতর থেকে। ফুলি দাঁড়িয়ে আছে দরজায় পিঠ দিয়ে, ব্লাউজের বোতাম খোলা, শায়া ঝুলছে নীচে, ফুলির চুল উস্কোখুস্কো, ফুলি গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে।

লোকজনকে বলাই ছিল মনে হয়। দরজা ভেঙে ঢুকল অনেকে। এসে আমাকে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে গেল। বাইরে জনসমুদ্র। ফুলিকে ওই অবস্থায় ডিসপ্লে করা হল। আঙুল তুলে ফুলি দেখাল, ওই বাবু আমার এই অবস্থা করেছে।

ছয়

রাত। মশারি টাঙাচ্ছিল হারু। মঞ্জু চলে গেছে। মেয়ে তিতির স্বামীর কাছে, দিল্লি। খবরটা পাবে। আর আসবে না। হারুই কেবল বিশ্বাস করেনি। সাসপেনশনের পরেও কাছে ছিল। বলেছিল, মাইনে দিতে হবে না।

জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে চরাচর। কাল চলে যাব। চৌধুরী ফোন করেছিল। হাসেনি, বিদ্রূপ করেনি। ক্ষমা চেয়েছিল। বলেছিল, মশা মারলেও হাতে রক্ত লাগে, রক্ত ওর ভাল লাগে না।

জ্যোৎস্না আড়াল করে মশারি টাঙাচ্ছিল হারু। খাটের ওপর বসে বাইরে তাকিয়ে ছিলাম। হারুকে বারণ করলাম।

হারু, আমার পঁচিশ বছরের ছায়াসঙ্গী হারুও অবাক হয়ে গেল। বলল, মশারি টাঙাব না?

ঘাড় নাড়লাম। হারু একটু দাঁড়িয়ে থেকে মশারি না টাঙিয়েই চলে গেল।

হারুকে বলিনি, কিন্তু জানি, এখন, এতদিনে। মশারি টাঙিয়ে মশা আটকানো যায় না।

হাত

শুরুটা অন্যান্য দিনের মতোই করেছিল প্রমথ। মনে পড়ছে, অফিসের গেট পেরিয়ে রোজকারমতো প্রথমে বাঁ তারপর-ডান পায়ের গোড়ালিটা ফুটপাথে ঠুকে দিনের সমস্ত ময়লা মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছিল।

মনে পড়ছে, তারপরেই তাকিয়েছিল বাঁদিকে, ঘাড় সামান্য হেলিয়ে, ওপরে। নতুন লাগানো হোর্ডিংয়ের মেয়েটাকে বরাদ্দ মতো তিরিশ সেকেন্ড দেখেছিল। ওপর থেকে চোখ নামাতে নামাতে ঠিক তিরিশ সেকেন্ড পরেই থেমে গিয়ে বাকিটুকু তুলে রেখেছিল রাতে শুতে যাবার আগের সময়টার জন্যে।

বলরামের দোকান থেকে দুটো জিভে গজা আর একখানা অমৃতি খেয়ে রাস্তার কলে হাত ধুয়ে চার টাকা ঠেকিয়ে আরামের ঢেঁকুরটাও তুলেছিল যথারীতি। পকেট থেকে রুমাল বের করে নিজেরই ঘামের গন্ধে নাক শিঁটকে তাড়াতাড়ি হাত-মুখ মুছে রুমালটা আবার পকেটে ঢুকিয়ে রেখেছিল।

ততক্ষণে প্রমথর অভ্যস্ত কানে পরিচিত শব্দটা গড়িয়ে গড়িয়ে ঢুকছে। ট্রামটা বেরোচ্ছে পার্কসার্কাস ডিপো থেকে। রাজসিক চাল। দু'কদম এগোয়, দাঁড়ায়, নড়ে, আবার এগোয়। ঘড় ঘড় আওয়াজটাও ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসে। প্রমথ ঘোরে।

ব্যস। এই পর্যন্ত। ঘুরে দাঁড়ানো পর্যন্ত প্রমথ যা যা করেছে সমস্ত নিখুঁত। কোথাও এককণা খাদ নেই। গোলমাল যা কিছু তারপরেই ঘটে গেল।

আর সবচেয়ে বড় কথা, এই পর্যন্তই প্রমথর স্মৃতিতে রয়ে গেছে। বাকিটা ধুয়েমুছে চুনকাম-করা দেয়ালের মতো বেবাক পরিষ্কার।

ট্রামটা এইখানে একটা বড় বাঁক নেয়। আমির আলি অ্যাভিনিউতে ঢুকে অনেকটা জায়গা নিয়ে রাস্তার মাঝখান দিয়ে বেশ কিছুটা চলে। প্রমথও প্রতিদিন ঠিক বাঁকের মুখে ট্রামের হ্যান্ডেল ধরে শরীরটা ভেতরে গলিয়ে দেয়। ট্রামটা ফাঁকাই থাকে এই সময়। পার্ক স্ট্রিট অবধি যেতে যেতে ভিড় হয়ে যায়। বেশির ভাগ দিনই বসার সিট পেয়ে যায় প্রমথ। ততক্ষণে পশ্চিমমুখো হয়ে স্পিড নিয়েছে ট্রাম। প্রমথর চেনা হাওয়াটাও ফাঁক গলে গলে ঠিক ট্রামের ভেতর ঢুকে প্রমথর ঘাড়ে-গলায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। আরামে চোখ বন্ধ করে ফেলে প্রমথ।

সবই তো ঠিক ছিল। তা হলে গোলমালটা হল কোথায়? প্রমথ কি আবার মাথা ঘুরিয়ে চোখ দুটো হোর্ডিংয়ের মেয়েটার দিকে তাক করেছিল? বিশ্বাসের ফাইলটা মাত্র পঞ্চাশ টাকায় ছেড়ে দেবার দুঃখটা বুকের মধ্যে ঘাই মারছিল? বেরুনোর সময় অণিমা যে মাথার দিব্যি দিয়ে বলেছিল, মেয়েটার জ্বর, আজ তাড়াতাড়ি ফিরো, সেটাই গলায় তেতো ওষুধের মতো উঠে এসেছিল?

বলতে পারবে না। কারণ ঘটনাটা ঘটার ঠিক আগের ও পরের সমস্ত কিছুই মাথা থেকে মুছে গেছে।

শুধু এইটুকু মনে পড়ছে, ট্রামটা ততক্ষণে স্পিড নিয়েছে, বাঁকের মুখে ঘটাং ঘটাং করে দুবার চাকার আওয়াজ হল, প্রমথ এগিয়ে গেল, তিন স্টেপ হেঁটে দুপা ছুটে হাত বাড়িয়ে দিল, এবং তারপরেই শরীরটা ছুড়ে দিল ভেতরে। এখনও বাজি রেখে বলতে পারে একশোর মধ্যে একশোবারই প্রমথ পারবে। ডান হাতে হ্যান্ডেল ধরা। এবং শরীরটাকে ভেতরে গলিয়ে দেওয়া, একটা রিফ্লেক্স অ্যাকশন। চোখ বন্ধ থাকলেও পারবে। আজই পারল না।

হাতটা ফস্কে গেল। হাতের ঠিক দু' ইঞ্চি সামনে ট্রামের হ্যান্ডেলটা পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছে, পড়ে যাচ্ছে প্রমথ। হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে শরীরটা ক্রমশ পেছনে হেলছে। হু হু করে রাস্তাটা প্রমথর পিঠের কাছে এগিয়ে আসছে। আর তখনই একটা হর্ন। তীব্র, চোখ বন্ধ করলেও এখনও প্রমথ শুনতে পায়। গাড়িটা বড়, দুধের গাড়ি অথবা ওইরকম কিছু। প্রমথর ঠিক পেছনে, ছ' ইঞ্চি কি আরও কম দূরত্বে। আওয়াজ, ব্রেক, হই হই। চোখ বন্ধ করে ফেলল প্রমথ।

চোখ খুলে প্রমথ দেখল ট্রামের মধ্যেই দাঁড়িয়ে আছে, লেডিজ সিটের ধার ঘেঁষে, পেছনে হেলান দিয়ে। তখনও কাঁপছে ঠকঠক করে। দুটো হাঁটু যেন এখুনি খুলে যাবে। ভার বইতে পারছে না। হাত দুটোয় জোর এত কম, তুলে ওপরের রড ধরবে সে সামর্থ্যও নেই। গলা শুকিয়ে কাঠ, বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস আওয়াজ। ট্রাম ততক্ষণে ওয়েলিংটনে পৌঁছে গেছে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই কার্জন পার্ক। নেমে পড়ল প্রমথ। একটা ফাঁকা জায়গা দেখে ঘাসের ওপর থেবড়ে বসল।

আর তখনই মনে পড়ে গেল। পুরোটা নয়, আবছা। রাতের দেখা স্বপ্ন যেমন দিনের বেলা মনে পড়ে যায়—ভাসা ভাসা, ছায়া ছায়া, ছেঁড়া-কাটা তেমনি।

একটা হাত। লোমশ, বলিষ্ঠ। চওড়া কবজি, বড় বড় আঙুল। রং ফর্সা নয়, আবার কালোও নয়। প্রমথ যখন পড়ে যাচ্ছে, মৃত্যু আর প্রমথর মধ্যে ফাঁক যখন কয়েক ইঞ্চি, তখনই সেই হাত ট্রামের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছিল, আঁকড়ে ধরেছিল প্রমথকে, তারপর হ্যাঁচকা এক টানে ভেতরে নিয়ে ফেলেছিল তাকে, মৃত্যু থেকে জীবনে।

হাতটা বেশ মনে করতে পারছে প্রমথ। কিন্তু হাতের মালিক? কোন জন? প্যান্ট-শার্ট গায়ে-গন্ধ ফেরত পয়সা নিয়ে যে কন্ডাক্টরের সঙ্গে তুমুল ঝগড়া করল? লুঙ্গি-ফতুয়া-দাড়ি যে মানুষটা নামবার সময় প্রমথর পা মাড়িয়ে দিয়ে চলে গেল? অসম্ভব। এদের কারও সঙ্গেই মেলাতে পারে না প্রমথ।

কল্পনায় প্রমথ দেখতে পায় সৌম্যদর্শন একজন মানুষ। তার দৃষ্টিতে অপার মমত্ব, হাতে বরাভয়। সে বৃদ্ধদের জন্য সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, অন্ধ ভিখারিকে হাত ধরে রাস্তা পার করে দেয়, অসুস্থ মানুষকে হাসপাতালে পৌঁছে দিতে অফিস কামাই করে। সে পড়ে যাওয়া মানুষের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে একটা ধন্যবাদেরও প্রত্যাশা করে না।

কিন্তু প্রমথ? এ কী করল প্রমথ? একটা শুকনো ধন্যবাদ, একটা কৃতজ্ঞতা, সামান্য দুটো কথা। কিছুই যে করা হল না প্রমথর! প্রমথ যে মানুষটাকে চিনতে পারল না। ছি ছি ছি! অনুতাপে পরিতাপে দগ্ধ হতে থাকে প্রমথ।

দূরে মেট্রো সিনেমার মাথায় আলোর মালায় সেজে দাঁড়িয়ে আছে রবিনা ট্যান্ডন। হাসছে, যেন প্রমথকেই চোখের ইশারায় ডাকছে। চোখ ঘুরিয়ে নেয় প্রমথ। আর একটু এগিয়ে বাঁদিকে ঘুরলেই প্রমথর পুরনো জায়গা, গ্লাস সাজিয়ে অপেক্ষা করছে হানিফ।

আর ডানদিকে খুপরি খুপরি ঘরে টগর-শিউলি-গোলাপি-চন্দনা।

আজ যেন কেউ প্রমথর নয়। দু'খানা স্ক্রু দিয়ে কে যেন পেছনটা পার্কের ঘাসের সঙ্গে এঁটে রেখেছে। পা দুটো দু'মন ভারী। জিভ শুকনো, চোখ দু'টোয় জ্বালা।

খরখরে ঠোঁটে জিভ বোলাল প্রমথ। হাতটা কিছুতেই মাথা থেকে সরাতে পারছে না। এখনও যেন প্রমথর গায়ে তার ছোঁয়া লেগে আছে। ঠিক কোনখানটা ধরেছিল প্রমথর? জামা? চুল? হাত? হাত মনে পড়তেই নিজের হাতখানা লাইট পোস্টের আলোয় মেলে ধরল। রোগা লিকলিকে, সরু সরু আঙুল, আঙুলের গাঁটগুলো শক্ত শক্ত উঁচু উঁচু, লম্বা নখের মধ্যে কালো হয়ে জমে থাকা ময়লা। সবচেয়ে বড় তফাত, প্রমথর ফর্সা হাতে একটাও লোম নেই। বিয়ের পর অণিমা তার চেপ্টা বুকে জায়গা খুঁজতে খুঁজতে বলেছিল, তোমার বুকে লোম নেই কেন গো? আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের বত্রিশ ইঞ্চিকে ফুলিয়ে চৌত্রিশ করে প্রমথ জবাব দিয়েছিল, তোমার বুঝি বনমানুষের মতো লোমওয়ালা পুরুষমানুষ ভাল লাগে?

প্রমথর আজ মনে হল, লোম বনমানুষ নয়, মানুষের থাকে।

প্রমথকে দেখে অণিমা ভূত দেখার মতো আঁতকে উঠল,—তুমি, এত সকাল সকাল? শরীরটরির ঠিক আছে তো?

মাছি তাড়ানোর মতো হাত নেড়ে প্রশ্নটা উড়িয়ে দিয়ে প্রমথ বলল, বিন্তি কেমন আছে? ওর জ্বরটা?

—দুপুরে খুব বেড়েছিল, একশো তিন। মাথায় জলপট্টি দিয়ে এখন একটু কমেছে।

ভিড় ছিল না। তিন-চার জনের পরেই ওদের ডাক পড়ল। বুকে পিঠে যন্ত্র বসিয়ে ডাক্তারবাবুর মুখ গম্ভীর,—টাইফয়েড মনে হচ্ছে। ওষুধ দিচ্ছি, এখনি খাওয়াতে শুরু করুন। পরশুর মধ্যে জ্বর না কমলে ইঞ্জেকশন দিতে হবে।

—টাইফয়েড? ঢোঁক গিলল প্রমথ।

—চিন্তার কিছু নেই। জ্বর বাড়লে মাথা ধুইয়ে দেবেন। ফোন নাম্বার নিয়ে যান, দরকার হলে ফোন করবেন।

বিন্তির মাথায় কপালে হাত বুলিয়ে দিলেন ডাক্তারবাবু। প্রমথ দেখল চওড়া পাঞ্জার শক্ত লোমশ হাত। বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল। প্রায় জিজ্ঞেস করে ফেলেছিল। বাইরে বেরিয়ে ভুল ভাঙল। লাল ক্রশ লাগানো গাড়িটার কাচ মুছছিল ড্রাইভার। ঠিকই তো, গাড়ি থাকতে ট্রামে উঠতে যাবেন কেন ডাক্তারবাবু?

ডিসপেনসারি থেকে বেরিয়ে কিছুটা আসতেই ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল। ভিজে যাচ্ছে মেয়েটা। কী করে? এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, টিংটিং করে বেল বাজিয়ে রিকশা এসে দাঁড়াল পাশে। উঠে বসতেই হুড তুলে দিল। তারপর সাঁই সাঁই করে চালিয়ে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে ঘাড় হেলিয়ে জিজ্ঞেস করল, খুকুমণির কি অসুখ করেছে?

প্রমথ হ্যাঁ বলে নামতে যাচ্ছিল, তখনও বৃষ্টি থামেনি, 'বসে থাকুন' বলে এক ধমক দিয়ে রিকশাওয়ালা নিজেই গিয়ে দরজায় কড়া নাড়ল। অণিমা ছাতা নিয়েই দরজা খুলতে এসেছিল। প্রমথ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে টাকা বের করছে , রিকশাওয়ালা বলল, যান, খুকুমণিকে আগে শুইয়ে আসুন, আমি দাঁড়াচ্ছি।

বিন্তিকে শুইয়ে অণিমাকে ওষুধ বুঝিয়ে বাইরে এসে দেখল মানুষটা নিজেই কখন

কাকভেজা হয়ে গেছে। বেশি ভাড়া দিতে গেল, এক হাত লম্বা জিভ বের করে বলল, অধর্ম হবে স্যার।

ভাড়া নিতে হাত বাড়িয়েছে, প্রমথর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। প্রমথ দেখল, লম্বা হাতে মস্ত মস্ত লোম। বৃষ্টি আর ঘাম গড়িয়ে পড়ছে হাত থেকে।

প্রমথ দম চেপে বলল, আচ্ছা ভাই, আজ কি বিকেলে তুমি পার্কসার্কাসের দিকে গিয়েছিলে?

—পার্কসার্কাস? না তো? রিকশা নিয়ে বেরিয়েছি সেই দুপুর তিনটেয়। তারপর থেকে...। কী ব্যাপার স্যার?

জবাব না দিয়ে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিল প্রমথ।

অফিসে ঢুকে দেখল অধিকারী বসে আছে। দূর থেকেই ঠোঁট উল্টে হাসি ওগরালো। সাত সকালে মেজাজ খাট্টা হয়ে গেল প্রমথর।

অথচ এমনটা হবার কথা নয়। মোডাস অপারেনডি মোটামুটি এইরকম ছেলেমেয়ে-বাজারদর-ঝড়বৃষ্টি ইত্যাদি সম্বন্ধে কিছু দরকারি বাক্যবিনিময়ের পরই প্রমথর চা-তেষ্টা পাবে। 'অফিসের চা-টা জঘন্য, মুখে দেওয়া যায় না, চলুন বাইরে থেকে চা খেয়ে আসি'—পরামর্শ দেবে অধিকারী। কথাটা মনে ধরবে প্রমথর। বাইরে বেরিয়ে উল্টোদিকের রেস্টুরেন্টে পর্দাঘেরা কেবিনে বসবে দু'জন। নতুন টেন্ডারের সমস্ত খবর বন্ধখামে নিয়েই এসেছিল প্রমথ। প্রমথর হাত থেকে খামটা নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা খাম অধিকারী থেকে প্রমথ হাতবদল হবে। প্রমথ সময় নষ্ট না করে সদ্যপাওয়া খামটা জামার ভেতরে গেঞ্জির বিছানায় শুইয়ে দেবে। ততক্ষণে চা এসে গেছে, একসঙ্গে চায়ে ঠোঁট ডোবাবে দু'জন, এবং তৎক্ষণাৎ 'সত্যি, এরাও আজকাল এত খারাপ চা বানাতে শুরু করেছে' বলে বাইরে বেরিয়ে আসবে। অতঃপর একে অপরকে চিনতেও না পেরে দু'দিকে হাঁটা দেবে।

আজ গম্ভীর মুখে চেয়ারে গিয়ে বসল প্রমথ।

অধিকারী ওপরে ফ্যানের দিকে তাকাল,—আজ যা গরম।

প্রমথ বলল, হুঁ।

—কাল বেলেঘাটায় এমন বৃষ্টি হয়েছে, ঘরবাড়ির ভেতরে জল ঢুকে গেছে। আজও ঢাললে নৌকো নামাতে হবে।

—হুঁ।

—গলা শুকিয়ে কাঠ, আজ একটা কোল্ড ড্রিংক না খেলেই নয়।

ড্রয়ার টানল প্রমথ। গ্লাস বের করে ভবতোষকে চোখের ইঙ্গিতে বলল জল ভরে দিতে। ঘাড় গলা মুছল। তার পর চেয়ারে এলিয়ে বসে চোখ বুজল।

অধিকারী ভাবল প্রমথ শুনতে পায়নি। আবার বলল, চলুন বাইরে গিয়ে একটা কোল্ড ড্রিংক...

বন্ধ চোখের পাতার ফাঁক দিয়ে প্রমথ ততক্ষণে অধিকারীর হাত দেখে ফেলেছে, রোগা ফর্সা শিরা বের করা নির্লোম দু'খানা হাত।

—থাক।

অধিকারী বিষম খেল,—যাবেন না?

—আজ থাক। পরে দেখা যাবে।

অধিকারী একটু ইতস্তত করল। প্রায় ছ' কোটি টাকার কাজ। দেরি হয়ে যাচ্ছে। এখনি কাগজগুলো না পেলে...। গলা নামিয়ে বলল, কোনও অসুবিধা আছে দাসবাবু? বাইরে আসুন না, কথাবার্তা বলে কিলিয়ার করে নিই?

—ফাইলটা আমি ছেড়ে দিয়েছি, একদম নীচের গোলাপি ফাইলটার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে মিথ্যে বলল প্রমথ।

অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল প্রমথর দিকে। তারপর উঠে বাইরে চলে গেল অধিকারী।

বিকেলে অফিসের গেট থেকে বেরিয়ে অভ্যেসমতো বাঁদিকে তাকিয়েই থমকে গেল প্রমথ।

সেই হোর্ডিং। সেই চুল, মুখ, চোখের ভাষা, অথচ কেন জানি আজ চোখ দুটো হোর্ডিং টপকে লাফিয়ে উঠে গেল আকাশে।

মেঘ! পরতে পরতে। গোলাপি, কমলা, জাফরান, নীল, বেগুনি। কে যেন ছিটিয়ে ছিটিয়ে রং মিশিয়েছে। মাথার ওপর থেকে পশ্চিম দিগন্ত অবধি। এত রং এই কলকাতার আকাশে?

ধর্মতলা থেকে মিনি ধরে প্রমথ। ঢুলতে ঢুলতে ফেরত পয়সাগুলো না গুনেই পকেটে ঢোকাচ্ছিল, হঠাৎ কী মনে হল, টিকিটের সঙ্গে খুচরোগুলো মিলিয়ে গুনল। তাকাল মুখ তুলে। কন্ডাক্টর ছেলেটা ফাঁকা হয়ে আসা মিনিবাসের দরজায় দাঁড়িয়ে শিস দিয়ে 'কহো না প্যার হ্যায়' করছে। হাত নেড়ে ডাকল প্রমথ। চোখে ঝগড়া নিয়ে ছেলেটা এগিয়ে এল প্রমথর দিকে।

—কিছু বলছেন?

—হ্যাঁ, ফেরত দেবার সময় গোলমাল করেছেন। মিলিয়ে দেখুন।

—আমাদের ভুল হয় না দাদা! বাড়ি গিয়ে মিলিয়ে নেবেন।! বলতে বলতে ছেলেটা আবার দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, প্রমথ বলল, এক টাকা বেশি দিয়েছেন, ফেরত নিয়ে যান।

ছেলেটা ঘুরে দাঁড়াল। প্রমথর কাছে গুটি গুটি এসে টিকিট আর খুচরোগুলো মিলিয়ে দেখল। তারপর দু' টাকার কয়েনটা তুলে এক টাকার একটা ফেরত দিল। প্রমথ যতক্ষণ না নামে, দরজায় দাঁড়িয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ছেলেটা প্রমথকে দেখল।

বাড়ি ফিরে দেখল বিস্তির জ্বর কমে গেছে, মার কোলে মাথা রেখে গল্প শুনছে। বাবাকে দেখেই লাফিয়ে উঠল, কী মজা। আজ গল্প শুনব, বাবা গল্প বলবে।

অণিমা খুশিটা ঠোঁটের ফাঁকে লুকিয়ে রেখে চোখ পাকাল, বাবা এখনি ফিরল, একটু রেস্ট নিতে দাও। স্নানটান করে খেতে খেতে তোমাকে গল্প বলবে।

ধোয়া পাজামা পরে বিস্তির মাথার কাছে বসে গরম রুটিতে আলুভাজা মুড়তে মুড়তে প্রমথ একটা আকাশের গল্প বলল। সেই আকাশে থই থই করছে আলো। প্রমথর স্টকে যত রং ছিল সব ঢেলে দিল সেখানে। দু-চারটে ফর্সা ফর্সা টুকটুকে পরী যারা লক্ষ্মী মেয়েদের সঙ্গে খেলতে আসে তাদেরও ছেড়ে দিল আকাশে।

গল্প শুনে চোখের পাতায় স্বপ্ন বোঝাই করে ঘুমোতে গেল বিন্তি।

এমনিতে প্রমথর অসুখবিসুখ করে না। শরীর খারাপ অফিসে যায়নি, শেষ কবে মনেই করতে পারে না। কিন্তু এবারের রোগটা প্রমথকে কাবু করে ফেলল। সেলুনে গেছে, চুল কাটা শেষ নাপিত ঘাড়ের কাছে আয়না ধরে প্রমথকে চুলের পেছন দেখাচ্ছে, প্রমথর হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। সেই হাত। তাড়াতাড়ি পেছন ফিরে নাপিতকে দেখল। ভুল ভাঙল। মিল আছে, কিন্তু পুরোটা নয়। নাপিতের ডানহাতের ছ'টা আঙুল।

ফাইল নিয়ে সাহেবের ঘরে ঢুকেছে, সাহেব মন দিয়ে টাইপ করা কী একটা কাগজে চোখ বোলাচ্ছিলেন, চুপি চুপি ফাইলটা টেবিলের ওপর রেখে চলে আসবে, হঠাৎ চোখ আটকে গেল। গোটানো হাতা জামার ভেতর দিয়ে দুখানা ফর্সা ফর্সা হাত বেরিয়ে আছে। ঘুরে ভাল করে দেখতে গেল, সাহেব কাগজ থেকে চোখ তুলে বললেন, কিছু বলবেন দাসবাবু? পালিয়ে বাঁচল প্রমথ।

পাশের বাড়ি চুরি হয়েছে, রোববারের সকাল, মজা দেখতে সবার পেছন প্রমথও দাঁড়িয়ে গেছে,হঠাৎ ভিড়ের ভেতর প্রমথর নজরে পড়ল,—একটা হাত। পুরুষ্ট, শক্তসমর্থ, পেশিবহুল একটা হাত, ঘন লোমে ভরতি, তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে ছুঁয়ে দেখতে গেল, হাতের মালিক ঝট করে প্রমথর দিকে ফিরল,—বলুন, কিছু বলবেন আপনি? পুলিশ ইন্সপেক্টর। বুক হিম হয়ে গেল প্রমথর। তিনবার ঢোঁক গিলে সাতবার ঘাড় নেড়ে ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়েও খটকা যায় না প্রমথর। বাইরে দাঁড়ানো পুলিশের গাড়িটা দেখে নিশ্চিন্ত হয়, না, এ ট্রামে ওঠা পুলিশ নয়।

এইভাবেই বাজারের মাছওয়ালা, সকালে দুধ দেয় যে ছেলেটা, কাগজ দিয়ে যায় যে, ইলেকট্রিক মিস্তিরি, জামার মাপ নেওয়া দর্জি রাস্তার মোড়ে বসে থাকা মুচি, অফিসের ঝাড়ুদার প্রত্যেকের হাতের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকা শুরু করল প্রমথ। নেহাত এরা প্রত্যেকেই পুংলিঙ্গ এবং হাতছাড়া অন্য কোনও কিছুতে তেমন ইন্টারেস্ট নেই প্রমথর, তাই অক্ষত শরীরে টিকে রইল প্রমথ।

খুঁজতে খুঁজতে প্রমথর হঠাৎ একটা দরকারি কথা মনে পড়ে গেল। এইভাবে খোঁজা তো খড়ের গাদায় আলপিন খোঁজা। কোনওদিনই প্রমথর সন্ধান শেষ হবে না। সেই মানুষটা উঠেছিল একটা ট্রামে। পার্কসাকার্স থেকে ধর্মতলাগামী একটা ট্রাম। কত নম্বর ট্রাম সেটাও প্রমথর জানা। এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক, মানুষটা রোজই ওই সময় ওই ট্রামে পার্কসার্কাস থেকে ওঠে। হয়তো প্রমথর মতোই নিত্যযাত্রী। কাছাকাছি কোনও অফিসেই কাজ করে । সুতরাং খুঁজে বের করার সবচেয়ে সহজ জায়গা তো ওই ট্রামই।

ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে বেরোয় প্রমথ। হোর্ডিং, অমৃতি বাঁধা রুটিন থেকে সমস্ত ছেঁটে ফেলেছে আজকাল। অপেক্ষা করে। সেই ট্রাম, সেই সময়। মোড় ঘোরার আগেই উঠে পড়ে প্রমথ। মানুষটা দাঁড়িয়েছিল নীচের ধাপে, গেটের পাশে, পেছন দিক চেপে, ঠিক সেইখানেই গিয়ে দাঁড়ায়। আশপাশে তাকায়। খোঁজে। ট্রাম চলতে থাকে দুলকি চালে। হাওয়ায় চোখ জড়িয়ে আসে প্রমথর।

ভিড় বাড়ে। ফুটবোর্ডেও মানুষ দাঁড়িয়ে থাকে। ওঠে নামে মানুষ। নামতে উঠতে প্রমথকে দ্যাখে। বিরক্ত হয়।

—আচ্ছা লোক তো! এইভাবে দরজা আগলে কেউ দাঁড়ায়? লোকজন ওঠা-নামা করবে না?

বৃদ্ধ কন্ডাক্টর: উঠে আসুন না দাদা! যাবেন তো ধর্মতলা, গেটের কাছটা হালকা করে দিন। দেখছেন না কত লোকের অসুবিধা হচ্ছে।

উড়ো মন্তব্য: যেতে দিন দাদা! এমনি এমনি কি আর গেট জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে? এই ভিড়ের মধ্যেই তো সুবিধে!

সব শোনে প্রমথ। আকাশ দেখতে দেখতে যায়। দোকান দ্যাখে। সেজেগুজে খুশি খুশি মুখে ঘুরে বেড়ানো মানুষও দেখতে থাকে আজকাল। ভেতরে তাকায় না। কোনও কথায় কান দেয় না। জবাবও দেয় না। শুধু নিজেকে ভিড়ের মধ্যে মিশিয়ে দিয়ে খুঁজতে থাকে।

চলতে চলতে খুঁজতে খুঁজতে প্রমথ মাঝে মাঝে নিজেকেই জিজ্ঞেস করে, কেন তার এই খোঁজা। মানুষটাকে যদি পেয়েই যায়, কী করবে প্রমথ? হাত চেপে ধরবে? এক কাপ চা খাওয়াবে? বাড়িতে নিয়ে যাবে? নাকি একটা শুকনো ধন্যবাদ দিয়ে দায় সেরে ফেলবে?

ঠিক যে কী, প্রমথ নিজেও জানে না। শুধু এইটুকু জানে, মানুষটাকে খুঁজে পেতেই হবে। খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত তার শান্তি নেই।

অভ্যেসটা রপ্ত করে ফেলল প্রমথ। ট্রামের ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে ভিড়ের সঙ্গে মিশে হাওয়া খেতে খেতে পার্কসার্কাস থেকে ধর্মতলা অবধি যায়। সিট খালি থাকলেও ভেতরে গিয়ে বসে না আজকাল। ট্রামের কন্ডাক্টাররা তাকে চিনে গেছে। রোজ যাওয়া-আসা করে, এই ট্রামেই ওঠে এমন মানুষরাও কিছু বলে না। তবু নতুন যারা, তাদের উড়ো মন্তব্য দু-চারটে এসেই যায়।

এইভাবে দাঁড়িয়ে যেতে যেতে অনেক কিছুই আজকাল করতে পারে প্রমথ। ভেতরটা না শুনতে পারে, বাইরেটা দেখতে পারে, আশপাশে খুঁজতে পারে, এবং হাওয়া খেতে খেতে অল্প ঘুমিয়েও নিতে পারে।

সেটাই বোধহয় করছিল সেদিন।

ট্রামটা ধর্মতলার কাছাকাছি এসে গেছে। এইখানে কিছু যাত্রী যেমন টলন্ত ট্রাম থেকে নামে, অনেকেই, ট্রামটা কার্জন পার্কে ঢোকার আগেই, উঠেও পড়ে টুকটাক। এরা পার্কসার্কাসে যাবে, আগে ওঠে, বসার জায়গা পাবার লোভে।

ট্রামটা স্পিডের মাথায় হঠাৎ বাঁদিকে ঘুরতেই জোড়ের মুখে চাকা পড়ে ঘটাং ঘটাং করে আওয়াজ হল। ঝাঁকুনি লাগল জোরে। তাড়াতাড়ি রড ধরে সামলে নিল প্রমথ। আর তখনই ঘটনাটা ঘটল।

অন্য অনেকের মতো এই মানুষটাও ট্রাম ধরার জন্য ছুটছিল। বগলে রেক্সিনের ব্যাগ, ধুতি-শার্ট, চামড়ার স্যান্ডেল। সবকিছু ঠিকঠাকই করছিল। একটু ছুটে ডানহাত বাড়িয়ে ট্রামের হ্যান্ডেলটা ধরে নিজেকে ছুড়ে দেওয়া। দিলও। আর ঠিক তখনই ঝাঁকুনি মারল ট্রামটা। হাতের এক ইঞ্চি দূর দিয়ে হ্যান্ডেলটা ছিটকে সরে গেল।

ব্যাগটা বগল থেকে গলে গিয়ে পড়ে যাচ্ছে রাস্তায়, চশমা খুলে গলা থেকে বুক হয়ে

নেমে যাচ্ছে, আর মানুষটা হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে শুয়ে পড়ছে পিচের বিছানায়। সমস্তটাই চোখের কোনা দিয়ে দেখল প্রমথ। আর তখনি এসে গেল বাঘছাপ একটা স্টেট ট্রান্সপোর্টের বাস, গাঁক গাঁক করতে করতে ধেয়ে এল ট্রামের দরজার দিকে।

একটা সমবেত চিৎকার। পিচের রাস্তা পড়ন্ত মানুষ এবং ছুটন্ত বাস—তিনটেকে একই ফ্রেমে পেয়ে গেল প্রমথ। এবং প্রমথ দেখল ডান হাত দিয়ে শক্ত করে ট্রামের রড ধরে তার নিজের সমস্ত শরীরটা ঝুঁকে এসেছে বাইরে। তারপর পড়তে থাকা মানুষটাকে হাতের ডানায় ধরে প্রমথ উড়িয়ে নিয়ে ফেলল ভেতরে।

ততক্ষণে ট্রাম ঢুকে পড়েছে কার্জন পার্কের সবুজে। বাসটাও মিশে গেছে যানবাহনের ভিড়ে। ভেতরের লোকজন ছুটে এসেছে মানুষটার কাছে। এক প্রস্ত বকাবকি গায়ে-মাথায় হাত বুলোনো, চোখে-মুখে জলের ছিটে। ভিড়ের পেছনে দাঁড়িয়ে প্রমথ দেখল তখনও ঠকঠক করে কাঁপছে মানুষটা, ভাল করে দাঁড়াতে পারছে না। একজন বসার জায়গা করে দিল। ব্যাগ আর চশমা কুড়িয়ে এনে দিল অন্যরা। সবার অলক্ষে ট্রাম থেকে খসে পড়ল প্রমথ।

রাত গভীর। বিন্তিকে একটা গল্প বলেছে প্রমথ। একটা ভাল মানুষের গল্প। ঘুমোতে গেছে বিন্তি।

অণিমা-কি দিন দিন স্বাদু আর সুগন্ধি হয়ে উঠছে? ঘুমোচ্ছে অণিমাও।

চুপি চুপি মশারি তুলে খাট থেকে নামল প্রমথ। শব্দ না করে দরজা খুলল। পাশের ঘরে গিয়ে আলো জ্বালল। পাঞ্জাবিটা খুলে ফেলল গা থেকে।

মাথার ওপর আলো, সামনে আয়না, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজের হাত দেখল। কোথায় সেই রোগা ফর্সা নির্লোম হাত? পেশিবহুল শক্ত দু'খানা হাত, ঘন লোমে আচ্ছন্ন, চওড়া কব্জি, মস্ত হাতের পাঞ্জা। চোখে চোখ রাখল প্রমথ। দু' চোখে টলটল করছে মমতা।

অনর্থক খুঁজে বেরিয়েছে প্রমথ বাইরে। হাসল, আয়নার দিকে তাকিয়ে। আলো নিভিয়ে শুতে গেল।

ব্রেইন টিউমার

সকলেই দেখছিল।

ভদ্রমহিলা উঠলেন দেরি করে, ট্রেনটা ততক্ষণে টইটম্বুর। জায়গা পাবার কথা নয়। মহিলা হলেও নয়। প্রথমত মেয়েদের জন্যে আলাদা কামরার বন্দোবস্ত যেখানে, সেখানে সাধারণ যাত্রীদের কামরায় মহিলা দেখলে জায়গা ছেড়ে দেবার রেওয়াজ উঠে গেছে। দ্বিতীয়ত এই ট্রেনটা মোটামুটি নিত্যযাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত। টিকিট চেকাররাও জানে বলে এড়িয়ে চলে।

তবু যে ভদ্রমহিলাকে জায়গা ছেড়ে দেওয়া হল, তার কারণ তাঁর সঙ্গের মানুষ। স্ট্রেচারটা কামরার দরজা দিয়ে ঢুকল না। কোনও মতে পাঁজাকোলা করে দুজন লোক ভদ্রলোককে ভেতরে ঠেলে দিয়ে তাড়াতাড়ি টাকা পয়সা বুঝে নিয়ে বিদায় হল।

ট্রেনের সমস্ত মানুষ ওইদিকেই তাকিয়েছিল। ভদ্রমহিলা তাদের দিকে তাকাতেই সকলে জানলা দিয়ে বাইরে, প্ল্যাটফর্মে চলমান টিভি, খাবারের স্টল, ম্যাগাজিন বিক্রি করা হকার ইত্যাদি ইত্যাদি দ্রষ্টব্য বস্তুসমূহে মনোনিবেশ করল।

অধিকাংশ তাতেই রেহাই পেয়ে গেল। কোপটা পড়ল ভদ্রমহিলার ঠিক পাশের সিটটাতে। কয়েকজন, যারা জায়গা না পেয়ে দাঁড়িয়েছিল, এগিয়ে এল,—উঠুন তো মশাই, উঠে পড়ুন। দেখছেন না অসুস্থ মানুষ। সঙ্গে একা ভদ্রমহিলা। জায়গা ছাড়ুন।

নিতান্ত অনিচ্ছায় চারজনকে উঠে দাঁড়াতে হল। দাঁড়ানো মানুষদের জনা তিনেক, যারা বসা চারজনকে তুলে দিতে পারায় আত্মপ্রসাদে আপাতত টইটম্বুর, তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে ধরে ধরে অসুস্থ মানুষটিকে সিটে শুইয়ে দিল। ভদ্রমহিলা জানলার ধারে বসে ভদ্রলোকের মাথাটি নিজের কোলে তুলে নিলেন।

ট্রেনটা মনে হয় এইটুকুর জন্যেই অপেক্ষা করছিল। একটা ঢেঁকুর এবং দুটো হেঁচকি তুলে চলতে শুরু করল। কামরার দু-তিনজন যাত্রী বাড়ির ঠাকুরঘরে সাজিয়ে রাখা মূর্তির উদ্দেশে কপালে আঙুল ছোঁয়ালেন। যারা এতক্ষণ দেখে যাচ্ছিল, এবং ভদ্রমহিলাকে গুছিয়ে নেবার সময় দিচ্ছিল, তারা এইবার মাঠে নেমে পড়ল।

উল্টোদিকের এক সিট পরে, স্বামীকে কোণঠাসা করে বিরাশি কেজির শরীরটা দু' সিটে ছড়িয়ে যিনি এতক্ষণ ডিবে থেকে সুপারি তুলে দাঁতে কাটছিলেন, এবং আড়চোখে স্বামী কুড়ি বছরের ছোট মহিলাটির দিকে কতখানি রাধানাথ শিকদারি দৃষ্টি নিক্ষেপ করছেন, জরিপ করছিলেন, ঝুঁকে এলেন,—স্বামী?

ঘাড় হেলিয়ে উত্তর এল।

বিরাশি কেজির স্বামী এবার জানতে চাইলেন, কতদূর যাবেন?

—বর্ধমান।

বিরাশি তাঁর সমস্ত ওজনটা জানলার দিকে ঠেলে স্বামীকে পিষে দিলেন। স্বামী বাড়তি কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার ক্ষমতা ও উৎসাহ দুটোই হারিয়ে ফেললেন। তবে প্রশ্ন করার

ক্ষমতা কেড়ে নিলেও দৃষ্টি এখনও অটুট এবং ছানিহীন। তাই দিয়ে দেখতে থাকলেন (এবং দেখার পরে বাকি জায়গাটুকু মনে মনে ভরাট করে নিতে থাকলেন),—ভদ্রমহিলার বয়েস্ চল্লিশের আশেপাশে। শরীরের বাঁধন এখনও অটুট, ছেলেমেয়ে হয়নি বলেই মনে হয়। হলে শরীরটা এতদিনে আর একটু ঢিলে হয়ে যেত। স্বামী, দেখে মনে হয় পঞ্চাশের ওধারে। অবশ্য অসুখবিসুখ শরীরে বয়েসের দুচারখানা ইঁট ধসিয়ে দিয়ে যায়। খুব অবস্থাপন্ন নয়, আবার গলার হারখানা ও একজোড়া বালা নেহাত হাভাতে নয় সেটা বুঝিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। সাজগোজের ঘটা নেই, এই অবস্থাতে সেটা শোভনও নয়, তবে হাতব্যাগটা সুন্দর চামড়ার, তাতে রাটিকের কাজ করা। রুচি আছে।

—অসুখ?

—হ্যাঁ।

কথাটা বিরাশি শুরু করেছিলেন, হঠাৎ দাঁড়িয়ে থাকা স্টিলফ্রেম তুলে নিলেন,—হাসপাতাল থেকে সোজা?

ভদ্রমহিলা চোখ তুলে স্টিলফ্রেমকে দেখে জবাব দিলেন, হ্যাঁ।

বিরাশি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে স্টিলফ্রেমের দিকে তাকালেন, স্টিল গ্রাহ্য করলেন না, তিনিও কারও চাপে পড়ে বিরাশিকে গৃহস্থ করেননি। অতএব ধার ধারেন না, কথাটা চালিয়ে গেলেন, কোন হাসপাতাল?

—বালাজী।

ঝাঁপিয়ে এলেন ব্রিফকেস,—চোর। শুধু টাকা নেবার ধান্ধা। ডেডবডি আটকে রেখে বলে একলক্ষ টাকা বাকি আগে নিয়ে এসো, তারপর বডি ছাড়ব।

বিরাশি এতক্ষণে সুযোগ পেলেন,—হার্ট না কিড়নি? কর্তার সামান্য হার্টের গোলমাল ধরা পড়েছে, চায়ে চিনি খাচ্ছেন না, দাদার কিডনির অসুখ। দুটোই আগে মনে পড়ল।

ভদ্রমহিলা জায়গা দখল করার মূল্য দিচ্ছিলেন, সারা রাস্তাটাই দিতে হবে ভেবে বললেন,—ব্রেইন।

শব্দটা সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর ভেতরে একটা হায় হায় আওয়াজ তুলল। কিডনি হার্ট অবধি ধরাছোঁয়া যায়। করোটির আড়ালে ঘাপটি মেরে থাকা ব্রেইন সম্বন্ধে সকলেরই তুমুল আশঙ্কা।

—টিউমার?

এবারে ভদ্রমহিলা জবাব না দিয়ে কেবল মাথা নেড়ে বাইরে তাকিয়ে রইলেন।

—কফি!

গলাটা শুকিয়ে গিয়েছিল। তা ছাড়া সামনে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ পড়ে। সস্বামী বিরাশি, স্টিলফ্রেম, ব্রিফকেস এবং উপস্থিত জনগণের অনেকেই কফিতে কণ্ঠনালী সিক্ত করে নিলেন। তা ছাড়া শরীরেও বল প্রয়োজন।

গলা ঝেড়ে ব্রিফকেস সামনে মুন্ডুটা বাড়ালেন,—আমার ভায়রার দাদা। বেশি বয়েসও নয়, এই সাতচল্লিশ আটচল্লিশ। ক'দিন ধরেই বলত। সকালের দিকে মাথা টিপটিপ করে। এক দিন ভোরে উঠে বমি করল, অফিসে গিয়ে অজ্ঞান। অফিসের লোকজনই নিয়ে গেল। 'ওই বালাজী। চাররকম স্ক্যান করল। আখমাড়াই। যেটুকু রস ছিল ছিবড়ে করে বলল অপারেশন করতে হবে, একলাখ লাগবে। তা-ই সই। চাঁদা তুলে জোগাড় করা হল। অপারেশন হয়ে গেল। অপারেশন সাকসেসফুল। অথচ মানুষটা চোখ

খোলে না, কথা বলে না, হাত পা নাড়ে না। তিনদিন পরে বলল ইনটেনসিভে দিতে হবে। সেখানেই রইল সাতদিন। পরে খোঁজ নিয়েছি। মরা মানুষ, মেশিনে চাপিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল। বাঁচানো নয়, বাঁচা দেখানো। সব শেষ হলে বলল আরও একলাখ লাগবে। নিয়ে এসো তবে বডি ছাড়ব। চামার, চামার!..... তার চেয়ে সরকারি হাসপাতালই ভাল।

স্টিলফ্রেম উত্তেজনায় এমন ঘাড় নাড়লেন, চশমাটা ঠিকরে গিয়ে ভদ্রমহিলার কোলে পড়ল। একটুর জন্যে ভদ্রলোকের চোখটা মিস করেছে। চশমার ভদ্রলোকের দৃষ্টির কতখানি সুরাহা হত বলা শক্ত, তবে কাচ ভেঙে ঢুকে গেলে ব্রেইনের সঙ্গে একখানা চোখও বেরিয়ে যেত।

—সরকারি হাসপাতাল? খেপেছেন? বাবার প্রস্টেট, ভর্তি করেছিলাম। সারারাত বাবা হায় রাম হায় রাম করেছে। না মশাই, নিতান্ত নাস্তিক মানুষ, জন্মে রামনাম করেনি? নানা, গান্ধীজির প্রতিও ভক্তি কম বাবার, বাবা কট্টর নেতাজিপন্থী। রাম ওয়ার্ডের সুইপার। দু' বোতল দিশি সাঁটিয়ে বাইরে লোহার খাটে সারারাত ঘুম মারল। এ দিকে বাবা রামনাম করতে করতে বিছানা ভাসিয়ে দুঃখে কষ্টে কোনওরকমে রাতটুকু পার করে সকাল হতেই আমার হাত ধরে হাউহাউ করে কেঁদে উঠল, আমাকে এই নরক থেকে এখুনি উদ্ধার কর, বাবা। .... ভুলেও সরকারি হাসপাতালে যাবেন না।

পাশ থেকে একজন বলে উঠলেন, তার চেয়ে নেলোর চলে যান।

থামুন তো। ব্রিফকেস তেড়ে এলেন, কত টাকার পরীক্ষা করিয়েছিল সেটা বলুন? দাদ-হাজা চুলকানিতেও কম করে দশ হাজার। হার্ট-ব্রেইন-কিডনি হলে পঞ্চাশেও ফুরোয় না। তারপর কোনও রিপোর্ট দেবে না। সব ওইখানে জমা থাকবে। তাপ্পিতুপ্পি মেরে দিল, ট্রেন থেকে নেমে বাড়ি অবধি পৌঁছাতে না পৌছতেই যন্ত্র আবার বিকল। ফোন করো চিঠি দাও, ফ্যাক্স করো—জবাব নেই। চেনাজানা কেউ, মাদ্রাজে থাকে, তাকে দিয়ে খোঁচা মারো,—সাফ্ জবাব—আবার নিয়ে এসো। নেলোর নেলোর করবেন না, সব পয়সা খেঁচার কল।

বাইরে থিয়েটারের ড্রপসিন বদলাচ্ছে হুহু করে। একটু আগেও যেখানে পাখি-সূর্য গাছগাছালি আঁকা ছিল সেইখানে ছায়াছায়া অন্ধকার আর ভাঙা এক টুকরো চাঁদ টাঙিয়ে দিয়ে গেছে কারা। ভদ্রমহিলা সেই দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে ছিলেন। বালাজী থেকে ফিরে এসেছেন। সরকারি না নেলোর সেই চিন্তাটাই খেয়ে নিচ্ছে তাঁকে বোঝা যায়। অথবা ভেতরের কোনও আলোচনাই তাঁকে আর ছুঁতে পাচ্ছে না। উদ্বেগ আশঙ্কা—নিরাপত্তাহীনতা—ভবিষৎ সমস্ত কিছু এতটাই গ্রাস করে আছে অন্য কিছু নিয়েই চিন্তার আর অবকাশ নেই। বিরাশি আড়চোখে স্বামীর দিকে তাকালেন। ঘুমিয়ে পড়েছে। এই হয়েছে এক.....। মানুষটা কেমন যেন ভোঁদা মেরে গিয়েছে। রাতে বিছানায় শুয়েছে কি শোয়নি, ঘুমিয়ে কাদা, কতভাবে কতরকম করে জাগাবার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়েছেন বিরাশি। নিজেকেই মনে মনে ধিক্কার দিয়েছেন। বিরাশিটা বাষট্টি হলে কি মানুষটা এমনি সাততাড়াতাড়ি ঘুমোতে পারত? এখন মনে হচ্ছে দোষটা পুরোপুরি তাঁর নয়। নইলে সামনে অমন তাজা সোমত্ত যুবতীকে বসিয়ে রেখে মানুষটা কি ঘুমিয়ে পড়তে পারত? কম্ফর্টারটা একদিকে ঝুলছিল। যত্ন করে জড়িয়ে দিলে বিরাশি।

স্টিলফ্রেমও দেখছিলেন। মলিনারও এই রকমই বয়েস হবে, চল্লিশটল্লিশ। অথচ দেখায় যেন পঁয়ষট্টি। হাতে হাজা, দাঁতে পায়োরিয়া মাথায় উকুন। চুল উঠে উঠে সিঁদুরটা

প্রায় ব্রহ্মতালু অবধি পৌঁছে গেছে। রাগ করতে গিয়েও স্টিলফ্রেম শেষ অবধি পারলেন না। পাঁচটা ছেলেমেয়ে সামলে কতখানি পারবে? সামনের মাসের মাইনে পেয়েই ভাল দেখে একটা টনিক,...আর হ্যাঁ আমলার তেল, চুলের জন্যে, একেবারে কিনে নিয়ে বাড়ি ঢুকবেন। তারপর খাইয়ে দাইয়ে সবাইকে ঘুম পাড়িয়ে তিনি আর মলিনা।

ব্রিফকেস ভদ্রলোককে দেখছিলেন। ঘুমিয়ে আছেন। কত বয়েস হবে, সাতচল্লিশ আটচল্লিশ। মাথার মধ্যে বাড়ছে একটা মাংসের দলা। বাড়বে, অপারেশন হবে। নাহলেও ক্ষতি নেই। কিছুটা সময়ের এদিক ওদিক। শেষ পর্যন্ত ওই ঘুম আর ভাঙবে না। ভদ্রমহিলার দিকে এবারে চোখ গেল। সিঁথির সিঁদুর মুছে যাবে, রং চঙে শাড়ি ছেড়ে সাদা শাড়ি—থান পরে না আজকাল কেউ, হাতের শাঁখা-পলা খুলে ফেলে দিতে হবে। এই বয়েসেই সব আশা—আনন্দের শেষ। দীর্ঘশ্বাসটা ট্রেনের চাকায় মিশিয়ে দিলেন ব্রিফকেস।

বিরাশির আদর, স্টিলফ্রেমের স্বপ্ন ও ব্রিফকেসের দীর্ঘশ্বাসের সাক্ষী পুরনো চাঁদটা ততক্ষণে আরও খানিকটা উঠে বেশ বল সঞ্চয় করে নদী-মাঠ-বাঁশঝাড়ে জ্যোৎস্না ঢালতে শুরু করেছে। হঠাৎই সকলের ঘোর ভাঙল। ঘড়ঘড়াং আওয়াজ। বর্ধমানের মানুষ মাত্রেই এই আওয়াজের অর্থ বোঝে। বাঁকা নদী। স্টেশনের আর দেরি নেই।

ভদ্রলোকের চোখ খুলল।

—আহাহা উঠছেন কেন? স্টেশন আসুক। আমরাই প্ল্যাটফর্মে নেমে একটা স্ট্রেচার বা হুইলচেয়ারের ব্যবস্থা করব। আপনি শুয়ে থাকুন। গার্ডকে বলে ট্রেনটা একটু বেশি দাঁড় করাব, চিন্তা করবেন না।

তবু ভদ্রলোক উঠে বসলেন,—না, না অত ব্যস্ত হতে হবে না। নামিয়ে দিলে উমাই ঠিক ব্যবস্থা করে নেবে। আপনারা কাইন্ডলি নামার সময়ে যদি একটু হেল্প করেন।

কোনও অসুবিধা হল না। ধরে ধরে নামিয়ে একটা বেঞ্চে গিয়ে বসানো হল উমার স্বামীকে। ব্রিফকেস, স্টিলফ্রেম, এমনকী অন্যরাও অনেকে এগিয়ে এল। উমাই সকলকে নিরস্ত করলেন,—কোনও দরকার নেই। খবর দেওয়া আছে। বাড়ি থেকে গাড়ি নিয়ে লোক আসবে। ওদের সঙ্গে সব আছে। আপনারা এগিয়ে যান, আমরাও পেছন পেছন আসছি।

প্ল্যাটফর্মে ভিড়। এই সময় ওভারব্রিজটায় খুব জ্যাম হয়। ওপরের লোক দু' মিনিট আগেও জানতে পারে না, কোন প্ল্যাটফর্মে গাড়ি ঢুকবে। সবাই ওভারব্রিজের ওপর চড়ে থাকে। প্ল্যাটফর্মে ট্রেন ঢুকলে তবে মাইকে ঘোষণা করা হয়। তখন ট্রেন থেকে নামা মানুষের দল ওপরে ওঠার চেষ্টা করে, এবং ওপরে দাঁড়ানো মানুষেরা ট্রেন ধরার জন্যে নামে। অনেকে পায়ের নীচে চাপা পড়ে, বাচ্চা এবং মেয়েদের আর্তস্বর শোনা যায়, বৃদ্ধরা লাঠি অথবা চশমা হারিয়ে হায়হায় করেন। স্টেশনের যেসব কর্মী এটা নিয়ন্ত্রণ করেন তাঁরা ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসে মজা উপভোগ করে আবার মাইকের সামনে গিয়ে বসেন।

ভিড় হালকা হল। ট্রেনটাও ছেড়ে চলে গেল। প্ল্যাটফর্ম ফাঁকা। উমার স্বামী এদিক ওদিক দেখে বললেন, চলো এবার ওঠা যাক।

উমাও দেখছিলেন,—হ্যাঁ, কাউকেই আর দেখা যাচ্ছে না, এবারে যাওয়া যেতে পারে।

ওভারব্রিজের সিঁড়িতে পা রেখে স্বামী বললেন, ভাগ্গিস স্ট্রেচারটা চোখে পড়েছিল।

—বুদ্ধিটা কার সেটা বলো? উমা বললেন,—না হলে পরপর দু'রাত ডিউটি করে তোমাকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আসতে হত। আমার না হয় লেডিজ বা অন্য কোথাও......

কুড়ি টাকা স্ট্রেচারের লোকদুটোকে দিতে হল, কিন্তু ওই টাকায় কি বার্থ মিলত।

যাকগে, তবে ওটাতে শুয়েছ, কত খারাপ খারাপ রোগী বয়ে নিয়ে যায়। বাড়ি গিয়েই জামাকাপড় চেঞ্জ কোরো, ওগুলো কাচতে দিতে হবে।

ঘাড় নাড়তে নাড়তে ব্রেইনটিউমার, উমার স্বামী ওপরে ওঠেন, পাশে সাবধানে পা ফেলে উমা।

মাধ্যমিকে জীবনানন্দ

স্কুল থেকে ফিরে কাঁধ থেকে ব্যাগটা নামিয়ে রেখেছে কি রাখেনি, মা এসে হাঁটকাতে শুরু করল।

—কোথায় রাখলি?

—কী?

—কী আবার, প্রগ্রেস রিপোর্ট। কেন, আজ রেজাল্ট বেরোয়নি?

—ইনস্ট্রুমেন্ট বক্স এর মধ্যে আছে, দেখে নিয়ো।

মা ইনস্ট্রুমেন্ট বক্স টেনে বের করছে, মুক্তো পাশের ঘরে চলে গেল। ভাল্‌লাগে না। এরপর যা যা সিন তৈরি হবে, মুক্তোর একেবারে সহ্য হয় না। তার চেয়ে একটু আড়াল-আবডালই ভাল।

—এ কী! তুই কী করেছিস? বেঙ্গলি নাইনটি সিক্স? তার মানে ফর্টি এইট পার্সেন্ট? ছি ছি, আমি মুখ দেখাব কী করে মুক্তো?

টাওয়েলটা কাঁধে ফেলে বাথরুমে যেতে যেতে আড়চোখে মাকে দেখল মুক্তো। মাটিতে থেবড়ে বসেছে, দুটো পা সামনের দিকে বাড়ানো, একহাতে একটা কাগজের টুকরো—ওটাই মুক্তোর প্রগ্রেস রিপোর্ট, ওটাতেই লেখা আছে বাংলায় মুক্তোর প্রগ্রেস পঞ্চাশ পেরোয়নি, অন্য হাতটা পিছনে একটু কাত হয়ে, সাদা দেওয়ালে চোখ, সেই চোখেও দেওয়ালের মতো ধবধবে নিরাশা, অপেক্ষা করলে একটু পরেই নেমে আসবে টপটপ জলের ফোঁটা এবং হেঁচকি—হেঁচকি-না তুলে মা কাঁদতে পারে না—'ডিসগাস্টিং' শব্দটা দু-পাটি দাঁতের মধ্যে পিষতে পিষতে মুক্তো বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

কার দোষ? স্কুলে হিসি-পটি পেলেও ইংরেজিতে ম্যামকে জানাতে হয়। ছোট থাকতে একবার বাংলায় কথা বলার জন্য পানিশমেন্ট পেতে হয়েছিল। পেরেন্টস-টিচার মিটিং-এ মাকে ডেকে আচ্যি ম্যাম-এর কী তড়পানি, সেই থেকে বাংলা উঠে গেল। এখন তো ভাল, কথাবার্তা বাংলাতেই হয়। সেই ওয়ান-টু বেলায় বাড়িতেও ইংরেজিতে কথা বলতে হত। যত ফেয়ারিটেল্‌স্ সব ইংরেজি। বাংলাটা যে শিখতে হবে, ওটাতেও নম্বর পেতে হবে, সে ধারণাটা মাথায় ঢুকতে ঢুকতেই মাধ্যমিক পরীক্ষা এসে গেল।

আর এতই যখন হল, তখন মাধ্যমিক কেন? পড়াবে ইংলিশ মিডিয়ামে, আর পরীক্ষার সময় মাধ্যমিক? স্কুলটার এমন হচপচ। মাধ্যমিক মানেই বাংলা। আর যে সে বাংলা নয়, ভাবসম্প্রসারণ-সারাংশ-সন্ধি-সমাস কী নেই, সে বাংলায়? দু-শো নম্বর। বাংলাও যে ফেলনা নয়, যথেষ্ট প্যাঁচালো, সেটা মুক্তো অনেকদিনই বুঝেছে, এবার মা-ও বুঝুক।

না তো কী? ফিজিক্যাল সায়েন্সের ফিজিক্সটা অমিত স্যার পড়ান, কেমিস্ট্রি নিত্য স্যার। তেমনি লাইফ সায়েন্সও দু'জন। হিস্ট্রি-জিয়োগ্রাফি-ম্যাথস্-অ্যাডিশনাল

প্রত্যেকটার জন্য একজন অথবা দুজন। ইংলিশটা পপি আন্টি। আর বাংলার বেলা যত নেগলিজেন্স। ওটা না পড়লেও চলে। বোঝো ঠ্যালা। এখন মাথা-কপাল চাপড়াও।

নাঃ, দেরি হয়ে যাচ্ছে। এরপরে মাঠে গেলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফিল্ডিং খেটেই চলে আসতে হবে। বাথরুমের দরজা খুলে বাইরে বেরোল মুক্তো। আর বেরুতেই মুখোমুখি।

—তুই কী ভেবেছিসটা কী? আমাদের সকলের মুখে চুনকালি মাখাবি?

আজ বোর করে ছাড়বে দেখছি! দেয়াল ঘড়িতে সময় দেখল মুক্তো, নাঃ এখনি না যেতে পারলে আজ মাঠের বাইরে বসে স্কোর টুকতে হবে।

—কী করব? একটাই এসে, কোনও অলটারনেটিভ নেই। ওটা নাকি পরীক্ষায় আসবে। বাংলার স্যার কোথা থেকে খবর পেয়ে টেস্টের পেপার সেট করার সময় শুধু ওটাই দিয়েছেন। বাকি সবই কিছু কিছু পেরেছি। ওটা একেবারে ছেড়ে এসেছি। নাহলে কিছু নম্বর বাড়ত।

—কী এসে?

—কবি জীবনানন্দ। তাঁর নাকি বার্থ না ডেথ সেন্টিনারি। খুব হইচই হচ্ছে। ফাইনালে আসবেই। তাই টেস্টে ওটা ছাড়া কোনও এসে দেননি মাইতি স্যার।

—তুই জীবনানন্দটা তৈরি করে যাসনি?

—নামই শুনিনি। হল থেকে বেরিয়ে শুনলাম অনেক নাকি লিখেছিল টিখেছিল। পোয়েট্রি। কেউ পড়ত না। শেষ অবধি মনের দুঃখে ট্রামের চাকার তলায় সুইসাইড করেছিলেন। তুমি পড়েছ মা জীবনানন্দ?

এবারে মাও খানিকটা থমকায়। গলা ঝেড়ে বলে, না মানে তেমন করে নয়। তবে তোর বাবা খুব জীবনানন্দ জীবনানন্দ করে। এলে জিজ্ঞেস করিস।

বাবা সুনন্দ রাতে এসে সব শুনে হায় হায় করতে লাগল,—ছি ছি, তুই জীবনানন্দ লিখতে পারলি না? আরে গাধা, তোর ভাল নাম যে সুতীর্থ, জানিস এটাও জীবনানন্দ থেকেই ধার করা। মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে, তুই, সুনন্দ মিত্তিরের ছেলে হয়ে জীবনানন্দ জানিস না?

বাবার উপরেও বেজায় রাগ হল মুক্তোর। এমনিতে সুতীর্থ নামটা মুক্তোর বেশ পছন্দ। বেশ আনকমন নাম। সুদীপ্ত, সুনীল, সুদীপ অনেকগুলো আছে ওদের স্কুলে, সুতীর্থ একখানাই, বরং মুক্তো নামটা কেমন মেয়ে মেয়ে। কিন্তু সে নামটা যে জীবনানন্দ থেকে ধার করা, বাবা কোনও দিনই তাকে বলেনি। বললে আর কিছু না হোক, একটা লাইনও তো লিখতে পারত, একদম ব্ল্যাঙ্ক রেখে আসতে হত না।

অবশ্য বাবা বলবেই বা কোথা থেকে? বেরোয় সকাল সাড়ে আটটায়। সাতটায় ঘুম থেকে উঠে রেডি হতেই সকালটুকু চলে যায়। অফিস সেরে, ইউনিয়ন-অফিস ক্লাব-কলেজ স্ট্রিট ঠেঙিয়ে ফিরতে রাত দশটা। তখন আর জীবনানন্দ হয়!

বাইরে কিন্তু জীবনানন্দ কম করে না সুনন্দ। বাড়িতে ওরা সে ব্যাপারটা ডুবোপাহাড়ের চূড়ার মতো জানে। জানে সুনন্দ অফিস ক্লাব করে, বন্ধুদের সঙ্গে কফি হাউসে গলা ফাটায়। কিন্তু জীবনানন্দ না হলেও সেও যে সুনন্দ, এদিক ওদিক তারও দু-চারখানা কবিতা ছাপা হয়, সে ব্যাপারটা তেমনভাবে বাড়িতে জানায়নি সুনন্দ। এবারে জানাতে হবে। এখন জানানোটা সবকিছু মিলিয়ে বেশ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, হঠাৎই উপলব্ধি করল সুনন্দ।

পরবর্তী একটা সপ্তাহ সুনন্দ তার এ অবধি অর্জিত সমস্ত যোগাযোগ ও প্রতিষ্ঠা ব্যবহার করে বেশ ভাল একটা জায়গায় সবকিছু দাঁড় করাল। জীবনানন্দ থাকবেন। থাকবে সুনন্দও। জায়গাটাও চমৎকার, শিশির মঞ্চ। একটি সান্ধ্য অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটা দু-ভাগে ভাগ করে। প্রথম অর্ধ জীবনানন্দ পাঠ, আলোচনা। দ্বিতীয়টা কবি-সন্ধ্যা। প্রায় জনা পনেরো নামী, অনতিনামী এবং সুনন্দর মতো অনামী কবি নিজের নিজের কবিতাপাঠ করবেন। সুনন্দ, এইসব আয়োজন করতে গিয়েই উপলব্ধি করল, দু-একটা কবিতা এদিক সেদিক ছাপার অক্ষরে বেরিয়ে গেলেই কবি হওয়া যায় না। কারণ ওইসব পত্রপত্রিকার পাঠক অন্যান্য কবিরা নিজেদের কবিতাটায় ছাপার ভুল আছে কি না তা ছাড়া অন্যান্য কিছুই লক্ষ করেন না। অতএব রাস্তা, তাঁদের এক জায়গায় জড়ো করে কবিতা শুনতে বাধ্য করা। আর সেটা কবিতা-সন্ধ্যা গোছের কোনও অনুষ্ঠান ছাড়া সম্ভব নয়। একজন কবি ওইরকম কোনও সন্ধ্যায় স্বরচিত কবিতাপাঠ করলে তবেই কবি হন। তার আগে নয়।

অতএব এক ঢিলে দুই পাখি। জীবনানন্দ। একটি সন্ধ্যা খরচ করে মুক্তোকে জীবনানন্দ বিষয়ে ভালরকম শিখিয়ে পড়িয়ে দেওয়া যাবে। এবং সুনন্দ। সুনন্দর কবি পরিচিতির প্রতিষ্ঠা লাভ। বাইরে তো বটেই মুক্তো এবং শর্মিষ্ঠার কাছেও—মুক্তো কি বাড়ি গিয়ে মাকে সব গুছিয়ে বলবে না? প্রথমে শর্মিষ্ঠাকেও আনবে ভেবেছিল, পরে বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে বিবেচনায় স্থগিত রাখল।

অফিস ক্লাব, একটি লিট্‌ল ম্যাগ এবং গালভরা একটা নাম, তিনটে যোগ করে সন্ধ্যাটা সাজিয়ে নিয়ে কথাটা বাড়িতে পাড়ল। শর্মিষ্ঠা লাফিয়ে উঠল। মুক্তোও রাজি হয়ে গেল। মাধ্যমিকে যখন আসছেই—

শর্মিষ্ঠা বেরুবার ঠিক আগেও মুক্তোকে মনে করিয়ে দিল, নোট বইটা গুছিয়ে নিয়েছিস? একটা পয়েন্টও যেন বাদ না পড়ে।

বুক পকেটে হাত দিয়ে পেন-টেন সব চেক করে বাবার পেছন পেছন জীবনানন্দ-শিকারে বের হল মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী মুক্তো।

জন্ম ৬ ফাল্গুন, ১৩০৫, মৃত্যু ৬ কার্তিক ১৩৬১। ছবির পেছনে বড় বড় করে লেখা, কথাগুলো নোটবইতে টুকতে টুকতে অন্যমনস্ক হয়ে গেল মুক্তো। ফাল্গুন, কার্তিক। তার মানে কী মাসে? মার্চ? না না ফেব্রুয়ারি। আর পরেরটা? নভেম্বর? যাক গে বিষয়টা যখন বাংলা, এখন ফাল্গুন আর কার্তিক মনে রাখলেই হবে।

বাবাকে একবার চোখের কোনা দিয়ে খুঁজল মুক্তো। ওই তো, স্টেজের নীচে ব্যস্ত হয়ে একটা ফুলদানি হাতে ঘোরাফেরা করছে। ফুলদানি আছে ফুল নেই। হ্যাঁ, আর একজন রমেশকাকু, স্টেজের একধারে উইংস-এর পাশে, হাতে একগুচ্ছ রজনীগন্ধা। রমেশকাকু খুঁজছে একখানা ফুলদানি। এইভাবে ফুল ও ফুলদানির খোঁজাখুঁজির মধ্যেই কে যেন মাইকে অ্যানাউন্স করে দিল, আমাদের অনুষ্ঠানের সভাপতি, বিশিষ্ট জীবনানন্দবিদ অমিতাভ ঘোষাল এইমাত্র জানিয়েছেন, তাঁর স্ত্রী অসুস্থ, আসতে পারবেন না।

একটা গুঞ্জন উঠল। পাশ থেকে কে বলে উঠল, এমন বউপাগলা লোকের জীবনানন্দ বিশারদ হওয়ার কোনও যোগ্যতাই নেই। তাই শুনে তার পাশ থেকে একজন মহিলা,

সাজগোজ, কপালে মস্ত টিপ হেসে বললেন, ছি, বলতে নেই, মরে গেছে না?

গেছে গেছে আপদ গেছে, বলে অন্যপাশের গলায় কঙ্কর্টার হঠাৎ গলা তুলে বললেন, তার চেয়ে আমাদের কবি সম্মেলনটাই আগে করে নিলে হত।

এইসবে মন দিতে দিতে, মুক্তো খেয়াল করেনি কখন পর্দা পড়ে গেছে। খরখর আওয়াজ করে পর্দা সরে গেল এবং দেখা গেল সাদা মঞ্চে মস্ত একখানা জীবনানন্দ, একগুচ্ছ রজনীগন্ধা এবং একটা শ্মশান ধূপ সঙ্গী করে খুবই নিঃসঙ্গ ও বিব্রত অবস্থায় হলভর্তি লোকের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

এবারে জীবনানন্দের ছবিতে মাল্যদান করবেন শ্রীমতী সুপ্রভা খাসনবিশ।

আড়াল থেকে কথাগুলো উড়ে আসার আগেই আঁচল উড়িয়ে এলেন সুপ্রভা। দু-সিট পরের ভদ্রমহিলা বললেন, আহা জামদানিটা কী সুন্দর দেখেছ? পেছনে কে যেন ফিসফিস করল, জীবনানন্দ এবার মাল্যবান হলেন।

দৈববাণী ভেসে এল, সভাপতির অনুপস্থিতিতে আমরা আনুষ্ঠানিকতা বিসর্জন দিয়ে একে একে জীবনানন্দ বিশেষজ্ঞদের অনুরোধ করব, তাঁদের অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞার নিরিখে জীবনানন্দের সাহিত্যসৃষ্টির বিভিন্ন দিক নিয়ে তঁরা যেন মূল্যায়ন করেন।

প্রথম এলেন শ্রীঅম্বুবাচী রুদ্র। অন্তত নামটা সেইরকমই কানে ঠেকল মুক্তোর। দশাসই চেহারা, লোডশেডিং-এর চেয়েও কালো, পরনে ধবধবে সাদা পাঞ্জাবি।

—আমার মূল প্রতিপাদ্য জীবনানন্দের কবিতায় আলো ও অন্ধকারের দ্যোতনা। জীবনানন্দের আলো ও অন্ধকার কিন্তু মূল অর্থে সত্যকার আলো ও অন্ধকার নয়। তাঁরই ভাষায় বলতে হয়—

'এখন এ পৃথিবীতে ভাল আলো নেই।
ভাষার বেগের বিহ্বলতার শেষ করে অন্ধকার
মাঝে মাঝে জীবনের পথে আসে।'

অর্থাৎ আলো শুধু আলো নয়। ভাল আলো, মন্দ আলো, কখনও কখনও অন্যায় আলো। কোনও আলো সূর্যের মতো। কোনও আলো বা বেনামদারের মতো হঠাৎ মাথা তুলে নিজেকেই আসল সূর্য বলে প্রচার করে। শুধু আলো নয়, অন্ধকারও আছে! আজকের এই পৃথিবীর নির্মোহ আলোয় যে অন্ধকার আসুক তার অন্য নাম প্রশান্ত শুশ্রূষা। শুধু ছায়া নয়, প্রচ্ছায়া ও উপচ্ছায়া, আমব্রা ও পেনামব্রা। আলো ও অন্ধকারের মধ্যেও কিছু। তাঁরই ভাষা ধার নিলে—

'তবুও মহাজিজ্ঞাসা ও অপার আশার কালো
অকূল সীমা আলোর মতো,—হয়তো সত্য আলো।'

আরও কীসব বলেই যাচ্ছিলেন অম্বুবাচী। মুক্তো ডায়েরি পেন বের করে নোট নিয়ে নিল। আশ্চর্য! আমব্রা ও পেনামব্রা? সূর্যগ্রহণ-চন্দ্রগ্রহণ? ওটাই তো এবার ফিজিক্যাল সায়েন্সে এসেছিল। অম্বুবাচী থেমেছেন। পায়রার ডানা ঝাপটানির মতো হাততালি। পাশ থেকে কে ফিসফিস করে বলল, কী অগাধ জ্ঞান। জীবনানন্দ সম্বন্ধে এখন উনিই এক নম্বর। অন্যজন বলল, হ্যাঁ, ওঁর বিশ্লেষণ বুঝতে গেলে আর একজন অম্বুবাচী প্রয়োজন। আশ্চর্য চিন্তার কারুকার্য।

পরের বক্তা উঠেছেন ততক্ষণে। ইনি মহিলা। নামটা খেয়াল করেনি মুক্তো। তবে বিষয়টা মাইকে বলা হয়েছিল, জীবনানন্দের ভৌগোলিক পরিধি।

ভদ্রমহিলা ছোটখাটো, আঁচল পেঁচিয়ে পরা। হাঁ করলে বোঝা গেল, মুক্তো আন্ডারএস্টিমেট করেছিল। মাইকের দরকার ছিল না। রবীন্দ্রসদন এবং নন্দনের শ্রোতারাও প্রতিটি শব্দ শুনতে পাচ্ছেন।

—জীবনানন্দ। জীবনানন্দ সম্বন্ধে আমরা কতটুকু জানি? যৌবনে জীবনানন্দ পাঠ করে মুগ্ধ হয়েছিলাম। পরে কলেজে ভূগোল পড়াতে গিয়ে জীবনানন্দ চাপা পড়ে গিয়েছিলেন। প্রায় পঁচিশ বছর পরে একটি পত্রিকায় জীবনানন্দের কবিতা পড়তে গিয়ে চমকে উঠি,—

'সেখানে বারুণী থাকে গঙ্গাসাগরের বুকে, সেখানে বরুণ
কর্ণফুলী ধলেশ্বরী পদ্মা জলঙ্গীরে দেয় অবিরত জল।'

স্তম্ভিত হয়ে লক্ষ করি একটি দুটি পঙ্ক্তিতে বাংলার ভৌগোলিক পটভূমি কী অনায়াস নৈপুণ্যে বিধৃত করেছেন কবি। সেই থেকে শুরু হয় আমার পরিক্রমা। আপনারা অনেকেই জানেন, সেই পরিক্রমার ফলশ্রুতি বিগত এগারো বছরে ছয়খণ্ডে আমার গবেষণা—জীবনানন্দের কবিতায় ভৌগোলিক পরিধি।

জীবনানন্দ ছিলেন বাঙালি। পোশাকে ও স্বভাবে আদ্যন্ত বাঙালি। কিন্তু তাঁর রচনায় ভৌগোলিক চেতনা কেবল নদীমাতৃক এই বাংলাদেশের গণ্ডিতে আবদ্ধ ছিল না। একটি উদাহরণ—

'জানি পাখি, সাদা পাখি, মালাবার ফেনার সন্তান।'

—প্রমাণ করে মালাবার উপকূল জীবনানন্দের অচেনা ছিল না। আরও এগিয়ে যাই, 'রাত্রি' কবিতায় জীবনানন্দ বলেছেন, নগরীর মহৎরাত্রিকে তাঁর মনে হয় লিবিয়ার জঙ্গলের মতো। অর্থাৎ মালাবার থেকে লিবিয়া জীবনানন্দের অচেনা কিছুই ছিল না। আরও গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে পাই, 'চাঁদিনী' কবিতায় জীবনানন্দ লিখছেন—

'অলিভকুঞ্জে হা-হা করে হাওয়া কেঁদেছে কাতর যামিনী ভরি
ঘাসের শাটিনে আলোর ঝালরে মার্টিন পাতা পড়েছে ঝরি।
উইলোর বন উঠেছে ফুঁপায়ে,—ইউ তরুশাখা গিয়েছে ভেঙে...।'

লক্ষ করুন, অলিভকুঞ্জ, মার্টিন পাতা, উইলোর বন, ইউ তরুশাখা—এরা কেউই বাংলার অনুষঙ্গ নয়, অর্থাৎ জীবনানন্দের ভৌগোলিক চেতনা বিস্তৃত ছিল দেশ থেকে দেশান্তরে, জীবনানন্দ ছিলেন যথার্থ এক বিশ্বমানব।

মুক্তোর মনে পড়ে গেল, মালাবার উপকূল আর কোঙ্কন উপকূল এবারে টেস্ট পরীক্ষাতেই এসেছিল, ম্যাপ পয়েন্টিং। ভাগ্যিস সায়ক পাশে বসেছিল। না হলে ও দুটোর চার নম্বর মুক্তোর ভূগোলের খাতায় মাইনাস হয়ে যেত। তাড়াতাড়ি ডায়েরি-পেন বের করে নোট নিল মুক্তো।

মাত্র চল্লিশ মিনিটে তাঁর এগারো বছরের গবেষণালব্ধ উপলব্ধি সমবেত শ্রোতাদের জানিয়ে বক্তা মঞ্চ থেকে নামলে এবারে এলেন শব্দভাষ দত্ত।

গলাটি মিহি, আগের বক্তার সমস্ত উত্তেজনা প্রশমিত করার জন্যই অত্যন্ত বিনীতভাবে শুরু করলেন, শ্রীমতী চক্রবর্তীকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি আমার বক্তব্য নিবেদন করতে চাই। জীবনানন্দ শুধু বাংলার ভৌগোলিক সীমানা পার হয়ে বিশ্ব পরিক্রমণ করেছিলেন তাই নয়। বর্তমানের গণ্ডি অতিক্রম করেও ব্যাপ্ত ছিলেন সুদূর অতীতে। তাই জীবনানন্দ ইতিহাসের এক অমর পথিক। স্মরণ করুন তাঁর সেই

অবিস্মরণীয় পঙ্‌ক্তিগুলি—

'ফেনায়ে তুলিছে শুধু পিরামিড যুগ থেকে আবেগ বারোমাস।

....

ঝরে শুধু—স্বপ্ন কি দেখেনি বুদ্ধ—নিউসিডিয়ায় বসে
দেখেনি মণিকা,
স্বপ্ন কি দেখিনি রোম, এসিরিয়া, উজ্জয়িনী, গৌড়-বাংলা, দিল্লি, বেবিলন।'

কিংবা একটু আগেই যে কবিতা থেকে পড়লেন শ্রীমতী চক্রবর্তী, সেই 'চাঁদিনী' কবিতায়—

'তরুণীর দুধ ধবধবে বুকে সাপিনীর দাঁত উঠেছে রেঙে।
কোন গ্রীস, কোন কার্থেজ, রোম, ক্রবেদুর যুগ কোন্।
চাঁদের আলোয় স্মৃতির কবর শফরে বেড়ায় মন।'

আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না, এখানে তরুণী আর কেউ নন, মিশরের রানি ক্লিওপেট্রা। অর্থাৎ ইতিহাসের পাতায় পাতায় অতীতের প্রতিটি অধ্যায়ে কবি জীবনানন্দের অনায়াস যাতায়াত, তাই আজ আমার আলোচ্য বিষয়, ঐতিহাসিক জীবনানন্দ।

এবারে আর ডায়ারিটা পকেটে ঢোকায়নি মুক্তো। খসখস করে নোট নিয়ে চলল মাথা নিচু করে।

পরের বক্তা মৃত্তিকা চাকলাদার। মুক্তো ভেবেছিল, আবার মহিলা-টহিলা কেউ হবেন। কিন্তু ইনি পুরুষ, এবং গোঁফদাড়ি ইত্যাদিতে যথেষ্টভাবে তাঁর পৌরুষ প্রতিষ্ঠিত। কাঁধের কাপড়ের ব্যাগটাই খালি মুক্তোর কেমন বেমানান মনে হল।

—আমার বক্তব্য শুরু করার আগে আমি জীবনানন্দের রূপসী বাংলা কাব্যগ্রন্থ থেকে একটুখানি উদ্ধৃত করছি—

'যখন চড়াই পাখি কাঁঠালীচাঁপার নীড়ে ঠোঁট আছে গুঁজে

....

যখন পুকুরে হাঁস সোঁদা জলে শিশিরের গন্ধ শুধু পায়
শামুক গুগলীগুলো পড়ে আছে শ্যাওলার মলিন সবুজে।'

খেয়াল করলে দেখবেন, তিনটি পঙ্‌ক্তিতে চড়াইপাখি, হাঁস, শামুক ও গুগলী। এইভাবে জীবনানন্দের কবিতা অন্বেষণ করলে আমরা পেয়ে যাব লক্ষ্মীপেঁচা, শালিক, দোয়েল, বক, মাছরাঙা, সুদর্শন, শঙ্খচিল, মাছরাঙা, মুনিয়া, শুক, দাঁড়কাক, শ্যামা, খঞ্জনা, বউকথা কও, চকোরী ইত্যাদি বিভিন্ন পাখির নাম। পাব বাদুড়, বেজি ও ইঁদুরের উল্লেখ। এ যেন প্রাণীবিজ্ঞানের কোনও পুস্তকের একটি পর একটি পাতা উলটে যাওয়া। শুধু পশুপাখি নয়, ম্যালাপোকা, গুবরেপোকা, শ্যামাপোকা, মৌমাছি, জোনাকি, ভোমরা—অজস্র পতঙ্গের উল্লেখও ছড়িয়ে রয়েছে জীবনানন্দের পাতায় পাতায়।

এতখানিই তন্ময় হয়ে শুনছিল মুক্তো যে নোট নিতেও ভুলে গিয়েছিল। তাই পরের বক্তার নামটা খেয়াল করেনি। তিনি এসে প্রথমেই মৃত্তিকা বাবুকে ধন্যবাদ দিলেন।

—প্রাণীবিজ্ঞানের দিকে তাকিয়ে থাকলে আমরা অনেক সময়েই উদ্ভিদজগৎকে নজর করি না। এরা মূক, এরা কথা বলে না। কিন্তু আচার্য জগদীশচন্দ্র প্রমাণ করেছেন, গাছেরও প্রাণ আছে। সেই প্রাণের স্পর্শ ছড়িয়ে রয়েছে জীবনানন্দের কবিতার অজস্র

পঙ্‌ক্তিতে, কয়েকটি উদাহরণ—

'এমনই হিজল-বট-তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ দেখেছিল

....

সোনালি ধানের পাশে অসংখ্য অশ্বত্থ বট দেখেছিল হায়...'

কিংবা

'নীল তেঁতুলের বনে তেমনি করুণা এক বুকে আছে লেগে,
কদমের ডালে আমি শুনেছি যে লক্ষ্মীপেঁচা গেয়ে গেছে গান'

অথবা

'জামের গভীর পাতা-মাখা শান্ত নীল জলে খেলিছে গোপনে,
আনারস-ঝোপে ওই মাছরাঙা তার মাছরাঙাটির মনে...'

অনুসন্ধান করলে দেখা যায় রূপসী বাংলায় চালতা, কাঁঠাল, হিজল, কলমী, ঘাস, ডুমুর, জাম, বট, অশ্বত্থ, ভাঁটফুল, পদ্ম, আকন্দ, বাসকলতা, ধান, বেত, ধুন্দুল, নাটাকল, চাঁপা, কামরাঙা, কুল, বঁইচি, আনারস, শটি, বাঁশ, লিচু, কদম, নোনাগাছ, আখ, গাব, কাশবন ইত্যাদি বাহান্ন রকম উদ্ভিদের উল্লেখ আছে। এই সমস্ত উদ্ভিদের পত্রবিন্যাস, শাখা বিন্যাস এবং ট্যাক্সোনমি গত সাত বছরের প্রচেষ্টায় আমি বিন্যস্ত করেছি। আমার বক্তব্য আমি দীর্ঘ করব না। এটুকু বললেই যথেষ্ট, জীবনানন্দের মাপের উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী বাংলাদেশে এ অবধি কেউ জন্মাননি।

দীর্ঘ হাততালির পর এলেন শেষ বক্তা প্রেমময় দাশগুপ্ত। হাতজোড় করে বললেন, জীবনানন্দের কবিতার নানাবিধ-অঘোষিত এবং অনাবিষ্কৃত অলিন্দ পূর্ববর্তী বক্তাগণ তাঁদের নিজ নিজ সিদ্ধি ও ঋদ্ধির আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত করে গেছেন। আমার বারো বছরের নাতি হঠাৎ জীবনানন্দের একটি কবিতা পড়তে গিয়ে বিশেষ একটি ক্ষেত্রের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। আমিও দেখতে গিয়ে চমকিত হই। দুটি কবিতার দুটি করে লাইন আমি পড়ছি—

'সমস্ত পৃথিবী যেন মিশে যায় রৌদ্রের সাগরে,
সিন্ধুচিল আর তার বণিতা যেখানে খেলা করে,'

'ধবল রোমের নিচে তাহার হলুদ ঠ্যাং ঘাসে অন্ধকারে।
নেমে চলে একবার-দুইবার-তারপর হঠাৎ তাহারে'

প্রতিটি লাইনের শব্দসংখ্যা গুনে দেখুন, বাইশ। দুই গুণ এগারো, এগারো একটি মৌলিক সংখ্যা। এইভাবে হিসেব করতে গিয়ে দেখতে পাই জীবনানন্দ প্রতিটি পঙ্‌ক্তিতে একটি মৌলিক শব্দসংখ্যা অথবা তার গুণিতক ব্যবহার করেছেন। এই আশ্চর্য উপলব্ধি নিয়েই আমার গবেষণা 'সংখ্যাতত্ত্ব ও জীবনানন্দ' আমি ডিলিটের জন্য জমা দিয়েছি। তার কিছু কিছু আজ আপনাদের শোনাই।

অনেকক্ষণ পর মুক্তোর মনে পড়ল। তাড়াতাড়ি হাতে-ধরা ডায়ারিতে অনেকখানি লিখে চোখ তুলে দেখল, মঞ্চ খালি। এবারে কবি সম্মেলন।

—যা ভেবেছি তাই, শালারা আমাকে সবার শেষে ঠেলেছে।

বাবাকে আজ সাদা পাজামা-পাঞ্জাবিতে চমৎকার দেখাচ্ছিল। কখন এসে পাশে

বসেছে খেয়াল করেনি মুক্তো। 'শালা'টা সাদা পোশাকে ঠিকরে ফিরে এল। অন্যদিকে মুখ ফেরাল মুক্তো।

এবারে একজন মঞ্চে এসে প্রথমে কবিদের নাম ঘোষণা করলেন। মুক্তো দেখল বাবার নামটা পড়া হল সবার পরে। বারবার মনে করিয়ে দেওয়া হল, কোনও কবিই একটির বেশি কবিতা পড়বেন না।

প্রথম যিনি এলেন, দাড়ি-গোঁফ-জটা-ঝোলা, অত্যন্ত বিনীতভাবে জনালেন, জমদগ্নি পত্রিকার পুজো সংখ্যায় বের হওয়া কবিতাটি তিনি পড়ে শোনাবেন। কবিতা শুরু হল। ছোটবেলায় বাবা-মার চাপে কয়েকটা কবিতা মুখস্থ করেছিল মুক্তো।

এখনও বাংলা টেক্সট বইয়ে কয়েকটা কবিতা আছে যেগুলোর সারাংশ ব্যাখ্যা ইত্যাদি তৈরি করতে হয়। কিছু কিছু শব্দ শক্ত। মানে বুঝিয়ে দিলে তবু কবিতাটি শেষ অবধি বোঝা যায়। কিন্তু এইরকম প্রথম থেকে প্রতিটি পরিচিত শব্দ সাজিয়েও যে অর্থহীন বাক্য একটার পর একটা রচনা করা যায় মুক্তো কোনওদিন কল্পনাও করতে পারত না। বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করে শুনতে শুনতে কিছুক্ষণ পর দেখল আর কিছুই মনে রাখতে পারছে না। এপাশ ওপাশ চোখ ঘুরিয়ে দেখল বসে থাকা অন্য মানুষজনও কেউ শুনছে না। কেউ পাশে বসা বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে গল্প করছে, কেউ হাতে ধরা কাগজের দিকে মন দিয়ে তাকিয়ে আছে, কেউ স্রেফ ঘুমোচ্ছে।

একটাই কবিতা। শেষ হল আধঘণ্টা পর। প্রবল হাততালির মধ্যে নেমে এলেন কবি। যারা ঘুমিয়েছিল তারাও ধড়ফড় করে উঠে তালিতে হাত মেলাল। নামার সময়েই মঞ্চে বসে থাকা ভদ্রলোকের কানে কানে কবি কী যেন বললেন। ভদ্রলোক ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিলেন। কবি কবিতার কাগজখানা কাঁধের ঝোলায় ঢুকিয়ে গুটিগুটি দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁর সঙ্গে আসা একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা—তাঁরাও বেরিয়ে গেলেন।

একটি কবিতায় আধঘণ্টা। ব্যাপারটা সভা-সঞ্চালকের দৃষ্টি এড়ায়নি। তিনি এবার স্মরণ করিয়ে দিলেন অনেক কবি অপেক্ষমাণ। রাতও কম হয়নি। অতএব সময়সীমা পাঁচমিনিট। পরের কবি প্রথম কবিতাটা তিন মিনিটে শেষ করে বিনীতভাবে জানালেন আরও দু-মিনিট সময় হাতে আছে। অতএব তিনি আর একটি ছোট কবিতা পড়বেন। বারো মিনিটে সেই ছোট কবিতাটি নামালেন তিনি। আগের দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি। দর্শকদের আড্ডা অথবা ঘুম, পাঠ শেষে হাততালি, সঞ্চালকের অনুমতি গ্রহণ এবং সপারিষদ নিষ্ক্রমণ।

জনাদশেক কবি এবং ঘণ্টা দেড়েক সময় পার হলে দেখা গেল হল প্রায় খালি এবং যে ক'জন অবশিষ্ট আছেন তাঁদের সম্মিলিত নাকের আওয়াজে মাইকাশ্রিত কবিকণ্ঠ চাপা পড়ে যায় যায়।

বাবা এবার কাছে ঘেঁষে এল মুক্তোর।

—দেখেছিস। কোনও শালা নিজের কবিতা পড়ে পরের জন্যে অপেক্ষা করছে না। আমার লাস্ট। ঠিক হ্যায়। সঞ্চালক আর তুই, দুজন পাঠক তো আমার বাঁধা।

ভুল হয়েছিল। বাবার আগের কবির নাম ডেকেই সঞ্চালক বললেন, তাঁর কী দরকারি কাজ আছে, আর দেরি করা সম্ভব নয়। কবিকে মঞ্চে তুলে দিয়ে তিনি দ্রুত কোঁচা দুলিয়ে প্রস্থান করলেন।

মুক্তো বাবার কবিতা শুনল। সত্যি বলতে কী আর কেউই অন্যের কবিতা শোনেনি। সেদিক থেকে সুনন্দ ভাগ্যবান। একজন অন্তত জেনুইন শ্রোতা। আর মুক্তোরও মনে হল বাবার কবিতার কথাগুলোই সবচেয়ে সোজা। বুঝতে কোনও অসুবিধা হয় না। হয়তো সেইজন্যই কবি হিসাবে বাবা তেমন রেপুটেড নয়।

মা কি দরজার আড়ালে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়েছিল? নইলে কড়া নাড়তেই অত তাড়াতাড়ি খুলে দিল কী করে?

দরজা খুলেই মা তাড়াতাড়ি মুক্তোকে টেনে নিয়ে বসাল তক্তপোশে—শিগগিরি বল, কী জীবনানন্দ শিখলি?

—আশ্চর্য! খিদে পেয়েছে, খেতে টেতে দেবে না-কি?

—দেব। আগে বল কী শিখলি?

পকেট থেকে ডায়ারি বের করল মুক্তো। চোখ বোলাল। তারপর গম্ভীর হয়ে বলল, জীবনানন্দ একজন কবি ছিলেন। জন্ম ৬ ফাল্গুন, ১৩০৫, মৃত্যু ৬ কার্তিক, ১৩৬১। কবি ছাড়াও জীবনানন্দ লেখাপড়ায় ভাল ছিলেন। হিস্ট্রি, জিয়োগ্রাফি, ফিজিক্যাল সায়েন্স, লাইফ সায়েন্স, ম্যাথস্, প্রত্যেকটা সাবজেক্ট-এ জীবনানন্দের হেভি ফান্ডা। মাধ্যমিকে বসলে সিওর লেটার। তবে... ডায়ারিতে ভাল করে কী যেন খুঁজল মুক্তো,—তবে যেটুকু বোঝা গেল, ইংলিশে জীবনানন্দ ছিলেন খুবই কাঁচা। ভাল টিউটর না পেলে ইংলিশটায় মনে হয় পাশ করতে পারতেন না।

সমান্তরাল

ট্রেন আসছে।

মাকড়সার জালের মতো একখাবলা কুয়াশা সিগনালের মাথায় জমে আছে, লাল-সবুজ বোঝার উপায় নেই। এত সকালে ঘুম ভাঙেনি সেই ঘোষকের, যিনি ট্রেন আসার খবর আগাম জানিয়ে দেন। কুয়াশা ভেদ করে দৃষ্টি পৌঁছয় না, উত্তরে কোথাও ট্রেনের আভাসটুকুও দেখা যাচ্ছে না। তবু প্ল্যাটফর্মের দিকে একঝলক চোখ ফেললেই বোঝা যায় ছটা আটান্ন ঢুকছে।

একটু আগেও দলা দলা মানুষের ফাঁক দিয়ে টাকের মতো প্ল্যাটফর্মের পিঠ দেখা যাচ্ছিল। এখন পুরোটাই ভর্তি। শীতের সকাল, এখনও রোদ ফোটেনি, তবুও কত মানুষ! এত মানুষ? সবাই যায়? কোথায় যায়?

ছটা সাতান্নয় এসে কোনও রকমে সাইকেলটা পুচনের জিম্মায় ঠেকিয়ে রেখে ছুটতে ছুটতে ঢুকন্ত ট্রেনে শরীরটা গলিয়ে দেয় যেসব দিন, এত কিছু ভাবনার সময় পায় না দিব্য। আজ ঝাড়া ছ'মিনিট আগে পৌঁছে গেছে। তাই দেখবার ও ভাববার অঢেল সময়।

এইসময় অফিসযাত্রী কম। মর্নিংশিফটে কলেজে পড়তে যায় ছেলেমেয়ে, আর বেশির ভাগই ব্যাপারি। ঝাঁকার পর ঝাঁকা ধুপধাপ পড়ছে প্ল্যাটফর্মে। মাথায় গামছা জড়াতে জড়াতে মাল বুঝে নিচ্ছে মানুষ। ভেন্ডার কামরায় উঠবে তো সামান্য ভগ্নাংশ। বেশিটাই প্যাসেঞ্জার কম্পার্টমেন্টে ঠাসা হবে। তবে তাড়া নেই। সব মাল বোঝাই হলে গামছা নাড়িয়ে সঙ্কেত দিলে তবেই ট্রেন ছাড়বে। গার্ড-এর সঙ্গে বন্দোবস্ত আছে, ট্রেন আওয়াজ দেবে, একবারের জায়গায় তিনবার। কিন্তু ছাড়বে যখন ছাড়বার তখনই, এক মিনিটও আগে নয়।

দাশুর উনুনে এতক্ষণে গনগনে আঁচ, কেটলিতে জল ফুটছে তার শোঁ-শোঁ আওয়াজেই মাছির মতো লোকজন সেঁটে যাচ্ছে। গরম-গরম এগিয়ে দিচ্ছে দাশু—ভাঁড়, কাপও কয়েকজন। বাসনা আর নিমকি বিস্কুটের বয়ামও খালি হল বলে।

ছন্দা অবশ্য ভিড় দেখছিল না। পুরনো দৃশ্য, দেখার আছেটাই বা কী?

বরং ভাবছিল। ভাবনাটা ভাল নয়। চিন্তার ব্যাপার। কেন যে কাল ফেরার সময় খেয়াল করেনি। মান্থলিটা কালই শেষ হয়ে গেছে। একদিনের এদিক ওদিক পেরিয়ে গেলে সাধারণত কিছু বলে না। মোবাইল থাকলেই মুশকিল। আজকাল আবার লাল-নীল গাড়ি বোঝাই হয়ে চেকিং-এ আসে। মেয়ে চেকার থাকে। ওরাই মেয়েদের বেইজ্জত করে বেশি। আড়চোখে ঘড়ি দেখল ছন্দা। হবে না। টিকিট কাউন্টার আপ প্ল্যাটফর্মে। গিয়ে কেটে ফিরে আসতে আসতে ট্রেন চলে যাবে।

এইসময় মা কালীকে ডাকে ছন্দা। রোজ সময় পায় না। রোজ বিপদ আসেও না। গাড্ডায় পড়লে মা কালীকে ডাকে। আজকেও খুব জোরে জোরে মা কালীকে মনে করার চেষ্টা করল। মুশকিল হল, খাঁড়াটা দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু জিভটা কিছুতেই আসছে না।

জিভেই ঠাকুরের শক্তি। হতাশ হয়ে পড়ল ছন্দা।

ট্রেন আসছে।

বেঞ্চে বসেছিল যারা উঠে গা মোড়ামুড়ি দিয়ে নিল। ভাঁড় থেকে তলানিটুকু গলায় ঢেলে চায়ের দাম মিটিয়ে দিল ক'জন। দাশু হেঁকে উঠল, ও হারু, বিস্কুটের দামটা বাকি পড়ে রইল যে! হারু জিভ কেটে তাড়াতাড়ি বুক পকেট থেকে দু'টাকার একটা তেলচিটে নোট বের করল। ধরাধরি করে ব্যাপারিরা ঝাঁকা মাথায় তুলতে লাগল, কেউ কেউ এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল ভেন্ডার কামরার সামনে।

কুয়াশার জন্যেই বোধহয় হেডলাইট জ্বালিয়ে দিয়েছে। নইলে ট্রেনের মুখটা ঠাহর হয় না এখনও। দুতিনজন উৎসাহী রেললাইনের ওধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, উঠতে সুবিধা হবে। দিব্য একটু পায়চারি করে হাঁটুদুটো ছাড়িয়ে নিল, ওঠার সময় ধাক্কাধাক্কি হবে।

ছন্দা এগিয়ে যাচ্ছিল লেডিজের দিকে। এখন মোটামুটি সামনে থেকে দু'নম্বরটা ফিক্স করে দিয়েছে। লেডিজেও যা ভিড়। আগে মেয়েদের আলাদা কামরা ছিল না, দুয়েকজন দয়া দেখাত। এখন তেড়ে মারতে আসে, এখানে কেন? যান না, আপনাদের তো আলাদা ব্যবস্থা রয়েছে।

ভদ্রলোক বোধহয় এদিকে নতুন, দিব্য আড়চোখে দেখল। পরিষ্কার পাজামা-পাঞ্জাবি-শাল, ব্যাকব্রাশ কাঁচাপাকা চুল, পুরু ফ্রেমের চশমা অধ্যাপক অধ্যাপক চেহারা। কোথাও কি বেড়াতে এসেছিলেন? চেহারাটা সৌম্য, কিন্তু ভাবেভঙ্গিতে কেমন একটা অস্থিরতা। স্থির হয়ে দাঁড়াচ্ছেন না। বেঞ্চে বসেছিলেন, উঠলেন, একটু হাঁটলেন। কী মনে করে আবার গিয়ে বসলেন। হাতের ফোলিও ব্যাগটা ডান হাত বাঁ হাত করছেন। রুমাল বের করে ঘাড়গলা মুছলেন। তাকাচ্ছেন আশপাশে। যেন খুঁজছেন কারোকে। যেন হারিয়ে গেছে কিছু।

ছন্দা বিরক্তই হল। এতখানি বয়েস হয়েছে, এখনও আক্কেল হল না? ভিড়ভাট্টার মধ্যে ওরকম হুটোপাটি করলে চলে? কোন দিকে দাঁড়াবে, কোথায় যাবে যেন ঠিকঠিকানা নেই। এগুচ্ছে পিছোচ্ছে এপাশে ওপাশে ফিরছে। আনপড় লোক। লোকালট্রেনে যাওয়া-আসা অভ্যেস নেই, বোঝা যায়।

শোঁ-শোঁ আওয়াজ হচ্ছে রেললাইনে। লেভেলক্রশিংয়ের কাছে এসে হর্ন দিল ট্রেনটা, টানা। প্ল্যাটফর্মের রেলিংগুলো কাঁপছে এখন। ঢুকে পড়েছে প্ল্যাটফর্মে। সকলের দৃষ্টি ট্রেনের ওপর। ট্রেনের দরজাগুলো একটার পর একটা চলে যেতে লাগল সামনে দিয়ে। সবার লক্ষ্য ফাঁকা কোণটায় কীভাবে একটু গলে যাওয়া যাবে। হুড়োহুড়ি ঠেলাঠেলি।

যেতে যেতেও দিব্যর চোখ পড়ে গেল পাশের মানুষটার ওপর। দাঁড়িয়ে ছিলেন, হঠাৎ টাল খেতে থাকলেন। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই হুড়মুড় করে পড়ে গেলেন প্ল্যাটফর্মের সিমেন্টের ওপর। ছুটে এল দু'তিনজন। আকাশের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট নড়ে উঠল মানুষটার। অনেকেই মাথা ঝুঁকিয়ে শোনার চেষ্টা করল। ভদ্রলোক বলে উঠলেন, আমি নীলিমার কাছে যাব। তারপরই চোখ থেকে দৃষ্টি উধাও হয়ে গেল। ঘোলাটে দু'চোখ বুঁজে এল।

হর্ন দিয়ে উঠল ট্রেন। এক মুহূর্ত দ্বিধা করল দিব্য। তারপর ছুটে গিয়ে উঠে পড়ল ট্রেনে।

চলন্ত ট্রেন থেকে মাথা ঘুরিয়ে ছন্দাও দেখল, মানুষটা তখনও প্ল্যাটফর্মে চিত হয়ে

শুয়ে। দুয়েকজন মানুষ গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়ে। দৃশ্যটা ফেলে রেখে প্ল্যাটফর্মের চৌহদ্দি পার হয়ে ট্রেনটা ঝাঁপিয়ে পড়ল ধানক্ষেতের মাঝখানে।

প্রথমেই দিনের কাজের অর্ধেকটা এগিয়ে রাখল দিব্য।

বড়ঘরে ঘড়ির নীচে রাখা রেজিস্টার খুলে নিজের নামের পাশে ধাঁ করে একটা সই মেরে দিল। টেবিলে এসে দেখল দীপক ততক্ষণে কয়েকটা ফাইল সাজিয়ে ফেলেছে। গুনে দেখে মিলিয়ে ফাইল কখানায় তার নামের পাশে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে একটা ইনিশিয়াল। ব্যস। কাজ খতম। বাকিটা সেই বিকেল পাঁচটায়।

টেবিলের ওপর জলের গ্লাসটা পড়েছিল। অর্ধেক ভর্তি। কাল বিকেলে জলটুকু বেসিনে ঢেলে গ্লাসটা ড্রয়ারে ঢোকাতে ভুলে গেছে। জলের ওপর ময়লা পড়েছে। একটা পোকা মরে ভাসছে। ক্যান্টিনের শৈলকে ডেকে বলতে হবে সাবান দিয়ে ধুয়ে দিতে।

গ্লাসের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ছোটবেলার কথা মনে পড়ে গেল দিব্যর। প্রফেসর সরকার। ম্যাজিশিয়ানরা সবাই প্রফেসর হয় কেন? কত কেনরই তো জবাব এখনও না পাওয়া রয়ে গেল। প্রফেসর সরকারকে দেখে প্রথমে দমে গিয়েছিল দিব্যরা।—তাপ্পি লাগানো কালো কোট বেল্টের বদলে দড়ি দিয়ে বাঁধা ফুলপ্যান্ট, টিকটিকির ল্যাজের মতো একখানা টাই, আর সবচেয়ে আশ্চর্য ইঁদুরের মতো গলার স্বর। কিন্তু স্টেজে উঠতেই মানুষটা কেমন বদলে গেল!

অনেক খেলা দেখিয়েছিল প্রফেসর। গ্লাসের খেলাটাই মনে আছে। আঙুল দিয়ে দিব্যকে ডেকে নিয়েছিল। আর চাঁদুকে। টেবিলে একটা গ্লাস রাখা ছিল। ওয়াটার অব ইন্ডিয়ার সেই আশ্চর্য জাগ থেকে জল ঢেলে অর্ধেক ভর্তি করেছিল। তারপর দিব্যকে ডেকে বলেছিল, কী দেখছ?

দিব্য বলেছিল, গ্লাস।

—ব্যস? গ্লাসে কিছু নেই?

জল।

—কতখানি জল?

—অর্ধেক।

—তুমি কী দেখছ? চাঁদুর দিকে তাকিয়েছিল ম্যাজিশিয়ান।

চাঁদু উঠেছিল পরে, দিব্যর কথাগুলো শোনেনি। বলেছিল, গেলাসের অর্ধেকটা খালি।

কান এঁটো করে হেসেছিল প্রফেসর,—ঠিক বলেছ, তোমরা দুজনেই ঠিক। গ্লাসের নীচটা দেখলে ভর্তি, আর ওপরটা খালি।...তা কী যেন নাম তোমাদের?

দুজনে নাম বলেছিল।

গ্লাসটা কালো কাপড়ে ঢেকে দিয়েছিল সরকার। জাদুকাঠিটা ছুঁইয়ে দুবার বলেছিল হোকাস পোকাস গিলিগিলি। কাপড় সরিয়ে নিতেই অবাক কাণ্ড!

গেলাস খালি। চাঁদুর দিকে তাকিয়ে প্রফেসর বলেছিল তোমার জিত।

তারপর দিব্য মুখ শুকনো করে দাঁড়িয়ে আছে দেখে বলে উঠেছিল, না না, তোমারও জিত। দাঁড়াও ব্যবস্থা করছি। বলেই আবার খালি গ্লাস কালো কাপড়ে ঢেকে মন্ত্র পড়ে গ্লাস জল বোঝাই করে দিয়েছিল।

এখন বুঝতে পারে দিব্য। ওয়াগন ভাঙতে গিয়ে শহিদ হয়েছিল খ্যাঁদা, চাঁদুকেও বড়

ছেলে হবার সুবাদে ছোটবেলাতেই কাজে নামতে হয়েছিল। টিফিনপিরিয়ডে আরতি সিনেমার লাইনে টিকিট কিনে ব্ল্যাকে বিক্রি করে তবে ক্লাশে ঢুকতে পেত;—গ্লাসের খালিটুকুই দেখতে পেত চাঁদু।

বিশ বছর আগে জল দেখতে পেয়েছিল। এখন আর পায় না দিব্য।

কাজেরও তেমনই কি? যে যেমন দ্যাখে। সকাল-বিকেলের সই করাটুকু কাজ ভাবলেই কাজ। বেশিরভাগই ওটা কাজ মনেই করে না। কাজ এইবার শুরু হবে।

রাজেন যেমন। পড়িমরি করে সইটা সেরে এসেই চেয়ারে হেলান দিয়ে বসবে। জল খেয়ে ঘাম মুছে টেবিল পরিষ্কার করে টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়বে। তিন মাস চোদ্দো দিন আগে ওর বিয়েতে বরযাত্রী গিয়েছিল সকলে। রাতের ক্লান্তি ওঠাতে এটুকু বিশ্রাম লোকে মেনে নিতেই পারে। ঘুম ভেঙে আড়মোড়া ভেঙে ঝোলা থেকে সিনেমার পত্রিকা বের করে মন দিয়ে পড়তে থাকে রাজেন। মাঝে মাঝে উল্লেখযোগ্য অংশ পড়েও শোনায়। একটা বেজে গেলেই ভীষণ খিদে পায় রাজেনের। টিফিন কৌটো বের করে রুটি-তরকারি হালুয়া এক একদিন এক একরকম সাজিয়ে ফেলে বাটিতে। দিব্যকে ভাগ দেয়। অন্য কেউ হাত বাড়ালে তাকেও ফেরায় না। খেয়ে দেয়ে হাত ধুয়ে ঘুমের সেকেন্ড হাফটা সেরে নেয়।

সকলেই আহাম্মকের মতো সময়টা অপচয় করে না অবশ্য। উদাহরণ সনাতন। চেয়ারের গায়ে ব্যাগ ঝুলিয়ে শেয়ারমার্কেটে দালালি করতে যায়। বিষ্টুদা যায় টিউশনি পড়াতে। সন্ধ্যাদি মেয়ের খাতা নিয়ে আসে, ল্যাবরেটরির ছবি এঁকে দেয়।

দিব্যও সময়টা কাজ করেই ব্যয় করে। সরোজদার কঠোর নির্দেশ, পার্ট মুখস্থ না হলে মহলায় এসো না। নতুন নাটক নামছে, এবারে যথেষ্ট বড় রোল পেয়েছে দিব্য। ঝরঝরে মুখস্থ না করে মহলায় যাওয়া নেই। সরোজদার যা মুখ। এতটুকু ভুল হলে রে রে করে তেড়ে আসবে।

দুপাতা মুখস্থ হয়ে গেছে, তৃতীয় পাতাটা সবে ধরেছে, ছেলেটা মুণ্ডু গলাল। মুখটা তেতো হয়ে গেল দিব্যর। ক'দিনই ঘুরঘুর করছে। অন্য টেবিলগুলোয় হানা দিচ্ছিল। আজ দিব্যদের পেড়ে ফেলল। খাতা বন্ধ করে দিব্য তাকাল।

—উনি কি?

—হ্যাঁ, ঘুমিয়ে পড়েছেন। রাতে অনেক পরিশ্রম হয়েছে। এখন বিরক্ত করা ঠিক হবে না।

প্রায় বাঁচিয়ে ফেলেছিল, ঠিক তখুনি হাই তুলে চোখ খুলে তাকাল রাজেন। ছেলেটার দিকে তাকিয়ে ধড়ফড় করে উঠে বসল, কী চাই?

ছেলেটা যেন এই জন্যেই অপেক্ষা করছিল। খবরাখবর নিয়েই এসেছে বোঝা যায়। নাহলে দিব্যকে ছেড়ে কেনই বা রাজেনকে অ্যাটাক করবে?

—আমি এল আই সি থেকে আসছিলাম।

—বেশ বেশ, এখন আমরা ব্যস্ত আছি, পরে আসুন। নড়াচড়ার কোনও লক্ষণই দেখাল না ছেলেটা। মৃদু হাসল। সেই হাসিতে লেখা ছিল, হ্যাঁ, আর বলতে হবে না, দেখতে পাচ্ছি।

হাসির লেখাটাও পড়ে ফেলল রাজেন। শশব্যস্তে বলল, যা বলার আছে ঝটপট বলে ফেলুন তো ভাই!

এবারে গুছিয়ে বসল ছেলেটা। ব্যাগ থেকে কয়েকটা কাগজ বের করল। গম্ভীরভাবে রাজেনের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনার বয়েস কত?

—এই টুয়েনটি নাইন রানিং।

—বেশ বেশ, যেন পাত্রীর ইন্টারভিউ নিচ্ছে, দুচোখে তৃপ্তি এনে বলল, তা হলে তো আপনার খুবই কম প্রিমিয়াম লাগবে।

—কত? রাজেনের গলা শুনলে যে কেউ বলবে জিনিস পছন্দ হয়েই গেছে, এবারে দরদাম করছে রাজেন।

—এই ধরুন দুলাখের ইনসিওর করলে বছরে দশ-হাজারেরও কম...

—ক...ত? ক'তে অনেকক্ষণ আটকে রইল রাজেন।

—দশ হাজার, বছরে। বেশি বলছেন?

ঘাম মুছল রাজেন, ওটা ওর বদভ্যেস। সবাই যখন শীতে ঠকঠক করে কাঁপে তখনও রাজেন ঘাম মোছে। শব্দগুলো কণ্ঠার কাছে আটকে গেছে বোঝা যাচ্ছে, চেষ্টা করলেও শিগগিরি বের করতে পারবে না।

—দুলাখ বিশ বছর বাদে পাঁচ লাখ হবে।

—সে তো অন্য অনেক জায়গায় আরও বেশি বাড়ে। থাকতে না পেরে এবার বলেই ফেলল দিব্য।

—তা বাড়ে, চিবিয়ে চিবিয়ে বলল ছেলেটা, কিন্তু তার সঙ্গে সিকিউরিটি? সেটা দেবে আপনার অন্য জায়গা?

—কার সিকিউরিটি?

—আপনার আবার কার? আপনি মরে গেলে তখন? সে কথাটা ভাবতে হবে না?

—আমি মরে গেলে টাকাটা পাব? পাবার জন্যে আবার ফিরে আসব?

—আপনি আসবেন কেন? আপনার ছেলেমেয়ে বউ যারা থাকবে। তারাই পাবে টাকা।

—আমিই যদি না পেলাম তাহলে আমার সিকিউরিটি কোথা থেকে হল?

ছেলেটা দিব্যর দিকে এমনভাবে তাকাল যেন চিড়িয়াখানায় সাদা ভাল্লুক দেখছে।

দিব্য আবার বলল, আমি খেয়ে না খেয়ে টাকা রাখব, তারপর মরব, যাতে আমার বউ-বাচ্চা সেই টাকা ভোগ করতে পারে? আমি কি গাড়োল?

ঝাঁ করে ঘুরে গেল ছেলেটা। সোজা রাজেনের চোখে চোখ রাখল, আপনার যদি হঠাৎ কিছু হয়ে যায়, আপনি কি চান আপনার সদ্যবিবাহিত স্ত্রী কিংবা অনাগত সন্তান, তারা ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াক? রাস্তায় ভিক্ষে করুক?

রাজেনের চোখ মুখ দেখে মনে হল এখখুনি কেঁদে ফেলবে। মায়া হল ছেলেটার। রাজেনকে নিয়ে উঠে গেল বাইরে।

ওরা বেরিয়ে যেতেই মনে পড়ে গেল দিব্যর। তাড়াতাড়ি গিয়ে খুঁজে এল, দেখতে পেল না। দেখতে পেলে জিজ্ঞেস করত, স্টেশনে দাঁড়িয়ে ট্রেনের অপেক্ষা করতে করতে যদি হঠাৎ উল্টে পড়ে যাই, প্রাণটা বেরিয়ে যায় খাঁচা ছেড়ে, তা হলে সে মৃত্যুকে কী বলা যায়? স্বাভাবিক? অপঘাত? অ্যাক্সিডেন্ট? পলিসি করা থাকলে টাকা মেলে? কে পায় টাকা? যে নমিনি? না যার কাছে যাবে বলে বেরিয়েছিল মানুষটা? নাটকের পাতায় আর মন বসল না দিব্যর।

একসঙ্গে তিনটেই করে যাচ্ছিল কমলাদি।

বাঁ হাতে রুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে মুখে ফেলছিল। চামচে করে ছানার তরকারি তুলে ঢোকাচ্ছিল খানিক বাদে বাদে। হাঁ করে খায় কমলাদি। খেতে খেতে কথা বলে। কচ কচ করে আওয়াজ হয়। খেতে খেতে কথাও বলছিল—একটাই ছেলে শাহরুখ। ও-ই টিঁকে থাকবে। বচ্চনের পর অতখানি ভার্সেটাইল আর কাউকে দেখলাম না। কত এল কত গেল,—সঞ্জয় দাত, গোবিন্দা, অক্ষয়, সেদিনের হৃতিক রোশন। থেকে গেল সেই শাহরুখ। অশোকটা দেখে আয়। বুঝবি অ্যাকটিং কাকে বলে। খাওয়া এবং ধারাভাষ্যের পাশাপাশি খাতাও দেখছিল। বাঁহাতে রুটি কিংবা চামচ, দৃষ্টি সামনে, সেখানে রূপালি পর্দায় নেচে যাচ্ছে শাহরুখ খান। ডান হাতে লাল পেনসিল। পেনসিল সরে সরে যাচ্ছে খাতার পাতায়। দাগ পরছে টিক, ক্রশচিহ্ন। দেখার দরকার হচ্ছে না। দাগানো শেষ হলে পাতা উল্টে পরের পৃষ্ঠায় চলে যাচ্ছে কমলাদি। নম্বর পড়ে যাচ্ছে একের পর এক প্রশ্নে।

খাতা দেখছিল ছন্দাও। হাত তুলে নিল। সামনে ওইভাবে কেউ খাতা দেখলে ছন্দার ভারী অসুবিধে হয়। ক্লাশে অশোক পড়াতে হয়, কমলাদি এখন অশোকা পড়াচ্ছে। এইভাবেই এখন বাচ্চারা ইতিহাস শেখে। রামায়ণ-মহাভারতও।

হই হই করে সুদেষ্ণা এসে বসল। সবসময়ই ওর হুড়োহুড়ি। যেন এক্ষুনি না করে ফেললেই সব পালিয়ে যাবে।

সকলের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে শেষ অবধি ছন্দাকেই টার্গেট করল,—বীথির ছেলের কাণ্ড শুনেছিস?

সবাই একটা গল্প প্রত্যাশা করছিল। বীথিকে চেনে না কেউই, তার ছেলেকে তো নয়ই। সুদেষ্ণা চেনে, তা হলেই হবে। গল্পটাও সুদেষ্ণাই বলবে। বলার জন্যেই তো ওর চেয়ার টেনে বসা।

লোয়ার কেজির ইন্টারভিউ। ইন্টারভিউ অবধি পৌঁছে গেছে, বুঝতেই পারছিস, বীথিদের তো এক্সপেকটেশন আকাশ ছুঁই ছুঁই। তা ম্যাম এসে মাথায় হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করেছে, বলো তো তোমার হাতে কটা আঙুল? ছেলে কী করল জানিস?

—কী করল? ছন্দা বাদে তিনজনেরই মুখ থেকে প্রশ্নটা ছিটকে বেরুল।

বীথির ছেলে গটগট করে বাইরে বেরিয়ে সোজা রাস্তায়।

—কী আশ্চর্য! কেন?

—বীথিরাও হতবাক। প্রথমে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে কী করবে বুঝতে পারেনি। তারপর বীথি, বীথির হাজব্যান্ড দুজনেই ছুটতে ছুটতে বাইরে। ছেলেকে এই মারে কি সেই মারে। ছেলের এক রা, কিছুতেই ভেতরে যাবে না। কেন না ওই মাসিটাও নিশ্চয় কুট্টি মাসির মতো আঙুলের ফাঁকে পেনসিল ঢুকিয়ে চাপ দেবে।

—কুট্টি মাসিটা কে?

—বীথির পিসতুতো বোন। ওকে পড়াত। বলতে না পারলে আঙুলের ফাঁকে পেনসিল গুঁজে দিত। আঙুল গুনতে বলেছে, ছেলেও অমনি ধরে ফেলেছে, এও আঙুলে পেনসিল গোঁজা মাসি না হয়ে যায় না।...পারল না! ছেলে ইন্টারভিউ না দিয়েই চলে এল?

—তোর ছেলে অনেক স্মার্ট, ছন্দাই সুদেষ্ণাকে প্রবোধ দিল, রাহুলকে তো দেখেছি, দেখবি পটাপট সব বলে আসবে।

সুদেষ্ণার মুখের অন্ধকার সবে কাটতে শুরু করেছে, কমলাদি বলল, তবে যা-ই বলিস, আমার দেওরের ছোট ছেলে ইন্টারভিউতে যা বলে এসেছিল, অমনটি আর কাউকে দেখলাম না।

—কী রকম, কী রকম?

—ওকে আন্টি জিজ্ঞেস করেছেন, বলো তো শৌনক, মাছ কোথায় দেখেছ? ও কী জবাব দিয়েছিল জানিস?

—জলে?

—অ্যাকোয়ারিয়ামে?

—বাজারে?

বিজয়ীর হাসি কমলাদির,—ফেল, সব্বাই আউট। ও বলেছিল, ঝোলে। হেসে গড়িয়ে পড়ল মৌসুমি, বলল, নিল?

—নেবে না? ওই রকম ব্রিলিয়ান্ট জবাব! তুই হলে পারতিস?

সুদেষ্ণা কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, আমার ছেলে যে অত ব্রিলিয়ান্ট নয় কমলাদি।

কমলাদি জবাব না দিয়ে আবার খাতায় পেনসিলনিবেশ করল। ছন্দা গলা নামিয়ে বলল, ঘাবড়াসনি, ঠিক ও চান্স পেয়ে যাবে, দেখিস।

—বলছিস?

খাবার নিয়ে বসল সুদেষ্ণাও। খাতাগুলোও লকারে রেখে ছন্দাও টিফিন কৌটো বের করল। খুলে ভেতরটা একঝলক দেখে নিল, হালুয়া। কাল রাত্রে করা, জমে শক্ত হয়ে আছে।

খেতে গিয়ে নজর পড়ল, মৌসুমি, হাত গুটিয়ে বসে।

—কীরে, খাবি না?

—আজ ফিফথ পিরিয়ডের ক্লাশটা নেব না, বড়দিকে বলে নিয়েছি।

কোথায় চললি। চোখ পাকাল সুদেষ্ণা।

—নন্দনের ওদিকটায়...মুখ নামাল মৌসুমি, ওর গালে লাল ছড়িয়ে যাচ্ছে।

ছেলেটাকে দেখেছে ওরা। অতনু না কী যেন নাম, ব্যাঙ্কে কাজ করে। ফর্সা, লম্বা, রোগা বলেই একটু কুঁজো দেখায়। তবে চোখের দৃষ্টি শান্ত, কথাবার্তাও মার্জিত।

—এলাম বলে ব্যাগ কাঁধে ফেলে হঠাৎই উঠে গেল মৌসুমি। সুদেষ্ণা চোখ টিপে হাসল।

ওর চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে হালুয়ার টুকরোটা মুখের মধ্যে নাড়াচাড়া করছিল ছন্দা। মৌসুমি একটা মিনিবাসে উঠল, নামল রবীন্দ্রসদনের সামনে। নন্দন। অনেকেই বসে আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে, বসা-বারণ রেলিং-এ। নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল মৌসুমি, এদিক-ওদিক তাকাল। ঘড়ি দেখল দুবার। হেঁটে বাংলা অ্যাকাডেমির দিক থেকে ঘুরে এল। এক কাপ চা খেল। ফিরে এল আগের জায়গায়। দেরি হচ্ছে। বিরক্ত হচ্ছে মৌসুমি। চিন্তিত হচ্ছে। ভুরুর মাঝখানে ভাঁজ পড়ছে।

নিশ্বাস দ্রুত পড়ছে ছন্দার। গালের ভেতর গলে মিশে যাচ্ছে সুজির ডেলা।

কথা ছিল। যাবার কথা ছিল। প্রত্যাশা ছিল। পৌঁছে যাব এমনই ঠিক ছিল। সব কথাই

কি ফলে যায়? সব যাওয়া পৌঁছে যায় লক্ষ্যে?
তা হলে নীলিমা কে? নীলিমা কেন?

দরজাটা বাইরে থেকে টানতে হয়। ভেতরে লাগানো শিকলে টান পড়ে, শিকল খুলে যায়। ভেতরে ঢুকে ওইভাবেই আলগা করে শিকল তুলে দিতে হয়। পরের জনও একই ভাবে ঢুকবে শিকল লাগিয়ে রাখবে। এই নিয়মই চলে আসছে।

কত দিন? দিব্যর বারো বছর, সরোজদা চোখ আধবোজা করে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে বলবে, ছেকলের গায়ে একটু হাত বুলিয়ে নে, তাতে যদি কিছু হয়। ওই লোহার ছেকল কে না ছুয়েছে? শম্ভু মিত্র অজিতেশ-উৎপল দত্ত থেকে কুমার-বিভাস-অশোক পর্যন্ত। ওই ছেকলটাই একটা ইতিহাস। ভবিষ্যতে বাংলার নাট্য আন্দোলনের যদি কোনও ইতিহাস লেখা হয়, কোনও আর্কাইভ হয়...

—ওই ছেকল সেখানে এক্সিবিট হিসাবে থাকবে, খুক খুক করে হেসে শিবাজী বলেছিল।

গলা নামিয়ে বললেও সরোজদার ঠিক কানে গিয়েছিল।—কী বললি, কী বললি ছাগল? এখনও তিন স-এর উচ্চারণের তফাত ধরতে পারলি না, থ্যাটার করবে? যা যা, বেরো এখান থেকে।

—আর নিজে যে সারাজীবন শেকলকে ছেকল সারকে ছার বলে এলে তার বেলা? গজগজ করেছিল শিবাজী।

দরজা পেরুলেই একটা ভ্যাপসা গন্ধ। ওপর থেকে যার যা বর্জ্য পদার্থ ছুড়ে ছুড়ে সিঁড়ির নীচে ফেলাই রীতি। সেখান থেকে সেসব তো আর পঞ্চভূতে মেশে না, বাংলা নাটকের ঐতিহ্য বুকে নিয়ে বসে থাকে।

তাড়াতাড়ি কয়েকধাপ সিঁড়ি ভেঙে উঠে যাওয়া। তারপর সামান্য বিশ্রাম। পুরনো কাঠের সিঁড়ি, এক এক ধাপের উচ্চতা দেড় ফুট। দশ থেকে বারো স্টেপ উঠলেই হাঁটু আলগা হয়ে যায়, নিশ্বাসে বায়ু কম পড়ে। এইখানে একটা ল্যান্ডিং, দশ সেকেন্ড দাঁড়িয়ে আবার ওপরে ওঠা শুরু করতে হয়।

সিঁড়ির মাথায় মস্ত শাল কাঠের দরজা, আধ ফাঁক করা। ভেতরের আলো সিঁড়ির মাথা অবধি সন্তর্পণে এসে আটকে গেছে। তাও সেটা ভাঁজ করা রুমালের চেয়েও সাইজে ছোট।

ঘরে ঢোকার আগে চিরকালই দু'দণ্ড দাঁড়ায় দিব্য। ভেতরে তাকায়। একটা বাল্‌ব ছাদ থেকে প্রায় চার ফুট ঝুলে ঘরের আধাআধি নেমে এসেছে। বাল্‌বের নীচে একখানা টেবিল, টেবিলের পেছনে চেয়ার। সেই চেয়ারে শিরদাঁড়া সোজা করে বসে সরোজদা। বারো মাস তিনশো পঁয়ষট্টি দিন ফতুয়া-ধুতি, চশমা, হাওয়াই চপ্পল। টাকে রিফ্লেক্ট করছে টিমটিমে আলো। চোখ দূরে নিবদ্ধ।

অন্যদিন চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে। স্বপ্ন ঠিকরে বেরোয়। দিব্যরাও দু'হাতে স্বপ্ন মাখে।

আজ বাইরে থেকে তাকিয়েই দিব্য বুঝতে পারল, সরোজদা তাকিয়েই আছে, চোখে কোনও ভাষা নেই।

ভেতরে ঢুকে শব্দ না করে শতরঞ্চির এক কোনায় বসল দিব্য। ঘর খালি? এই সময়ে?

অন্ধকার হয়ে আসছিল। মশারা এখন রোঁদে বেরোয়। অনেকক্ষণ থেকেই কামড়াচ্ছিল, সরোজদার চটকা ভেঙে যাবে ভেবেই সহ্য করছিল দিব্য। শেষে আর পারল না। পাখির সাইজের মশাটার রক্ত টিপে বের করে শতরঞ্চিতে মুছে তৃপ্তি হল দিব্যর।

শব্দে ঘুরে তাকাল সরোজদা।

কী আশ্চর্য! চোখ থেকে একটু আগের সমস্ত কিছু উধাও হয়ে গেছে। গভীর প্রশান্তি নিয়ে দিব্যর দিকে তাকিয়ে সরোজদা বলল, এসেছিস? বোস। দাঁড়া চা বানিয়ে আনছি।

শালা মক্ষিচুষ। এককাপ চাও আমাদের ঘাড় ভেঙে খাবে। প্রতিম বলত দাঁতে দাঁতে চেপে।

কথাটা সত্যি। মহলায় মুড়ি-তেলেভাজা তো বটেই, দু-কাপ চা আনাতে হলেও সরোজদা হাত ওলটাত না। কবে সরোজদা চা বানিয়ে খাইয়েছে মনে পড়ে না দিব্যর।

দুটো কানা ভাঙা কাপে চা বানিয়ে টেবিলের ওপর এনে রাখল সরোজদা। দিব্যর জন্যে অপেক্ষা না করেই নিজেরটা তুলে ঠোঁট ডোবাল। হুস করে চা টেনে জোরে নিশ্বাস ফেলে বলল, আঃ।...

তারপর দিব্যর দিকে ফিরে—ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, ফেলে রাখছিস কেন খা!

চায়ের কাপ টানতে টানতে দিব্য জিজ্ঞেস করে ফেলল, ওদের দেখছি না? শিবাজী, প্রতিম? ওরা আসেনি আজকে? মহলা হবে না?

চোখ বুজে চায়ের স্বাদ উপভোগ করছিল সরোজদা। চা-চিনি-দুধ কোনওটাই নেই, নিছক গরম জল, একটু আগেই চেখে দেখেছে দিব্য। তাও কী যে পাচ্ছে সরোজদা!

সরোজদার বন্ধ চোখ হঠাৎই খুলে গেল। দিব্যর চোখের দিকে না তাকিয়ে কড়িকাঠ গুনতে গুনতে বলল, শিবাজী এসেছিল, প্রতিম এসেছিল, জীবন এসেছিল।

—তা হলে? ওরা চলে গেল?

—চলে যাবে কেন? আমি তাড়িয়ে দিয়েছি।

—তাড়িয়ে দিয়েছ? সেকী?

—হ্যাঁ, কারণ তার আগে চন্দনাও এসেছিল।

—তা তো আসবেই, ওর আজকে ফুল রিহার্সাল দেবার কথা। তা ওর আসার সঙ্গে অন্যদের তাড়িয়ে দেবার কী সম্পর্ক?

—চন্দনা বলতে এসেছিল, ফস করে একটা বিড়ি ধরাল সরোজদা, মহলায় বিড়ি-সিগারেট বারণ, সরোজদারই কঠোর ডিসিপ্লিন, ও জানাতে এসেছিল, যে ওর মহলায় আসতে অসুবিধে হচ্ছে। ছোট মেয়েটা ঠাকুমার কাছে থাকতে চাইছে না, কান্নাকাটি করে; স্বামীর ইচ্ছে নয়। তাই ও আর আসবে না।

—কী সাংঘাতিক! ওকে না হলে তো নাটক অচল! মেয়ে ছোট, কান্নাকাটি করে, একি নতুন নাকি? আগে জানত না? ন্যাকা?

আধপোড়া বিড়িটা ঘষে ঘষে নিভিয়ে দিল সরোজদা। চল্লিশ পাওয়ারের বালবের আলোয় সরোজদার মুখের একটা পাশ অন্ধকার।

হাসল সরোজদা। শাজাহানের হাসি। সরোজদাই শিখিয়েছে। বলল, কথাটা মিথ্যেরে দিব্য। খবর আগেই এসেছিল আমার কাছে। এতদিন ছোটখাটো অফিসক্লাবে খেপ মারত, পয়সা কার না দরকার। জেনেও না করিনি। এবারে সিরিয়াল। অরুণ চৌধুরীর

নতুন মেগাসিরিয়াল 'কলঙ্কের রং হলুদ'-এ লিড রোলে চন্দনাকে নিচ্ছে। রোজ শুটিং, কী করে আসবে মহলায়।

মাথা নামিয়ে চুপ করে বসেছিল দিব্য। বুকের ভেতরটা খালি লাগছিল। অনেকক্ষণ পর মুখ তুলে বলল, আরও তো কত মেয়ে আছে, তুমি খুঁজছ শুনতে পেলে অনেকেই ছুটে আসবে। সরোজ চৌধুরীর হাতে তৈরি। তার দামই আলাদা।

—সেটাই তো কথা! চন্দনার বদলে ময়না আসবে। গড়েপিটে তৈরি করব। নিয়ে যাবে ছোট পর্দা। ধনেখালির একটা কারিগর একখানা শাড়ি বুনে কত পায় জানিস? পঞ্চাশ টাকা। সেই শাড়িই গড়িয়াহাটে দু'হাজারে বিক্রি হয়।

—সেটাও তো এক ধরনের আনন্দ সরোজদা। সৃষ্টির আনন্দ। টাকাটাই কি সব?

—ঘুরে দেখে আয়,—ধনেখালি, ফরাসডাঙা, শান্তিপুর একটার পর একটা জায়গা। সব তাঁত বন্ধ। এইভাবে থিয়েটার হয় না রে!

উঠে দাঁড়াল সরোজদা। ঘরের মধ্যে পায়চারি করল। তারপর দিব্যর দিকে ফিরে বলল, একা চন্দনা নয়, খবর আছে শিবাজীও। হয়তো প্রতিমও। যে একটু পারে সেই চলে যাবে। থিয়েটার হল পা রাখার প্রথম ধাপ। তারপরই একটা লাফ—সিরিয়াল। আর লেগে গেল তো বড় পর্দা, সিনেমা, স্টার।

—থিয়েটারের জন্যে ভালবাসাটাসা কিছু নয়।

—নাটক করিস না! ভালবাসা খায় না মাথায় দেয়? ভালবাসা বলে কিছু নেই, কিছুর জন্যেই নেই। ভালবাসা ব্যাপারটাই একটা ফাঁপা বেলুন, গ্যাসে ঠাসা। তোদের যেমন গ্যাস দিয়ে দিয়ে ধরে রেখেছি। এতকাল। শম্ভু মিত্র? উৎপল দত্ত? অজিতেশ? কেন মরতে আসবে রে এই কুঁড়েঘরে? তাদের নিজেদের দল নেই? ওগুলো নাম। ওই নামগুলোর একটা তেজ আছে। সেই তেজে তোদের জ্বালিয়ে রেখেছি। আর পারলাম না।

দিব্যর হাত-পাগুলো অবশ হয়ে লেপটে ছিল। নাড়াচাড়া করতেও যেন অনেক পরিশ্রম। গলা শুকনো কাঠ। জিভটা মুখের মেঝেতে স্ক্রু দিয়ে লাগানো।

একটা নির্দেশ, একটা অনুজ্ঞার জন্যে যেন বসেছিল দিব্য। নির্দেশ চিরকাল সরোজদাই দিয়ে এসেছে। সরোজদার অন্ধকার মুখের দিকেই শব্দহীন তাকিয়ে ছিল দিব্য।

সরোজদা সামনে এসে বসল। সোজা তাকাল দিব্যর চোখের দিকে।

—আর আসিস না। এসে কোনও লাভ নেই। কী হবে? আর কি পারব দল গড়তে? আবার ঝেড়ে-মেড়ে উঠে দাঁড়াতে? নতুন নাটক নামাতে? জানিসই তো আমার আর কিছু নেই, থিয়েটার ছাড়া! থিয়েটারকেও আজ ছুটি করে দিলাম।

তারপর লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে সরোজদা বলল, কোথায় যাব বলতে পারিস? কার কাছে যাব?

রুমনি জিজ্ঞেস করল, কফিই করি জম্পেশ করে বল? ঠাণ্ডা পড়েছে, গরম গরম পকোড়ার সঙ্গে ভাল লাগবে।

ছন্দা অবাকই হয়ে গেল। গুছিয়ে বসতে বসতে ঘাড় নেড়ে দিল। রুমনি উঠে গেল কফি করে আনতে।

সোফা-কুশন-টিভি-ফ্রিজ থেকে দেওয়ালে লটকানো কৃষ্ণনগরের টিকিটিকি—সমস্ত কিছুই আগের মতো। রুমনিসুদ্ধ।

না। ভাল করে দেখল ছন্দা, ডিনারওয়াগনের ওপর ল্যামিনেটেড ছবিটা নেই, রুমনি আর অমিতের। পুপলুরটা আছে, পাঁচ বছরের জন্মদিনে তোলা, রুমনি বলেছিল আগেরবার।

—দ্যাখ্ দু চামচ চিনি দিলাম, জিজ্ঞেস না করেই। বেশি হয়ে গেল না তো?

—না, না, আমিও দু-চামচই খাই। চায়ে চিনি কম হলেই ভাল লাগে, কফিতে উল্টো।...পকোড়া কি ভেজেছিলি, না আমার জন্যেই...?

—তোর জন্যে কেন হতে যাবে? সন্ধেবেলা আমাকেও তো কিছু বানাতে হতই। অফিস থেকে ফিরে এই সময়টায় বেশ খিদে পায়। কোনও কোনওদিন ইচ্ছে করে না, ফেরার সময় এটা-সেটা কিনে নিয়ে চলে আসি। আজ তাড়াতাড়ি ফিরেছি, ইচ্ছে হল, তাই ঝপাঝপ কটা ভেজে ফেললাম।

কফিতে ঠোঁট ডোবাল রুমনি, দেখাদেখি ছন্দাও। কথাটা রুমনিই শুরু করুক, অপেক্ষা করছে ছন্দা। অথচ রুমনি যেন কিছুই হয়নি এমন ব্যবহার করছে।

—পুপলুর ছুটি কবে?

—বড়দিনে, তাও তো আজকাল ছুটি কমিয়ে দিয়েছে, অ্যাকাডেমিক সেশন চেঞ্জ হয়ে গেছে না!

—কোন ক্লাশ হল যেন?

—সেভেন।

—সত্যি, দেখতে দেখতে কত বড় হয়ে গেল! সেভেন মানে তো আর তিন বছর, তার পরেই মাধ্যমিক।

—হ্যাঁ। তবে একটাই সুবিধা, ভর্তি করা পর্যন্তই বাবা-মায়ের ঝক্কি। অবশ্য নিয়মিত টাকাটা পাঠাতে হয়। রোববার রোববার গিয়ে দেখা করা। লেখাপড়ার দিকে আর ভাবতে হয় না। মিশনই সব নজর রাখে।

একটা সুযোগ পেয়ে গেল ছন্দা। মুখ থেকে কফির কাপ নামিয়ে পকোড়ায় আলতো করে একটা কামড় দিল। গরম। মুখের মধ্যে সইয়ে সইয়ে নেড়েচেড়ে চিবোল।

বলল, শুনেছি অনেক টাকা-পয়সা লাগে। তোর অসুবিধে হচ্ছে না?

—কেন, দায় কি আমার একার? তেরচা করে তাকাল রুমনি।

ঢোঁক গিলল ছন্দা, তা বলিনি। বলছি, ও দায় অস্বীকারও তো করতে পারে?

—সে সুযোগ দিলে তো? অবশ্য ও কোনও আপত্তি করেনি। বলতেই সুড়সুড় করে সই করে দিয়েছে। ছেলের লেখাপড়ার দায়িত্ব পুরোটাই ওর।

—কতদিন?

—যতদিন না পুপলু চাকরি-বাকরি পেয়ে এস্টাব্লিশড হয়। যতদিন লেখাপড়া চালিয়ে যাবে, দরকার হলে বিদেশেও।

জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিল ছন্দা। রুমনি এমন ক্যাজুয়াল যেন দেওরের শালীর গল্প শোনাচ্ছে। ওর কি কিছুই হচ্ছে না?

করব না করব না করেও জিজ্ঞেস করেই ফেলল, তোর, মানে কোনও অসুবিধা হচ্ছে না?

হেসে ফেলল রুমনি। কফি চলকে পড়েই যাচ্ছিল, তাড়াতাড়ি টেবিলে নামিয়ে আঁচলে মুখ মুছে রুমনি বলল, তুইও তো একা আছিস, তোর অসুবিধা হয়?

আমার অভ্যেস হয়ে গেছে। নতুন কিছু নয়। তোর তো আর তা নয়!

—তুই কি জন্ম থেকেই একা আছিস নাকি রে ছন্দা? ওসব বাজে কথা,...হ্যাঁ, কিছু কিছু অসুবিধে হয়। প্রথম প্রথম একটা সেন্স অব ইন-সিকিওরিটি। একা একা ভয় ভয় করত। রাতে আলো জ্বেলে শুতাম। বাথরুমে গেলে চারিদিক ভাল করে দেখে নিতাম। রাত্তিরে ঘুম ভাঙলে উঠে বাইরের দরজা ঠিকমতো লক করেছি কিনা দেখে আসতাম। এখন,...তিনমাস হয়ে গেল তো, সব কেটে গেছে। বেশ ঝরঝরে, ফুরফুরে লাগছে।

অবাক লাগছিল ছন্দার, কলেজের সেই রুমনি? গোলগাল ফর্সা মিষ্টি মেয়েটা, পেছনে লাগলে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলত। খবরটা পেয়েছে আগেই, আসব আসব করে দেরি হয়ে গেল। কত কী ভাবতে ভাবতে এসেছে। কী বলবে, কেমন করে সান্ত্বনা দেবে? ফোন করে রুমনির অফিসে খোঁজ নিয়েছিল। একটা অ্যাড-ফার্ম, তাও রুমনি চাকরি করছে বছর দুয়েকও হয়নি, ওরাই বলল রুমনি রেগুলার অফিস করছে। সেই ভরসাতেই শেষ অবধি চলে এল ছন্দা, এসে যে অন্য রুমনিকে দেখছে!

—একা তো ছিলামই রে ছন্দা। পা ছড়িয়ে এবার যেন একটু সিরিয়াস ভঙ্গিতেই শুরু করল রুমনি।—এক বাড়িতে এক ছাদের তলায় থাকলেই কি দোকা হয়? আগে তবু খিটিরমিটির লাগত। আবার বিছানায় মিটেও যেত সব। বছরখানেক হল আমাদের ঘর আলাদা হয়েছিল। পেয়িংগেস্ট-এর মতো ও আসত যেত, রাত্তিরে ওর ঘরে শুত। কোনও কোনওদিন তাও আসত না। অনেকেই যেচে এসে কত কথা শুনিয়ে যেত, অমিত এই করছে সেই করছে। মনে হচ্ছিল ও মুখ ফুটে বলে উঠতে পারছে না। আমিই একদিন খাবার পর ড্রয়িংরুমে বসে কথাটা পাড়লাম। মনে হল ও যেন বেঁচে গেল। আশ্চর্য ব্যাপার, প্রথমে মনে হয়েছিল আমি পারব না, শ্যাটার্ড হয়ে যাব। সব হয়ে যেতে অবাক হয়ে দেখলাম, আমারও তেমন কোনও রিঅ্যাকশন হল না। বুঝলাম, ভেতরে ভেতরে প্রিপারেশনটা অনেকদিন আগে থেকেই হয়ে ছিল। টের পাইনি।

বাইরে সন্ধে ঘোর হয়ে উঠছিল। ফিরতে দেরি হয়ে যাবে। ছন্দা, যেন জিজ্ঞেস করতে হয় তাই করা, জানতে চাইল, মাসিমা-মেসোমশাই? তোর দাদারা? একাই থাকবি? ফিউচার প্ল্যানস্? কিছু ভেবেছিস?

উঠে গেল রুমনি,—একমিনিট, কাপ-প্লেটগুলো রেখে বাথরুম থেকে ঘুরে এল। ফিরে সোফায় কাত হয়ে বসল,—হ্যাঁ, বাবা-মা। দুঃখ পেয়েছে। দেখা করে এসেছি। দাদারা, তার চেয়েও বেশি বৌদিরা ভয়ে ভয়ে ছিল, আবার ঘাড়ে গিয়ে না চড়ি। নাঃ, অনেক তো দেখলাম। এই ফ্ল্যাটটা আমার নামে, চাকরিটাও আমার। পুপলু। এখখুনি নতুন কিছু ভাবছি না। কিন্তু পা ছড়িয়ে বসে সারাজীবন হা-হুতাশ করবই বা কেন? অফিস থেকে এন্ড অব জানুয়ারি গোয়া যাচ্ছে, আমারও টিকিট করতে বলে দিয়েছি। দেখিইনা, জীবনটা নিজের মতো কাটাই। তারপর কেউ যদি আসে, সেইরকম মনে করি, অন্যভাবে ভাবতেও পারি।

উঠে পড়ল ছন্দা। দরজা অবধি এগিয়ে দিয়ে এল রুমনি।

একা বসে ছিল পুচন। ঝাঁপ গুটিয়ে ফেলেছে, স্ট্যান্ড খালি। দরজা বন্ধ করে বাইরে

দিব্যর সাইকেলটা বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে চুপ করে বসেছিল। শীত জাঁকিয়ে পড়েছে। একটা পাতলা হাতকাটা সোয়েটার গায়ে ছেলেটা হিহি করে কাঁপছিল।

দিব্যর খারাপ লাগল। ওর জন্যেই ছেলেটা কষ্ট পেল। ফেলে যে চলে যায়নি! চোখ রগড়ে দিব্যর দিকে তাকিয়ে হাই তুলল পুচন,—এই নটা চল্লিশ অবধি দেখে আর দাঁড়াতাম না দিবুদা। কাল আবার সেই পাঁচটা তিপ্পান্ন।

তালা খুলে সাইকেলটা নামাতে নামাতে কী মনে হল, একটা টাকা দিল পুচনের হাতে। নেড়েচেড়ে দেখে পকেটে রেখে দিল পুচন। মনে হল দু'টাকা না এক টাকা সেটাই পরখ করল। দুটাকা হলে খুশিটা ডবল হত।

সাইকেলে চড়ে একটু প্যাডেল করেই মনে হল পেছনের চাকায় পাম্প কম আছে। সকালেও ছিল কি? মনে করতে পারল না দিব্য।

স্টেশনের লাগোয়া দোকানপাট, সোম-বিষ্যুতের হাট, একটা চালের গুদাম পার হলেই ফাঁকা মাঠ। বাঁদিকে বাঁশঝাড়, ডানদিকে ঘোষেদের পুকুর, পাশে একা শিবমন্দির, তারপর থেকে ধুধু ধানখেত। রাস্তাটায় ধুলো ওড়ে শীতকালে, বর্ষায় হাঁটু অবধি কাদা, নেমে সাইকেল ঠেলে নিয়ে যেতে হয় আধ মাইল রাস্তা। ধুলোতেও চাকা আটকে যায়, কিন্তু চাকা ঠিক থাকলে চলে যায়। একটু এগিয়ে নেমে পড়ল দিব্য।

টায়ারটা রিমের সঙ্গে ঠেকে যাচ্ছে। একটা ইঁটের টুকরোয় খড়াং করে উঠল। নেমে টিপে দেখল হাওয়া কম নয়, লিক। এর ওপর চালিয়ে গেলে চাকার রিম বেঁকে যাবে। সোজা করতে অনেক টাকার ধাক্কা।

সাইকেলটা গড়িয়ে হাঁটতে লাগল পাশেপাশে। আকাশভর্তি চাঁদ, একাই সব গ্রহ-নক্ষত্রকে গিলে বসে আছে। আলো চুঁইয়ে পড়ছে গাছের পাতায়, পুরন্ত ধানের শিষে। থমকে থাকছে কিছুক্ষণ। তারপর চলকে পড়ছে মাঠে-রাস্তায়-পুকুরঘাটে। জ্যোৎস্নায় গা ডুবিয়ে পুব থেকে পশ্চিমে হেঁটে গেল দিব্য।

ছ'মাস আগে হলেও তাড়াতাড়ি পা চালাত। ঘড়ি দেখত ঘনঘন। থালা সাজিয়ে ভাত বেড়ে হারিকেনের সলতে বাড়িয়ে গালে হাত দিয়ে বসে থাকত মা। রাস্তা দিয়ে যে যেত হারিকেন তুলে মুখে আলো ফেলে খুঁজে দেখত, এলি বাপ! সে যন্ত্রণা থেকেও মুক্তি পেয়ে গেছে দিব্য।

ইলেকট্রিকের পোল গেছে দে-পাড়া দিয়ে। এদিকটায় কানেকশন দেয়নি। হুকিং করে সবাই বিজলি এনেছে। দাদাও। দিব্য পারেনি। মা চোখে ভাল দেখত না শেষ দিকটায়। অন্ধকারে আছাড় খেয়ে চোট-আঘাতও পেয়েছে। শেষদিকে দিব্যও লাইনে নাম লেখাবে বলে মনে মনে তৈরি হয়েই গিয়েছিল। মরে গিয়ে দিব্যকে সবদিক থেকেই বাঁচিয়ে দিয়েছে মা।

শিউলির মা রান্না করে ঢেকে রেখে গেছে ঘরে। বেড়াল ঢুকছে আজকাল। ভাল করে চাপা না দিলে খেয়ে রেখে দেয়। একদিন সারারাত পেটে কিল দিয়ে বসে থাকতে হয়েছিল দিব্যকে। সেই থেকে সাবধান হয়েছে।

পুজোর পরে পরেই জ্বরে পড়ল। ধুম জ্বর। তিনদিন তিনরাত অঘোরে পড়ে রইল, জলটাও গড়িয়ে দিতে আসেনি কেউ। দেয়ালের ওপারেই দাদা। দাদা সারাদিন থাকে না, বৌদি। তিনদিন পর জ্বর একটু কমতে হামাগুড়ি দিয়ে উনুনে জল চাপাচ্ছে যখন, দাদা যেন আকাশ থেকে পড়ল, উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছিল,—একটা খবরও দিতে পারলি না?

কিছুই বলেনি দিব্য। ঘেষটে ঘেষটে হাঁড়ি থেকে চাল বের করতে করতে বলেছিল, চা খাবে?

দাদা আর দাঁড়ায়নি।

শিউলির মাকে তারপরেই রেখেছিল। বাসনমাজা ঘরঝাঁট, রান্না। জামাকাপড়টা ছুটির দিনে নিজেই কেচে নেয়।

ঢলদীঘির পাড়ে এসে দম নেবার জন্যে দাঁড়াল। বালির মধ্যে পা ডুবে যাচ্ছে, সাইকেলের চাকাও বসে যাচ্ছে। ঠেলে ঠেলে আনতে কষ্ট হচ্ছে। একটা শিশুগাছ দীঘির পাড়ে উঠে গেছে খাড়া। গাছের গায়ে সাইকেলটা ঠেসিয়ে ঘাসের ওপর বসে পড়ল দিব্য।

পেছনে স্টেশন ফেলে এসেছে, কুয়াশার চাদর পেরিয়ে কোনও আলো দেখা যাচ্ছে না। সামনে মিহি চাঁদের আলোর বুনট, পেরিয়ে আবছা কিছু গাছপালা, ওইগুলো পেরিয়ে আরও খানিকটা গেলে দিব্যর বাড়ি।

বাড়ি? চারটে দেয়াল, ওপরে টিনের চাল ভাগের বারান্দার এক কোনায় রান্নাঘর, বাথরুম-পায়খানা এখনও বেশিরভাগ মানুষ মাঠেই সারে। দিব্য উঠোনের এককোনায় বানিয়ে নিয়েছে। ঘরের ভেতর একটা খাট, দুখানা সুটকেশ, কাঠের র‍্যাকে কতগুলো বই। মেঝেতে ঢাকা দেওয়া থালায় চারখানা রুটি, তরকারি এক খাবলা গুড়।

অবিশ্রাম জ্যোৎস্না বর্ষণ করে চলেছে আকাশ। চরাচর ভেসে যাচ্ছে আলোয়। সামনে-পেছনে এপাশে-ওপাশে তাকায় দিব্য। কোথাও কি যাবার ছিল? কোনও নারী কখনও চায়নি দিব্যকে। কোনওদিন কেউ চিঠি লেখেনি। কেউ চোখের ইশারায় কাছে ডাকেনি।

দিব্যই কি চেয়েছে কারওকে সেইভাবে? এক ঝলক দেখল, ভাল লাগল, হয়ে গেল। ভাল লাগারা সকলেই এতদূরের! সাহস সঞ্চয় করে কোনওদিন বলেও উঠতে পারেনি। মা মাঝে মাঝে কথা তুলত। শুনেও না শোনার ভান করে থাকত দিব্য। অনেক আগে, যখন বয়েস ছিল, এক দুটো সম্বন্ধ এনেছিল পাড়ার লোকে। দিব্যর তখন একমাত্র প্রেম থিয়েটার। গা করেনি।

আজ সরোজদার অন্ধকার ঘরে দিব্যর সব শেষ হয়ে গেল। কোথায় যাবে দিব্য। কোথায় যায় মানুষ?

দিগন্তপ্লাবী জ্যোৎস্নায় হঠাৎই নতজানু হয়ে বসল দিব্য। অঞ্জলি পেতে দু'হাতে গ্রহণ করতে লাগল জ্যোৎস্নার ধারা। মাথায়, গালে, ঘাড়ে, সমস্ত শরীরে জ্যোৎস্না মাখতে মাখতে হঠাৎই এক উদ্গত কান্নায় আকুল হয়ে ভেঙে পড়ল দিব্য। দেহের ভেতর থেকে, কোনও গুহা-কন্দর থেকে তীব্র জলস্রোত যেন বাঁধ ভেঙে উদ্দাম ধারায় নির্গত হতে লাগল দিব্যর সমস্ত কিছু ভাসিয়ে।

ভূমি স্পর্শ করে শরীর মেলে দিতে দিতে দিব্য এক অসহ্য ঈর্ষায় সেই মানুষটিকে স্মরণ করল, যে জীবন ছেড়ে যেতে যেতেও কোথাও, কোনও একজনের কাছে যেতে চেয়েছিল।

দীপালির কাছে একটা ডুপ্লিকেট চাবি থাকে। বিকেল বিকেল রাতের খাবার বানিয়ে টেবিলে চাপা দিয়ে চলে যায়। খেয়ে বাসনে জল ঢেলে রেখে দেয় ছন্দা। সকালে

দীপালি এসে মেজে দেয়।

বয়েসে ছন্দার চেয়ে কত হবে, বড়জোর বছর দশেকের বড়। নাতি-নাতনি নিয়ে ভরন্তি সংসার। ছন্দার ওপর হম্বিতম্বি করে। ডাকে দিদি, ভাবখানা যেন বয়ে-যাওয়া বড় মেয়ে।

বিছানায় হাতের ব্যাগটা ছুড়ে ফেলে আধশোয়া হয়ে গড়িয়ে পড়ল ছন্দা। বাইরের ঘরের আলোটাই শুধু জ্বেলেছে, আলো আসছে, দরজায় ঠোকা খেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে। সুইচ অবধি হাত বাড়াতে ইচ্ছে করছে না। অন্ধকারটাই যেন ভাল। যেন নিজেকে পুরোপুরি দেখতেও অনীহা।

সারা দিনের ঘাম-ময়লা। জামাকাপড়ও সেই সাতসকালে চড়িয়েছে। পরিষ্কার-পরিষ্কার বাই ছন্দার। দীপালি দেখলে বলত, আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম গো! নোংরা শাড়িটা পর্যন্ত ছাড়লে না?

কী এক ক্লান্তি আজ ছন্দার সমস্ত শরীর ছেয়ে আছে। উঠে বসতে, দাঁড়াতে, বাথরুমে যেতেও ক্লান্তি। সারাদিন বলতে গেলে না খাওয়া। অথচ খিদেও পাচ্ছে না তেমন।

শুয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ কখন ঘুম এসে গিয়েছিল। কানের কাছে একটা মশা কামড়াল জোরে। ধড়মড় করে উঠে বসল ছন্দা। অন্ধকার। উঠে আলো জ্বালিয়ে ঘড়ি দেখল, সাড়ে নটা।

ঠাণ্ডাটা কম লাগে ছন্দার। বন্ধুরা ঠাট্টা করে, বলে থাইরয়েড। কমলাদি সব খবর রাখে। থাইরয়েডের অসুখে কমলে ঠাণ্ডা, বাড়লে গরম, কমলাদিই বলেছিল। সুদেষ্ণা বলেছিল, প্রেশার বাড়লেও হয়। চেক করিয়ে নিস। ছন্দা কথা বাড়ায়নি।

বাথরুমে বালতিতে জল তুলে রেখে গেছে দীপালি। বিকেলে জল পালটায়নি। সর পড়েছে। মগে করে ওপরের জল তুলে ফেলে ভেতর থেকে নিয়ে হাত-পা মুখ ধুল। টিউবওয়েলের জল, কষা। আজকাল জলে নাকি আর্সেনিক। হতেও পারে, যে রেটে হাত-পায়ের চামড়া খসখসে হয়ে যাচ্ছে।

শাড়ি পালটে ম্যাক্সি পরল ছন্দা। চাদর জড়িয়ে নিল ওপরে। হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে গেলে গতবারের মতো ভুগতে হবে। ভাগ্যে দীপালি ছিল।

রুটিগুলো শুকিয়ে চামড়া হয়ে গেছে। বাঁধাকপির তরকারিটাও জোলো-পানসে। আধখানা রুটি কোনও মতে গিলে দুধটুকু চুমুক দিয়ে খেল ছন্দা। বাসন তুলে দরজা খুলে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল।

আকাশ ফেটে পড়ছে জ্যোৎস্নায়। দরজার সামনেই একটা শিউলি গাছ, গাছের মাথায় গলগল করে আলো ঢালছে চাঁদ। মৃদু উত্তরে হাওয়ায় পাতা কাঁপছে ঝিরঝির করে, পাতার ফাঁক দিয়ে ফুল হয়ে আলো ঝরে পড়ছে নীচে।

দু'হাতে আঁজলা ভরে শিউলির থোকা মাটি থেকে তুলে কোঁচড়ে রাখল ছন্দা। শালের একটা প্রান্ত গা থেকে খুলে পাতল মাটিতে, ফুলগুলো ছড়িয়ে দিল সেখানে। শালটা ভুটিয়াদের কাছ থেকে কেনা, সস্তা, কিন্তু গরম। কালো শালের ওপর সাদা ফুলের গুচ্ছ চাঁদের আলোয় ঝকঝকে করছে। ছন্দার মনে হল আকাশের নীচে আঁচল পেতে জ্যোৎস্নাই ধরে ফেলেছে খানিকটা। মুঠো করে শিউলি তুলে গালে ঘষতে লাগল। ঘ্রাণ নিল প্রাণভরে।

সেদিনও চাঁদ উঠেছিল জোর। পৃথিবী ভেসে গিয়েছিল মাতালকরা জ্যোৎস্নায়। এক রেলস্টেশনের ওয়েটিং রুমে কাঠের বেঞ্চে শুয়ে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিল ছন্দা।

মাথার নীচে জামাকাপড় ভর্তি কাপড়ের ঝোলাটা ঠেসে দিয়ে গিয়েছিল একটা মানুষ যে, একটু রেস্ট কর, এখুনি আসছি, বলে ওয়েটিংরুম থেকে বেরিয়ে প্ল্যাটফর্মের ইঁট বের করা মেঝের ওপর হেঁটে গিয়েছিল একটু আগেই।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে, মায়াবী জ্যোৎস্নায় পৃথিবীর অবগাহনের আশ্চর্য দৃশ্যে এবং ফেলে আসা দিনের ক্লান্তিতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল ছন্দা। ঘুম ভাঙল ঝাড়ুদারের ডাকে,—ঘর পরিষ্কার হবে দিদি, বাইরে যেতে হবে খানিক। অবাক হয়ে উঠে বসেছিল ছন্দা। তাকিয়েছিল এদিক ওদিক, কোথায় আছে ভেবে নিতে সময় লেগেছিল। সামান্য জিনিসটুকু গুছিয়ে বাইরে এসে তাকিয়েছিল চারপাশে। ঘুম ভেঙে জেগে উঠছে ছোট স্টেশন। সামনে পেছনে এপাশে ওপাশে যতদূর চোখ যায় খুঁজেছিল তন্নতন্ন করে। কিছু মানুষ জড়ো হয়েছিল, কেউ কেউ খুঁজে এসেছিল কাছে এবং দূরে। পাওয়া যায়নি। আসছি বলে চলে গিয়েছিল মানুষটা ছ'বছর হয়ে গেল। এইরকম এক জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাতে, ঘুমিয়ে পড়েছিল ছন্দা।

আকাশের দিকে তাকায় ছন্দা। কথা ছিল, মাটিকে ফুল সাজে সাজিয়ে দিচ্ছে বৃক্ষ।

ফুলের দিকে তাকায় ছন্দা। কথা ছিল, বাতাস গন্ধে আমোদিত করছে পুষ্প।

'আসছি' বলে চলে গিয়েছিল একটা মানুষ। কথা দিয়েছিল। সেকি মিথ্যা? তবুও কীসের প্রতীক্ষা ছন্দার? অপেক্ষা কার জন্যে?

নীলিমার কাছে যেতে চেয়ে অন্য কোথাও চলে যায় মানুষ। সব যাওয়া যাওয়া হয় না। তবে কি তা-ই ঘটেছিল সেই মানুষেরও? চেয়েছিল। পেরে ওঠেনি!

সবশেষে, চেয়েছিল, চেয়েছিল, পারেনি, ভোরের সেই মানুষটার যেতে চাওয়ার তীব্র আর্তি বুকে নিয়েই শান্ত হয় ছন্দা। স্রোত থেমে আসে। বিশ্বাস এসে অধিকার করে বঞ্চনা। অর্থহীনতা, ধীরে, প্রবাহিত রাত্রিটির মতো, দিগন্তে অবসৃত হতে হতে বেঁচে থাকার অন্য কোনও অর্থ ছন্দার ভেতরে জ্বালিয়ে রেখে বিদায় নেয়।

মরবে, মরবে, এই করেই একদিন মরবে।

দীপালির ডাকে ধড়মড় করে উঠে বসে ছন্দা। মাথার কাছে দীপালি. ঘরময় থইথই রোদ্দুর।

—আজকেও এসে দেখি দরজা খোলা। তোমার কি ভয়ডর নেই? একা, বয়েসের মেয়ে, থাকো এই মাঠের মধ্যে। দিনকাল ভাল নয়, কোন আক্কেলে বাইরের দরজা খুলে শুয়ে থাকো শুনি?

হাসে ছন্দা, হাসিতে যতখানি সম্ভব বিব্রতভাব ছড়িয়ে দীপালির দিকে ঘোরে, সত্যিই তো দীপালি! যদি কেউ আসত। ঢুকে পড়ত বাড়িতে? চুরি করে নিয়ে যেত সর্বস্ব?

—চোর-ডাকাত হলেও তো কথা ছিল। মেয়েমানুষের জ্বালা কি কম? বুঝবে, বুঝবে একদিন। কথা তো কানে নাও না...

গজগজ করতে করতে দীপালি কাজে যায়।

সারারাত খুলে রাখা দরজার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস আড়াল করে আর একটা দিন শুরু করে ছন্দা।

কোথাও যেতে চেয়েছিল দিব্য। দিব্যর পথের শেষে কেউ দীপ জ্বালিয়ে অপেক্ষা

করে না, দিব্যর ফিরে যাবার কোনও ঘর নেই।

সারারাত দরজা খুলে অপেক্ষা করে ছন্দা। কে যেন আসবে, কার যেন আসার কথা ছিল। রাত ফুরিয়ে ভোর হয়ে যায়।

দিব্য ও ছন্দা, ছন্দা ও দিব্য দুটি সমান্তরাল সরলরেখায় দিনযাপন করে। কেউ কারও সন্ধান পায় না।

উড়ান

বাবা, এখন নাকি সিঙ্গাপুরেই সবচেয়ে উঁচু বিল্ডিংটা আছে, মানে যেটা এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংয়ের চেয়েও উঁচু?

—তাই তো শুনেছি।

উত্তরটা নিরাপদ। জানা না-জানার মাঝামাঝি। যদি ঠিক হয়, তা হলে,—বললামই তো। ভুল হলে,—শোনা কথা, ঠিক ভুল যারা বলেছে তারা জানে।

তাতাই-এর সব প্রশ্নগুলোই এখন সিঙ্গাপুর ঘিরে। তপনকেও সিঙ্গাপুর শিখে নিতে হচ্ছে এখন,—কিছুটা শুনে, বাকিটা পড়ে। কারণ একা তাতাই নয়, মাধবীও।

—হ্যাঁ গো, সিঙ্গাপুরে শুনেছি অনেক ভারতীয়?

—হ্যাঁ।

—তারা নিশ্চয়ই শাড়ি পরে, বলো?

অবাক হয়ে তাকায় তপন।

মাধবী প্রাঞ্জল করে, মানে অনেকগুলো শাড়ি নিয়ে ফেললাম তো, ওখানে শাড়ি দেখে লোকে ড্যাবড্যাব করে না তাকিয়ে থাকে।

—পাগল। কসমোপলিটন শহর। পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে মানুষ এসেছে। তা ছাড়া সবাই ওখানে ব্যস্ত। সকলেই ছুটছে। এশিয়ার কমার্শিয়াল ক্যাপিটাল বলে কথা। তোমার শাড়ি দেখার সময় আছে ওদের?

ঘাড় নাড়তে নাড়তে চলে গেছে মাধবী। তাও শেষ অবধি কী ভেবে কয়েকটা শাড়ি বের করে সালোয়ার কামিজ ঢুকিয়ে নিয়েছে সুটকেসে। মস্ত একখানা ফর্দ করেছিল। মিলিয়ে মিলিয়ে গোছাতে গিয়ে দুটো সুটকেসে ধরল না, তিন নম্বর একখানা কিনতে হল, তাতাই-এর জন্য।

তপন রাগারাগি করেছিল—মাথাপিছু চল্লিশ কেজি: শেষকালে দেখবে প্লেনে উঠতেই দিচ্ছে না।

মাধবীও গলা তুলেছিল,—চল্লিশ কেজি কততে হয় তোমার আন্দাজ আছে? চল্লিশ কেন, তিরিশও হবে না। তা ছাড়া একটা হ্যান্ডব্যাগও তো নিতে দেয় শুনেছি।

বোঝা যায় মাধবীও বন্ধু-বান্ধব-আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে খোঁজ খবর নিচ্ছে। সিকিওরিটি চেক ব্যাপারটা কী দুদিন আগে সে বিষয়ে গুছিয়ে জ্ঞান দিল তাতাইকে পাশের ঘর থেকে শুনল তপন। তপন ভাবছিল, কাস্টমস এড়িয়ে কী কী আনা যেতে পারে। কিন্তু সস্তা বলেই সিঙ্গাপুরে লজেন্স-এর দরে ক্যামেরা বিক্রি হয় এমন তো হতে পারে না।

ক্যালেন্ডারে চোখ চলে যায় তপনের। দিনের মধ্যে ছ-সাতবারই যায়, যাচ্ছে ক'দিন হল। আর আটদিন। মাঝে মাঝে ভাবে একটা খবর নেবে, কতদূর এগোল? তারপরই নিজেকে সান্ত্বনা দেয়, কী দরকার? সরকারদা নিজেই যখন দায়িত্ব নিয়ে বলে গেছে,

কোনও চিন্তা নেই ব্রাদার, বৌমাকে শুধু বলো গোছগাছ করতে, আর তুমি ভাবো কী কী শপিং করবে, বাকি চিন্তা আমার,—তখন অনর্থক চিন্তা করে সময় নষ্ট করার কোনও মানে হয়?

অথচ আলাপটা একেবারেই হঠাৎ হয়ে গেল।

মাধবীর কাকা বিলাসপুরে থাকেন, ক'দিনের জন্য এসেছিলেন ফিরে যাবেন, সেই টিকিট কাটতে কম্পিউটারাইজড রিজার্ভেশন কাউন্টারে লাইন দিয়েছিল তপন। ঘন ঘন ঘড়ি দেখছিল, অফিসের লেট হয়ে যাচ্ছে। তপনের জনাতিনেক সামনে ছিলেন সরকারদা, মানে সরকারদাকে তখন সরকারদা বলে চিনত না তপন। একেবারে কাউন্টারে পৌঁছে গেছেন সরকারদা, স্লিপ ভেতরে পাঠিয়ে দিয়েছেন, কী একটা কারেকশনের জন্য ভেতর থেকে স্লিপ ফেরত পাঠাল। কলম বের করে লিখতে গিয়ে সরকারদা দেখলেন রিফিল শেষ। পেছনে-পাশে তাকালেন, কেউ একটা পেন এগিয়ে দিল না।

তপন যে পেনটা এগিয়ে দিয়েছিল তার কারণ, একজন অসহায় মানুষকে সাহায্য করা যতটুকু ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল নিজের স্বার্থ,—ওরটা হয়ে গেলে তপনের টার্নও তাড়াতাড়ি আসবে।

সরকারদা কিন্তু অন্য রকম বুঝলেন। নিজের কাজ হয়ে গেলেও পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তপন টিকিট নিয়ে বেরোতে যাচ্ছে, পাশে এগিয়ে এলেন,—কিছু মনে করবেন না, আপনার নামটা জানতে পারি?

অবাক হয়েছিল তপন। তাড়াও ছিল, তবু বলেছিল, তপন, তপন দাশগুপ্ত।

পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে ভদ্রলোক বলেছিলেন আমার নাম পরিমল সরকার। 'উড়ান' বলে একটা ট্রাভেল এজেন্সি চালাই আমরা।...আজকাল মানুষ, মানে মানুষের মতো মানুষ তো খুব একটা দেখা যায় না। আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে ভাল লাগল। সকলে কেমন যেন স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক হয়ে গেছে। নিজেরটা বাদ দিয়ে ভাবে না আর কিছু। সামান্য একটা পেন, তাই-ই বাড়িয়ে দিতে তিনবার ভাবে।...কিছু মনে করবেন না ভাই, যেচে আলাপ করলাম। এই আমার কার্ড, রইল, দরকার হলে ফোন করবেন।

সারাদিনই কথাগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করল তপন। ভুলতে পারল না। রাত্তিরে মাধবীকে বলল। মাধবী, মেয়েরা যেমন হয়, সবকিছুতেই স্বার্থের গন্ধ খোঁজে, তাতিয়ে দিল,—বাঃ ভালই তো, ট্রাভেল এজেন্সির লোক মানে তো কত জায়গায় বেড়ানোর সুযোগ। কার্ড যখন দিয়েছে, একটা ফোন করলেই তো পারো।

দোনামনা করে শেষ অবধি ফোনটা করেই ফেলল তপন। অন্য কেউ ধরল। নাম বলতেই সঙ্গে সঙ্গে ডেকে দিল। তপন পরিচয় দিতেই, আরে কী খবর, কী সৌভাগ্য! আপনি যে ফোন করবেন, ভাবতেই পারিনি। চলে আসুন একদিন। ঢাকুরিয়া ব্রিজ থেকে নেমেই বাঁদিকে। যে কাউকে জিজ্ঞেস করবেন, সঙ্গে সঙ্গে বলে দেবে। আসুন, ভাল লাগবে।

ফোন ছেড়ে দিয়েও ভাললাগাটুকু জড়িয়ে ছিল হাতে। অতটুকু আলাপেও মানুষটা কেমন আপন করে নিয়েছে। আত্মীয়তা রক্তে নয়, আবার যেন উপলব্ধি করে তপন।

একদিন কোনও এক নেতার অপমৃত্যু, অসংখ্য সরকারি কর্মীর আশীর্বাদ কুড়িয়ে নেতা হাফ-হলিডে মঞ্জুর করে চুল্লিতে গেলেন, ছুটি পেয়ে তপন 'উড়ান' দেখতে গেল।

দেখে কিন্তু চমকে গেল। প্যান্ট বুশশার্ট, বর্ষার জুতো পরিমল সরকারকে দেখে তপন ভাবতেও পারেনি, ভদ্রলোক অমন একটা ঝাঁ চকচকে অফিসে কাজ করেন। আর কাজ বলে কাজ? চরকির মতো টেবিল থেকে টেবিলে ঘুরছেন পরিমল, সকলকেই কোনও না কোনও কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছেন, সবাই সরকারদা ছাড়া যেন অচল। তপনকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে কম্পিউটার রুমও দেখিয়ে আনলেন সরকারদা। সমস্ত ফ্লাইট, ট্রেন-নাম্বার সেখানে কম্পিউটারে ফুটে উঠছে,—কোথায় কোথায় কোন সিট খালি আছে বোতাম টিপলেই উঠে যাচ্ছে কম্পিউটার স্ক্রিনে।

একটা খালি চেয়ারে বসিয়ে কফি আনতে বললেন সরকারদা। তারপর গালে মিষ্টি একটা হাসি বোঝাই করে বললেন আমরা মানুষকে শুধু স্বপ্ন দেখাই না, স্বপ্নের ডানায় চড়িয়ে আকাশে উড়িয়েও দিই।

বেরিয়ে এসেও মাথা ঝিমঝিম করছিল তপনের। যেন স্বপ্নটা তারও মধ্যে চারিয়ে দিয়েছেন সরকারদা। ফিরে মাধবীকে স্বপ্নের একটা টুকরো ভাগ দিল রাত্তিরে। মাধবী হামলে পড়ল,—ভদ্রলোককে একদিন বলো না আসতে। শুনেছি ওঁদের হাতে দারুণ ট্রিপ থাকে। আমাদের যদি কনসেশনে কোথাও একটা নিয়ে টিয়ে যেতে পারেন।

দুদিন বাদেই ফোন। এবার সরকারদার,—কেমন লাগল?

উচ্ছ্বাসটা চেপে রেখে তপন বলল, খুব ভাল। এবার একদিন আমাদের গরিবখানায় আসুন। পারলে বৌদিকেও নিয়ে আসবেন। একটা সন্ধ্যা আপনার স্বপ্নের ডানায় আমরাও না হয় উড়ি।

হা হা করে হাসলেন পরিমল। বললেন, যাব।

মাধবী অনেকদিন পর কোমর বেঁধে রাঁধল। চুলে শ্যাম্পু করল। ঠোঁটে লিপস্টিক ঘষল। তারপর সন্ধেয় সবচেয়ে ভাল শাড়ি বের করে সরকারদার জন্যে অপেক্ষা করল।

সরকারদা এলেন একটু দেরি করে। এক বাক্স গাঙ্গুরামের সন্দেশ নিয়ে। তাতাইকে আদর করলেন, মাধবীর হাতে মিষ্টির প্যাকেট দিলেন, তপনের সঙ্গে পা ছড়িয়ে আড্ডা মারলেন, তারপর খাওয়া দাওয়া হলে মাধবীই কথাটা পাড়ল।

—দাদা, শুনেছি আপনাদের হাতে নাকি দারুণ দারুণ ট্রিপ থাকে। চেনাজানাদের সস্তাতেও নিয়ে যাওয়া যায়। দেখুন না চেষ্টা করে, আমাদের যদি কোথাও একটা ঢুকিয়ে নেওয়া যায়।

সরকারদা মুচকি মুচকি হাসছিলেন—ভালই খবর রাখো দেখছি,—ততক্ষণে তপন ও মাধবী দুজনেই আপনি থেকে তুমিতে,—তা কোথায় যাবে ভেবেছ কিছু?

লাফিয়ে ওঠে তাতাই,—তার মানে যেখানে চাই সেখানেই যাওয়া যাবে?

—না, না অতটা নয়, নায়েগ্রা দেখাতে নিয়ে যেতে পারব না, আফ্রিকাটাও অসম্ভব, তবে ছোটখাটো ট্রিপ হলে অসুবিধা হবে না।

মাধবীর হিসেবি বুদ্ধি, গোড়াতেই বলিয়ে নিতে চায়,—অসুবিধা হবে মানে কী দাদা? আফ্রিকা-ইউরোপ ওসব জায়গায় যেতে তো অনেক খরচ।

—হ্যাঁ, খরচ আছে, এবার যেন একটু চিন্তিত হন সরকারদা, তা ছাড়াও আর একটা অসুবিধে, তোমাদের তিনজনের একসঙ্গে টিকিট জোগাড় করা মুশকিল। তার চেয়ে কাছাকাছি, ধরো এই সিঙ্গাপুর।

—সিঙ্গাপুর! দারুণ হবে। লাফিয়ে ওঠে তাতাই,—ওখানে নাকি একটা জাঙ্গল

সাফারি আছে, খোলা জন্তু জানোয়ারের মধ্যে দিয়ে গাড়ি করে নিয়ে যায়। সিঙ্গাপুরটাই হোক।

একটু লজ্জা লজ্জা করে তপনের। যেন সিঙ্গাপুরটা হয়েই গেছে। তিনজনের সিঙ্গাপুর, কনসেশন রেটে টিকিট কাটলেও কম করে তিরিশ চল্লিশ হাজারের ধাক্কা। কোথা থেকে জোগাড় করবে অত টাকা?

শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলে, তিনজনের সিঙ্গাপুর মানে কতখানি কনসেশন পাওয়া যেতে পারে সরকারদা?

সরকারদার মুখে ততক্ষণে হাসিটা ফিরে এসেছে, আন্দাজ করো।

ফর্টি পার্সেন্ট? বাড়িয়েই বলে তপন।

—ওপরে।

—ফিফটি?

—ওপরে।

—সেভেনটি ফাইভ? এবারে উত্তেজনা আর গোপন রাখতে পারে না তপন, পার্সেন্টেজটাও যতদূর সম্ভব তুলে দেয়।

—আরও ওপরে ভাবো।

—হান্ড্রেড, এবারের গলাটা মাধবীর।

—একজ্যাক্টলি। কোনও খরচই লাগবে না।

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে তপন। যেন আরব্য-রজনীর সেই জাদু-প্রদীপ হাতে বসে আছে সরকারদা। মাটিতে ঘষলেই ইচ্ছাপূরণ।

সরকারদা হাসতে হাসতে বলেন, ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলি। আমরা, ট্রাভেল এজেন্টরা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্সগুলোর কাছ থেকে কিছু কমপ্লিমেন্টারি টিকিট পাই। অধিকাংশ সময়ই সেগুলো নেওয়া হয় না, আন ইউটিলাইজড থেকে যায়। সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্স-এর ওরকম বেশ কিছু ফ্রি টিকিট আমার নামে জমা পড়ে আছে। সময় কোথায়? তা ছাড়া সিঙ্গাপুর আমার একবার নয় তিন তিন বার দেখা। তোমরা যদি যেতে চাও, আমি টিকিট ধরে রাখব, কোনও অসুবিধা হবে না।

—যাওয়া আসা তিনজনের, একদম ফ্রি?

—একদম ফ্রি।

নিশ্বাসটা বুকের কাছে আটকেছিল যেন, এতক্ষণে ছেড়ে দিয়ে লম্বা করে শ্বাস নিল মাধবী, বলল, যাঃ, আপনি ঠাট্টা করছেন।

সরকারদা হেলান দিয়ে বসলেন, বিশ্বাস না হলে যেয়ো না। এমনিতেই টিকিটগুলো নষ্ট হয়, এবারেও না হয় হবে।

সমস্ত এগোতে লাগল ঝড়ের মতো। সরকারদাই বলে বলে দিচ্ছেন, তপনরা শুধু করে যাচ্ছে।

প্রথম পাসপোর্ট। তিনজনের কারোরই পাসপোর্ট নেই। সরকারদা অভয় দিলেন কোনও চিন্তা নেই। দুভাবে পাসপোর্ট করা যায়। একটা অর্ডিনারি, বছর ঘুরে যায়; অন্যটা আর্জেন্ট, দু'সপ্তাহে পাওয়া যায়। আমার ভেতরে লোক আছে, দু'সপ্তাহও লাগবে না। তোমাদের কাজ দেখেশুনে ফর্মটা ফিলাপ করা।

একটা রাত তিনজনে বসে জেগে জেগে ফর্ম ভরল। তবু দু'একটা জায়গায় আটকে

গেল, সরকারদাকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিল। ছবি তোলাতে হল। সেটাও চব্বিশ ঘণ্টায় ডেলিভারি পাবার জন্যে ডবল চার্জ দিতে হল। সরকারদা এসে ফর্ম, ছবি আর টাকা নিয়ে গেলেন।

হ্যাঁ, পাসপোর্ট অফিস তো আর বিনা পয়সায় কাজ করে দেবে না। হিসাব করে একটা মিনিমাম চার্জ বলেছিলেন সরকারদা। সেটাই তপন দিয়ে দিল হাতে।

পাসপোর্ট, প্লেনের টিকিট ছাড়াও খরচ আছে। এয়ারপোর্ট ট্যাক্স লাগবে, কিছু ফরেন এক্সচেঞ্জ, তা ছাড়া হোটেল ভাড়া। সিঙ্গাপুরের হোটেলগুলো সাংঘাতিক এক্সপেনসিভ, সরকারদাই খোঁজখবর করে ইস্ট হরাইজন বলে মোটামুটি সস্তার একটা হোটেল বুক করলেন, শুধু প্রথম দু'দিনের ভাড়াটা অ্যাডভান্স নিচ্ছে ওরা, পারডে দেড়শো ডলার। সরকারদা বললেন, সিঙ্গাপুর জানো না তো, এখন টোকিওর চেয়েও বেশি খরচের শহর, আর তোমরা যাচ্ছ একদম পিক সিজনে। সারা পৃথিবীর মিলিওনেয়াররা এই সময় আসে সিঙ্গাপুরে এনজয় করতে। দেড়শো ডলার তো থ্রো অ্যাওয়ে রেট।

অত হিসাব মাথায় ঢুকছিল না তপনের। সবমিলিয়ে কত লাগবে সেটাই জানতে চাইল সরকারদার কাছে। সরকারদা একটা রাফ এস্টিমেট দিলেন। সতেরো হাজার দুশো। পরদিনই ব্যাঙ্কে পাসবইয়ে যতটা জমানো ছিল, প্রায় ততখানিই তুলে দিয়ে এল সরকারদার হাতে। পি. এফ-এর একটা লোনের অ্যাপ্লিকেশনও জমা দিয়ে এল, নিজেদের হাতেও তো কিছু থাকা দরকার। তা ছাড়া শুধু প্রথম দু'দিনের হোটেল ভাড়াই দিয়ে যাচ্ছে, থাকবে তো তিনদিন।

খরচ শুধু যাওয়াতেই নয়, যাওয়ার প্রস্তুতিতেও। মাধবী যে কত টাকা সংসার খরচ থেকে সরিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল, এই সুযোগে টের পাওয়া গেল। নতুন সুটকেশ-জামাকাপড় জুতো থেকে শুরু করে কী নয়? তপন ঠাট্টা করল, লোকে সিঙ্গাপুর যায় শপিং করতে। আর তুমি বাক্স বোঝাই করে সিঙ্গাপুরে যাচ্ছ, জিনিসগুলো কি ওদের দিয়ে আসবে?

—কেন, আরও কিনব।

—কিনে আনবে কীসে করে?

—ওখানে ভাল সুটকেস পাওয়া যায় না?

তর্ক বৃথা, সরে গেছে তপন এবং তাতাই মস্ত একখানা ম্যাপ জোগাড় করেছে এশিয়ার, সেইখানে সিঙ্গাপুর জায়গাটা ঘিরেছে লাল কালি দিয়ে। সকাল সন্ধ্যা ম্যাপ নিয়ে গবেষণা হয়েই চলেছে। একদিন বিকেলে স্কুল থেকে ফিরল মুখে টিউবলাইট জ্বালিয়ে। ব্যাপারটা মাধবীই তপনের কাছে ভাঙল, আজ তাতাই সিট বেল্ট বাঁধা শিখে এসেছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, বন্ধু শৌভিকদের নতুন ওপেল অ্যাস্ট্রায় অনেক তোষামোদ করে একটু চড়েছিল তাতাই, ওই গাড়িতে সিটবেল্ট লাগানো যায়। শৌভিকই দয়া করে তাতাইকে সিটবেল্ট লাগানো আর খোলা শিখিয়ে দিয়েছে।

উত্তেজনাটা তপনের মধ্যেও ছড়িয়ে যাচ্ছিল। লোনের অ্যাপ্লিকেশন আগেই করেছে। ছুটির কথাটাও জানিয়ে রাখল। সত্যেন মুখোমুখি বসে, জিজ্ঞেস করল কী ব্যাপার, ছুটি, লোন, কোনও কাজটাজ আছে? কাজ মানে বোনের বিয়ে, ছেলের পৈতে। ওই সবেতেই লোন করে সবাই ছুটি নেয়। তিনদিনের ছুটি নিয়ে বেড়াতে গেলে কেউ বিশহাজার টাকা তোলে না। আর সিঙ্গাপুর বললে তো হাটে হাঁড়ি ভেঙে যাবে। বলা যায় না, কার মনে

কী আছে? বাগড়া দেবার লোকের তো অভাব নেই!

রোজ রাত্তিরে শোবার আগে ক্যালেন্ডারে দিন দেখে মাধবী, পনেরোদিন, বারো দিন, দশ সাত পাঁচ তিন।

যাবার যখন আর দিন তিনেক বাকি, মাধবীই ঠেলা দিল, কী ব্যাপার গো, কোনও খবরই পাচ্ছি না। এদিকে তো আমরা গোছগাছ করে তৈরি। পাসপোর্ট-ই হাতে এল না এখনও। একটু খোঁজ নাও না।

তপনেরও ভেতরে অস্বস্তিটা গুড়গুড় করছিল। শেষ অবধি একটা ফোন করল। সরকারদা ছিলেন না। অন্যদের কাছে মেসেজ রেখে বলল এলে যেন ফোন করেন। সরকারদা বিকেলেই ফোন করলেন, তপনের অফিসে।

—কী ব্যাপার?

—কিছু না তেমন। এই যাবার সময় তো হয়ে এল। কোনও খোঁজখবরই পাচ্ছি না, তাই ভাবলাম...মানে মাধবী বলল আর কি...

হা হা করে হাসলেন সরকারদা,—চিন্তা হচ্ছে? কবে যেন যাবার কথা তোমাদের?

ঢোক গিলল তপন, সে কী, ওদের যাবার দিনটাও ভুলে গেছেন সরকারদা? বলল আজ সোমবার, সামনের শুক্রবার, সাত তারিখ আমাদের যাবার কথা, ভোরের ফ্লাইট।

তা হলে তো আর দেরি নেই! ছুটি নিয়ে নিয়েছ? গোছগাছ?

—সব কমপ্লিট।

—ঠিক আছে, বিষ্যুৎবার দুপুরে, এই-ই দুটো নাগাদ এখানে এসে তোমাদের টিকিট, হোটেলের কাগজ, পাসপোর্ট সব নিয়ে যেয়ো। খুশি?

বুকের ভেতরটা কেমন করছিল তপনের। বলেই ফেলল, আপনাকে যে কী বলে...

—রাখো, রাখো, ওসব ফিরে এসে হবে খন, ফোন রেখে দিলেন সরকারদা।

সোম মঙ্গল বুধ, তিন দিন তিন রাত্রি। উড়ান। উড়ে চলেছে তাতাই, উড়ছে মাধবী এবং তপন। কাজের মাসি মানদা, তাকে আসতে বারণ করে দিয়েছে মাধবী। তবু অনেক কিছুই বুঝিয়ে দেওয়া বাকি। ফেরা সোমবার, কাজেই তার আগে একবার যেন এসে ঘরদোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখে। শুক্র-শনি-রবি তিনদিন দুধ বন্ধ, খবরের কাগজও। বারণ করা সত্ত্বেও শেষ অবধি তাতাই তার বন্ধু অভিষেককে খবরটা বলেই ফেলেছে। অভিষেক বলেছে, ছবি নিয়ে আসবি, দেখব। মাধবীও ওর বাবা মাকে না বলে পারেনি। এবং মাধবীর মা জানা মানে হাওড়া স্টেশনের ফলওয়ালাটা পর্যন্ত জেনে যাওয়া। তবু যাওয়া যখন হচ্ছেই, যাওয়া আর না যাওয়ার মধ্যে পড়ে রয়েছে কেবল বৃহস্পতিবার, টিকিট এবং আনুষঙ্গিক কাগজপত্র সংগ্রহ, তখন না বলার তেমন কোনও যুক্তিগ্রাহ্য কারণ দেখছে না কেউই।

বৃহস্পতিবার, এদিনটাও ছুটি নিয়েছে তপন। কারণ শুক্রবার ভোরের ফ্লাইট। প্রিপারেশনের জন্যও তো একটা দিন দরকার। মাধবী সব কিছুই গুছিয়ে নেবে তবু শেষ অবধি পৌঁছে দেখা যাবে তপনের রাতে পরার পাজামাই হয়তো নেওয়া হয়নি,—তাই লাস্ট টাচটা তপনই দেয়, বরাবর।

দুপুর। খাওয়াদাওয়া সেরে ফেলল একটার মধ্যে। একটা পনেরো। তপন রাস্তায়। অটো, বাস। বাস থেকে নেমে তপন দেখল হাত-পা থরথর করে কাঁপছে। ওই তো ট্রাভেল এজেন্সির ঝকঝকে নিয়ন আলো জ্বলছে নিবছে। 'উড়ান'! রিভলভিং দরজা

ঠেলে তপন ঢুকল। তাকাল বাঁদিকে ডানদিকে। সরকারদা। দূরের টেবিলে দাঁড়িয়ে কাকে যেন কী বুঝিয়ে দিচ্ছেন। আস্তে আস্তে সামনে গিয়ে দাঁড়াল তপন। সরকারদা ঘুরলেন।

আরে! এসে গেছ? এসো এসো, চলো বসে কফি খাই।

একটা ফাঁকা টেবিলে তপনকে বসিয়ে কফির অর্ডার দিলেন সরকারদা। জিজ্ঞেস করলেন, শুধু কফি, না সঙ্গে কিছু দিতে বলব?

—না, না আজ অফিস যাইনি। বাড়ি থেকেই এলাম। একটু আগেই লাঞ্চ করেছি; পেট ভর্তি। কিচ্ছু খাব না।

সরকারদা একটা সিগারেট ধরালেন। তাকিয়ে আছে তপন। টিকিট? হোটেল বুকিং? পাসপোর্ট?

সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়লেন সরকারদা, গোল করে, তাকালেন তপনের দিকে সোজা।

—একটা প্রবলেম হয়েছে জানো! তিনটে টিকিট মানে তোমাদের তিনজনের একসঙ্গে এখন রাশ সিজন তো জানই, পাওয়া খুবই ডিফিকাল্ট হচ্ছে।

হাঁ করে চেয়ে থাকে তপন।

সরকারদা বলে যান, কয়েকটা দিন দেরি হবে, একটু পিছিয়ে যাবে তোমাদের বেড়ানো। এই ধরো মাস খানেক। খুব অসুবিধে হবে?

তখনও যেন বুঝে উঠতে পারে না তপন। সরকারদা তপনের অবস্থা দেখে হেসে ফেলেন, কী হল, ভেঙে পড়লে নাকি? যাওয়া তো তোমাদের হচ্ছেই, কেবল সময়টা পিছিয়ে যাচ্ছে। যাও যাও, আর মুখ গোমড়া করে বসে থাকতে হবে না, বৌমাকে গিয়ে বুঝিয়ে বোলো, আমিও না হয় ফোন করে দিচ্ছি।

তপন বাড়ি ফেরার আগে মাধবী জেনে গেল, কথার নড়চড় নেই সরকারদার, ঠিক ফোনে সব বুঝিয়ে দিয়েছেন। যেমন ভেবেছিল তেমন হল না। মাধবীই বরং সান্ত্বনা দিল,—অত চিন্তা করছ কেন, একটা তো মাসের ব্যাপার। যাওয়া যখন হচ্ছেই...

ছুটি নেওয়া হয়ে গিয়েছিল। আবার জয়েন করার কোনও মানে হয় না। মাধবীর পিসিমা পুরুলিয়ায় থাকেন, অনেকবার যেতে বলেছেন, যাব যাব করে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। সেখানেই চলে গেল তিনজনে। কটা দিন হই হই করে কাটল। তবু, অযোধ্যা পাহাড়ের মাথায় বসেও একটা কাঁটা যেন তপনের পায়ে ফুটতেই থাকল।

ফিরে এসেই খোঁজখবর নিল। শান্তনুর এক পিসতুতো দাদা পাসপোর্ট অফিসে কাজ করেন, একদিন শান্তনুর চিঠি নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেল। শান্তনু জিজ্ঞেস করেছিল কী দরকার, একটা ভুজুংভাজাং দিয়ে ব্যাপারটা এড়িয়ে গিয়েছিল।

ভদ্রলোক বড় অফিসার, কিন্তু অমায়িক, প্রয়োজনটা তেমন করে বলার দরকার হল না, একজন পিওনকে ডেকে ঠিক ঠিক লোকের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে কম্পিউটার, তন্ন তন্ন করে খুঁজেও গত ছ'মাসের মধ্যে তাদের তিনজনের নামে কোনও পাসপোর্টের অ্যাপ্লিকেশন জমা পড়েছে খুঁজে পাওয়া গেল না।

তপন যে খুব ভেঙে পড়ল তা নয়, কারণ তার সন্দেহটা এইরকমই ছিল।

একমাস নয়, সাতদিনের মধ্যেই সরকারদার সঙ্গে দেখা করল তপন। মুখে সেই চওড়া হাসি, তপনকে দেখেই আপ্যায়ন,— এসো এসো, তোমাদেরটাই করছিলাম। এখনও তো তিন সপ্তাহ...

—আমাদের পাসপোর্টটা?

—সেটা তো কবে হয়ে গেছে। বাড়িতেই আছে আমার ড্রয়ারে। সব একসঙ্গে পাবে।

—আমি পাসপোর্ট অফিসে গিয়েছিলাম সরকারদা, সব খোঁজ নিয়েছি, কোনও অ্যাপ্লিকেশন আমাদের নামে জমা পড়েনি।

চোয়াল ঝুলে পড়ল সরকারদার। হাসি মিলিয়ে গেল। ফিরে এল পরমুহূর্তেই,—আরে আরে চটছ কেন ভায়া? পাসপোর্টটা আমাদের কাছে কোনও ব্যাপারই নয়। তোমাদের টিকিটের ব্যাপারটা ম্যানেজ হয়ে গেলেই...

—থাক, এবারে গলা তুলল তপন, মাথাটা নামিয়ে আনল টেবিলের ওপরে, চোখ সরকারদার চোখে, আমি পুরোটাই জেনে গেছি সরকারদা, সবটা। টাকাগুলো আমি ফেরত চাই। আমার ভায়রাভাই আই বি-র ইন্সপেক্টর এইটুকুই জানিয়ে গেলাম।

মিথ্যে কথাটা বলতে একটুও গলা কাঁপল না তপনের। কথাগুলো বলেই বাইরে বেরিয়ে এল। নীল আকাশে তখন পশ্চিম থেকে পুবে উড়ে যাচ্ছে একটা ঝকঝকে জেটপ্লেন।

তিনদিন পর ফোনটা পেল, একসঙ্গে টাকাটা দিতে পারব না, তিন মাসে শোধ করব, এসে নিয়ে যাবেন। হ্যাঁ, সরকারদা এবার আপনি বললেন তপনকে।

প্রথম কিস্তিটা নিয়ে এসেছে তপন। পরেরগুলোও পাওয়া যাবে, জানে। রাত্তিরে রোজকার মতো তিনজনে বসেছে। মাধবী বলল, এক মাসের কিন্তু দেরি নেই, খেয়াল আছে তো?

তপন তাতাইকে জড়িয়ে বলল, সিঙ্গাপুর থেকে তাতাইসোনা কী আনবে?

তাতাই বলল, সেটাই তো বুঝতে পারছি না। তুমি কিছু সাজেস্ট করো না বাবা?

তাতাই-এর মাথার গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে তপন মনে মনে বলে, স্বপ্ন।

চিলেকোঠা

তুমি এখনও বসে আছ মা? যাবে না?

কনিষ্ক। এই নিয়ে তিনবার। কৌশিক হলে অমন করে বলত না। পেছন থেকে এসে গলা জড়িয়ে ধরত,—আমার মামণি, সোনা মা, অনেক বেলা হয়ে গেছে; লক্ষ্মীটি, এবার চলো। ও দিকে সবাই যে না খেয়ে বসে রয়েছে।

আর কৌশিক বললে কি সরমাই না করতে পারতেন?

উপায় নেই কৌশিকের। ওরা দুজনে সাতসকালে উঠেই অল্প দুটো মুখে দিয়ে ওবাড়ি চলে গেছে। কী করবে। এ দিক থেকে যখন হুড়মুড় করে জিনিসগুলো গিয়ে পড়বে, কারওকে তো থেকে গুছিয়ে তুলতে হবে। তা ছাড়া শ্রী কিছু অন্তত রান্নাবান্না না করে রাখলে এতগুলো মানুষ খাবে কী? সব কিছু সাজিয়ে রাখতে রাখতে বেলা গড়িয়ে যাবে। শীতের বেলা, দেখতে না দেখতেই ঝুপ; খিদেও তো পাবে মানুষগুলোর। আর বাড়িটা যখন কৌশিকের তখন অন্য কে আর ও দিককার দায়িত্ব নেবে?

তবে যত সহজে হয়ে যাবে ভেবেছিলেন ততখানি হল না। প্রথমে ভাবা গিয়েছিল একটা লরি, একটা ম্যাটাডোর। তারপর দুটো ম্যাটাডোর, এখন তো পুরো এক ট্রিপ দিয়ে এসে তিনটে গাড়িই আবার প্রায় ভর্তি হয়ে এল। এখনও সব নেওয়া বাকি।

হবে না? আজকের জিনিস? দেখতে দেখতে চল্লিশ বছর হয়ে গেল। কৌশিক তো নয়ই, কনিষ্কও হয়নি। সামর্থ্য কম ছিল। তা ছাড়া নিজেদের থাকার একটা জায়গা, একদম আলাদা, তাতেই খুশি যেন উপচে উঠছিল। ছোট্ট বাড়িটার দুখানা ঘর, রোয়াক, রান্নাঘর, সিঁড়ি হয়ে চিলেকোঠা অবধি থইথই করছিল আনন্দ।

তা দোষেরও তেমন ছিল না। সরমার কেটেছে রেল কোয়ার্টারে। আজ এই স্কুল তো কাল অন্যটায়। শহরও আলাদা আলাদা। নতুন নতুন বন্ধু। চলন্ত ট্রেনের মতোই। জানলার কাচে মুখ রেখে তাকিয়ে ইস্টিশান দেখছ, একটু ঢুলুনি এসেছে কি আসেনি, চোখ খুলে দেখলে কদমগাছটা হয়ে গেছে শিউলিগাছ। আজকাল লিফটে উঠলেও অমনি মনে হয় সরমার। এক একবার দরজা খোলে, আর এক একটা মানুষ, এক একটা সংসার। সিনেমার ছবির মতো। পালটে পালটে যায়।

ওনারও ততটা না হলেও, কম কিছু ছিল না। মামারবাড়ি মানুষ, পড়াশুনা বাইরে বাইরে, হোস্টেলে। চাকরি পেয়ে থিতু হতে না হতেই মা-ও চলে গেলেন। কষ্ট পেয়েছিল মানুষটা। সরমা কাছে ছিলেন তখন। কষ্টটায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন। এখনও ভাবলে ভেতরটা টনটন করে ওঠে সরমার।

ধুপধাপ করে কী সব পড়বার আওয়াজ হল।

কী হল রে, সরমা তাড়াতাড়ি উঠতে গেলেন, আজকাল বসা থেকে দাঁড়িয়ে উঠতেও যে কী পরিশ্রম!

রনি, কনিষ্কর বড় ছেলে, ছুটে এল, কিছু হয়নি ঠাম্মা, হ্যামকটা ছিঁড়ে মাটিতে পড়ে

গেছে।

হ্যামক? বুঝতে না পেরে তাকিয়ে রইলেন সরমা, পেছন পেছন জয় এসেছিল, কৌশিকের ছেলে, বলল, দোলনা গো ঠাম্মা, ওই যে যেটা বারান্দায় ঝোলানো থাকত।

হ্যাঁ, এইবার বুঝতে পেরেছেন সরমা। দড়ি পাকিয়ে বানানো দোলনাটা ঝোলানো থাকত ভেতরের ঘরের লাগোয়া বারান্দায় ছাদের সঙ্গে ফাঁস লাগিয়ে। একবার, কৌশিক তখন ছোট, ওকে নিয়ে আস্তে আস্তে দোল খেতে খেতে গান গেয়ে ঘুম পাড়াচ্ছেন, হঠাৎ কনিষ্ক ছুটতে ছুটতে কী যেন বলতে এসেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। কনিষ্কর চোখের দিকে তাকিয়ে ওপরে তাকাতেই সরমারও হাত-পা ঠাণ্ডা। একটা সাপ পাশের জঙ্গল থেকে কখন এসে দোলনার দড়ি জড়িয়ে পাক খেয়ে সরমার মাথার একটু ওপরেই চুপচাপ বসে। কী করে যে কৌশিককে তুলে কনিষ্ককে জড়িয়ে ছুটে ঘরে গিয়েছিলেন আজও মনে পড়লে হাত-পা ঠকঠক করে কাঁপে। পাশে বাগানে কাজ করত ত্রিভুবন মালী, ওকে চিৎকার করে ডাকতে ও এসে খুঁচিয়ে সাপটাকে বের করেছিল।

কলকাতার বাইরে, আদিগঙ্গা পেরিয়ে এতদূর এসেছিলেন সরমারা। নইলে কি আর নিজেদের একখানা আস্ত বাড়ি হত? সে বাড়ির ঘর-বারান্দা-রান্নাঘর, সিঁড়ি এমনকী একখানা চিলেকোঠা অবধি ছিল। ছাদটাই ছিল কত সুন্দর। জামাকাপড় মেলো রে, আচার শুকোতে দাও রে, বড়ি রোদ্দুরে দাও রে, শীতে রোদ পোয়াও রে, গ্রীষ্মে সন্ধ্যায় গঙ্গার হাওয়া খাও রে।

ও বাড়িতে কিচ্ছু নেই। তিনটে ঘুপচি ঘুপচি ঘর। আর একখানা ব্যালকনি। ব্যস্। আছে অনেক, মোজাইক, টাইলস, শাওয়ার আরও কত কী? তবু কেমন যেন দমবন্ধ করা। চারদিক থেকে দেওয়ালগুলো চেপে ধরছে যেন। আর মাটিটা কত দূরে, কত নিচুতে। অত উঁচু থেকে খালি পায়ে মাটিতে নামা যায় না, জুতো পরে হাঁটতে হয়।

অবশ্য ওদেরও দোষ নেই। কনিষ্ক চাকরি নিয়ে বাইরে চলে গেল। কৌশিক অফিসের ফ্ল্যাট পাচ্ছে শহরের মধ্যে। কৌশিক-এর অফিস, জয়-এর স্কুল, শ্রী-র কলেজ সবই কাছে কাছে। তা ছাড়া এই বাড়িটা বুড়ো হয়েছে, চলটা খসে পড়েছে, সারিয়ে নিতে অনেক খরচ। পাড়ার রাজু অনেকদিন ধরেই পেছনে লেগেছিল, সরমাই রাজি হচ্ছিলেন না। নবমীর দিন হঠাৎ মাথাটা ঘুরে ওঠার পর থেকেই সরমার মনে হল আর মায়া বাড়িয়ে লাভ নেই। উনি থাকলে হয়তো শেষ অবধি রাজি হতেন না, সরমার সাহসে কুলোল না। তা ছাড়া রাজু দুটো ফ্ল্যাট দেবে, ইচ্ছে করলে টাকাও নিয়ে নিতে পারে কনিষ্ক আর কৌশিক। খারাপ কী?

অনেকক্ষণ থেকেই কসরত করছে, হাতুড়ি-শাবল অনেক কিছুই জড়ো করেছে, এবারে মনে হয় গাঁইতি-কুড়ুলটাও নিয়ে আসবে, হঠাৎ একটা শব্দ হল ধড়াম করে।

—ভাঙলি তো, বুকচেরা আর্তনাদ করে উঠলেন সরমা।

—না দিদিমা, এতক্ষণে খোলা গেছে। অত দিনের জিনিস, খোলা কি সোজা কথা?

—খুললি না ভাঙলি, ঠিক করে বল তো বাবা?

—না বাবা না, ভাঙেনি, বিশ্বাস না হয় দেখে যান।

রাজুই জোগাড় করে দিয়েছে। লরির সঙ্গে লেবার। সবকিছুই ম্যানেজ করেছে, খাটটায় এসে ঠেকে গিয়েছিল ওরা। কিছুতেই আর খুলতে পারছিল না। পারবে কী করে? খাঁটি বার্মাটিকের জিনিস, অকশনে কেনা। একি আজকালকার হালকা-পলকা শৌখিন মাল?

প্রথমটায় সরমাও ঘাবড়ে গিয়েছিলেন, বাবা, অত উঁচু? উঠব কী করে খাটে?

কানে নেননি কর্তা। একটা টোকা মেরে বলেছিলেন, আসল সোনা বুঝেছ! যত দিন যাবে তত এর দর বাড়বে। তোমার ছেলের নাতিও এই খাটেই শোবে, তুমি দেখে নিয়ো।

ছেলের নাতি? নতুন বাড়িতে ঢোকানোতেই যে কী আপত্তি, কত ওজোর! নাতিও নয়, ছেলে। ভাগ্যিস ওনাকে দেখে যেতে হল না।

কত হবে, চারটার। ছেলে ঘুমোচ্ছে, সরমারও দুপুরে দুটো চোখের পাতা সবে লেগে এসেছে, হঠাৎ দুদ্দাড় আওয়াজে ধড়মড় করে উঠে বসলেন। খোকা, কোথায় গেল?

তাকিয়ে দেখেন ছেলে নীচে, খিচুনি হচ্ছে। তাড়াতাড়ি কোলে তুলে দেখলেন মাথা ফুলে আলু, একটা দাঁত ভেঙে গিয়েছে, রক্ত পড়ছে গলগল করে। হবে না, অত উঁচু খাট, চাট্টিখানি কথা? দুপুরবেলা, চিৎকার করে পাড়া মাথায় করলেও কাউকে পাওয়া যাবে না। মাথা ঠাণ্ডা করলেন সরমা। তাড়াতাড়ি মাথায় থাবড়ে থাবড়ে ঠাণ্ডা জল দিলেন। এক খাবলা চিনি নিয়ে চেপে ধরলেন মাড়িতে। বহুক্ষণ বাদে ছেলে ডুকরে কেঁদে উঠল। ধড়ে প্রাণ এল সরমার। রক্ত বন্ধ হতে পরে দেখলেন একটা দুধের দাঁত ভেঙেছে, ভয় নেই, উঠে যাবে। উঠেছিল, কিন্তু মাড়িটা অনেকদিন ফাঁকা থাকায় দাঁতটা আগে উঠে বড় হয়ে গিয়েছিল। কনিষ্কর সামনের দাঁতটা তাই একটু উঁচু। কাউকে কখনও বলেননি, সরমাই শুধু জানেন, ওই দাঁতটা খুঁত হয়ে যাবার কারণ এই মস্ত পালঙ্কখানা।

নীচে যেতে ইচ্ছে করছে না।

কী দেখবেন? যেখানে পালঙ্কখানা ছিল সেখানে বেআব্রু খানিকটা চলটা ওঠা মেঝে। ওরা পালঙ্কটা খুলে নিয়ে গেছে। পালঙ্কটাই জানে ওরা। কাঠ-লোহালক্কড়-ছতরি-পায়া। পালঙ্কর ওপরটা ওরা জানে না।

দেওয়ালটাও এখন পরিষ্কার। মুখোমুখি একটা ছবি ছিল। গ্রুপ ফটো। টালিগঞ্জের স্টুডিওতে গিয়ে তুলিয়েছিলেন। সে স্টুডিও উঠে গেছে। গত বছর নীলিমার মেয়ের বিয়েতে গিয়েছিলেন ও পাড়ায়। ট্যাক্সি থেকে নেমে খুঁজছেন, নীলিমার বর অনঙ্গ বলল, কী খুঁজছেন মাসি? সরমা বললেন, এখানে একটা ফটো তোলার দোকান ছিল না? অনঙ্গ হেসে বলেছিল, হ্যাঁ, ছিল তো, তিন বছর হল উঠে গেছে। ওই যে মাংসের দোকানটা দেখছেন, ওটাই ফটো তোলার স্টুডিও। সরমা তাকিয়ে দেখলেন মস্ত বড় একটা চপার নিয়ে খালি-গা একজন কিমা বানাচ্ছে।

মনে পড়ে গেল ছবি তুলতে গিয়ে কৌশিক কী ঝামেলাই না করেছিল। কৌশিকের তখন, কত হবে, বছর দুই? একটু আগেই দাদার হাত থেকে লজেন্স কেড়ে নিতে গিয়ে একটা থাপ্পড় খেয়েছে, তখনও চোখ লাল। তারপর ছবি তুলতে এল যে সে কালো কাপড়ে মাথামুড়ি দিয়ে কী সব আলোটালো ফেলল, দেখেশুনে তো ওর মেজাজ খাপ্পা। কালো কাপড়ের আড়ালে কী আছে দেখা ওর চাই-ই চাই। চিৎকার করে আকাশ ফাটাচ্ছে, সেই অবস্থাতেই ফটোগ্রাফার বলল, রেডি। ছবি তো তোলা হয়ে গেল। একটু বড় হতে, বুঝতে শিখল যখন, হাঁ করা নিজের ছবি দেখে এই মারে কি সেই মারে। দেওয়াল থেকে ছবিটা নামিয়েই ছাড়বে। অনেক বলে-কয়ে বুঝিয়ে তবে রেহাই পেল।

ছবি কি আর ছবি? পালঙ্কও পালঙ্ক নয়। দোলনার দিকে তাকালে দোলনা দেখতে পান না সরমা। ছবি-পালঙ্ক-দোলনা সবকিছুর গায়ে গায়ে জড়িয়ে সুতোয় গাঁথা বেলফুলের মতো অতীত থেকে টুপটাপ উঠে আসে এক একটা স্মৃতি, তার সমস্ত গন্ধ নিয়ে। ওরা তার কতটুকু বুঝবে?

গন্ধ বলতেই মনে পড়ে গেল। কদমগাছ। পেছনের ছোট একটুকরো জমি, সেখানে কেমন করে যেন একটা কদমগাছ হয়েছিল। লাগানো হয়নি, পাখি মুখে করে বীজ এনেছিল, তাই থেকেই হবে। বর্ষায় কী গন্ধ কী গন্ধ! কদমফুলের গন্ধটা কেমন নেশা ধরায়, মাথা ঝিমঝিম করে। কিন্তু ওই গন্ধটায় অন্য কিছু ছিল। কেমন বাড়ি বাড়ি ব্যাপার। এমনও হয়েছে, মধুপুরে বেড়াতে গেছেন, কোথা থেকে ঝোড়ো বাতাস বয়ে নিয়ে এল কদমফুলের গন্ধ, অমনিই বাড়ির কথা মনে পড়ে গেল।

ওনাকেও তো ওই কদমগাছের নীচেই শোয়ানো হয়েছিল। সরমা বুঝতেও পারেননি। খেয়ে উঠে দুপুরবেলায় শুয়ে শুয়ে মাথার কাছে রেডিও রেখে গান শুনতেন। ঘুমোনোর অভ্যেস ছিল না। মজা করে বলতেন, একটা মানুষ ঘুমিয়েই জীবনের তিন ভাগের এক ভাগ খরচ করে ফেলে জানো? যে ষাট বছর বাঁচল, সে আসলে কিন্তু ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিল কুড়িটা বছর। সরমারই বরং অনেকদিনের অভ্যেস, দুপুরে মেঝেতে মাদুর পেতে একটু গড়িয়ে নিতেন। তা সে দিনও, পালঙ্কের ওপর উনি, সরমা মাটিতে, হঠাৎ মনে হল দুবার কাশলেন। ঘুমের মধ্যেই শুনলেন, আবার ঘুমিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে, জল এসেছে, কল খোলা ছিল, জলের আওয়াজে ধড়মড় করে উঠে পড়লেন সরমা; বালতিগুলো ভরে না রাখলে রাত্তিরে জলের টান পড়বে। তখনও খেয়াল করেননি। জল ভরে রান্নাঘরে গিয়ে চা বানিয়ে, পাতলা লিকারের চা পছন্দ ছিল মানুষটার, এসে ডাকতে গিয়ে দেখেন, কেমন ঘাড় কাত করে শুয়ে, চশমাটা পাশে গড়িয়ে পড়েছে।

গায়ে হাত দিতেও হয়নি, ডুকরে কেঁদে উঠেছিলেন সরমা। বাইরে বাসন মাজছিল কালোর বউ, ছুটে এসেছিল। কৌশিক তখন অফিসে, বিয়ে করেনি, হাঁপাতে হাঁপাতে এল। কনিষ্ক এল পরদিন দুপুরে। ততক্ষণ অবশ্য রাখা যায়নি। কৌশিকই মুখাগ্নি করল। সকাল অবধি ওরা কনিষ্কর জন্য ওনাকে রেখে দিয়েছিল। শুইয়েছিল ওই কদমগাছের নীচে। সরমাই বলেছিলেন। কদমফুলের গন্ধ বড় ভালবাসত মানুষটা।

এই চিলেকোঠার ঘর থেকে সবটুকুই দেখতে পাচ্ছেন সরমা। পেছনের কদমগাছ, গাছটাও বুড়ো হয়ে গেল বোধ হয়, শুকিয়ে গেছে, ফুল ফোটে না আর। গাছের নীচটা খালি। আর কটা দিন। তারপরেই প্রোমোটারের লোক এসে কুড়ুল চালিয়ে ওর শিরদাঁড়া ভেঙে মটকে দেবে। পেছনে কত নতুন নতুন বাড়ি, নতুন মানুষজন। এদের চেনেন না সরমা। সেইভাবে দেখতে গেলে সরমারই এখন পাড়ায় নিজেকে নতুন নতুন লাগে—আনকোরা, অচেনা, যেন বেড়াতে এসেছেন। সামনের গ্র্যাভেল বিছানো ছোট রাস্তাটুকু হেঁটে পার হলেই কাঠের ল্যাচ দেওয়া দরজা, তারের পাঁচিল। ওপাশে বারো ফুট রাস্তা। রাস্তায় জড়ো হচ্ছে সরমার সংসার। শেষ চিহ্নটুকুও মুছে নেওয়া হয়ে গেছে। বাকি সরমা নিজে। চলে গেলেই পড়ে থাকবে বাড়ির কঙ্কাল। তারপর সব ভেঙেচুরে মাথা তুলবে একটা ফ্ল্যাটবাড়ি।

—যাবে না মা?

মাথা না ঘুরিয়েও সরমা বুঝতে পারলেন, কৌশিক।

—তুই এলি যে, ও দিকটা কে দেখছে?

—শ্রী, ও একাই সামলে নেবে বাকিটা। মোটামুটি গুছিয়ে রেখে এসেছি। তোমাকে ভাবতে হবে না।...চলো!

—এই যাই।

যাই বললেন, ওঠার ভঙ্গিও করলেন একটু, আবার কোমর ভেঙে বসে পড়লেন। কৌশিক এগিয়ে এল,—ধরব?

—আমাকে ধরতে হবে না, তুই জিনিসগুলো নে।

—জিনিস? কৌশিক অবাক হয়।

সরমা পেছন থেকে পোঁটলাটা সামনে আনেন। সিঁদুরের কৌটো, খোকার দুধ খাওয়ানোর রুপোর ঝিনুকবাটি, একটা গ্রুপ ফটো, আরও কী সব। সমস্ত জড়ানো একটা মলিন বিছানার চাদরে।

—এটা, মানে এইসব, ইয়ে...ওই বাড়িতে যাবে?

—যাবে বইকী বাবা।

—না, মানে এইসব নোংরা পুরনো জিনিস না নিলেই কি নয়?

—আমিও তো পুরনো হয়েছি অনেক। নোংরাও। ফেলেই দে না হয়।

চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে কৌশিক, কনিষ্ক হলে চোটপাট করত। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নীচে নেমে গেল। দাদার সঙ্গে পরামর্শ করতে বোধ হয়।

কত বছর হবে? কৌশিক হয়নি তখনও। ভরসন্ধেয় এল মানুষটা। কর্তার পেছনে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে। অন্ধকারে ভাল করে ঠাহরও করতে পারেননি। কর্তাই ডাকলেন, আয় অর্ক, আমার বউ রমা, আলাপ করিয়ে দিই।

অর্ক? অর্কপ্রভ? এই মানুষটার কথাই উনি সাতকাহন করে গল্প করতেন সরমাকে? দু হাতে পিস্তল নিয়ে ছুটতে ছুটতে উধাও হয়ে গিয়েছিল, ছুটন্ত কুকুরের পায়েও গুলি করতে পারে, মাথার দাম পাঁচ লক্ষ টাকা, তিনটে রাজ্যের পুলিশ পাগলের মতো খুঁজে বেড়াচ্ছে—সেই অর্কপ্রভ? দাড়ির জঙ্গলের আড়ালে মুখটাকে খুঁজে পেলেন না, শরীরটাও পাকিয়ে যেন শনের দড়ি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধুঁকছে, ধাক্কা দিলে পড়ে যাবে।

চিলেকোঠার ঘরে থাকতে দেওয়া হল। নিজেই পছন্দ করল এই ঘরটা। জোর করেছিলেন উনি, কিছুতেই শুনল না, বলল, মাটিতে না শুলে অভ্যেস খারাপ হয়ে যাবে। শেষ অবধি একটা মাদুরের ওপর চাদর বিছিয়ে শুত। চব্বিশ ঘণ্টা বিড়ি, বিড়ির গন্ধ আবার সহ্য করতে পারতেন না সরমা। দাড়ি কেটে ফেলেছিল। দুখানা জ্বলজ্বলে চোখ যেন দাড়ির আড়ালে ঘাপটি মেরে বসেছিল। লাফিয়ে বেরিয়ে এল সুযোগ পেয়ে। আর সেই চোখদুটো সরমার মুখের ওপর ফেলে যখন বলত, কত কিছু যে করার ক্ষমতা ছিল আপনাদের, সব নষ্ট করলেন এই হেঁশেল ঠেলে আর ছেলে মানুষ করে, সরমার ভেতরে কোথায় কী সব যেন হত।

সরমা খুব চেয়েছিলেন, উনি যেন না যান। অন্তত যতদিন ওই মানুষটা রয়েছে। উনি শোনেননি। জরুরি ট্যুর, তিন দিনের জন্য মধ্যপ্রদেশ যেতে হবে। অর্ক রইল, দেখো। সাবধানে রেখো।

প্রথম দিনটা ভালয় ভালয় কাটল। মানুষটা ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে কীসব কবিতা আউড়ে গেল সারাদিন। অনেক রাত অবধি জেগে জেগে গান গাইল। খাবার খেতে নীচে নামল না। সরমাই খাবার পৌঁছে দিয়ে এলেন। দুপুরে খেল। পরদিন সকালে ওপরে উঠে দেখলেন, রাতের খাবার ঢাকা দেওয়া।

—কী হল, খাননি?

প্রথমে জবাব দিল না। মাথা ঘোরালে দেখলেন, চোখ দুটো টকটকে লাল।

—শরীর খারাপ?

হ্যাঁ-না-এর মাঝামাঝি ঘাড় নেড়ে ওপাশ ফিরে শুয়ে পড়ল আবার। থালা-বাসন নিয়ে নীচে নেমে এলেন সরমা।

—মা, চলো, দেরি হয়ে যাচ্ছে, লরিওয়ালা ডাকাডাকি করছে। এবারে দু ভাই একসঙ্গে এসেছে।

উঠলেন সরমা। বলতে হল না, সরমার পোঁটলাটা কৌশিক কাঁধে নিয়েছে। নিক, ওটা ওরই নেওয়া উচিত। সিঁড়ি দিয়ে নামতেই হাঁপ ধরে গেল যেন। একটুখানি রাস্তা হেঁটে দরজা অবধি এসে একবার ঘুরলেন। দেখলেন বাড়িটা।

—মা, ওরা ভিক্ষে চাইছে। তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে। দেবে?

কৌশিকের গলা শুনে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন পাড়ার কিছু পুরনো ভিখিরি। সরমা দিতেন। এই নিয়ে ওনার সঙ্গেও ঝগড়া হত। এরা সরমাকেই চিনত। ছেলেরা জানে।

—দিয়ে দে, আজ আমার হয়ে তোরাই দে না হয়।

—না মা, তুমিই দাও।

ছেলেদের হাত থেকে নিয়ে ছড়িয়ে দিলেন ওদের মধ্যে, আনন্দ করে নিল।

কেউ চাইলে না দিয়ে পারেন সরমা? সে ভিক্ষাপাত্র বাড়িয়ে দিয়েই চাক, আর দুখানা বড় বড় লাল চোখ চোখের ওপর ফেলেই চাক, সরমা দিয়েই থাকেন। দিয়েও যে এতখানি পূর্ণ হয়ে ওঠা যায় আগে তো কখনও বোঝেননি।

ফিরে এসে রেগে আগুন হয়ে গিয়েছিলেন উনি।

—চলে গেল? তুমি ওকে যেতে দিলে?

আমি যেতে দেবার কে? আমি আনিওনি, তাড়িয়েও দিইনি। কথাগুলো বলে উঠতে পারেননি সরমা। শুধু এক আশ্চর্য ভিক্ষাপাত্রে দান করার সুখ সমস্ত শরীরে বয়ে বেড়িয়েছিলেন।

সে দিনটার কথাই বেশি মনে পড়ে। মানুষটা অফিস থেকে ফিরল বাজপড়া তালগাছের মতো। কাগজটা সরমার সামনে দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। হাতে নিয়ে ভেতরের পাতায় ছাপানো ছবিটা দেখলেন সরমা, লেখাটা পড়ে উঠতে পারলেন না। চোখ দুটো ছবি থেকেও তাকিয়েছিল সরমারই দিকে।

সেই কাগজটাও আছে। মাদুরের ওপর পেতে দেওয়া মলিন চাদরখানা দিয়েই মোড়া। ওই যে কৌশিকের কাঁধে এখনও, ওরই তো নিয়ে যাওয়ার কথা। সামলে নিতে একটা বছর কেটে গেল। কৌশিক তখন এক মাসের শিশু। কৌশিকের মুখের দিকে তাকিয়েই বুক বাঁধলেন সরমা। মুখ নয়, চোখের দিকে।

গাড়ি স্টার্ট দিয়েছে। সরমা এবারে উঠবেন। আর একবার পেছন ফিরে বাড়িটা দেখলেন। শোবার ঘর-বারান্দা-রান্নাঘর-ডাইনিং স্পেস-বাথরুম। নতুন ফ্ল্যাটে কী নেই? যা-যা এই বাড়িতে ছিল, সবই সেই সুন্দর ঝকঝকে ফ্ল্যাটে সাজিয়ে রেখেছে কৌশিক। কৌশিকেরা। একটা জিনিসই খালি নেই, এই দীর্ঘজীবন, এই সংসারযাত্রা, এই গৃহধর্ম পালন, এর মধ্যেও সমস্ত দায় ও দায়িত্ব পালনের পরেও, কাউকে এতটুকু কম কোথাও না দিয়েও সরমার নিজের জন্য এই বাড়িতে একটা চিলেকোঠা ছিল। যেখানে সরমা একা এবং সম্পূর্ণ। যেখানে সরমা প্রার্থী নন, দাতা।

নতুন বাড়িতে যাবার জন্য পা বাড়ালেন সরমা।

বমাল

ট্রেন থেকে নেমে বাইরে বেরিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। চারিদিক ফাঁকা, শুনশান, এদিক ওদিক কাচ ছড়ানো, দোকানপাটের ঝাঁপ টানা। সাইকেল-স্ট্যান্ডটাও মনে হচ্ছে বন্ধ হয়ে গেছে।

স্টেশন থেকে বাড়ি না-হোক মাইল দেড়েক রাস্তা, সাড়ে দশটায় মফস্‌সল শহরে মধ্যরাত, বিশেষ করে শীতকালে। সাইকেল না পেলে হেঁটেই ফিরতে হবে। চোর-ডাকাতের ভয় নেই। কিন্তু রাস্তার কুকুরগুলোকে নিয়েই চিন্তা। দশ-বারো বছর বয়েসে একবার পেটে চোদ্দোটা ইনজেকশন নিতে হয়েছিল; সেই ভয়াবহ স্মৃতি এখনও মাথা থেকে যায়নি। তার চেয়েও বেশি বিপদ কাল সকালে সাইকেল না থাকলে ছটা বারোর লোকাল যে কী করে ধরব সেই ভাবনায় আজ রাতে ঘুম হবে না।

দাঁড়িয়ে থাকতেও গা-ছমছম করছে। কিছু একটা ঘটে গেছে, তার চিহ্ন এখনও ছড়ানো, আবার যে শুরু হবে না তার কোনও গ্যারান্টি নেই। তাড়াতাড়ি জায়গাটা ছেড়ে চলে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

আপনার জন্যেই বসেছিলাম স্যার!

চমকে উঠলাম। অন্ধকার থেকে কখন বাছা পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে টেরই পাইনি। একদম ঘাড়ের কাছ থেকে কথা বলেছে, আর একটু হলেই খারাপ কিছু হয়ে যেতে পারত। বাহান্ন বছরের পুরনো হার্ট একটু বুঝে সমঝে কথা বললেও তো পারিস!

আজ সন্ধে থেকেই চলছে। জগা আর ফোটনের দল। গোড়ার দিকটায় ইঁট পাটকেল বোতল ছোড়াছুড়ি। একটু আগে পেটোও পড়েছে খান তিন-চার। সবাই ঝাঁপ ফেলে দিয়েছে। আপনি স্যার এই দশটা বাইশে আসবেন, ফিরতে পারবেন না, তাই সাইকেলটা বের করে পেছনে লুকিয়ে বসেছিলাম।

বুকটা কেমন করে উঠল! বাছা—মালিক ওই নামেই ডাকে। তাপ্পি মারা প্যান্ট, শীতেও একটা পাতলা হাফ-হাতা শার্ট, হাওয়াই চপ্পল, সারা গায়ে কালি, আমার জন্যে জেগে সাইকেল পাহারা দিয়ে বসে আছে। মাঝে মাঝে চাকায় হাওয়া ভরে দেয়। টাকাটা আধুলিটা বখশিশ দিই। তার জন্য এতখানি? গরিব বলেই হয়তো! পেটে ভাত পরনে কাপড় জুটলে মূল্যবোধ ওর গা থেকে পুরনো জামার মতো খসে পড়ত।

দুটো টাকা দেবার জন্যে পকেটে হাত ঢুকিয়েও বের করে আনলাম। মনে হল অপমান করা হবে। পিঠে হাত রেখে বললাম, ঠাণ্ডা লেগে যাবে, বাড়ি যা। মনে মনে ঠিক করে রাখলাম, পিকুর ছোট হয়ে যাওয়া একটা সোয়েটার এনে দেব। যেতে গিয়েও ঘুরে দাঁড়াল বাছা।

বলল, স্যার, আপনার সাইকেলের কেরিয়ারে একটা প্যাকেট আছে। অন্য এক বাবুর। আমাকে রাখতে দিয়েছিল সকালে। নিয়ে যাবার কথা ছিল, সন্ধেবেলা গোলমালের মধ্যে মনে হয় আসতে পারেনি। কী আছে জানি না। আমার কাছে রাখলে যদি হারিয়ে যায়!

আপনি রেখে দেবেন? সকালে আসবেন যখন আমি নিয়ে নেব।

মনটা নরম হয়েই ছিল। বাছাকে বললাম, কোনও চিন্তা করিস না। প্যাকেটটা আমার কেরিয়ারেই থাকবে। কাল সকালে যাবার সময় তোকে দিয়ে যাব।

নিশ্চিন্ত হয়ে বাছা চলে গেল। আমিও সাইকেলে উঠে প্যাডল করতে শুরু করলাম।

খানিকটা পথ জিটি রোড। রাত্তিরে শহরের মধ্যে ট্রাক ঢুকতে পায়। বড় বড় মালবোঝাই লরি গোঁ গোঁ করতে করতে আসছে, রাস্তা ছেড়ে পাশে নেমে যাচ্ছি, আবার চলে গেলে রাস্তায় উঠছি। রাস্তায় একলা পেয়ে শীতটাও ফাঁকফোকর গলে গালে গলায় হাত বোলাচ্ছে। একবার দাঁড়িয়ে মাফলারটা ভাল করে জড়িয়ে নিলাম।

কোথায় থাকে? ঝুপড়িটুপড়ি হবে। মাথার ওপরে ছাদ নেই, দরজার ফাঁক দিয়ে ঢুকছে হু হু উত্তরে হাওয়া, ওই তো ছেঁড়া জামা, শীত কাটায় কী করে ছেলেটা? নিজেকে নিয়েই পেরে ওঠে না, তার ওপর কোন এক বাবুর প্যাকেট জিম্মা নিয়ে বসে আছে। ঠিকই করেছে। একটা রাত আমার কাছে নিরাপদে থাকবে, কাল সকালে আমার কাছ থেকে নিয়ে মালিকের হাতে দিয়ে দেবে।

আকাশে থইথই জ্যোৎস্না, চাঁদের আলোয় পথ দেখে সাইকেল চালাতে চালাতে হঠাৎ গান এসে গেল গলায়। এইসব সময়ে রবীন্দ্রনাথ আমার গলায় ভর করেন। উদাত্ত গলায় গেয়ে উঠলাম: জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে।

বসন্তের মাতাল সমীরণ হয়ে দুবার জ্যোৎস্নারাতে ফিরতে না ফিরতেই হঠাৎ আমার গলায় সুরের প্রবাহ ব্রেক কষল। হাত দিয়ে পেছনটা দেখলাম। ঠিক আছে তো? হ্যাঁ, চমৎকার টাইট করে লাগানো আছে কেরিয়ারে। কোনও চিন্তা নেই।

কিন্তু কী আছে ওই প্যাকেটে? বাছার চেনাজানা অন্য কোন এক বাবু প্যাকেটটা রাখতে দিয়েছেন। কেন? নিজের কাছে না রেখে বাছার কাছে রাখা কেন? নিজের কাছে রাখা নিরাপদ নয়, তাই? বাছা গরিব মানুষ, সাইকেল স্ট্যান্ডে কাজ করে খায়, ওকে কেউ সন্দেহ করবে না তাই? কখন দিয়েছে প্যাকেটটা? সকালে? বাছা কি সত্যি কথা বলল? নাকি যখন ঝামেলা চলছিল তখন অন্ধকারে এসে ওর হাতে দিয়ে গেছে? ওই প্যাকেটটার জন্যই ঝামেলা নয় তো? প্যাকেটের মালিকানার হাতবদল? অজান্তেই কখন সাইকেলের স্পিড আস্তে হয়ে গেছে। এক সময় একটা বাড়ির রকের সামনে সিঁড়িতে পা রেখে দাঁড়িয়েও পড়েছি খেয়াল নেই। ঘড়ি দেখলাম। এগারোটা। মৌ চিন্তা করবে। না খেয়ে বসে থাকবে। আবার প্যাডেলে চাপ দিলাম।

কী আছে প্যাকেটটায়? হেরোইন? এই মফস্‌সল শহরেও ড্রাগের চলন বেড়েছে খুব। পাতা-পুরিয়া সবই চলে। তারাবাগের দিকে রাতের অন্ধকারে পুলিশের হাল্লা-গাড়ি তুলেও এনেছে কজনকে। ড্রাগ নিয়ে খুনোখুনিও হয়ে গেছে একটা।

ডলারও হতে পারে। বর্ডারের আশপাশে পুলিশের ধরপাকড় বলে গরম জিনিস তাড়াতাড়ি সরিয়ে দেয়। গুসকরা, বর্ধমান এসবই রিলেটিভলি সেফ্ এরিয়া, সাধারণ মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের বাস। ডলার-টলার নিয়ে পুলিশের মাথাব্যথা নেই। পেটি ক্রিমিনাল সামলেই দিন কেটে যায়।

সোনা-দানা? মনে হয় না, তা হলে ভারী হত। কিন্তু কতটা ভারী হাতে না নিয়ে বুঝব কী করে? সাইকেল দাঁড় করিয়ে পেছনে হাত ঘুরিয়ে প্যাকেটটার গায়ে হাত বোলালাম। শক্ত কিছু নয় বলেই মনে হচ্ছে। কেরিয়ার থেকে খুলে হাতে নিতে ভয় ভয় করল। থাক।

যদি আঙুলের ছাপ-টাপ থেকে যায়।

জালনোটও হতে পারে। পাঁচশো টাকার নোট। নাকি বাজারে যা চলে তার অর্ধেকই জাল। আই এস আই-এর হাত। হতে পারে কয়েকশো জাল পাঁচশো টাকার নোট প্যাকেটটায় ভরা আছে। কাল সকালে যথাস্থানে পৌঁছে যাবে।

মৌ ঠিকই বলে। নিজেকে যতই বুদ্ধিমান মনে করি না কেন, আসলে আমি একটি গাড়ল। কেউ মিষ্টি মিষ্টি দুটো কথা বললেই গলে যাই। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা নেই। বাছা বলল, আর আমি নিয়ে নিলাম? একবারও ভাবলাম না? একবার জানতেও চাইলাম না? ওর সামনে প্যাকেটটা খুলেও তো দেখতে পারতাম!

একবার মনে হল প্যাকেটটা ছুড়ে নর্দমায় ফেলে দিই। পরক্ষণেই ভাবলাম, তাতে বাছা বিপদে পড়ে যাবে। কাল সকালে প্যাকেটের মালিক যখন আসবে, মাল না পেয়ে...বাছাকে খুনও করে ফেলতে পারে। বাছা তো কোনও অন্যায় করেনি। আমার অবিমৃষ্যকারিতায় বাছা কেন শাস্তি পেতে যাবে?

পরক্ষণেই ভাবলাম, বাছাও এর মধ্যে নেই তো? আজকাল তো শোনা যায়, বড় বড় গ্যাং এইরকম নিরীহ ছাপোষা মানুষদের দিয়েই কাজ করায়। তাতে অপারেশনের সুবিধা হয়। রাঘববোয়ালরা আড়ালে থেকে যায়, মরতে মরে গরিব মানুষগুলো।

একটা বোকামি যে করে ফেলেছি তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এখন ভালয় ভালয় রাতটা কাটিয়ে কাল সকালেই বাছার হাতে মালটা হ্যান্ডওভার করতে পারলেই বেঁচে যাই।

ভাবতে ভাবতেই দেখলাম, সামনে বাড়ির দরজা।

মৌ ভাল কিছু রান্না করেছিল: চিংড়ি মাছ বা কাঁকড়া। খাওয়া হলে জিজ্ঞেস করল, কেমন খেলে? ভ্যাবলার মতো তাকিয়ে রইলাম। কী খেলাম কী দিয়ে খেলাম আদৌ খেয়েছি কিনা তাই মনে পড়ছে না!

মৌ মুখ গোমড়া করে বলল, ওই জন্যেই তোমার জন্যে ভাল কিছু রান্না করতে ইচ্ছে করে না। কুমড়োর ঘ্যাঁটই ভাল।

বাসন গুছিয়ে টেবিল মুছছিল মৌ, আমি হাত-মুখ ধুয়ে ওর কাছে গিয়ে বললাম, আজ আমি নীচে শোব।

মৌ অবাক হয়ে গেল। আমাদের বাড়িটার একতলায় রান্নাঘর, খাবার ঘর আর জঞ্জাল রাখার ঘর বাদ দিলে একটাই ঘুপচি ঘর, সেখানে কেউ এলেটেলে শোয়, আমরা দোতলার ঘর দুটোতেই থাকি। বহু কালের মধ্যে নীচে শুইনি।

মৌ জিজ্ঞেস করল, হঠাৎ?

মিথ্যে বলতে গেলে আমার জিভ জড়িয়ে যায়। বললাম, একটা কাজ নিয়ে এসেছি। কালই অফিসে জমা দিতে হবে। অনেক ভোরে উঠে বেরিয়ে যাব। তোমাদের ঘুমের ডিসটার্ব হবে...।

বিশ্বাস করল বলে মনে হল না; তবে ঘুমে চোখ জড়িয়ে এসেছিল। কথা বাড়াল না। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল মৌ।

সাইকেলটা সিঁড়ির তলায় অন্ধকারে ঠেসানো আছে। মুখেচোখে জল ছিটিয়ে পা ধুয়ে ভগবানের নাম করে বিছানায় উঠে শুতে শুতে হঠাৎ মনে হল, প্যাকেটটায় বিস্ফোরক নেই তো, আর ডি এক্স? মাঝরাতে একটা বিস্ফোরণ, সবসুদ্ধ দলাপাকানো মাংসের

পিশু! কাল সন্ধ্যায় টিভিতে ছবি!

এখন আর ভেবে লাভ নেই। এ-পাশ ও-পাশ করছি। মশারি টাঙানো হয়নি। হাতে গালে মশারা কামড়াচ্ছে যথেচ্ছ। কামড়াক। আজ রাতটা ঘুম না আসাই ভাল। জেগে থাকলে অনেক কিছু ম্যানেজ করা যায়। ঘুমের মধ্যেই মানুষ অসহায়। তা ছাড়া এটাই যদি শেষ রাত হয়। অনর্থক ঘুমিয়ে বাজে খরচ করি কেন?

এ-পাশ ও-পাশ করতে করতে কখন যে-দুচোখের পাতা জুড়ে এসেছে টেরই পাইনি। ঘুম ভেঙে গেল জোরে জোরে কড়ানাড়ার শব্দে। অন্যরা জেগে ওঠার আগেই তাড়াতাড়ি গিয়ে জানলা দিয়ে উঁকি মারলাম। জ্যোৎস্নার আলোতেও বুঝতে অসুবিধা হল না, বাড়ির সামনেটায় পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ।

ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে দরজা খুলে দিলাম। আমাকে একরকম ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল আট দশ জনের একটা দল। অফিসার গোছের একজন আমার বুকের ওপর পিস্তলের নল ঠেকিয়ে বলল, আমাদের কাছে খবর আছে কিছু সেনসিটিভ ডিফেন্স-ডকুমেন্ট পাকিস্তানে পাচার করা হচ্ছিল। আমরা পেছনে লেগেছি জানতে পেরে ওরা সাইকেল-স্ট্যান্ডের বাচ্চা বলে একটা ছেলের কাছে সেটা রাখতে দিয়েছিল। ও আবার প্যাকেটটা আপনার হাতে হ্যান্ডওভার করে। আমরা এটাও জানি, আপনিও এই র‍্যাকেটের সঙ্গে কানেকটেড। আমরা বাড়িটা একবার সার্চ করব।

হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

পুলিশ দেখে মনে মনে ঠিকই করে নিয়েছিলাম, সবকিছু খুলে বলে প্যাকেটটা দেখিয়ে দেব। ওরা প্যাকেটটা নিয়ে চলে গেলেই ঝামেলা শেষ। কাল সকালে সত্যিকথাটা বাচ্চাকে বলে দিলেই চলবে।

কিন্তু এখন প্যাকেটটা ওদের হাতে তুলে দিলেও নিস্তার নেই। ওরা তো জেনেই এসেছে যে আমিও এর মধ্যে জড়িয়ে। প্যাকেট হাতে পেলে সেই ধারণাটাই জোরদার হবে। তার চেয়ে একটা রিস্ক নেওয়া যাক। সার্চ করলেও প্যাকেটটা পাওয়া অত সহজ নয়। মুখে হাসি ফুটিয়ে বললাম, আপনাদেরও ভুল হয় অফিসার? যাই হোক, সার্চ করুন, আমি রেডি।

তন্ন তন্ন করে সমস্ত খুঁজে দেখল ওরা। ওপরেও গেল। মধ্যরাতে ঘুম ভেঙে মৌ আর পিকু অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। জিনিসপত্র টেনে নামিয়ে ছত্রাখান করে কোথাও খুঁজে না পেয়ে মুখ চুন করে নেমে এল সবাই। আমার মুখে হাসি। অফিসার সরি বলে বেরোতে যাচ্ছে, হঠাৎ ধড়মড় করে একটা আওয়াজ। এক পুলিশ সিঁড়ির তলায় বাথরুম দেখে ভেতরে ঢুকতে গিয়েছিল, অন্ধকারে দেখতে পায়নি, সাইকেলে হোঁচট খেয়ে উলটে পড়েছে। তার ওপরে কাত হয়ে পড়েছে আমার সাইকেল, এবং সাইকেলের কেরিয়ার থেকে প্যাকেটটা খুলে ছিটকে পড়েছে উঠোনে।

ধুলো ঝেড়ে প্যাকেট হাতে আমার সামনে এসে দাঁড়াল পুলিশ অফিসার। ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট!

চিৎকার করে উঠলাম, না, আমি নির্দোষ।

ঘুম ভেঙে গেল।

কেউ আসেনি। রাত গভীর ও নিঃশব্দ। ঘামে সমস্ত শরীর স্নান করে গেছে। বুকের মধ্যে এখনও ধড়াস ধড়াস আওয়াজ। জিভ শুকিয়ে কাঠ।

এক গ্লাস জল খেয়েও মনে হল ভেতরটা শুকনো। যেন মাঘ নয়, চৈত্রের দাবদাহ। দ্বিতীয় গ্লাসটা ঢালার পর ভেতরের আগুন একটু নিভল। আর ঘুম আসার কোনও প্রশ্ন নেই। এ ঘরে একটা বইও নেই যে খুলে বসে থাকব। গা থেকে চাদর খুলে খাটের ছত্রীতে হেলান দিয়ে ঘড়ির টিকটিক শব্দ শুনতে লাগলাম। অপেক্ষা: কখন ভোর হবে।

সকাল। রোদ এসে পড়েছে বিছানায়। শীতের সকালের নরম রোদ, তাই আরাম লাগছিল। হঠাৎ দরজায় খটখট আওয়াজ। বুকের ভেতরে আবার রক্ত হোঁচট খেল। উঠে দরজা খুলে দিলাম।

রোদ উঠে গেছে, বাইরে লোক চলাচল করছে, গলার আওয়াজও পাচ্ছি অনেকের; তাই দরজা খুলতে দুবার ডাকতে হয়নি। খুলেই অবাক।

বাছা, সঙ্গে আর একজন। সাড়ে ছ'ফুট লম্বা, আমার থাইয়ের চেয়েও চওড়া কব্জি, বাহান্ন ইঞ্চি বুক, দৃষ্টিতে হায়েনার ক্রূরতা।

বাছা আঙুল তুলে দেখাল ইনি, এনার কাছেই রাখতে দিয়েছিলাম আপনার প্যাকেট। মানুষটা কথা বলল না, চোখ দিয়ে ইশারা করল। ইঙ্গিতটা ধরতে অসুবিধা হল না। কথা না বাড়িয়ে চুপচাপ মালটা হ্যান্ডওভার করো।

অত কিছুর অবশ্য দরকার ছিল না। বাছা এবং তার সঙ্গীকে দেখেই পায়ে পায়ে পিছু হটতে শুরু করেছিলাম। কালবিলম্ব না করে ছুটে গেলাম সাইকেলের কাছে।

সিঁড়ির নীচে যেমন রেখেছিলাম কাল রাতে, তেমনি সাইকেলটা দাঁড় করানো আছে। শুধু কেরিয়ারটা খালি। সেখানে কোনও প্যাকেট নেই।

সাইকেল সরিয়ে, কাত করে, উল্টিয়ে, তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলাম, কোথাও প্যাকেটটা নেই। রাতের স্বপ্নের কথা মনে পড়ল—পুলিশ। প্যাকেটটা ছিটকে পড়া। কিন্তু ওটা তো স্বপ্ন। কেউ সাইকেলে হাত দেয়নি। রাতে আসেওনি কেউ। কে নিল প্যাকেটটা?

আমার দেরি দেখেই মনে হয় পায়ে পায়ে ভেতরে ঢুকে এসেছিল বাছা। পেছন পেছন সেই সঙ্গী। বাছা আমাকে হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করল, কী হল স্যার, প্যাকেটটা?

গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোচ্ছে না। কোনও মতে কুঁইকুঁই করে বললাম, এইখানে, সাইকেলের কেরিয়ারে ছিল...

তো? কোথায় গেল?

বাঘের মতো গর্জে উঠল বাছার সঙ্গী।

সকালে বাথরুমে যাবারও সময় পাইনি। ছোটবড় সব একসঙ্গে পেয়ে গেল। বলে ফেললাম,...পাচ্ছি না।

—পাচ্ছি না মানে? হাপিশ? কোথায় সরিয়েছিস এখখুনি বল? নইলে...

বলতে বলতেই বিশাল হাতের মুঠোয় আমার গলার নলিটা চেপে ধরল প্যাকেটের মালিক, অক্লেশে তুলে ফেলল মাটি থেকে। শূন্যে ঝুলতে ঝুলতে চিৎকার করে সকলকে ডাকতে গেলাম, গলা দিয়ে কোনও আওয়াজ বেরুল না।

একটুখানি বাতাসের জন্য ছটফট করতে করতে ঘুম ভেঙে গেল। দেখলাম, খাটের গায়ে হেলান দিয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, সকাল হয়ে গেছে। রোদ এসে পড়েছে ঘরে, পাখি ডাকছে, ওপরে মৌ উঠেছে বোধহয়, খুটখাট আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

খানিকক্ষণ চুপ করে বসে নিশ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হতে দিলাম। তারপর তড়াক করে উঠে ছুটে গেলাম সাইকেলের কাছে। প্যাকেটটা কেরিয়ারে গোঁজা রয়েছে, ঠিক রাতের মতোই।

যথাসময়ে স্টেশনে পৌঁছে বাছার হাতে প্যাকেটটা আমি ফিরিয়ে দিয়েছিলাম।

বিশ্বকাপ অথবা একটা রিকশার টুং টাং শব্দ

এই যে এক ধাত হয়েছে মানুষের, তোমার কী হল কি না হল, কেবল অন্যকে দোষারোপ, এ আমার একেবারে সহ্য হয় না।

রাস্তায় কাটা ডালখানা পড়ে আছে, দেখার কথা তোর, তা তুই কী করলি, না আকাশপানে দু'খানা চোখ, হাঁটতে গিয়ে হোঁচট খেলি, নখটা আঙুল ছেড়ে বাইরে এসে ঝুলে পড়ল, কোথায় আঙুল চেপে মাটিতে বসবি, একটু দুর্ব্বোঘাস লাগাবি, তা নয়, কেরে, কোন ....র ছেলে ডালটা কেটে এইখানে ফেলে রেখেছে, ...চলল আকাশ ফাটিয়ে। এইটা, এইটাই দস্তুর।

তাই মজুমদার যখন বলল, এত তোদেরই কম্মফল, খাবি না ওগরাবি তোদেরই বিবেচনা, আমরা ঘাড় নাড়লাম, হক কথা। একেবারে ন্যায্য কথা। অবিবেচনায় একটা কাজ করে ফেলেছি, পুন্নির বয়স কম, দায়টা আমারই ওপর বেশি বর্তায়, ঠিক সময়ে সামলাতে পারিনি, সুতলির দড়িটা আলগা হয়ে গেছল, তা কী করা? দুষব মজুমদারকে? গাছ, আকাশ, বিছানা বালিশকে? আমরা দুজনেই, মানে আমি আর আমার বিয়ে করা বউ পুন্নি, ঘাড় নাড়লাম ডাইনে বাঁয়ে, মানছি। এবারে বলো কী করা?

মজুমদার মানুষ ভাল, এই যে, ভালকে ভাল বলে স্বীকার করা, এটাও আজকাল কেউ করে না। রীতিটাই উঠে যাচ্ছে। কত কথা! কী? না মজুমদার চশমখোর, মজুমদার গলা কাটে, মজুমদারের কাছে যে যায় সে আর বেঁচে ফেরে না—হয় প্রাণটা যায়, নাহলে সর্বস্ব। কেমন বিচার! কষ্ট করে লেখাপড়া শিখেছে, বাপের পয়সার শ্রাদ্ধ করে ডাক্তার হয়েছে, তবে না আজ এইখানে চেম্বার খুলে বসেছে মজুমদার! কষ্টের দাম নেই? নেবে না পয়সা? এই যে কত দরদ দিয়ে কথা বলল, যত্ন করে দেখল, ওটারই দাম পয়সা দিয়ে মাপা যায় না। দেখেশুনে মজুমদার বলল—আধঘণ্টার ব্যাপার, তারপর তোর পুন্নি আবার আগের পুন্নি, বলে, কেউ বলে আজকাল? অমন করে অন্যের দায়ে ঘাড়টা বাড়িয়ে দেয়?

তবে সেইভাবে ভাবতে গেলে আমাদেরও যে রামশ্যাম দোষ আছে বলা যায় না। রথের মেলায় লোক হয়েছিল বিস্তর, সারাদিন নিশ্বাস ফেলার সময় পাইনি, না আমি না পুন্নি। দু হাঁড়ি ঘুঘনি শেষ, দু বস্তা মুড়ি, দেড়শো কাপ চা। সন্ধেবেলায় ঝাঁপটা নামিয়ে গুনে দেখলাম চারশো আটাশ টাকা। ততক্ষণে পাশের কদমগাছটায় কদম ফুটে গন্ধ ছড়িয়েছে জোর। সারাদিন ঝিরঝিরে বৃষ্টি শেষে মেঘগুলো বেজায় ক্লান্ত হয়ে ঘুমোতে টুমোতে গেছে। চুপিচুপি চাঁদ উঠেছে একখানা। ফটফট করছে জোছনা। চালার ফাঁকফোকর গলে তার এক দু' কুচো পুন্নিমার অর্থাৎ আমার পুন্নির মুখেও পড়তে শুরু করেছে। ও পাশে দলা হয়ে ঘুমোচ্ছে চার বছরের মাখন, পুন্নি আর আমি, এই হতভাগা সনাতন, আমাদের মধ্যে আর কেউ কিছু নেই। হয়ে গেল, হয়েই গেল শেষ পর্যন্ত, ঠিকঠাক বিবেচনা করলে আমাদেরই কি দোষটা তেমন করে দেওয়া যায় আজ্ঞে?

যাক ওসব দোষারোপের গল্প। যা হয়েছে তার তো কোনও চারা নেই। বরং যা হতে পারে তা কেমন করে আটকানো যায় সেজন্যই মজুমদার। আটকানোর রাস্তাটা তো পাঁচ ব্যাটারির টর্চ মেরে ঝকঝকে দেখিয়ে দিল কিন্তু যাবটা কীসে, হেঁটে না পালকিতে? ঝেড়ে কাশো বাবা মজুমদার।

তিন নিই, তোরা কাছের লোক, দুই দিস। ওষুধটষুধ, আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট হারাধন ওরটা, একবেলার ভাড়া, ছুরিকাঁচি সবসুদ্ধ।

শুয়ে পড়লাম সটান। ওটা অব্যেস আছে। জামাকাপড়ের মায়া করলে চলে না। পরে জগার দোকানের একটা বাটি সাবান আর পুন্নির মেহনতে জামার হাল ফিরবে, কিন্তু দু'হাজার?

তারপর দড়ি টানাটানি চলল। একবার এগোয় একবার পিছোয়। বারোশোতে এসে দাঁড়িয়ে গেল। উঠে একেবারে জুতো গলিয়ে বাইরে, ওর থেকে একটা পয়সাও কমে হবে না, সিধে বলে দিলাম। কতখানি রিক্স্ আছে জানিস? থানা পুলিশ হলে কে সামলাবে?

ঘরে ফিরে মাথায় হাত দিয়ে বসলাম দু'জনে। চালাটা উড়ে গেছে দু'চার জায়গায়, ছাইতে হবে, পয়সাগুলো উনুনের ধারে মাটি খুঁড়ে জমিয়ে রাখছিল পুন্নি। বের করে গুনে দেখা হল তাও দেড়শো কম, ধার করতে হবে। বিয়েতে পুন্নির বাপ চারগাছা চুড়ি দিয়েছিল, বার দুই তাকাল ওগুলোর দিকে, আমি কটমট করে তাকাতে চোখ সরিয়ে নিল। কানের দুল দু'খানা আমার দেওয়া। আমার নজর আড়াল করতে হাত দিয়ে কান ঢাকছে না পুন্নি।

যাই হোক, শেষ অবধি জোগাড়যন্তর করে, মাখন আমাদের একটা মাত্তর ছেলে, এখনও সুযোগ পেলে পুন্নির আঁচল সরিয়ে মুখ ঘষে, ওকে পুন্নির দিদির বাড়ি রেখে গঞ্জে সিনেমা দেখতে যাচ্ছি বলে চললাম দু'জনে মজুমদারের আস্তানায়।

ডাক্তারি না করে ব্যবসা করলেও মজুমদারের পয়সায় ওর নাতিপুতি বসে খেত। জায়গাটা কেমন বেছেছে দেখো। পঞ্চাশ পা গেলেই নদীর ঘাট, দিনে আটবার লঞ্চ ছাড়ছে, আর ঘণ্টায় ঘণ্টায় নৌকো। ঢিল ছুঁড়লে বাসস্ট্যান্ড, বাস যাচ্ছে সোজা ইস্টিশান, ঘণ্টা খানেকের রাস্তা। সবচেয়ে বড় কথা মজুমদার একা। 'পাঁচ মিনিটে আরোগ্য' বড় সাইনবোর্ডখানা ইলিশের পেটির মতো রোদে ঝকঝক করে। কোয়াক দু'চারজন আছে, চার-পাঁচশোয় নাবিয়ে দেয়, কিন্তু ভরসা কম। ডিগ্রিও নেই। ডিগ্রির দামই তো পাঁচশো। পাকা দালান, বসার জায়গা, পর্দাঢাকা কেবিন, বেশি নেয় না।

একটা মেয়ে রেখেছে মজুমদার। বিকেলের পর সাকরেদ হারাধন চলে যায়। তারপর মজুমদার আর মেয়েটা থাকে একলা। লোকে কত কিছু বলে, ওই যে, লোকের বড় কথা বলা অব্যেস! কেন থাকে মজুমদারের কাছে? তোদের কাছে থাকে? ক্ষমতা আছে পোষার? ক্ষমতা নেই তাই যত গুজগুজ ফুসফুস। থাকে বেশ করে, তা সেই মেয়েটা হাত ধরে নিয়ে গেল পুন্নিকে। যাবার সময় পুন্নি একবার ফিরে তাকাল। নীচের ঠোঁটটা চেপে রাখল ওপরের ঠোঁটের তলায়। ঠোঁটটা কাঁপত না হলে, চোখ সরিয়ে নিলাম। দালানে নয়, বসলাম গিয়ে নদীর ঢালে।

টাকা পয়সা হিসাব করে বুঝে নিয়েছে আগেই। আর ডাক পড়বে না। লেখে পাঁচ মিনিট। হরেদরে আধঘণ্টা। কত সময় আধঘণ্টা? ঘণ্টায় ঘণ্টায় নৌকো ছাড়ে। একটা

নৌকো ছেড়ে গেল। এখন ভাঁটা। এদিক থেকে যেতে সময় লাগবে বেশি। একটা বউ বাচ্চা নিয়ে ছুটে ছুটে গিয়েও নৌকো পেল না। ঘাটে বসে পড়ল। আবার এক ঘণ্টা। বাস স্ট্যান্ডের দিকে আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। একটা বাস এসেছে। এবার প্যাসেঞ্জার নিয়ে ছাড়বে। ডেকে ডেকে লোক তুলছে। জোরে হর্ন মারল দুবার। আরও অনেকবার বাজবে, তবে না ছাড়ার সময়। এখানকার লোক বোঝে, বাইরে দাঁড়িয়ে চা বিড়ি খায়, গল্প করে, ছাড়ার সময় হলে তবে ওঠে। শীতকালে ছাদে ওঠে, রোদ খেতে খেতে যায়। পরের নৌকোটা এসে গেল। আধঘণ্টা তো পার হয়ে গেল তা হলে? যাই দেখি, মজুমদারের কতদূর!

মজুমদারের ডেরা আজ ফাঁকা। বেশ চুপচাপ। ভেতর থেকেও কোনও আওয়াজ-টাওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না। না মজুমদার না মজুমদারের চেলারা। পুন্নিরও গলা পাওয়া যাচ্ছে না। হলটা কী? কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে, দোনামনা করে, পর্দার ফাঁক দিয়ে মুন্ডুটা গলালাম। মজুমদার একটা চেয়ারে বসে ঘনঘন সিগারেটে টান দিচ্ছে। আমার দিকে চোখ পড়ে গেল, এই যে তোমাকেই খুঁজছিলাম। হয়ে গেছে, এমনিতে ভালই আছে। তবে রক্তটা একটু বেশি পড়ছে। চিন্তা নেই। বন্ধ হয়ে যাবে। তা তোমার বউয়ের আগে রক্ত পড়ার ধাতটাত ছিল নাকি? রক্ত পড়ার ধাত? কই মনে পড়ে না তো! বরং বেশ শক্তপোক্তই ছিল পুন্নি। কেটেকুটে গেলে ঝটপট রক্ত বন্ধ হয়ে যেত। বুকের মধ্যে গুড়গুড় করল আমার। শুকনো ঠোঁট দুটো জিভ দিয়ে চেটে নিয়ে বললাম, কেমন আছে পুন্নি? একটু দেখা যাবে?

হ্যাঁ হ্যাঁ কেন যাবে না? যাও, চটিটা খুলে চলে যাও পাশের ঘরে। শুয়ে আছে তোমার বউ।

পাশের ঘরে ঢুকতেই একটা গন্ধ এসে লাগল নাকে, ঝাঁজঝাঁজ মিষ্টি মিষ্টি, চোখটা ধাঁধিয়ে গিয়েছিল, সইয়ে নিয়ে দেখলাম একটা টেবিলের ওপর শুয়ে আছে পুন্নি। চোখ বোজা, ঘরের তুলোটুলো পরিষ্কার করে একটা বালতিতে ফেলছে সেই মেয়েটা। পুন্নির পাশে গিয়ে কপালে একটা হাত দিলাম। চোখ খুলল। হাসল। মুখ নামিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ঠিক আছ? ঘাড় নাড়ল, বলল, ব্যথা।

মেয়েটা বাইরে যেতে বলল। বাইরে গিয়ে বসলাম। নৌকো আসে যায়। নদীতে জোয়ার এল, সরেও গেল। পেটের মধ্যে একটা খিদে নড়ে চড়ে আবার তলিয়ে গেল। মজুমদার সাইকেলে চড়ে বাড়ি গেল। খেতে বোধ হয়। ফিরল বিকেল গড়িয়ে। ভেতরে ঢুকল।

বেরোয় না। বাস এল আর একটা। এটার পর আর একটাই বাস। নৌকো অবশ্য আছে সন্ধে পর্যন্ত। হারাধন এল, তোমাকে ডাক্তারবাবু ডাকছেন। ভেতরে গেলাম।

মজুমদার চেয়ারে বসে আছে সোজা, কপালে ঘাম, সামনে একটা টুল, দেখিয়ে বসতে বলল। পেছনে এসে দাঁড়াল হারাধন, মেয়েটা।

তোমার বউয়ের ব্যাপারটায়, কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিল ডাক্তার, একটু ঝামেলা হয়েছে বুঝেছ। এমনিতে সব ঠিকঠাকই আছে, তবে ব্লিডিংটা বন্ধ হচ্ছে না। মনে হয় রক্ত দিতে হবে, তা এখানে তো সে সব ব্যবস্থা নেই। শহরে যেতে হবে। তবে, আর একটাও গোলমাল হয়েছে। ওর পেচ্ছাপটা বন্ধ হয়ে গেছে, মুখচোখও ফোলা ফোলা লাগছে, আমি বলি কী, শহরে গিয়ে সময় নষ্ট না করে সোজা কলকাতা চলে যাও।

মাটিটা দুলে উঠল সামান্য। কলকাতা? বার দুয়েক কলকাতা গেছি। হাওড়া ব্রিজ, গঙ্গা, কোলে মার্কেট, কালীঘাট। গোলকধাঁধা মনে হয়। কোথায় যাব, কী করব? দুশো টাকা হাতে গুঁজে দিল মজুমদার। বাসটা দাঁড়িয়ে আছে, দেরি কোরো না, এখনি রওনা হলে ছ'টা বাইশের ট্রেনটা পেয়ে যাবে।

পুন্নিকে বাইরে টেনে বের করে ঝাঁপ বন্ধ করে সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে উধাও হয়ে গেল মজুমদার। রোদ শুকিয়ে আসছে, খেয়া ধরার জন্য বিকেলের ফিরতি মানুষজন জড়ো হচ্ছে, নদীটাও বিকেলে গা এলিয়ে দিয়েছে কেমন। আমাকে আর পুন্নিকে একলা ফেলে রেখে এই যে চলে গেল মজুমদারকে আমি কিন্তু দোষ দিই না। যতখানি সাধ্য ও করেছে, যখন পারেনি জবাব দিয়েছে। তাও ঘাড় ধরে নদীতে ঠেলে ফেলে দেয়নি। অতবড় মান্যি গন্যি মানুষটা টুলে বসতে দিয়েছে, কথা বলেছে ভাল করে। জানে হাতে পয়সা নেই, দুশো টাকা গুঁজে দিয়েছে জোর করে। তবু মানুষটার দোষ ধরব?

বাসে দ্যাখো। পুন্নিটা দাঁড়াতে পারছে না, ভিড় বাস ড্রাইভারের কেবিনে শুইয়ে দিল, বাসেরই লোকজন তো! একা পুন্নিকে নিয়ে ইস্টিশানে নামলাম, বাসের গেটে দাঁড়িয়ে লোক ডাকে যে ছেলেটা যেচে এসে জিজ্ঞেস করল, পারবে তো নিয়ে যেতে? ওরও কিছু দেরি হয়ে যাচ্ছে। তবু বলল। না বললেও তো পারত!

ট্রেনে যে বাবুরা পুন্নিকে সিট থেকে নামিয়ে দিল তারাও অন্যায্য কিছু বলেনি। একে তো বসার সিট, পুন্নি শুয়ে পড়েছিল একা চারজনের সিট দখল করে, ওরা আর কেমন করে জানবে পুন্নি বসতেই পারছে না! তার ওপর ওর জামাকাপড়ে ব্যান্ডেজ ভিজিয়ে রক্তের দাগ লাগছিল। নোংরা গন্ধ। তাও বাবুরা নয়। একজন দিদিমণিই নাক সিঁটকে চিৎকার করে উঠল, ইস, ম্যাগো। পুন্নিটারও ঘটে বুদ্ধিসুদ্ধি আছে। গুটিগুটি আমার সঙ্গে উঠে বাইরেটায় চলে এল। যেখানটায় ওপর থেকে হাতল ঝোলে দরজা দিয়ে উঠেই, সেই জায়গাটায়। তারপর আঁচল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। আর কী হাওয়া! আদতে ভালই হল, সারাদিনের ক্লান্তি, চোখটা জড়িয়ে এল।

শিয়ালদা স্টেশনে লোকজন নামার সময় ডেকে দিয়ে গেল। সেও তো মানুষকে কেউ মাথার দিব্যি দেয়নি। রাত হয়েছে, লোকজন কম। কোনও রকমে আমার গায়ে হেলান দিয়ে হাঁটি হাঁটি পা পা করে পুন্নি স্টেশনের দরজা অবধি এসে শুয়ে পড়ল। কালো কোট পরে বাবু দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিল। কাছে এল। কী ব্যাপার? টিকিট? আমার মুখ দেখে বুঝতে পারল টিকিট নেই। বললাম, রোগা বউটাকে নিয়ে সোজা চলে এসেছি। টিকিট কাটতে পারিনি। বাবুর দয়ার শরীর। হাসল। বলল, বুঝেছি। দাও, দশটা টাকা দাও, ছেড়ে দিচ্ছি। একটা চালাকি বুদ্ধি এল? বললাম—দশ টাকা তো নেই, পাঁচ টাকা দিচ্ছি। টাকাটা নিতে নিতে বাবু বলল, এক প্যাকেট সিগারেটের দামও হবে না যে! যাকগে, বউয়ের অসুখ বলছ, যাও।

পুন্নি মাটিতেই পড়েছিল। কোলে তুলে নিতে গিয়ে বুঝলাম শাড়িটাড়ি ভিজে সপসপ করছে। হাত আলোয় ধরলাম, রক্ত।

বাইরে বেরিয়ে দেখলাম লোকজন কম, এদিক ওদিক শুয়ে আছে অনেকে, একপাশে রান্না হচ্ছে। আকাশে মেঘ জমেছে, বিদ্যুৎ চমকাল। অনেকটা হেঁটে এসেছি পুন্নিকে কোলে নিয়ে, নামিয়ে রাখব?

হঠাৎ টুং টাং করে ঘণ্টা বাজিয়ে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল এক রিকশাওলা। টানা

রিকশা। আমাদের ওদিকে নেই। বিহারি। কথাবার্তা ভাল বুঝতে পারলাম না। এক ঝটকায় আমার কোল থেকে পুন্নিকে নিয়ে রিকশায় ফেলল। আমাকে দেখিয়ে উঠে বসতে বলল। উঠলাম। ও রিকশাটা টেনে তুলতে পড়ে যাই আর কি? পুন্নিও ঘোরের মধ্যে বলে উঠল মাগো।

কাছেই একটা হাসপাতাল। বড় বড় বাড়ি। অত রাতেও লোক গিসগিস করছে। একটা চালাতে রিকশা নামিয়ে রিকশাওলা আঙুল দেখাল ভেতরে। ভেতরে গেলাম। কয়েকজন মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে। কাচের ঘরের মধ্যে আরও ক'জন। ক'টা বেঞ্চি, সবুজ প্লাস্টিক মোড়া, তাতে দু'চারজন শুয়ে কাতরাচ্ছে, একটা লোকের হাত কেটে ঝুলছে, ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছে, বাবাগো মাগো চেঁচাচ্ছে। একটা মোটা মতন লোক এসে তার গালে একটা থাপ্পড় কষিয়ে বলল, চোপ, আরও চেঁচালে ও হাতটাও কেটে নেব।

হকচকিয়ে ভাবছি কী করব, দেখি রিকশাওলা ততক্ষণে পুন্নিকে বয়ে এনে বেঞ্চিতে শুইয়েছে। দেখে কাচের আড়াল থেকে দু'জন এল। একজন পুন্নির কাছে গেল, একজন এল আমার কাছে। গলাটা যতখানি গম্ভীর করা যায় করে জিজ্ঞেস করল, কী কেস?

গলাটা শুকিয়ে গিয়েছিল। এক গ্লাস জল পেলে ভাল হত ভাবছি। শুনলাম, এ তো রক্তে ভেসে যাচ্ছে দেখছি। খোঁচাখুঁচি করে মেরে এনেছে মেয়েটাকে। মুখ চোখ ফুলে গেছে। কী হে কাগজপত্র আছে কিছু?

মনে পড়ল, মজুমদার একটা কাগজ দিয়েছিল। তিন পকেট হাতড়ে কাগজখানা বের করে দিলাম। পড়ে টড়ে আমার হাতে কাগজটা ফিরিয়ে দিয়ে চলে গেল দু বাবু।

বসে আছি। মশা কামড়াচ্ছে। গুড়গুড় করে মেঘ ডাকল বৃষ্টি আসবে মনে হচ্ছে। পুন্নি পড়ে আছে বেঞ্চিতে। কেউ আসেও না, ওষুধও দেয় না। কাচের আড়ালে দুই বাবুকে দেখাও যাচ্ছে না। উঠে গেলাম। সেই দুম্বোমতো লোকটা বসেছিল, কী ব্যাপার? ততক্ষণে গলায় স্বর এসেছে। বললাম। ও চোখ তুলে দেখল। তারপর টেবিল থেকে একটা কাগজ এনে হাতে দিল—হাঁ, ডাক্তারবাবুরা দেখে লিখে দিয়েছেন, এখানে হবে না, বড় হাসপাতালে নিয়ে যাও।

ছোট মুখে বড় কথা তবু জিজ্ঞেস করলাম—ডাক্তারবাবুরা?

ওনারাও তো মানুষ। সেই সকাল থেকে তোমাদের জন্যে মুখে রক্ত তুলছেন। এখন গেছেন একটু বিশ্রাম করতে। যাও, তোমাদের কাগজ লেখা রয়েছে, নিয়ে বড় হাসপাতালে চলে যাও।

বড় হাসপাতাল! মজুমদার বলেছিল কলকাতায় বড় হাসপাতাল। এত বড় বাড়ি থইথই লোক এখন এই মাঝরাত্তিরেও চা বিক্রি হচ্ছে, কিনে খাবার লোকেরও অভাব নেই, এর চেয়েও বড় হাসপাতাল? লোকটা একটা নাম বলেছিল, ঠিকানাও। বাইরে বৃষ্টি নেমেছে। এখন গুঁড়িগুড়ি, ঝমঝমিয়ে নামবে শিগগিরি। পুন্নিটা ক্রমশ ফ্যাকাশে আর নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে। কী করি? রিকশাওলা যে এই অবধি দিয়ে গিয়েছিল তাকেও তো আর দেখা যাচ্ছে না। ভাবতে ভাবতে বৃষ্টিতে না ভিজে যতদূর যাওয়া যায় সেই চাতাল অবধি এগিয়ে গেলাম। আরে! রিকশাওলা তো যায়নি! এদিকেই তাকিয়ে বসে আছে। কাছে গেলাম। আমার কথা আমার ভাষাতেই বললাম। মাঝবয়সী মানুষটা, কাঁচাপাকা গোঁফ, ঘাড় নাড়ল। আমাকে সঙ্গে করে ভেতরে গেল। পুন্নিকে দু'জনে মিলে ধরে

তুললাম রিকশায়। রিকশা চলল ঘণ্টা বাজিয়ে।

রাতের কলকাতা! শান বাঁধানো রাস্তা। একটা দুটো গাড়ি যাচ্ছে হর্ন বাজিয়ে। রাস্তিরেও ঝকঝকে আলো লাল-নীল-সবুজ। জ্বলছে নিবছে। রাস্তার মোড়ে আলো। বাড়ির ছাদে আলো। আলোয় কোমরে হাত বাইকে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুন্দর মতো একটা ছেলে, তার গলা জড়িয়ে একটা মেয়ে, একটা উঁচু বাড়ির ছাদে ছবিটা ঝিকমিক করছে। পুন্নি জেগে থাকলে বলত—মাগো কী অসভ্য!

বৃষ্টি জোরে নামল। ছাঁটে ভিজে যাচ্ছে পুন্নির শাড়ির নীচটা। আমার হাঁটু অবধি ধুতি। আর আমার সামনে সেই মানুষটার ঘাড় গলা পিঠ হয়ে নেমে আসছে স্রোত, পা ডুবে যাচ্ছে জলে, ছপছপ করে শব্দ হচ্ছে। রাতের কলকাতা জাগিয়ে আমরা যাচ্ছি বড় হাসপাতাল।

এই হাসপাতালটা দেখতে কিন্তু তেমন বড় নয়। উঁচু উঁচু বাড়ি নেই তেমন। একতলা একটা দালানের সামনে রিকশাটা দাঁড় করিয়ে রিকশাওলা দেখিয়ে দিল ভেতর। ভেতরের চেহারাটায় অবশ্য আগেরটার সঙ্গে তেমন বিশেষ ফারাক নেই। পুন্নিকে আবার একটা বেঞ্চিতে শোয়ানো হল। একজন এসে দেখে গেল। কিছুক্ষণ পরেই হাতে একটা কাগজ ধরিয়ে বলল—স্যালাইন দিতে হবে, এগুলো কিনে নিয়ে এসো। কিছুই চিনি না। আমাকে খুঁজতে হল না। মানুষটা বৃষ্টি আড়াল করে দাঁড়িয়ে কাঁধের গামছা নিংড়ে মাথা মুছছিল। বৃষ্টিতে নামল আবার।

ওষুধ ইঞ্জেকশন, স্যালাইনের বোতল সব কিনে ফিরে এলাম। দিলাম ডাক্তারবাবুর হাতে, কটাকট পুন্নির হাত বিঁধিয়ে ছুঁচ ঢোকানো হল। বোতল থেকে জল এসে ঢুকছে পুন্নির হাতে, ঢলঢল করছে শাঁখা। সাদা শাড়ি পরা দিদিমণি এসে শাঁখাটা ওপরে তুলে ব্যান্ডেজ জড়িয়ে দিল, ক'গাছা চুড়ি আর দুটো কানের দুল আমার হাতে দিয়ে বলল—রাখুন, নইলে চুরি হয়ে যাবে।

এইসব চলছিল যখন, খেয়াল করিনি আমার বন্ধুকে। আমার সঙ্গে ভেতর অবধি এসেছিল একবার দেখেছিলাম। কিছু একটা করার চেষ্টা হচ্ছে, দেখেছিল মানুষটা, তারপর সব চালু হয়ে গেলে গলার কাছে আটকে থাকা নিশ্বাসটা চুপি চুপি হাওয়ায় ঢেলে ফেলে ঘাড় ঘোরালাম যখন, ওকে আর দেখতে পেলাম না। বাইরে এলাম। বৃষ্টি থেমে গেছে। আকাশ সামান্য ফিকে হচ্ছে। পাখি ডাকছে। একটা রিকশা টুং টাং করতে করতে এসে দাঁড়াল। রোগী নামছে সামনে, গাছতলায়, রাস্তার ওপর খুঁজে এলাম। নেই। রিকশাটাও নেই! কী যেন নাম? কই নামটাও জিজ্ঞেস করা হয়নি! লোক বাড়ছে। নানা বয়সের লোকজন। রোগী আত্মীয়স্বজন। হাসপাতাল চত্বর ভরে যাচ্ছে ভিড়ে। অথচ আমার এত একা লাগছে।

ভেতরে এলাম। চোখ বুজে পড়ে আছে পুন্নি। নিশ্বাসে ছোট্ট বুকটা ওঠানামা করছে। বোতলটা শেষ হয়ে এসেছে। দিদিমণি এসে নাড়ি দেখে গেল। টেবিলের ওপাশে ডাক্তারবাবু এসে বসেছে এতক্ষণে। চা খাচ্ছে। নিমকি বিস্কুট। ভয়ে ভয়ে কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। চোখ তুলল।

কী ব্যাপার?

পুন্নি। ওই যে, আঙুল দিয়ে দেখালাম।

ভাল নেই। কিডনি বোঝ? কিডনির অসুখ। কাজ করছে না। রক্ত সাফ্ করতে হবে।

ভর্তি করা দরকার। অপেক্ষা করো। একটু পরে সামনের ঘরে বড় ডাক্তারবাবু বসবেন। দেখে ভর্তি করে নেবেন।

বাইরে এলাম। কাল দুপুর থেকে খাওয়া নেই। জলটুকুও খাবার সময় পাইনি। চা বিক্রি করছে একজন কাগজের গ্লাসে। চা নিলাম, একটা চিনি দেওয়া বিস্কুট। দুটো টাকা নিয়ে নিল। গাছতলায় বসে বসে চাটা খেলাম। গ্লাসটা ফেললাম না। একপাশে একটা উঁচু কল থেকে জল পড়ছিল। গ্লাস ভর্তি করে তিন গ্লাস জল খেয়ে নিলাম। ভেতরটা জুড়োল।

বড় ডাক্তারবাবু যে ঘরটায় বসবেন তার সামনের ভিড় দেখে আমার তো পিলে চমকে গেল। লাল রঙের একটা পোস্টকার্ড-এর মতো কাগজ কিনতে হল একটাকা দিয়ে।

সেটা ভেতরে পাঠিয়ে অপেক্ষা। কত মানুষ দূর দূর থেকে এসেছে। এই ডাক্তারবাবুর নাম নাকি দেশজোড়া। একবার ছুঁয়ে দিলেই রোগ সেরে যায়। পুন্নিকে শুইয়ে রেখেছি একটা সিমেন্টের বেঞ্চিতে। সারি সারি রোগী। কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে। পুন্নিটা বড্ড ঝিমিয়ে গেছে। মুখচোখও ফুলে গেছে। কথা বলছে না। হেঁচকি তুলছে মাঝে মাঝে।

হঠাৎ ভিড়টা নড়ে উঠল। আসছেন। আসছেন। ঘাড় তুলে দেখলাম। চোখ দুটো জুড়িয়ে গেল। কী সৌম্য চেহারা! কী রূপ! রং যেন ফেটে পড়ছে। মাথা উঁচু করে আস্তে আস্তে ডাক্তারবাবু ঢুকলেন। একটা গন্ধ ডাক্তারবাবুর গা থেকে ছড়িয়ে পড়ল দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের মধ্যে, ঠিক দেবতার গা থেকে যে গন্ধ বেরোয়।

এক একজনের ডাক পড়ে যায়, দেখিয়ে বেরিয়ে আসে। কেউ কেউ অপেক্ষা করে, ভর্তি হবে, পরে আবার ডাক পড়বে। কতক্ষণ পর কে যেন পুন্নির নাম ধরে ডাকল। ধড়মড় করে উঠে পুন্নিকে কোলে নিয়ে ভেতরে গেলাম। ভেতরে ধপধপে বিছানা। পুন্নিকে শোয়ালাম। পুন্নির জামাকাপড়ে রক্ত জমাট হয়ে আছে, রক্ত এখনও পড়ছে বোধহয়। তার দাগ লাগল বিছানায়। তেড়ে উঠল একজন, একটু পরিষ্কার টরিষ্কার করে আনতে পারো না? দিলে তো চাদরটা নষ্ট করে।

ডাক্তারবাবু এলেন। বুকে নল বসালেন। হাতের কাগজটা পড়লেন মন দিয়ে। তারপর আমার দিকে তাকালেন। আহা কী দরদ সে চোখে! আদর মাখানো গলায় বললেন, বাইরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিন, ভর্তি হলেই ডাক পড়বে আবার। রোগী ভাল নেই, ভর্তি হওয়া দরকার।

বাইরে পুন্নিকে শুইয়ে দিলাম আবার। অপেক্ষা। ভিড় খালি হয়ে গেল। ডাক্তারবাবু একসময় বেরিয়ে এলেন। ছুটে গেলাম, আমারটা কী হল ডাক্তারবাবু, ভর্তি?

ডাক্তারবাবু ঘুরলেন, সরি বেড খালি নেই, ভর্তি করা গেল না। এক সপ্তাহ পর আসুন, চেষ্টা করব।

ডাক্তারবাবু চলে গেলেন। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম। কী করি? ডাক্তারবাবু দেবতুল্য লোক। কত চেষ্টা করেছিলেন। বেড খালি না থাকলে কী করেন? কিন্তু পুন্নিকে নিয়ে এখন কোথায় যাই?

অনেকক্ষণ ধরেই একটা লোক ঘুরঘুর করছিল। পাশে এসে বসল। একটা বিড়ি এগিয়ে দিল—চলে? খাই, কিন্তু এখন কিছুই ইচ্ছে করছে না। না বললাম, লোকটা বিড়ির মাথাটা দুবার মাটিতে ঠুকে ঠোঁটে চাপল, ধরাল, মুখ থেকে বিড়িটা নামিয়ে

জিজ্ঞেস করল—কী ভর্তি হল?

ঘাড় নাড়লাম। মানুষটা আবার জিজ্ঞেস করল—কে হয়? বললাম। গলা নামাল। কিডনি খারাপ হয়ে গেছে, এখুনি ভর্তি করে ডায়ালিসিস করা দরকার, নইলে বাঁচবে না।

ডায়ালিসিস কথাটা শুনে শুনে মুখস্থ হয়ে গেছে। লোকটা আমার মনের কথাই বলেছে। ক্রমশ ঝিমিয়ে পড়ছে পুন্নি। হেঁচকিটা ঘনঘন হচ্ছে।

চুপ করে আমার দিকে তাকিয়েছিল লোকটা। ইশারায় উঠে আসতে বলল। একটা ঘর খালি, তার মধ্যে ডেকে নিয়ে গেল। বলল—শোনো ভাই, তোমাকে দেখে আমার খারাপ লাগছে। এত কষ্ট করে স্ত্রীকে নিয়ে এসেছ। কিন্তু বাঁচাতে পারবে না। এখানে বেড খালি নেই। ভর্তি হবে না। ডায়ালিসিস করলেই রোগী কিন্তু ভাল হয়ে যাবে। .....বিড়িতে দুটো জোর টান মেরে পায়ের নীচে পিষল লোকটা। হাজার পাঁচেক টাকা খরচ করতে পারবে?

কত? মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল আমার।

পাঁচ হাজার। অত চমকাচ্ছ কেন? তেমন তেমন পার্টি হলে দশ পনেরো হাজার বলতাম। তোমাকে দেখে আমার মায়া হল তাই.... তা ঠিকই বলেছে মানুষটা। চোখের তারায় মায়া ঝিলিক মারছে। পুন্নিকে বাঁচানোর কথাই তো বলছে ও। মনে মনে হিসাব করলাম। দুল আর চুড়ি ক' গাছা বেচে কত হবে? নাঃ পাঁচ হবে না।

চার পর্যন্ত দিতে পারি, তাও গয়না বেচে। আর ক্ষমতা নেই আমার।

একটু ভাবল লোকটা। তারপর চোখের নিমেষে উধাও হয়ে গেল। ফিরে এল একটা সাদা গাড়ি নিয়ে, ভয় নেই, উঠে পড়ো।

পুন্নিকে নিয়ে উঠলাম। প্যাঁপোঁ আওয়াজ করে গাড়ি ছুটল ঝড়ের মতো। একটা রং ওঠা দোতলা বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দু'জন লোক দরজা খোলার জন্য ছুটে এল। পুন্নিকে একটা চাকাওলা গাড়িতে বসিয়ে সোজা চলে গেল ভেতরে।

আমাকে নিয়ে লোকটা বাইরে জানলার কাছে গেল। একজন বসে আছে। তার কাছে কাগজপত্র জমা দিলাম। লোকটা ওখানেই আমাকে ছেড়ে অ্যাম্বুলেন্সে চড়ে আবার ফিরে গেল।

গুটি গুটি ভেতরে ঢুকলাম। একটা অন্ধকার ঘরে শুইয়েছে পুন্নিকে। জামাকাপড় ছাড়িয়ে একটা ডোরাকাটা শেমিজ পরিয়েছে গলা পর্যন্ত। একজন মেয়েছেলে বেরিয়ে বলল—আপনার স্ত্রী? হ্যাঁ বললাম। বলল—একটু পরেই ডায়ালিসিস হবে, অপেক্ষা করুন, স্যার আসবেন।

চুপ করে বসেছিলাম। হঠাৎ সেই গন্ধ। অগুরু চন্দন, ধূপ, ঘি সব মেশানো এক দৈব গন্ধ। ডাক্তারবাবু এসেছেন। উঠে দাঁড়ালাম। আরে একটু আগেই তো ডাক্তারবাবুকে হাসপাতালে দেখলাম। সেই চেহারা, সেই হাসি। কাঁধে হাত রাখলেন, ঘাবড়াবেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে। যাক, আর কোনও চিন্তা নেই। হাসপাতালে বেড খালি ছিল না, দয়ার শরীর, তাই এখানে চলে এসেছেন, পুন্নি যাতে বেঁচে যায়।

দরজা বন্ধ হয়ে গেল। বাইরে একটা টুলে বসে রইলাম। অনেকক্ষণ পর ডাক্তারবাবু বেরোলেন। আবার কাঁধে হাত। ডায়ালিসিস শুরু করে দিয়েছি, কাল দুপুরের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে। পারলে একটু রক্ত জোগাড় করুন। লম্বা মানুষটা সোজা হেঁটে চলে গেলেন বাইরে, গাড়ি ছাড়ার আওয়াজ পেলাম।

একজন দিদিমণি গোছের বাইরে এল। শুনুন আপনি যে টাকা জমা দিয়েছেন ওতে তো হবে না। আরও টাকা লাগবে। রক্তও দিতে হবে। আমাদের এখানে রক্ত অবশ্য পাওয়া যায়, তা সে জন্যও পাঁচশো টাকা জমা দিতে হবে। শিগগির আপনি কাউন্টারে টাকা জমা দিন।

বাইরে এলাম। জিজ্ঞেস করে একটা সোনারুপোর দোকানে গেলাম। দুল দুটো, চুড়ি ক'খানা খাঁটি সোনার আমি জানি। তবুও দরদস্তুর করল, বলল—গিল্টি। হাতে পায়ে ধরে চার হাজার টাকা নিয়ে ফিরে এলাম। সেই জানলার লোকটার হাতে টাকাটা জমা দিলাম।

সন্ধে গড়িয়ে রাত হল। টুলে বসে আছি। ঘরের মধ্যে পুন্নি। একটা গোঙানির আওয়াজ আসছে কিছুক্ষণ হল। দরজাটা একটু ফাঁক করলাম। অন্ধকার ঘর। আবছা আলোয় চোখ সইয়ে দেখলাম পুন্নি একাই শুয়ে আছে, আর কেউ নেই। পা টিপে টিপে কাছে গেলাম। পাশে কীসের বোতল ঝুলছে, পুন্নির পেটের মধ্যে একটা নল বেঁধানো। জ্ঞান নেই। মুখ দিয়ে ফেনার মতো উঠছে। বিছানার চাদরটা মুঠো করে ধরেছে। মনে হল কষ্ট হচ্ছে।

দিদিমণিরা কোথায় গেল? ওপরে একটা হইহল্লা হচ্ছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠলাম আওয়াজ না করে। একটা ঘরে আলো জ্বলছে। অনেকগুলো মানুষ, গলা শোনা যাচ্ছে। আস্তে আস্তে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। একটা টিভি। ও জিনিস গ্রামেও আমি দেখেছি। তফাতের মধ্যে হালদারদের টিভির ছবিগুলো সাদাকালো। এটা রঙে ঝলমল করছে। ছুটছে কতগুলো মানুষ। বল খেলছে! আমরাও কাদায় খেলেছি কত। আমার ছায়া পড়ল বোধ হয়। একজন মুখ ঘোরাল কী ব্যাপার?

আমার রুগিটা, ছটফট করছে, আওয়াজ করছে। মনে হয় কষ্ট হচ্ছে।

কিছু হবে না। ওরকম একটু হয়। আপনি বাইরে গিয়ে বসুন। চিন্তা করবেন না।

ওপাশ থেকে একজন বলল, কী দরকার! আপনিও আসুন। বিশ্বকাপের খেলা হচ্ছে। বসুন, দেখুন আমাদের সঙ্গে। দরজা থেকে সরে এলাম। আবার সিঁড়ি ধরে ধরে নীচে নামতে থাকলাম। সারাদিন কষ্ট করে, এখন খেলা দেখছে। থাক। বিরক্ত করে লাভ নেই। পুন্নির ঘরের সামনে গেলাম। হঠাৎই একটা চিৎকার উঠল, গোল! ওপরে টেবিল চাপড়ানোর আওয়াজ, নাচানাচি, লাফালাফির শব্দ। মুন্ডুটা গলালাম দরজা দিয়ে, না, পুন্নি আর চেঁচামেচি করছে না। খুবই শান্ত চুপচাপ ঘুমিয়ে রয়েছে পুন্নি।

পায়ে পায়ে বাইরে এলাম। একটা ভেজা, ঠান্ডা হাওয়া মুখে এসে লাগল। নির্জন রাস্তা। আলোগুলোও কেমন যেন নিস্তেজ আর মরা মরা। টাকা পয়সা জমা দিয়ে দিয়েছি। পুন্নিকে ওরা আটকাবে না। কিন্তু তারপর?

কলকাতার জনহীন রাস্তায় কান পেতে রইলাম আমি। দূর থেকে বিশ্বকাপের চিৎকার ভেসে আসছে। কিছুই শুনছি না। আমার এখন একটাই শব্দের বড় প্রয়োজন, একটা রিকশার টুং টাং আওয়াজ।

বর্ণপরিচয়

রং চেনে না মিতুল। লাল, সবুজ, হলুদ, নীল কিছু নয়। শুধু সাদাটা চেনে। আর কালো। তাও সাদা যে সাদা আর কালো কালো ছাড়া অন্য কিছু নয়, সেটা গুলিয়ে ফ্যালে।

পাঁচ বছরের বড় দাদা রাহুল বাবাকে গিয়ে বলে, মিতুলটা কী বোকা জানো তো বাবা?

চোখের সামনে থেকে কাগজ সরিয়ে বাবা তাঁর বড় ছেলের দিকে তাকান।

রাহুল বলে, মিতুল সাদা দেয়াল দেখিয়ে বলল, কুচকুচে সাদা।

আর কালোকে? সত্যিকারের বিস্মিত দেখায় বাবাকে।

ও কালো চেনেই না। কী বোকা না?

রাহুলের হাসিতে যোগ দিতে গিয়েও চোয়াল আটকে যায় বাবার। ব্যাপারটা মোটেও হাসির নয়। মিতুলের বয়েস তিন হলে কী হবে? জীবনের প্রথম এবং সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষাটাই ওর সামনে। অতএব অফিস থেকে ছুটি নিয়ে মিতুলের হাত ধরে বেরুতে হয় বাবাকে।

পার্কের সবুজ ঘাসে লাল বল ছুটে বেড়ায়। পেছন পেছন মিতুল। কাছেই লোহার বেঞ্চিতে বাবা।

ছুটতে ছুটতে ঘেমে লাল হয়ে বাবার হাত ধরে টানাটানি করে মিতুল। চলো না, খেলি।

বেশ, খেলব। তার আগে বলো, এই বলের রং কী?

মিতুল তার পাতলা ঠোঁট খুলে কী বলব ভেবে থমকে যায়।

বাবা বলেন, বলের রং লাল।

মিতুল আওড়ায়, বলের রং লাল।

ঘাসের ওপর দুজনে ছুটতে ছুটতে গড়িয়ে পড়ে। গাছের পাতায় আঙুল ছুঁইয়ে বাবা জিজ্ঞেস করেন, মিতুল, পাতার রং কী?

মিতুল জবাব দেয়, বলে দাও।

বাবা বলেন, পাতার রং সবুজ।

মিতুল বলে, পাতার রং সবুজ।

ক্লান্ত হয়ে দুজনে চিত হয়ে শুয়ে থাকে। ওপরে হেমন্তের আকাশ। আকাশের দিকে আঙুল তুলে বাবা দেখান, ওটা কী মিতুল?

মিতুল তাকিয়ে থাকে।

বাবা বলেন, ওটা আকাশ।

মিতুল বলে, আকাশ।

বাবা: আকাশের রং নীল।

মিতুল: আকাশ নীল।

আর আকাশের মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছে ওইগুলো মেঘ।

মেঘ।

মেঘের রং সাদা। সাদা মেঘ।

সাদা মেঘ।

একসময় মিতুল নিজে নিজেই বলতে শেখে, লাল বল, সবুজ পাতা, নীল আকাশ, আর সাদা মেঘ।

আর বাইরে, ঘাসের ওপর আকাশের নীচে নয়। মায়ের কাছে পড়তে বসে মিতুল। পরীক্ষা এগিয়ে এসেছে।

বইয়ের পাতায় চৌকোনা আকাশ, সেখানে এক কোনায় লাজুক একটা মেঘ। আকাশে আঙুল ঠেকিয়ে মায়ের জিজ্ঞাসা, হোয়াট কালার ইজ দ্য স্কাই?

স্কাই? মানে আকাশ? আকাশের রং নীল।

স্টুপিড। নীল নয়, বলো ব্লু। দ্য স্কাই ইজ্ ব্লু।

মিতুলের ঠোঁট ততক্ষণে সাদা। মিতুল বলে, দ্য স্কাই ইজ্ ব্লু। পরের ছবি গাছ, গাছের পাতা, এমনকী একটা প্রজাপতি।

হোয়াট কালার ইজ্ দ্য লিফ্?

লিফ্? ঢোঁক গেলে মিতুল।

হ্যাঁ, লিফ্, বলো, লিফ-এর কী কালার?

লিফ মানে পাতা?

হ্যাঁ হ্যাঁ পাতা, পাতার কী কালার?

সবুজ।

থাপ্পড়ের শব্দটা পাশের ঘর থেকেও শোনা যায়। টিভির ভল্যুম জোরে করে দেন বাবা। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে মুখস্থ করে মিতুল, আকাশ মানে স্কাই, স্কাই-এর রং ব্লু। নীল মানে ব্লু, সবুজ মানে গ্রিন, সাদা মানে হোয়াইট।

অবশেষে বাবা-মার হাত ধরে মিতুল পৌঁছয় বিবর্ণ নির্জীব একটা তিনতলা বাড়ির একতলায়। সেখানে আকাশ বাইরের গেটেই ফুরিয়ে যায়, দরজায় বড় বড় করে লেখা, ঘাস-পাতা-প্রজাপতি এখানে ঢোকা বারণ। মস্ত একখানা হলঘরে আরও অনেক মিতুল অপেক্ষা করছে। অথচ ঘরটা কবরখানার মতো ....

সকাল থেকে অপেক্ষা করতে করতে খিদে পেয়ে যায় মিতুলের। প্যাকেট খুলে বিস্কুট দেওয়া হয় তাকে, ওয়াটার বটল্ থেকে জল। এক সময় মার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ে মিতুল।

কাকডাকা দুপুরে মিতুলের যখন ডাক পড়ে একরকম হিঁচড়ে টেনে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় একটা ঠান্ডা ঘরে। বাবা-মার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় আরও ছোট আরও অন্ধকার অন্য একটা ঘরে।

ঘুমে জড়িয়ে আসা চোখ কোনওরকমে খুলে মিতুল দ্যাখে তার চারপাশে কুচকুচে দেওয়াল, আর খুব কাছে এক আন্টি। হাতের লম্বা লম্বা নখ আর পুরু দুই ঠোঁট টকটক করছে লাল।

সকাল থেকে একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে করতে ক্লান্ত ও বিরক্ত আন্টি মিতুলের চোখের সামনে লাল চোখ নিয়ে জানতে চাইলেন, হোয়াট কালার ইজ দ্য স্কাই?

ওপরে-নীচে চারপাশে আন্টির মুখ-চোখ-আঙুল ও ঠোঁটে কোথাও একবিন্দুও আকাশ খুঁজে না পেয়ে মিতুল বলে ফেলল, লাল মানে রেড।

রিগ্রেট লেটার এসেছিল। স্কুলে ভর্তি হতে পারেনি মিতুল।

তার চেয়েও বড় কথা, মিতুলের আকাশ-মেঘ-ঘাস-পাতা সবকিছুর রংই এখন টকটকে লাল।

ডাক্তার বলেছেন, সারতে সময় লাগবে।